Cu 12 - Ho (992 - 3 - 25345

১৩০ ... ১ম সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, এ. এ. সি. এস, শ্রীযুক্ত বাধাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস, শ্রীযুক্ত রাখাল গণেশ দেউস্কর, শ্রীযুক্ত হরসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার বি, এ, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, শ্রীযুক্তা বিনয়কুমারী বসু ও অন্যান্য।

3

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। [illegible]	...	১৯। [illegible]	...
২। [illegible]	...	১২। [illegible]	...
৩। [illegible]	...	১৩। [illegible]	...
৪। [illegible]	...	[illegible]	...
৫। [illegible]	...	[illegible]	...
৬। [illegible]	...	[illegible]	...
৭। [illegible]	...	১৪। [illegible]	...
৮। [illegible]	...	১৫। [illegible]	...
৯। [illegible]	...	১৬। [illegible]	...
১০। [illegible]	...	১৭। [illegible]	...
১১। [illegible]	...	১৮। [illegible]	...

কলিকাতা;

১৩৯ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৯ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৯।

বিজ্ঞাপন।

আমরা সকলকে জানাইতেছি যে, কলিকাতা এবং মফস্বলের যে সকল গ্রাহক এখনও মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা যেন ভি, পি, যোগে মূল্য পাঠাইবেন।

৩৫ নং বলরাম দত্তের লেন। } শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

হারমোনিয়ম-শিক্ষক।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পাশ্চাত্য সাঙ্গীতিক প্রণালী হারমোনিয়ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ সুবিধা হইবে, তাহা সেই সময়ে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। বিনা শিক্ষকে হারমোনিয়ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে এই পুস্তক অবশ্য ক্রয় করিবেন। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পংক্তি, ৩২ নং বাহুড়বাগান ষ্ট্রীটের ছাপা, কলিকাতা। এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে নাবিকগণ সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

উপনিষদ্।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য, এই ছয়খানি উপনিষদ। মূলসহিত, শাঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতি হইতে সারভাগ ও নানা বিষয়ের টীকাটিপ্পনী সংগ্রহ করিয়া, সরল ও সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রবোধচন্দ্র সাধক কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহিত। ইহা পাঠ করিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সমস্ত উপনিষদের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। মূল্য ১৲ টাকা। ১০৷১২ নং খাঁপাড়ার গলি, শ্যামবাজার অন্তর্গত নাবিকের অন্বেষণে পাঠাইলে ভি, পি, যোগে পাঠান যায়।

চৈতালী তন্ত্রী।

(নূতন কবিতাপুস্তক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

ছোট গল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

এই গ্রন্থে গল্পের বিস্তার অধিক নহে। পৃষ্ঠা এক শত। এই গ্রন্থে গল্পের বিস্তার অধিক নহে, এমন পুস্তকগুলি ২০৷২৫ খানা কপি করিয়া লইতে, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাঠান যায়।

NOTICE

The undersigned begs to inform the public that he is willing to undertake any kind of Copying Work in Colours or in the Shades as may be required at moderate charges.

Nabacoomar Nath Sharma

64, Shib Narain Shaw's Lane, Calcutta.

৯। সহযোগী সাহিত্য ... ...
১০। ২৮৭
১১। ... সাহিত্য ... ২৮৯
১২। ... সমাজনীতি ... ২৯৫
১৩। ... জীবনচরিত ... ২৯৯
১৪। পাখের বই (গল্প) ৩১৩
১৫। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৩১৫

ভাদ্র ।

১। রাজা বিশ্বজিৎ মিত্র ৩১৭
২। হেমু ৩৩৩
৩। সহযোগী সাহিত্য ... ৩৪১—৩৪৩
৩। সাহিত্য ৩৪১
৩। জীবনচরিত ৩৪৩
৩। সমাজনীতি ৩৪৩
৪। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম ৩৫৪
৫। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৩৬৯
৬। বৈজ্ঞানিক সংবাদ ... ৩৯৩
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৩৯৫
৮। সাময়িক সমালোচনা ... ৪০৩

আশ্বিন ।

১। একটি পুরাতন বিষয় ... ৪১১
২। মাধবাচার্য্য ও মহম্মদাদ ... ৪২৯
৩। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৪৩৯
৪। অপূর্ব্বসম্মিলন ৪৫৪
৫। বৈজ্ঞানিক সংবাদ ... ৪৫৭
৬। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৪৫৮
৭। সহযোগী সাহিত্য ... ৪৭৭—৪৮৮
৭। সাহিত্য ৪৭৭
৭। সমাজনীতি ৪৮১
৮। ৪৮৬

৯। ৪৮৮
১০। ৪৯৩
১১। ৪৯৫
১২। ৪৯৭
১৩। ৪৯৯
১৪। ৫০১
১৫। ৫০৩
১৬। ৫০৫
১৭। ৫০৭
১৮। ৫০৯
১৯। ৫১১

৯। মাধবী (উপন্যাস) ১৪৬
১০। সাংবাৎসরিশ্রাদ্ধ ১৪৭
১১। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ... ১৪৯
১২। বঙ্গভাষা (কবিতা) ... ১৫৩
১৩। সহযোগী সাহিত্য ... ১৫৭—১৬৫
২। সাহিত্য ১৫৭
২। সমাজতত্ত্ব ১৬০
৩। শিক্ষা ও শিক্ষা ১৬১
১৪। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ...

আষাঢ়।

১। মাধুরী ১৭১
২। য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবী ১৮৫
৩। পত্রমাদু ... ১৯৫
৪। সমাজ (উপন্যাস) ... ১৯৭
৫। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... ২০৫
৬। অপরাধবিজ্ঞান ... ২১০
৭। আদি বেদান্ত ... ২১৫
৮। আইরমা ... ২২৩
৯। বাক্‌চরবাদ ও আদিবাদ ... ২৩০
১০। সহযোগী সাহিত্য ... ২৩২—২৩৯
১। রাজনীতি ... ২৩২
২। সাহিত্য ... ২৩৪
৩। সমাজনীতি ... ২৩৮
১১। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ...

শ্রাবণ।

১। মধুসূদনের সময়ের কথা ...
কবিবন্ধুকে চিত্রকরের অনুরোধ
২। সরাপলী মহাভারত ...
৩। রহিম খাঁর কবিতা ... ২৫৩

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দন্ত-শোধন চূর্ণ।

[illegible] কতিপয় চমিক্ষ ডাক্তার, কবিরাজ ও দন্তচিকিৎসকের [illegible] পরীক্ষা করিয়া এই [illegible] চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তি [illegible] দাঁত পরিষ্কার [illegible] দাঁতের বিশেষ উপকার দর্শে, তাহার অনেক প্রশংসা [illegible] করিতেছি। [illegible] যাহাতে কি বালী, কি বৃদ্ধ, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন, সে জন্য [illegible] অতি-সুলভ করিয়াম। এবং বিশ্বাস করি ইহা ব্যবহার করিয়া [illegible]

ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, দাঁত উজ্জ্বল হইবে, মুখের দুর্গন্ধ [illegible] বিনাশ করিবে। দন্তগত, জিহ্বাগত বা মুখগত সকল প্রকার [illegible] অপরিষ্কার দূর করিবে। দাঁতের গোড়া শক্ত হইয়া, দন্তপড়া নিবারণ হইবে।

চারি প্রকার ভিন্নের। আবশ্যক হইলে কাঁচের কার্টিয়ে [illegible] হয়। [illegible] কৌটার মূল্য ১০, ১৫, ৫০ ও ৬০ আনা মাত্র। কেবল চূর্ণের [illegible] প্রতি ছটাক ১০ দশ আনা। [illegible] কিনিতে চাহিলে [illegible]

এতদ্ভিন্ন কয়েক প্রকার [illegible] আছে, যাহা এম, এ, [illegible]

"আমি, আউলস, আলেনের হাতের [illegible] চূর্ণ, তাহার [illegible] অতিশয় [illegible] দ্বারা, দাঁতগুলি [illegible] হইয়া যে [illegible] হয়, তাহা আরোগ্য হয় এবং [illegible] গোড়া শক্ত হয়। এই দন্ত-শোধন চূর্ণ ব্যবহার করিয়া [illegible] দন্তের যাবতীয় বিকার [illegible] করিয়াছি।" [illegible]

[illegible]

[illegible]

CHEAP OLD BOOKS.

The New Science of Healing or the Doctrine of the [illegible] Diseases forming the basis of a uniform Method of cure without [illegible] new with Instruction and Advice for the Healthy and the Sick by [illegible] Volume. Rs. 5.

Am I ill or Sick? A vade-mecum for every one, by Dutta, [illegible] পড়িলে [illegible] ঔষধ ও চিকিৎসকের [illegible]

Valuable Rare Books on drama and the East Asiatic Journal [illegible] Quarterly Register devoted to Topics on India and the East. Nearly Bound, [illegible] Rare Production.

Pennethorne and Robertson's The geometry and optics of Ancient Architecture Illustrated by examples from Thebes, Athens and Rome [illegible] large plates, some splendidly executed in colours and gold and also [illegible] of Text, large Volume, Atlas folio, half morocco new Price [illegible]

Bombay quarterly Review 8 Vols. [illegible] Calcutta Review old Numbers [illegible] each, Asiatic Researches 8 Seeds, Sir William Jones's works Complete 6 vols Royal [illegible] G. A. Grierson's Bihar Peasant Life in Behar 8-8, Stuart's History of Bengal Original Edition, 10-0

R. B. MITRA.

[illegible] Hidaram Banerjee's Lane, Bowbazar Calcutta.

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জ্বর প্লীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজার অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানবাসী, কি পঞ্জাবিবাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-স্ত্রীর বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু! বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-রমণী বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়। সুতরাং, যাঁহার জ্বরভাবের উপক্রম হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু জ্বালা, হাত পা জ্বালা করিতেছে, যাঁহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে; যাঁহার ক্ষুধা হয় না, যাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, যাঁহার কাসি সর্দ্দি হইয়াছে,—এই বেলা বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে না। বিজয়া বটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-প্লীহা-যকৃতাদি রোগে ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টার যাঁহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—ডাক্তার কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরাম হইতেছেন;—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর প্রতিবেশীবৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, আসামের কালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার #	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১॥৵০	।০	৵০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	২৪৪	৪।০	।০	৵০

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়ুগ্রাম, পোষ্ট সাদিপুর, বর্দ্ধমান—স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে. সি. বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—
সিলারিশন রোড, পটলডাঙ্গা
এণ্ড কোম্পানী

কুন্তলীন

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও শ্রীসম্পাদনকারী
মনোহর সুগন্ধি তৈল।

সুবাসিত কুন্তলীন	... ...	১৲
পদ্মগন্ধ কুন্তলীন	... ...	১৷৷০
গোলাপগন্ধ কুন্তলীন	... ...	২৲

উপরোক্ত সমস্ত তৈলের নমুনা বিনামূল্যে কেবলমাত্র ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচের জন্য ছয় আনার টিকিট পাঠাইলেই পাঠান হইবে।

বঙ্গদেশ, আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ লোক এখন কুন্তলীন রীতিমত ব্যবহার করিতেছেন। কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, একবার ব্যবহার করিয়া দেখিলে, অন্য কোন তৈল ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইবে না।

এইচ বসু,
"বীণা পার্ফিউমারি"
কলিকাতা।

চিত্রসূচী।

১। বঙ্কিম বাবুর চিত্র ... ... ৬৮ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে

২। ভূদেব বাবুর ছবি ... ... ১৫৩ পৃষ্ঠার পর

৩। ভূদেব বাবুর বাড়ী ... ... ১৫৬ পৃষ্ঠার পর

৪। নক্ষত্রচক্র ... ... ৯২ পৃষ্ঠার পর

৫। প্রাচীন গৌড়ের মানচিত্র ... ... ৬৩৩ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে

৬। রাজা দিগম্বর মিত্র ... ... ৩০৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে

৮। বৃজকমল গোস্বামী ... ৫৮৪
৭। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৫৯০
৮। মহারাষ্ট্র সাহিত্য ৬০১
৯। ভারত সৃষ্টি ৬১৩
১০। নীরকাশেম ৬২৬
১১। সহযোগী সাহিত্য ... ৬৩৬—৬৭
১। রাজনীতি ৬৩৬
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৬৫৬
৩। বিবিধ ৬৫৮
১২। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৬৬৮

মাঘ।

১। লক্ষ্মণাবতী ৬৬৯
২। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ... ৬৫৩
৩। কামেটেশ্বর ৬৫৬
৪। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... ৬৬৪
৫। নীরকাশেম ৬৬৯
৬। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৬৭৩
৭। অপূর্ব্ব যন্ত্র ৬৮০
৮। মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য ৬৮৫
৯। সহযোগী সাহিত্য ... ৬৯৫—৭০২
১। সমাজনীতি ৬৯৫
২। সাহিত্য ৬৯৬
৩। বিবিধ ৭০০
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৭০২

ফাল্গুন।

১। সরস্বতী ৭১৫
২। আত্মা কি ? ৭২৩
৩। কেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য ... ৭২৬
৪। নীরকাশেম ৭৩২
৫। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৭৩৮
৬। সহযোগী সাহিত্য ... ৭৫৩—৭৫৯
১। নূতন পুস্তক ৭৫৩
২। ভেকীসিংহের প্রত্যাচার ... ৭৫৬
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৭৫৯
৮। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ... ৭৬৫

চৈত্র।

১। হর্ষ্মান হেলমহোল্‌টজ্ ... ৭৭৭
২। প্রবাসযাত্রা ৭৮৯
৩। অপরাধবিজ্ঞান ৭৯৪
৪। বাতপ্রতিষেধ ৭৯৯
৫। নীরকাশেম ৮০৩
৬। অমল-ধবল (রহস্য) ... ৮১৩
৭। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ... ৮১৯
৮। সহযোগী সাহিত্য ... ৮২৩—৮৩৭
১। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৮২৩
২। সমাজনীতি ৮২৭
৩। সাহিত্য ৮২৯
৯। ঘাস কবিতা ... ৮৩০—৮৩৮
রূপপূজা ৮৩৫
অরূপপূজা ৮৩৬
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৮৩৮
১১। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ... ৮৪৭

সেকশুভোদয়া।

বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় হস্তলিখিত গ্রন্থ।

মালদহ জেলার অন্তর্গত পাঁড়ুয়া নগরে "বাইশহাজারি" নামক পীরোত্তর বা "বক্‌ফ্" সম্পত্তি-সংসৃষ্ট মসজীদে পরিরক্ষিত।

বসা[illegible]৯২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে উক্ত মসজীদ পরিদর্শন [illegible] দ্বারা উক্ত যা[illegible] প্রথমে সি এই পুস্তকের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হই। [illegible] সংস্কৃত সন গণিত হইয়াছিল; গ্রন্থের মূল সময় লিপি শকাব্দেই ছিল, অনুমান ৮০। কিন্তু লিপিকরের অজ্ঞতাবশতঃ তাহা "শাকে বিক্রমাদিত্যস্য" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে=১১২৫ শকে বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ব বাঙ্গলায় পলায়ন করেন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে সাহ জালাল লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী গৌড় নগরে আগমন করিয়াছিলেন দেখা যায়।

বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের প্রকৃত সময় ১১২৪ শকাব্দ। ঐ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে একটি শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা এই সেকশুভোদয়া গ্রন্থেই এক স্থানে দেখা যায়। সেই শ্লোক এই:—

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্কঃ সমুপাগতঃ॥"—

গ্রন্থের মধ্যে ইহাও লিখিত আছে যে, সাহজালাল গৌড়ে উপস্থিত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই—তিনি লক্ষ্মণ সেনকে একটি কুলক্ষণ দেখিয়া, ছিলেন, "মহারাজ! আপনার এই রাজধানী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে।—" য বৎসর বখ্‌তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন, সেই বৎ- ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সাহজালাল গৌড় নগরে আসিয়াছিলেন, তছে।

সেন হিন্দু রাজা হইয়াও এক জন মুসলমান ফকীরকে মসজীদ নির্ম্মা- ও তথায় দান খয়রাতের জন্য যে প্রভূত পরিমাণে ভূমি দান করিয়া- স্থানে স্থান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহারই বিবরণ গ্রন্থে লিখিত

বাবু গিরিশনারায়ণ রায় আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে লইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এ প্রদেশে ২৪ পুরুষ বাস করিয়াছেন। তাহা হইলে প্রায় ছয় শত বৎসর তাঁহারা এ দেশের বাসিন্দা। জগন্নাথ রায় হইতে গিরিশনারায়ণ রায় নয় পুরুষ। তাহা হইলে প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে জগন্নাথ রায় বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রন্থের যে প্রতিলিপি এক্ষণে বর্ত্তমান, উহা জগন্নাথ রায়ের পাঠার্থ লিখিত হইয়াছিল, দেখা যায়। ইহার বয়স প্রায় ২২৫ বৎসর।

বাবু গিরিশনারায়ণ রায় আরো লিখিয়াছেন;

"রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সময় সাহ জালালুদ্দীন বুজরুকি দেখাইয়া এই সম্পত্তি রাজা লক্ষ্মণ সেনের নিকট প্রাপ্ত হন। এবং সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর, সা জালাল আপন ইষ্টদেব, অর্থাৎ খানে-খোদাকে সমর্পণ করেন। এবং এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, সম্পত্তির আয় হইতে মেলা মবারক ও দীনদরিদ্র ও চেরাক্ রৌশনী এবং নিয়ত নিত্য নৈমিত্তিক খয়রাৎ হইতে থাকে। এজন্য তাঁহার বিরাদর সা মেমৎতুল্লা অলীকে মতবল্লীর পদে নিযুক্ত করিয়া, সেই জালাল সাহেব তবরেজ সহরে যান। তৎপর তিনি তবরেজ সহরে থাকিয়া মেমৎতুল্লা অলীর নানারূপ বদনাম শুনেন। অর্থাৎ খয়রাৎ আদি যে সকল কার্য্য মতবল্লীর করা কর্ত্তব্য তাহা না করায় পুনরায় পাণ্ডুয়ার মেলার সময় সা জালাল সে সকল দুর্ণাম প্রত্যক্ষরূপে দেখিবেন বলিয়া আসেন। এবং প্রত্যক্ষরূপে বিশৃঙ্খল এবং খয়রাৎ আদি বন্ধ দেখিয়া মতবল্লীর প্রতি রাগান্বিত হইয়া অভিসম্পাৎ করেন, এবং সেই দিবসেই অভিসম্পাৎ অনুসারে মতবল্লীর মৃত্যু হয়। স্বজাতি দ্বারায় ভালরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না বিবেচনায় পুনরায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ জগন্নাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষকে ধার্ম্মিক বলিয়া এবং উপযুক্ত লোক বিবেচনায় হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের পদে অভিষিক্ত করিয়া মতবল্লী কার্য্যনির্ব্বাহজন্য বরেন্দ্রে দিনাজপুর জেলার অধীন বাশোড় গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং কার্য্যাদি উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া পুনরায় পশ্চিম তবরেজ সহরে যান। সেই সময় হইতে মতবল্লীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মহেন্দ্রনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত মতবল্লীর অর্থাৎ চৌধুরীর পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এ সম্পত্তি রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরে মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনে ছিল। নবাব সেরাজউদ্দৌলার আমলেও কতক দিন মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র কিঙ্করনারায়ণ রায় মতবল্লী ছিলেন। সেরাজউদ্দৌলা নবাব সাহেব কিঙ্করনারায়ণ রায়কে বলেন, তুমি হিন্দু, মুসলমানি করিতেছ, অতএব তুমি মুসলমানিধর্ম্ম অবলম্বন কর, নচেৎ মতবল্লীর পদ থাকিবে না। রায় মজকুর মুসলমান হইতে স্বীকার না হওয়ায় মতবল্লীর পদ নবাবের মীরমুন্সী অর্থাৎ বর্ত্তমান মতবল্লীর পরদাদা সৈয়দ সদরুদ্দীনকে নিযুক্ত করিয়া এই সম্পত্তি তাঁহাকে অর্পণ করেন।"

বাবু গিরিশনারায়ণ আরো লেখেন যে, সেকশুভোদয়া নামক রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত লিখিয়া সাহজালালকে প্রদান করে। সাহজালাল সেই পুস্তক উক্ত বাবুর পূর্ব্বপুরুষকে চৌধুরীনিয়োগের সময় বলেন যে,

"এই গ্রন্থখানি তোমরা যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। যতদিন এই গ্রন্থ তোমরা রাখিবে, তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না, আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তোষ থাকিব। সাহ জালালের আজ্ঞাক্রমে আমাদের পুরুষানুক্রমে এই গ্রন্থ পূজা করিয়া আসিতেছিলেন এবং আমিও পূজা করিয়া থাকি।"

গ্রন্থখানি যদিও অনেক কাল্পনিক উপন্যাসে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে দুই একটি ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে স্থানে রাজা লক্ষ্মণ সেন আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন; তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। একটি অতি প্রাচীন হিন্দু গোষ্ঠীতে বাঙ্গলা দেশের শেষ হিন্দুরাজবংশের ইতিহাস অন্ততঃ কিয়ৎপ্রকারে কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে জানা যায়। লক্ষ্মণ সেনের এই আত্মবংশের বিবরণপাঠেই ইহাকে হলায়ুধের রচনা বলিতে আমাদের অভিরুচি হয় না; কেন না, ইহাতে লক্ষ্মণ সেনের বংশ যে সাত পুরুষ এদেশে রাজত্ব করিবেন, ইহা লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেন বিজয় সেন ইহাতে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছেন; বাস্তবিক ইতিহাসে জানা যায়, লক্ষ্মণ সেনের পর চারি জন সেনবংশীয় রাজা (মাধব সেন, কেশব সেন, শূর সেন, দনৌজা মাধব) পূর্ব্ব বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দনৌজা মাধবের পর সেনবংশ বিলুপ্ত হয়। ইহাতে গ্রন্থস্থিত সেনবংশের বিবরণ যে দনৌজা মাধবের পর লিখিত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাহা হইলেও এই সপ্ত সংখ্যার ঐতিহাসিকতাতে গ্রন্থবিবরণ যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ দেখা যায়।

ফলতঃ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে লাক্ষণ্য সেন নামক এক সেনবংশীয় রাজার কল্পনা করেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এই গ্রন্থে যে লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ আছে, তিনি ১১২৪ শকাব্দে তুরুষ্কগণ কর্ত্তৃক বঙ্গের পশ্চিম ভাগ অধিকৃত হইবার সময়ে এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বিজয়সেনের পৌত্র এবং বল্লাল সেনের পুত্র।

মুসলমান লেখকেরা যে এই লক্ষ্মণ সেনকে লছমনিয়া বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। মালদহনিবাসী ৺ এলাহী বক্স মুন্সী পারসী ভাষায় স্বরচিত "খোরশেদ জাহানুমা" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—

"লক্ষ্মণ রা আহ্‌ল-এ-এসলাম আলেফ্ তহকীর দর-আখেরস্ অফজুদা বনাম লখমনিয়া হম্-নভসতা-অন্দ্।"—

অর্থাৎ, "লক্ষ্মণকে মুসলমানেরা অবজ্ঞাসূচক আলেফ্ অক্ষরের চিহ্ন শেষে যোগ করিয়া দিয়া লখমনিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন।"—

অতএব দেশীয় ভাষায় লক্ষ্মণ ও মুসলমান লেখকদের লখমনিয়া সমান। যিনি জনকতক অশ্বারোহীর ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন, বীরত্বাভিমানী মুসলমান লেখকেরা যে তাঁহাকে অবজ্ঞাসূচক "লখমনিয়া" নাম প্রদান করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি?

বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে এক্ষণে লাক্ষ্মণ্য সেন নামক রাজাকে একবারে বিদায় দিতে হইবে। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণই যে বখতিয়ারের ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিলেন, প্রাচীন কুলাচার্য্যদের গ্রন্থেও তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। হরিমিশ্র নামক প্রাচীন কুলাচার্য্য (বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩২৬ পৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন,

বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাবলঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিঞ্চাপ্যকরোদ্দন্দে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনোজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
ভূতৎসভায়াং বহবো আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥"

লক্ষ্মণ সেন যে, বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে স্বদেশেও তাঁহার ঘোর কলঙ্ক হইয়াছিল। তিনি যে স্বভাবতঃ ভীরু ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু, বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে অতর্কিতভাবে গূঢ় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ কুক্ষণে ভয়াভিভূত হইয়া, তিনি পলায়ন করেন। তদীয় ভয়রূপ দোষ তাঁহার গ্রহবৈগুণ্যবশতঃই ঘটিয়াছিল, ইহা উক্ত শ্লোকের মর্ম্ম, এবং সেই ভয়ে বিনা রণে যবনসৈন্যের নিকট হইতে পলাইয়া তিনি ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র মাধব অল্প কাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অপর পুত্র কেশব রাজ্য প্রাপ্ত হন। পিতা যে রণস্থল হইতে পলায়ন করেন, কেশব সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন, এবং পাপের ক্ষালনার্থে ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ধন দান করিয়া, গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও পূর্ব্ব বঙ্গে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং "মতিঞ্চাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে" অর্থাৎ মুসলমানগণ আক্রমণ করিলে যুদ্ধদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

এই সময়ে বেদপন্থী রাজা গৌড় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, মুসলমানদের ভয়ে ব্রাহ্মণেরা আর সে দেশে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেনবংশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রমশঃ পূর্ব্ব বাঙ্গলায় গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব বঙ্গে বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার ঐতিহাসিক হেতু। পরে কেশবের পৌত্র দনৌজা মাধব যৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন গৌড় হইতে অনেক সদ্বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ, পলাইয়া আসিয়া তাঁহার সভায় আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন।

সেকশুভোদয়া গ্রন্থে যে স্থানে লক্ষ্মণ সেন, সাহজালালকে আপনার বংশের পরিচয় দিতেছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল,—

"শ্রুত্বা চ সকলাং তস্য যোগিনশ্চ কথাং শুভাং।
রাজানং ব্রতবান্ সেকঃ স্বকীয়াং কথ্যতাং কথা॥

সলজ্জো রাজা সেকভয়েন কথয়তি। রাজোবাচ। মমাখ্যানং শৃণুত। মম পিতামহো বিজয়সেনঃ স অতীব দরিদ্রঃ শিবভক্তশ্চ তস্য জীব্যং ত্রিত্যং কাষ্ঠচয়নং-কৃত্বা সপ্তবুটিকা কপর্দ্দকঞ্চ প্রাপ্নোতি কলত্রভয়েন তত্র চৌর্য্যং কৃত্বা, পঞ্চটকপর্দ্দকং জীব্বা নিত্যং শিবং পূজয়তি। আশ্বিনে মাসি একস্মিন্ দিবসে অতিশয়বৃষ্টিহেতোঃ কাষ্ঠচয়নং ন ভূতং, তদ্দিনে দাত্রখণ্ডং বল্কঞ্চ দত্ত্বা স গৃহিণ্যৈ সপ্তবুটিকান্ দত্তবান্। অপরদিনে মম পিতামহো যস্য গৃহে দাত্রবল্কং দত্ত্বা স্তে তত্র গতঃ তস্মৈ বহুতরকাকুবাদং কৃত্বা দাত্রং ন প্রাপ্তবান্, ততো মন্দং মন্দং গৃহং গচ্ছন্ চিন্তয়ামাস ময়ি গৃহং গতে গৃহিণী তিরস্কারং করিষ্যতি। তস্মাদহং প্রান্তরে বিল্ববৃক্ষতলে তিষ্ঠামি শিবার্চ্চাপি ন ভূতা ইতি কৃত্বা বিল্ববৃক্ষতলে স্থিতঃ, কিয়দ্রাত্রৌ শিবং সংস্মৃত্য শয়িতঃ। অথং কার্পটিকো ব্যাঘ্রেন পশ্চাৎ খাদ্যত ইতি কৃত্বা শিবঃ তত্রাগত্য তমবদিত্,—ভোঃ কার্পটিক কিং ম্রিয়তে? কার্পটিকোঽবদৎ ভবতস্তেন কিং—মং যানাসি নিদ্রালুরসৌ যাহং নিদ্রালুঃ। যাগর্ম্মহং মম বস্ত্রাদিকং নেতু মাগতোসি নগুড়হস্তং যাং ন পশ্যসি গম্যতাং। পুনস্ত্বাহ শিবঃ। ব্যাঘ্রেণ ত্বং হন্তব্যঃ উত্থায় পলায়তাং দুর্গতঃ স শিবমুবাচ ত্বং দুর্গতঃ। মম পুত্রঃ কলত্রঞ্চ বিদ্যতে গেহে ভগ্নশিলা বিদ্যতে কলসে তণ্ডুলকণা বিদ্যতে তত কথং দুর্গতোঽহং পুনঃ শিবেনোক্ত ত্বং গৃহং গচ্ছ অরণ্যে কথং তিষ্ঠসি স শিবমাহ অহং দাত্রখণ্ডং বল্কঞ্চ দত্ত্বাগ্নি সোঽস্মাকং ন দত্তবান্ দাত্রং ভবতাং বচসা গৃহং গচ্ছামি মম ভার্য্যা মুখরা মাং তর্জ্জিষ্যতি মম শিরায় মন্দং ধরিষ্যতি চ তস্মাদ্গৃহং ন গচ্ছামি ত্বমস্মাকং গতকথাং ন যাসি এতস্মিন্ সময়ে বালপালো রাজা অনপনেন গর্ত্তকামো গঙ্গায়ামবতিষ্ঠতে ক্রন্দতো লোকানাং রায়পালোঽবাদীত্ ভো জনপাদাঃ মনোজ্ঞানি সর্ব্বাণি পালয়িষ্যথ ময়া শিবপ্রসাদাত্ বাপকাশভ্র পুত্রেষঃ মাত্যং মৃতং ইদানীং অপুত্রোঽহং গর্ত্তকাম বুষমেসাস্মাকং পুত্রাঃ ভবতাং কারণাত নিজপুত্রং খুসং দত্তবান্ তস্মাত সর্ব্বৈ জনপদৈর্মম শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমবশ্যম্। যদি মৃতে সতি কশ্চিদ্রাজা যো ভবেত তস্য দাসস্য দাসোঽহং যো মে কীর্ত্তিং ন লঙ্ঘয়েত। ব্রাহ্মণজীবিকা ধার্ম্মিক জীব্যাদুরাদ্যাদি জীব্যানি যো ন লঙ্ঘয়েত।

আতুরা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তথাচ মম কিঙ্করাঃ।
এতান্ যঃ পালয়ামাস স রাজা জয়তাদ্চিরং॥
ইত্যুক্ত্বা মৌনমাস্থায় বালপাল স্থিতস্তদা।

* ক্রুরবুদ্ধ্যনপদাঃ সর্ব্বে হন্ত তাতো মৃতা যেন।
অন্তর্জ্জলে স্থিতো রাজা রাজপত্নী সহায়বান্।
পুনারাত্রৌ শিবঃ প্রাহ দাত্রং দুর্গতপঞ্চত্বে॥
গঙ্গাতীরং সমাগত্য আগামিদিবসে নরঃ।

ভো রাজন্ ঠিক্ প্রাতর্গঙ্গাতীরং গমিষ্যসি তত্রৈবং তব দাত্রং দাস্যন্তি। দাত্রং দৃষ্ট্বা মম পিতামহঃ প্রহসিতবদনঃ শিবমবদীত্ ভবান্ কথং স্থানে মম দাত্রং প্রাপ্তবান্। তমাহ শিবঃ যত্র তত্র প্রাপ্তং গঙ্গাতীরে যস্মিন্ স্থানে বামপালো রাজা অন্তর্জ্জলেঽস্তি তত্র যাসি তত্র তুভ্যং দাত্রং দাতব্যং ইত্যুক্ত্বা শিবশ্চলিতঃ। গত্বা তস্যামেব রাত্রৌ সহমেবুমোষং মন্ত্রিণসাহ শিবঃ। ভো রহুমুরঘোষ আগামিদিবসে সপ্তঘটিকোপরি বামপালো রাজা মরিষ্যতি তস্মিন্ মৃতে বিজয়সেনো নাম কাপ্ত ঠিক্ তত্রাগমিষ্যতি লগুড়ং হস্তে কৃত্বা অভিষিচ্য তং রাজানং করিষ্যব ইত্যুক্ত্বা শিবশ্চলিতঃ। ততঃ সুপ্রভাতায়াং রজন্যাং বিজয়সেনো লগুড়হস্ত স্তত্রাগতঃ॥

শাকে যুগ্ম রেণুরন্ধ্রগতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণপক্ষতি বাসরে যমতিথৌ বামধ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্দ্ধ্যাত্বা পদং
চক্রিপ্রোহ্যগোধর নৌমিমতুলং শিল্পী বামপালো মৃতঃ॥ ১২২॥

অস্মিন্ সময়ে মহদেরঘোষ মন্ত্রী বিজয়সেনং তথাগত মপশ্যত ততঃ সেবক মুখাচ্চ মন্ত্রী শ্রুত্বা লগুড়হস্তং অত্রানয় ততঃ সেবকস্তমানয়তি স বিজয়সেনঃ সেবকমবোচৎ মাং দৃষ্ট্বানয়সি তমব্রবীত্ সেবকঃ ত্বং ন যাসি রাজা বামপালঃ সুস্থোঽভবৎ তত্ত কল্যানার্থং মন্ত্রিণা বলিদানং কর্ত্তব্যং মনুষ্যঃ কোঽপি ন লভ্যতে ত্বমনাথো দীনশ্চ অতস্ত্বাং বলিদানার্থং নয়ামি ততঃ শ্রুত্বা স বহুতরং কারুণ্যবাদং করোতি। নাহমনাথঃ মম কলত্রং পুত্রশ্চ বিদ্যতে মন্ত্রিণোক্তং শীঘ্রমানয় তান্ স ক্রন্দতি পাত্রেণোক্তং প্রাপ্যতামসৌ স আহ কথং মাং স্নাপয়সি পাত্রেণোক্তং চন্দন-চর্চ্চিতং ক্রিয়তামসৌ স আহ কথমহং চন্দনচর্চ্চিতং কৃতঃ সেবকেনোক্তং মূঢ় ইদমপি ন জানাসি বস্ত্রাভরণবিশিষ্টং ক্রিয়তে স স্নাপ্যতে চন্দনেন চর্চ্চ্যতে বধ্যশ্চক্রিয়তে। স আহ মাং রক্ষ তুভ্যং মন্ত্রী ভূষণানি ত্রব্রবীৎ ভবান্ কথং রোদিতি স আহ মন্ত্রিন্ রূপমহমানীতো বলিদানার্থং ততো মন্ত্রী হাহাকৃতবান্। ভো মা ভৈষীঃ সুস্থো ভব বস্ত্রাভরণং পরিধেহি মন্ত্রী ব্রবীতি ভবতঃ কিন্নাম ধেয়ং তমব্রবীত সেনঃ বিজয়সেনো নামাহং মন্ত্রী স্বয়ং বস্ত্রালঙ্কারং পরিধাপ্য অমাত্যোভ্যো ব্রুতবান্ হে সুহৃদঃ শ্রুয়তাং অদ্য রাত্রৌ স্বয়ং বুদ্ধেনাহমুক্তঃ মন্ত্রিণ বিজয়সেনো নাম কাপ্ত ঠিক্ হস্তে লগুড়ংকৃত্বা গঙ্গাতীরমাগমিষ্যতিতি বাজানং করিষ্যথ ইদানীং যদি শিববচনং কুরুথ তদাশৌ রাজা ক্রিয়তাং ততঃ সর্ব্বে শিববচনং শিরসিধার্য্য অভিষেবং কৃত্বা মহাবলসমন্বিতোঽসৌ যোগঃ ইতি কৃত্বা তং রাজানং কৃতবন্তঃ স রাজ্যমাসাদ্য বামপালভৌদ্ধদেহিকং কারয়ামাস একস্মিন্ দিবসে সর্ব্বে আমাত্যা উচুঃ। রাজন্নস্মান্ সমাজ্ঞাপয় কিং করিষ্যামঃ কারয়িষ্যামো বা ততো রাজাঽব্রবীত হে মন্ত্রিণঃ মম দাত্রখণ্ডং ন প্রাপ্তং ততঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে আমাত্যাঃ সহদেব ঘোষং মন্ত্রিণং হন্তুমুদ্যতাঃ সোপি মন্ত্রী পলায়িতঃ গৃহং গত্বা নিবাহারো ভূত্বা স্থিতঃ নাপিতস্য শিবস্য বচনাৎ অসৌ রাজানং কৃতঃ শিরোমুণ্ডনং কৃতঃ কাঞ্জীরিকাং রাজানং করোতি অহমপ্যস্তঃ সোপি রাজা মূর্খঃ। রাজত্বং প্রাপ্য দাত্রখণ্ডং যাচতে তমাহুয় তত্রত্যৈরুক্তং ভূতং ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রী সুপ্তঃ। পুনঃ শিবমাগত্য রাত্রৌ হে মন্ত্রিণমাহ দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈর্দ্বাদ্বিজ্বালা-পলায়তে। আগামি দিবসে ভদ্রং ভবিষ্যতি পুনঃ প্রাতঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ মন্ত্রিনমাসাদ্য শুভোদয়ং কথিতবন্তঃ অপররাত্রৌ শিবঃ স্বয়মাগত্য মম পিতামহমুবাচ ভো রাজন্ মা ভৈষীঃ সুস্থো ভব তবতঃ সপ্ত পুরুষান্যাবৎ রাজ্যং করিষ্যন্তি। কোপ্যত্র বলাবলং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ পুনর্ভবতে শব্দভেরীং

বিদ্যা দত্তা ত্বং পুত্রাভাবেনাং কথয়িষ্যসি সোপ্যহমস্মৈ এবং সপ্তদুর্জ্জয়াভবিষ্যন্তি। ইতি রাজ্ঞ কথা সমাপ্তা॥ ইতি হলায়ুধমিশ্রকৃতৌ সেকশুভোদয়ায়াং গৌড়বিজয়রাজ্যে সেকাগমনে একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

উপরিপ্রদত্ত অংশ পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহারই অনুকরণ। ইহাতে "ৎ" এর পরিবর্ত্তে "ত" কারের ব্যবহার আছে। আর "র" এর স্থানে "র" এবং "ব" এর স্থানে "র" অনেক দেখা যায়। পাণ্ডুলিপির লিখনপ্রণালী অনুসারে "র" র, আকার পেটকাটা "ব"। ইহাতে "র" ও "ব" ঐ গোলমাল হওয়াই সম্ভব। তজ্জন্য রামপাল বামপাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে, পালবংশীয় শেষ রাজার নাম "রামপাল"। বিক্রমপুরস্থ প্রাচীন রামপাল নামক পুরী, যাহা এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র, তাহার সহিত এই রাজার সম্পর্ক থাকা সম্ভব। তাহা হইলে রামপাল সমুদায় বঙ্গদেশের অধীশ্বর ছিলেন দেখা যায়। বৌদ্ধপরিব্রাজক তারানাথের তালিকা অনুসারে, রামপাল ঠিক পালবংশের শেষ রাজা নহেন; এক জন বাদ শেষ রাজা। তারানাথের তালিকায় শেষ রাজার নাম যক্ষপাল। বোধ হয় যক্ষপাল রামপালের পুত্র। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, রামপাল অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; স্বীয় পুত্রকে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার অপরাধে খুন দিয়াছিলেন। সেই পুত্রই যদি তারানাথের যক্ষপাল হয়, তবে রামপালের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, এবং রামপালই পালবংশের শেষ রাজা।

রামপালের মৃত্যুসময়বিষয়ে যে শ্লোকটি গ্রন্থে দেখা যায়, উহা বোধ হয় অন্যের রচিত। উহার রচনা সুন্দর। অপকৃষ্ট গদ্যের মধ্যে ঐরূপ উৎকৃষ্ট পদ্য হঠাৎ আসার কারণ এই অনুভব হয় যে, রচয়িতা তৎকালে প্রচলিত ও সুবিদিত একটি প্রাচীন শ্লোক, স্বীয় রচনার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। এইরূপ শ্লোক মুখে মুখে চলিয়া আসে, এবং ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনা যাথার্থরূপে স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই শ্লোকটি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহাতে লিপিকর প্রমাদ যথেষ্ট আছে, "হা পাল্লয়" স্থলে "হা প্রালাম্বয়" পড়িতে হইবে। "কৃষ্ণ" স্থলে "কৃষ্ণে" পড়িতে হইবে। "ধ্যাত্বা" স্থলে "ধ্যাত্বা" পড়িতে হইবে। আর "মার বিবেচনায়" "বেণুরন্ধ্র" ঠিক পাঠ নহে। এখানেও "র" "ব" এর গোলমাল হইয়াছে। শুদ্ধ পাঠ "বেণুরন্ধ্র" বলিয়া বোধ হয়। অঙ্কে যে ৯২২ দেওয়া আছে, তাহা কিরূপে হইল, বুঝা যায় না। বোধ হয় যুগ্ম শব্দ দেখিয়াই ২২ অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

শ্লেষ অর্থে ২ পাওয়া যায় কি না, তাহা আমার জানা নাই। বেণুরন্ধ্র অপেক্ষা বেণুরন্ধ্রে কবিত্ব আছে। ৯২২ শক=১০০০ খৃঃ অব্দ। বিজয় সেন যদি ৯২২ শকে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলে ৩ পুরুষে (বিজয়—বল্লাল—লক্ষ্মণ) ২০৩ বৎসর রাজ্য করা কতকটা অসঙ্গত দাঁড়ায়। "বেণুরন্ধ্র" পাঠ ধরিলে ৯৭৭ শক=১০৫৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শ্লোকটি এইরূপে পঠিত হইবে—

শাকে যুগ্মবেণ্বন্ধ্রগতে কস্যাং গতে ভাস্করে,
কৃষ্ণে বাসৃতিবাসরে যমতিথৌ বামস্বরে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্ত্যজনশৈর্য্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালাম্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীবল্লালো মৃতঃ॥

বেণুরন্ধ্রে, সপ্ত স্বর নির্গত হয়, অতএব বেণু=৭। আর "রন্ধ্র" বা "দ্বার" নয় (৯) বলিয়া ধরা যায়। যুগ্ম শব্দে দুই পাওয়া যায়। তাহাতে "শাকে যুগ্মবেণ্বন্ধ্রগতে"=৯৭৭ শাকাব্দ লব্ধ হয়। উক্ত শকাব্দের আশ্বিন মাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিবস রবিবার ছিল কি না, তাহা গণনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মাদারহাট মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সেকশুভোদয়া পুস্তকের যে সার সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সেকশুভোদয়ার সার মর্ম্ম।

কোন সময়ে কৌশাম্বীপতি লক্ষ্মণসেন দেব, জাহ্নবীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক কৃষ্ণবর্ণধর আপাদলম্বিত বসন দুর্ব্বেষ (দুর্ব্বোধ্য) গঙ্গা-স্রোতের উপর দিয়া পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতেছেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? রাজা কুপিত হইয়া বলিলেন, আমার নাম লক্ষ্মণসেন দেব, আমি পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা, আমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হই, সে মনোভিলাষ লাভ করিতে পারে, যাহার প্রতি কুপিত হই, তাহার জীবন নাশ হয়। দরবেশ হাসিয়া বলিলেন, তুমি স্বমুখে আপনাকে পৃথিবীর রাজা বলিতেছ, আচ্ছা দেখ যে বক মৎস্য ধরিবার জন্য বসিয়া আছে, উহাকে মৎস্য ত্যাগ করিতে বল, সে তাহার রাজার কথা অবশ্যই শুনিবে। লক্ষ্মণসেন বলিলেন, বক তির্য্যগ্‌যোনি, জ্ঞানহীন, সে আমার কথা শুনিবে কেন? তোমার ক্ষমতা থাকে ত উহাকে আদেশ কর। দরবেশ বককে মৎস্যত্যাগের আদেশ করিবামাত্র, সে তাহা ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। রাজা নিতান্ত বিস্মিত ও ভীত হইলেন। দরবেশের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। তাঁহার বোধ হইল যে, "দুর্ব্বেষবেষধারীত্বং

সাক্ষাদিন্দ্র ইহাগতঃ"—ইন্দ্রদেব এই যবনের আকৃতি ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, মহাত্মন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার আলয়ে আগমন করুন। সেক রাজার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে মন্ত্রী উমাপতি রাজার সাক্ষাৎ হইল। উমাপতিধর এক যবন দরবেশকে রাজার সঙ্গে গমন দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। এই বেদে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, কল্কী ব্যতীত কোন যবন আগমন করিলে, রাজা তাহার প্রাণবধ করিবেন। কিন্তু রাজার এই ভাব দেখিলে উহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, ইনি পূর্ব্ব, ইহাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন কর্ত্তব্য। গমনসময়ে বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী মূর্ত্তিকাকে স্কন্ধে করিয়া পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিয়া সেক বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার গমন করিব না। নগরপ্রবেশের পূর্ব্বেই আমার অমঙ্গল ঘটিল হইল। আপনার নগরী বিনষ্ট হইবে। আমি এই স্থানেই অবস্থান করি। রাজা বলিলেন, মহাত্মন্! এই স্থানে ব্যাঘ্রভয়, এখানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নয়। সেক বলিলেন, মহারাজ! পরমেশ্বর কেহ কাহারও প্রাণনাশ করিতে পারে না। আপনি স্বগৃহে গমন করুন, আমি এই আছি। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! আপনি গৃহে গমন করুন, আমি সেকের অন্নপানের ব্যবস্থা করিতেছি। রাজা গমন করিলে, মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দরবেশ নীচ লোকদিগকে যবন করিতে আসিয়াছে। আমি ইহাকে বিষান্ন ভোজন করাইবার প্রেরণ করিব। মন্ত্রী বহু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। সেক এই সময়ে উপাসনা (নমাজ) করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। লিখিত আছে, ভোজন শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহা সেই শব্দকে মেঘনির্ঘোষ, কেহ বৃক্ষপতনশব্দ, কেহ বা পর্ব্বত (নদীমধ্যস্থ কূলভঙ্গ) পতনশব্দ মনে করিয়াছিল। অন্ন প্রস্তুত হইলে যক্ষ করিয়া কেহ তাহা সেকের নিকট লইয়া যাইতে সম্মত হইল না। দানানামক রজ দ্যূতক্রীড়ায় মীনবস্ত্র বন্ধক দিয়া দ্যূতোপযোগী অর্থ গ্রহণের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এক খানি পুরাণ কাপড়ের লোভে সেকের নিকট অন্ন লইয়া গমন করিল। এই দানা মহিমাকৃষ্ট হইয়া, চিরকাল তাঁহার সহচর হইয়া রহিয়াছিল।

সেক সেই বিষান্ন ভোজন করিয়া, মন্ত্রীর কার্য্য বুঝিতে পারিলেন। বিষদোষপ্র জন্য তিন্তিড়ী প্রার্থনা করিয়া তাহা ভোজন করিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সেক তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আমি কিছু পূর্ব্বে আসিয়া উপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু এই দরিদ্র ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ না করিয়া চাহিয়া লইয়া যাইতেছে। সেক বলিলেন, মহারাজ! অন্নে বিষ মিশ্রিত ছিল। বিষদো নষ্টের জন্য আমি তিন্তিড়ী ভক্ষণ করিতেছি। রাজা মন্ত্রীর স্বভাব জানিতেন, তিনি বদনে মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখনও মন্ত্রীকে যথোপযোগী তিরস্কার বসিলেন, শত্রুও গৃহে আগমন করিলে লোকে তাহার সম্মান করে। এ ব্যক্তি ধর্ম্মে পেত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহার প্রতি এতাদৃশ দুর্ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত। যদি ইনি এদেশে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিঘ্ন কে জন্মাইবে? পূর্ব্বে রাজা বিক্রমা সভার আকাশ হইতে এক পত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত ছি

চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রে হ্যতিথিকে।
বেহ্লারপাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্কঃ সমুপাগতঃ॥

অর্থাৎ ১১২৪ শাকে তুরুষ্কগণ এদেশে আগমন করিবে, ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে রাজা সেককে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়ার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেও সেক সম্মত

লেন না, নগরসমীপবর্ত্তী অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দানা তাঁহার নিকটে রহিল; লিখিত আছে, রাত্রিকালে তিনটি ব্যাঘ্র সেখানে আসিয়া সেককে প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে রাজা, দানার মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি সেকের অবস্থিতির জন্য একটি চতুঃশাল ভবন সেই স্থানে নির্ম্মাণ করাইলেন।

গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, রাজপত্নী বল্লভা দেবী নিতান্ত মুখরা ছিলেন, তিনি কখন কখন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। এক দিবস রাজজ্ঞালক কুমারদত্ত, মধুকর নামক বণিকের পত্নী মাধবীর রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হন। অনন্তর ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইলেন। রাজপত্নী বল্লভা দাসীমুখে ভ্রাতার বিপদের কথা শুনিয়া রাজসভায় উপনীত হইলেন, এবং মন্ত্রী উমাপতি ধরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। মাধবী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "মাতঃ! ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করুন, আপনার পিতৃকুলে কি এক জনের স্ত্রী অন্যে হরণ করিয়া লয়?" মাধবীর অনুনয়ে রাজ্ঞীর হৃদয় বিচলিত হইল না; তিনি সভামধ্যে তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এইরূপ অন্যায় ব্যবহার দর্শনে রাজগুরু গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! অচিরে তোমার রাজ্য নষ্ট হইবে।" এই বলিয়া তিনি সভাগৃহপরিত্যাগে উদ্যত হইলে, রাজা ও সভাসদগণ বিস্তর স্তুতি করিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। রাজা, পুরোহিত কুমারদত্তের শিরশ্ছেদনের জন্য উত্থিত হইলে, মাধবী তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। মাধবীর উদারস্বভাবদর্শনে সকলে মোহিত হইল। রাজা কুমারদত্তকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া রাজ্য হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। রাজ্ঞী, উমাপতিধরের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া থাকিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের স্বভাবের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন।

এক দিবস সায়ংকালে গঙ্গাতীরে বহু লোকের সমাগম হইল। জয়দেব মিশ্র, হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ পত্নী সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন। মধুকরপত্নী মাধবী, নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বামিসমভিব্যাহারে তথায় গমন করিল।

পরিচারকমুখে রাজ্ঞী শুনিতে পাইলেন যে, মাধবী যেমন অলঙ্কার পরিধান করিয়া আসিয়াছে, রাণীর তেমন অলঙ্কার নাই। রাজ্ঞী মাধবীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রাণী অধীরা হইলেন, এবং স্বয়ং মাধবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। মাধবী রাণীকে যথেচ্ছ গালি প্রদান করিল। রাজার অনুনয় বিনয়েও রাজ্ঞী কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করিলেন না। কোন সময়ে মাধবীর স্বামী মধুকর সিকোরোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, মাধবীর কাতরবাক্যে সেক তাহার চিকিৎসা করেন। তদবধি মাধবী ও মধুকর সেকের অনুগ্রহভাজন হয়। অলৌকিকক্রমতাসম্পন্ন সেক মাধবীকে নানালঙ্কার দান করেন। রাজ্ঞী কর্ত্তৃক গৃহীত কুণ্ডলদ্বয়ও সেক দান করিয়াছিলেন। মাধবীকে রাজ্ঞীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কুণ্ডলগ্রহণে উদ্যত দেখিয়া, সেক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি মাধবীকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া তাহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিলেন। "যে ব্যক্তি আমার স্বামীকে বাঁচাইতে পারিবে, আমি তাহাকে আমার অর্দ্ধধন দান করিব।" মাধবী তিন লক্ষ মুদ্রার বিষয়-ভোগ করিত। অঙ্গীকারানুসারে মাধবীর অর্দ্ধধন সেকের হইয়াছিল, কিন্তু সেক তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং অন্যের অর্থ সেই দম্পতীকে দান করিয়াছিলেন। সেকের মধ্যবর্ত্তিতায়, রাজ্ঞীকে কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করিতে হইল না। মাধবী ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেকশুভোদয়া গ্রন্থে সেকের অনেক অলৌকিক কার্য্যের বর্ণনা আছে। আমরা তৎসমুদায় অনাবশ্যক বোধে লিখিলাম না। যাহা হউক, সেকের অলৌকিক কার্য্যপরম্পরাদর্শনে তাঁহার প্রতি বাদ্সার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল, তিনি সমস্ত কার্য্যেই সেকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মন্ত্রী উমাপতিধরের অত্যন্ত মনোমালিন্য জন্মিল। উমাপতিধর সেকের লোকাতীত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। লিখিত আছে, মন্ত্রীর চারি জন অনুচর সেকের ক্ষমতার পরীক্ষার্থ, অন্ধরূপে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অন্ধতাপনয়নের ঔষধ প্রার্থনা করে। সেক সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, তাহাদিগকে সমুদ্রতীরে আসিতে বলিলেন দিলেন। তাহারা সেকের বাটীর বাহির হইয়া মাত্র বাস্তবিক অন্ধ হইল। তাহাদের পত্নীগণের কাতর প্রার্থনায় সেক তাহাদিগকে পুনর্বার চক্ষু দান করিলেন।

উমাপতিধর সেকের অনিষ্টচেষ্টা করিলেও সেক তাঁহার অনিষ্টচেষ্টা করিতেন না। উমাপতিধর নানা স্থানে রাজা রাজ্ঞী ও সেকের বিস্তর কুৎসা করিতেন। তৎসমুদায় যখন সময়ে বাদ্সার কর্ণগোচর হইত, কিন্তু বাদ্সা তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। ধনুর্বিদ্যায়, লক্ষণ সেন দেবের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। এক দিবস রাজা লক্ষ্মণ সেন, সসৈন্যে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনার শরশিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিলেন। ধনুর্ব্বেদে রাজার অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শন করিয়া, সমাগত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য করিতেছিল। মন্ত্রীর মদন নামক পারিষদও ধনুর্বিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল। সে রাজার প্রশংসাবাদ শুনিয়া বিদ্রূপাত্মক কোনও কথা বলে। তৎক্ষণাৎ সে কথা রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা মদনকে নিকটে আহ্বান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, সে ব্যক্তি মন্ত্রী উমাপতিধরের একজন পদাতিক। তিনি মন্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী রাজার আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। রাজার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। রাজভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে ধরিয়া আনিল। রাজা তাঁহার শিরশ্ছেদনের অনুমতি দান করিয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমার কুৎসা করিয়া থাকে। অদ্য ইহার অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা দেখিলাম। সংপ্রতি ইহার শাস্তিবিধান করিব। এক জনের অপরাধে, অন্যের প্রাণ যায় দেখিয়া, সেক রাজাকে মন্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। সেকের অনুরোধে মন্ত্রীর প্রাণরক্ষা হইল। রাজা মদনকে আপনার সহচরশ্রেণীভুক্ত করিলেন।

কোনও সময়ে রাজার প্রার্থনানুসারে সেক আপনার নিম্নলিখিত পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ! অন্ধ্র রাজ্যে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম কাফুর, মাতার নাম গরীবা। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পিতা আমাকে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। আমি একবার যাহা শুনিতাম, তাহাই লিখিতে পারিতাম। দ্বিতীয় বার গুরুকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইত না। গুরুগৃহের নিকটে রমজান নামক সওদাগর বাস করিতেন। আয়েসা নাম্নী তাঁহার এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। আমার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া আমাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে রমজানের অভিলাষ হয়। আমার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। রমজান, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে। আমি ইহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারিতাম না। আমি সর্ব্বদাই পিতামাতাকে বলিতাম, অরণ্যে শাক খাইতে কেন আমরা গরের অর্থে জীবনধারণ করি। আয়েসা যৌবনসীমায় উপস্থিত হইলে, রমজান আমাকে নিজ গৃহে লইয়া রাখিলেন। লোকে জানিল, আমি অচিরে রমজানের জামাতা হইব। আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া লোকে আমাকে অকর্ম্মী বুঝিতে পারিল। আয়েসা আমাকে প্রলোভিত করিতে যাইয়া বিফলপ্রযত্ন হইলেন। ক্রোধে রমজান্

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমার বস্ত্রাদি চুরি করিবে, এই দেখ আমার হস্তে লগুড় রহিয়াছে। গৃহে আমার পুত্রকলত্র আছে, কলসে তণ্ডুলকণা আছে; আমি কিরূপে দুর্গত হইলাম?" শিব বলিলেন, তুমি গৃহে গমন কর, এখানে থাকিও না।" পিতামহ বলিলেন, "আমি দাত্র বন্ধক দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইলাম না। শূন্যহস্তে গৃহে গমন করিলে গৃহিণী অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন। অদ্য আমার পিণ্ডলোপ হয় নাই। তুমি ত আমাদের গৃহের কথা জান না, কাজেই আমাকে গৃহে গমন করিতে বলিতেছ।" শিব বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে গমন করিও, তথায় তোমার দাত্রদণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" তৎকালে এই রাজ্যের রাজা রামপাল মৃতপ্রায় হইয়া গঙ্গার অন্তর্জলে অবস্থান করিতেছিলেন। রামপাল অতি মহৎ লোক ছিলেন। পালবংশের রাজারা পুরুষ এদেশে রাজত্ব করেন। রামপাল, এই বংশের শেষ রাজা। তিনি প্রজাবর্গের অনুরোধে আপনার একমাত্র দুর্বৃত্ত পুত্রকে শূলে আরোপিত করেন। সুতরাং রামপাল নিঃসন্তান পরলোকগমন করেন। মহাদেব, পিতামহকে পবিত্র গঙ্গাতীরে গমনের আদেশ দিয়া, স্বপ্নযোগে রামপালের মন্ত্রী সহদেব ঘোষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! আগামী দিবসে সপ্তঘটিকার পর রাজা রামপাল পরলোক গমন করিবেন। প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বিজয়সেন নামক লগুড়ধারী পুরুষকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবা সকলে তাহার আদেশ পালন করিবে। এই বলিয়া সদাশিব অন্তর্হিত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। বিজয়সেন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। এদিকে ১২২৭ শকের আশ্বিন মাসের বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্দশীর দ্বিপ্রহর বেলার সময় রামপাল চক্রপাণির পদধ্যান করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

এই সময়ে মন্ত্রী সহদেব ঘোষ, লগুড়পাণি বিজয়সেনকে অবলোকন করিয়া ভৃত্যদিগকে তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিলেন। পিতামহ, ভৃত্যদিগকে বলিলেন, তোমরা কি জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ। তাহারা বলিল, রাজা রামপালের কন্যাপুত্র মন্ত্রী তোমাকে ভূমিদান করিবেন। তাহাদের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া পিতামহ অনেক কাকুতি করিলেন। ভৃত্যেরা মন্ত্রীর আদেশানুসারে পিতামহকে স্নান করাইয়া চন্দন চর্চ্চিত করিল। পিতামহের বিশ্বাস হইল, নিশ্চিতই আমাকে ভূমিদান করিবে। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। সহদেব ঘোষ, পিতামহের মনোভাব জানিতে পারিয়া অভয় দান পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই। আপনার নাম কি?" পিতামহ আপনার নাম বলিলে, মন্ত্রী অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া শিবাদেশ প্রকাশ করিলেন। অমাত্যগণ দেবাদিদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পিতামহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। পিতামহ, যথাসময়ে রামপালের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিলেন।

পরদিন অমাত্যগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নবীন রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আমরা কে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব? পিতামহ কাতর স্বরে বলিলেন যে, অমাত্যগণ! আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই, ইহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। এই বাক্য শুনিয়া অমাত্যগণ সহদেব ঘোষকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। সহদেব ঘোষ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। মনে ভাবিলেন, শিব উন্মত্ত, আমি উন্মত্তের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাঙ্গালীকে রাজা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। সহদেব ঘোষ নিদ্রিত হইলে মহাদেব তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অভয় দান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি নিশ্চিন্ত হও, আগামী দিবসে বিজয় সেনের বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইবে। অনন্তর মহাদেব পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানদান করিয়া বলিলেন, রাজন্! ভয় করিও না। তোমার সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত এই দেশে রাজত্ব করিবে। এই বলিয়া মহাদেব, পিতামহকে শুভ

ভেরী বাদ্য প্রদান করিলেন। পিতামহের নিকট হইতে পিতা, পিতার নিকট হইতে আমি সেই শব্দভেরী বাদ্য লাভ করিয়াছি। মহারাজ, এই আমার বংশবিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সেকের মহতী অবদানপরম্পরা দর্শন করিয়া সকলের মনে অত্যন্ত ভক্তিরসের সঞ্চার হইল। সেক যাহাতে তাহাদের দেশত্যাগ করিয়া না যান,—সকলে তাহার জন্য সেককে অনুরোধ করিতে লাগিল। সেক বলিলেন, যদি তোমাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি ভাল স্থান দেখিয়া একটি দেবসদন (মসজিদ্) নির্ম্মাণ করি। মন্ত্রী-বিনা সকলেই সেকের বাক্যের অনুমোদন করিল। সেক ছদ্মবেশে স্থানান্বেষণে নির্গত হইলেন। তিনি পাণ্ডু নগরে (পাণ্ডুয়ায়) প্রবেশ করিয়া এক গোপগৃহের পিণ্ডার উপরে উপবেশন করিলেন। গোপ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ? সেক বলিলেন, আমি বৈদেশিক, অদ্য রাত্রিকালে এই স্থানে অবস্থিতি করিব। গোপ, সেককে স্থানদান করিতে সম্মত হইল না, সেকও সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। গোপের চীৎকারধ্বনিতে পল্লীবাসিগণ সেই স্থলে উপনীত হইল। পাণ্ডু নগরীর সেই পল্লীর হট্টগ্রাম নাম ছিল। পল্লী-বাসিগণ বলিল, তোমাকে স্থান দান করিলে আমাদের কি লাভ হইবে? সেক বলিলেন, তোমরা কি চাও? তাহারা কৌতুক করিয়া বলিল, যদি ঐ গোময়রাশিকে স্বর্ণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তুমি যত স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহা এককালে প্রদান করিব। সেক বলিলেন, আমার এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম যত স্থান ব্যাপিতে পারে, আমি তাহার অতিরিক্ত স্থান চাই না। গোপগণ সম্মত হইল। সেক বলিলেন, তোমরা ঐ গোময়রাশি তৃণাচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি দান কর। তাহারা পরম কৌতূহলী হইয়া তাহাই করিল। পর দিন প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল, গোময়রাশি স্বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। সেক বলিলেন, এখন আমি ব্যাঘ্রচর্ম্মা-চ্ছাদিত ভূমি-গ্রহণ করি। তাহারা সম্মত হইল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম সমভাবে প্রসৃত হইয়া চলিল। গোপপল্লীতে হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। সেক, তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রসার সংরোধ করিলেন। অনন্তর এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা সেই স্থানে আগমন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তথায় একটি সুন্দর দেবসদন (মসজিদ্) নির্ম্মিত হইল। সূত্রধরগণ এক একটি কাকরের পুটুলি প্রাপ্ত হইল। সেক তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা এই পুটুলিগুলি বণিকদের নিকট প্রদান করিলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিবে। বণিকেরা, পুটুলিগুলি খুলিয়া তৎসমুদায় স্বর্ণখণ্ডে পরিপূর্ণ অবলোকন করিল। শিল্পীগণ প্রার্থনাধিক অর্থলাভ করিল। সর্ব্বত্র এই গীতি শ্রুত হইতে লাগিল, যথা,—

"বনের শাক খায় সেক বনের গোনা,
শিকরির পুটুলি বাধিঞা দেয় সেক, হাটে বিকাইলে হয় সোনা।"

লিখিত আছে, মন্দিরনির্ম্মাণের সময় সেকের ইচ্ছানুসারে ত্রুবকাষ্ঠ দীর্ঘতালাভ করি-য়াছিল।

একদা এক রাজভৃত্য আসিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! পুলক নামক দানব আসিয়া ছাগনরুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যপশ্বাদি ভক্ষণ করিয়া রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। সেক রাজাকে অভয় দান করি-লেন। পর দিন সেক ও সামুচর রাজা, মদনের সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেক, দানবকে আক্রমণ করিতে মদন পদাতিককে আদেশ করিলেন। উভয়ের তুমুল-সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দানব নানাবিধ মায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু সেকের আশীর্ব্বাদগুণে

দর্শনমাত্র রণে ভঙ্গ দিয়া ভূবিবরে প্রবিষ্ট হইল। বিবরমুখ প্রস্তর দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইল। দেশ নিষ্কণ্টক হইল। রাজা লক্ষ্মণ সেন দেব, সেই অবণ্য সেককে দান করিলেন। সেক, সেই অবণ্যে দেবতল নামক জনপদ স্থাপন করিলেন। নানাদেশ হইতে প্রজাগণ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

আর এক দিন রাজা সেকের সহ সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক রাজপুরুষ আসিয়া রাজাকে জানাইল, মহারাজ! নন্দী নামক ক্ষেত্রপাল আপনার রাজ্যে প্রত্যহ মনুষ্য ভোজন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। সেক রাজাকে অভয় দান করিলেন। পর দিন সেক ও রাজা, মদনেষ সহ দানবপতি নন্দীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মদনের সহিত নন্দীর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেকের ক্রোধদৃষ্টিতে নন্দী ভস্মীভূত হইলে সর্ব্বত্রঃ জয়শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেই দেশ সেককে দান করিলেন। সেক তথায় নান্দোর নামক পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। নান্দোর পুরী, বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে।

সেকের প্রার্থনানুসারে রাজা একবার তাঁহাকে ষট্‌সহস্র ও অন্যবার দ্বাবিংশতি সহস্র গ্রাম দান করেন, সেকও ইহার মূল্যস্বরূপ রাজ্ঞীকে অমূল্য মণি দান করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রাম প্রদান বিষয়ে মন্ত্রীর অভিমত ছিল না। রাজ্ঞী বল্লভা, সেকের প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তনানুসারে রাজা সেককে স্বহস্তাঙ্কিত দানপত্র প্রদান করেন। ষট্‌ সহস্র গ্রামের মধ্যে রামাবতী নাম্নী পুরী ছিল। শুভোদয়া গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পুরী রামাবতী যত্র ভুবি বিখ্যাতনামিকা।

শুভোদয়ার এই স্থলের রচনা নিতান্ত অস্পষ্ট। অন্য যে দুপাঁচ খানি গ্রামের নাম আছে, তাহা পড়িতে পারা যায় না।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সমাজ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের আয়োজন।

তালপুখুরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ধনশালী বিষয়ী বিজ্ঞ মহামাঙ্গি-নাজির মহাশয় আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে বাছিয়া তাহাকে হৃদয়েশ্বরী করিবেন, মিত্রবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জ্বল করিবেন; বিবাহে বড় ঘটা হইবে, দেশের সমস্ত ভদ্রলোক সমবেত হইবে, মুলুকের কাঙ্গালী ভিখারী বিদায় পাইবে;—এইরূপ কথা ঘরে দ্বারে, পথে ঘাটে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! কৃষকেরা মল্লিকবাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া দুটা খোস গল্প শুনিয়া যাইত, রমণীগণ মিত্রবাড়ীর নিকট কলস নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া যাইত।

তারিণী বাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শদাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিবা রাত্রি সাধুবাদ ও প্রতিবাদ ও নাস্তির মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতিরা বলিতেন,—এ ত তারিণীবাবুই উপযুক্ত কায। এরূপ যোগ্যলোক কি আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়? লক্ষ্মী সরস্বতী দ্বারে বাঁধা। বিদ্যা বুদ্ধি কলে সাহেবমহলে তারিণীবাবু কত মান, কত রাজা রায়বাহাদুর হাব নামিয়া যায়! আর বিষয়ের ত কথাই নাই, তালপুকুরের মধ্যে দীন দরিদ্র, ইতর ভদ্র, যে কখন বিপদ আপদে পড়ে, তারিণী বাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণীবাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, মল্লিকবংশ বজায় রাখুন, আও পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন, ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তারস্বরে কহিতেন,—তারিণীবাবুর সদাই ধর্ম্মে মতি, তিনি ধর্ম্মিষ্ঠ লোক, তাহার ত এ যোগ্য কার্য্যই বটে। সৎকুল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া, সুলক্ষণা কন্যা স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসঙ্গত কায করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজ কাল যেরূপ সময়, নাস্তিক গুলো কি করে, তাহার কি ঠিক আছে? কেহ বয়স্কা কন্যা খোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আপনার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। ছি! ছি! সমাজ, তারিণীবাবুকে দেখিয়া শিক্ষালাভ কর! পুত্রসন্তানকামনায় সদ্বংশজা সুলক্ষণা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়া তারিণীবাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন, ইত্যাদি।

তারিণীবাবুর বন্ধুগণ বলিতেন,—তা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণী বাবুর বয়সই বা কি? এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা মুখ খানি যেন কার্ত্তিকের মত, শরীর খানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্যা করিয়া কন্যা এরূপ বরলাভ করে, ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণীবাবুর মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘন ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধ্য এক গাছি পাকা চুল বাহির করে? নাপিতের মাহিয়ানা দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যহ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন, দাড়ী গোঁপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে।

স্বর্ণকার দিন দুই তিন বার করিয়া তারিণীবাবুর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিতেছে; পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার ফরমায়েস হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণীবাবু নববধূর অঙ্গ ভূষিত করিয়া দিবেন! কথাটা এক এক বার মনে হইতেছে, আর বৃদ্ধের বুকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার সুন্দর ললাটে সিঁথি পরাইয়া দিবেন, ললিত-বাহুলতা হাতে ধরিয়া আদর করিয়া তাবিজ বাজু পরাইয়া দিবেন, কুসুমকলিবিনিন্দিত বক্ষের উপর সখের হার ঝুলাইয়া দিবেন, কটীতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন। ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল,—বুড়ো বুঝি পাগল হয়!

তারিণীবাবুর বাড়ী আজ লোকারণ্য এবং জ্ঞাতিকুটুম্বে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। পুখুর হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাঙ্গারি করিয়া শাক শবজি, বর্দ্ধমান হইতে খাজা সীতাভোগ মিহিদানা, কলিকাতা হইতে সন্দেশ ও রসগোল্লা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবারাত্রি যজ্ঞ হইতেছে, বাহিরে দিবারাত্রি বাদ্য ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হুলুস্থুল-পড়িয়া গিয়াছে।

দরিদ্র বিন্দু ও সুধা গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিল, এক দিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া জেঠাইমার ঘরে গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিল। কিন্তু আজ আনন্দের দিন,—দুঃখিনীদের কান্না কে শুনে, কে দেখে? সন্ধ্যাবেলা ঢাক বাজাও, রোশনচৌকির শব্দে গ্রাম কম্পিত কর, তেরিরবে সমস্ত গ্রামে খোচার কর,—আজ গ্রামের আনন্দের দিন, আজ মহামান্য নাজির মহাশয়ের শুভবিবাহ!

এ দিকে কন্যার বাড়ীও আজ লোকারণ্য। মিত্রগণ এককালে গ্রামের বড়লোক ছিলেন, তালপুখুরে ও নিকটস্থ গ্রামসমূহে তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্বের অভাব ছিল না। তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন পক্ষীকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিত্রদিগের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার সময় সেইরূপ জ্ঞাতিকুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছিলেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ পক্ষীকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিত্রদিগের সৌভাগ্যরবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জ্ঞাতিকুটুম্ব আসিয়া, গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল।

চাকর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থূল শরীরখানি গহনা ভরা, মুখে সদাই হাসি। এত দিন পরে বোমকিকে মনে পড়িল, পাল্কী করে মিত্রদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে পরিবেশী বলি-

লেন,—তা বল, আমার চাকিও যে, গোপীও সে,—আহা! এত দিন বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি. তা আমাদের যে সংসার, সহজে কি আসা হয়? তা, বাছা গোপী ভাল আছে? বেঁচে থাকুক, শ্বশুর-বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকুক, সোণার চাঁদের মত ছেলের মুখ—দর্শন করুক! মল্লিকদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাতায়াত আছে, বাছা গোপীকে সর্ব্বদাই দেখে যাব। আমরা আসিব না ত কে আসিবে? কথায় বলে,—মাও যে মাসীও সে, মা মাসী বাছাকে দেখবে না ত দেখবে কে? ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর পিশি হয়। গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে. শরীর শীর্ণ, স্বভাবটি একটু রুক্ষ। ভ্রাতার মরণের পর মিত্রবাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অনকষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করায় এক বার পাঁচ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাও ঘটি বাটী বিক্রয় করাইয়া সুদ সুদ্ধ আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিশিমার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে, গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবাশুশ্রূষা! বলিলেন,—তা আমরা করব না ত করবে কে গা বল্? থাক্‌তেন আজ দাদা বেঁচে, আহা এ আনন্দের দিন কতই আনন্দ কর্‌তেন! আহা দাদা যখন যে কাষটি করতেন, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ত করতেন না, আমাকে না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হবার যো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাত্মা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো, আহা মেয়ের মুখে কথাটি নেই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক বাছা, গা ভরে গয়না পর্‌বি, পাল্‌কী চড়বি, বারাণসী সাড়ী পরে মগ্‌গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়া কি সুখ আছে? বাছা তোদের সুখ দেখে মর্‌তে পারিলেই বাঁচি। ইত্যাদি।

শ্যামের মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হয়। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাপ বিষয় লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছিলেন,—গোপীর বাপের মৃত্যুর পর, শ্যামের মা বিধবা জার উপর সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মকদ্দমা করিয়া দরিদ্র জার জমা জমি বিক্রয় করিয়া লইলেন, ডিক্রি করিয়া তাঁহার ঘটি বাটী বিক্রয় করিয়া লইলেন, সন্দেশ হাতে করিয়া ছেলেদের পাঠাইয়া দিতেন,—গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি! গোপীর মা গরিব ও ভাল মানুষ, সমস্ত সহ্য করিত ও কাঁদিত। টাকার কি মধুময়ী ক্ষমতা! গোপীর মার সৌভাগ্য-উদয়ে শ্যামের মা সমস্ত বৈরভাব ভুলিলেন, প্রিয় জার প্রতি তাহার কত মায়া, কত মমতা, কত যত্ন! বলিলেন,—আহা বোন! পুরাতন

কথা কি ভুলা যায়? সেই তোমার আমার একই বৎসরে বিয়ে হয়, আহা আমরা যেন বোনের মত ছিলাম গো, এক মন এক প্রাণ, কেবল শরীর-ভিন্ন বৈ ত নয়? তোমার যখন গোকুল পেটে, তখন বাছা শ্যামলাল হয়, তা আমার শ্যামলালও যে, গোকুলও সেই। তা গোকুল বেঁচে থাকুক, গুণবান্ বুদ্ধিমান ছেলে হয়েছে, দু পয়সা রোজকার করিতেছে, মিত্রবুলেস নাম রাখিবে। আর বাছা গোপীর বড় ঘরে বিয়ে হইতেছে, বড় মানুষের বৌ হবে, গা ভরে গয়না পর্‌বে, সুখে থাক্‌বে। আহা ওদের সুখ দেখলে আমাদের চক্ষু জুড়ায়,—ইত্যাদি।

এই রূপ আত্মীয়াদিগের যত্ন, সুশ্রূষা, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলকামনায় গোপীর মা বড়ই আপ্যায়িত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিত্রবাড়ী ভরিয়া গেল, এ কয়েক বৎসর ইহার চতুর্থাংশ অনুগ্রহ পাইলে গোপীর মা অন্নবস্ত্রের জন্য বিন্দু ও সুধার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইত না! গোপবালা মার চেয়ে সেয়ানা মেয়ে; বাপের বুদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধাদিগের কাছে মেয়ের মুখে কথাটি নাই, তাহাদের মমতা ও স্নেহবাক্যে মেয়ের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুখুর ধারে সমবয়স্যাদিগের কাছে আসিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া হাসিল।

সমবয়স্যারা বলিল,—কিলো, বড় ঘরে বিয়ে হবে বলে বড় আহ্লাদ যে,—মুখে হাসি ধরে না যে।

গোপী। না লো তার জন্য হাসি নয়।

বয়স্যাগণ। তবে কি জন্য? মনের কথাটা খুলেই বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিশিমা, খুড়িমাদের যত্ন দেখে হাসছিলাম।

বয়স্যাগণ। ইস্! হেসে যে গড়িয়ে গেলি, যেন রকম দেখ না। তা মাসীমা পিসিমা বিয়ের সময় আসিয়াছেন, তোদের ভাল বাসেন বলে যত্ন কচ্ছেন, তাতে আবার হাসি কিসের লা?

গোপী বলিল,—"না, না, তা নয়, তবে মাসীমা পিশিমার যত্ন দেখিয়া একটা রূপকথা মনে পড়িল তাই হাসিতেছিলাম। রূপকথাটি বলি, শুন। দুইটি ভাই ছিল, বড় ভাইটি বড়লোক, আর ছোট ভাইটি গরিব। তা বড় ভাইয়ের স্ত্রীর বড়মানুষী চাল, সে গরিব ছোট জাটিকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা হইলে কথাও কয় না। গরীবরা দুঃখে থাকে, কাঁদাকাটি করে, কিছু দিন পরে সে গ্রাম থেকে উঠিয়া গেল।

"বিদেশে চাকরি বাকরি করিয়া গরিবদের দেখে অনেক টাকা হইল। তখন তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পাকা বাড়ী করিল, নূতন পুকুর কাটাইল, জমিদারী কিনিল, আর অনেক চাকর বাকর রাখিয়া বড়মানুষী চালে চলিতে লাগিল।

"বড়জা তখন ছোট জাকে অনেক আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া লোক পাঠাইল। ছোটজা খাইতে আসিয়া দেখে,—রূপার থালে ভাত বাড়া, রূপার বাটীতে ব্যঞ্জন সাজান, রূপার রেকাবিতে সন্দেশ মণ্ডা! ছোটজা আসনে বসিল। ভাত গুলি চারি ভাগ করিল, ব্যঞ্জন গুলি চারি ভাগ করিল, সন্দেশ মণ্ডা গুলি চারি ভাগ করিল। এই রকমে ভাগ করিয়া, আসন থেকে উঠিয়া হাত ধুইল।

"বড়জা বলিল, একি বোন, খেলে কৈ? ছোটজা বলিল, যাদের জন্য খাবার করেছ দিদি, তাদের জন্য ভাগ করে দিলাম। এত আমার জন্য খাবার করনি দিদি।

"বড়জা বলিল, তোমার জন্য নয় ত কার জন্য বোন? ছোটজা বলিল, এই একভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্য, এই একভাগ আমাদের নূতন পুকুরের জন্য, এই একভাগ আমাদের জমিদারীর জন্য, আর এই একভাগ আমাদের লোকজনের জন্য। এই সব দেখে রান্না বাড়া করিয়াছ দিদি, খাওয়া দাওয়া এদেরই সমর্পণ কর। আমাকে যদি খাওয়াইতে ইচ্ছা থাকিত, তা হলে যখন গরিব অবস্থায় অন্নের জন্য লালায়িত ছিলাম, তখন একদিন দেখা খাওয়াইতে।"

সন্ধ্যার সময় শাঁক বেজে উঠিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ বাতি জ্বলিল, বাহির দরজায় বাদ্য আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীদিগের যোগদান ও হাস্যধ্বনি, দাসীদিগের ছুটাছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল। বাহিরবাড়ীতে কন্যা-কর্ত্তা গোকুল বাবু কোমরে চাদর বাঁধিয়া, ডাবা হুঁকা হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতে বাতি জ্বালাইতেছেন, হাঁক ডাক দিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন। ভিতর বাড়ীতে আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, কন্যাকে সাজাইবার জন্য ডাক হইল। মেয়ে সাজিতে বসিল, মুখখানি নম্র ও শান্ত, হৃদয়খানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভবিবাহ।

তুষারমণ্ডিত বিশাল হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় টোপর-মণ্ডিত ভাবিনী বরের বিশাল শরীর সভস্থল জমকাইয়া বহিয়াছে। পাথুরে-কাল স্থূল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাপড় শোভা পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের গোপ-কামান বরের মাথায় জরির টোপর শোভা পাইতেছে। কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম।

বাড়ী লোকারণ্য, চারি দিকের গ্রামসমূহের কায়স্থকুলের কেহ নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই। বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল্ কল্ শব্দ, তাহাদের হাস্যধ্বনি, ও তাহাদের কথারহস্যে বাড়ী আনন্দপূর্ণ।

কোনও নবীনা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সখীকে ডাকিয়া বলিতেছে,—ও লো দেখবি আয় লো দেখবি আয়। ও মা একি বিয়ের বর, না একটা মুখপোড়া মিন্‌সে লো?

দ্বিতীয়া। দূর পোড়ারমুখী! বিয়ের রাত্রি বরকে অমন কথা বলে? কেন লা, বরের রূপ মন্দই বা কি? রংটা একটু কাল বই ত নয়, তা মুখের ছিরি আছে।

প্রথমা। হ্যাঁ, ছিরি আছে বৈকি,—কেবল গাল দুটি যেন পাকা বেগুন ঝুলে রয়েছে!

দ্বিতীয়া। দূর পোড়ামুখী! শুখনো চড়ান গাল বুঝি ভাল?

প্রথমা। আর ঠোঁট দুটি যেন বোলতায় কামড়ে দিয়েছে!

দ্বিতীয়া। দেখিস্, দেখিস্, ঐ ঠোঁট পেয়ে গোপী বশে যাবে। শ্বশুরবাড়ী একবার গেলে হয়, এমন গোল গাল স্বামী পেয়ে আর এমুখো হবে না।

প্রথমা। আর বলে কি চুলা দিদি, ঠিক যেন আমাদের বাড়ীর আস্তাকুড়ের জঞ্জাল!

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! অমন কথা বলতে নেই!

প্রথমা। ও বাবা! পেটটা কি ফুলো গা? মিন্‌সের পেট ফুলেছে না কি?

দ্বিতীয়া। যা যা, তোর আর বরের নিন্দে করতে হবে না। গোপী শুনলে রাগ করবে। দেখিস্ ঐ লাদোশ লোদোশ শরীর পাইয়া আমাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না লত্য দিদি, বরের পা দুখানা দেখ! ওমা, পায়ে গোদ হয়েছে না কি? গোদা পা নিয়ে কোন লজ্জায় মিন্‌সে বিয়ে কর্‌তে এল? কোন্ এক জোড়া মোজা পরে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস্ দেখিস্, ঐ পা গোপী কত যত্নে পূজা কর্‌বে।

প্রথমা। ইস্! তা আর হতে হয় না। গোপী আপনার খুদে খুদে আল্‌তা-মাখা পা দুখানি যদি মিন্‌সের টোপরের উপর না রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল মানুষ, মনখানি সুরের মত ধারাল।

বর গাত্রোত্থান করিলেন,—যেন হিমালয় পর্ব্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন! বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী-আচার, রসিকাগণ সে আচার বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি? বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিল্ পিল্ করিতেছে, তারিণী বাবুর বিশাল শরীরের চারি দিকে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, নির্লজ্জ হইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে,—যেন একটি বিশাল তালবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মৈনা পাখীগুলি উড়িতেছে। কোনও মেয়েটি ভিঙ্গি মারিয়া তারিণী বাবুর থল্-থলে কান্‌টি একবার মলিয়া দিল! কেহ বা সেই প্রকাণ্ড উদরের উপর দৈবের হাতের ছাপ লাগাইয়া গেল! এবং কোনও রসিকা সেই বিশাল পৃষ্ঠদেশে আলপানার দাগ দিয়া যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের শোভা করিয়া দিল!

ক্ষুদ্র গোপীকে পিঁড়ায় বসাইয়া বরের চারি দিকে সাত বার পাক দেওয়া হইল, তারিণী বাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি সেই পিঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। যখন 'বর বড়—না কনে বড়' প্রশ্ন হইল, তখন গোপীর পরম বন্ধুগণও স্বীকার করিল, বর বড় বটে। যখন বরণডালা লইয়া পতিপুত্রবতী কোনও গৃহিণী নাজির মহাশয়কে "ভ্যা" করিবার অনুরোধ করিলেন, তখন রসিকাগণ কাণাকাণি করিতে লাগিল,—"ভ্যা করিবেন দিন কতক পর,—গোপী তেমন মেয়ে নয়!"

তাহার পর বরকন্যা একত্র বসিলেন, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তারিণী বাবু স্বেদপূর্ণ স্থূলহস্তে কন্যার সেই সুচিক্কণ-সুন্দর পুষ্পবিনিন্দিত হস্ত গ্রহণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন,—অবগুণ্ঠনশূন্য বধূর মধুমাখা মুখ, মুক্তা-বিভূষিত ললাট, এবং অলক্তকরঞ্জিত ওষ্ঠ দেখিয়া,—বুড়ো বুঝি বিবাহসভায় মূর্চ্ছা যায়!

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ বড় তামাসা,—তারিণী বাবুর মত নাদশ-নোদশ, গোল-গাল, রসিক বর তালপুখুরের সুন্দরীগণ সর্ব্বদা পান না, আজ বুঝি বরকে আস্তই খেয়ে ফেলেন! বর ঘরে আসিবামাত্র এক জন শ্যামা, ফুল্লাঙ্গিনী, মধ্যবয়স্কা রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, "এস এস গোপীবল্লভ এস, তোমার বিরহে গোপবালা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!" রসিক তারিণী বাবু ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক জন নয়, যেন ষোল শত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন!

বাসরঘরের রং তামাসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা সুন্দরীগণ,—তোমরা সে গূঢ় আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় তারিণী বাবুর কোলে ময়না পাখিটির ন্যায় কনেটিকে বসাও, আমরা বিদায় হইলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কৃত্তিকা নক্ষত্র।

হিন্দু জ্যোতিষীগণ রাশিচক্রকে সম দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'রাশি' নাম দিয়াছেন। সূর্য্যের এই দ্বাদশরাশি পরিক্রমণ দ্বারা হিন্দুদিগের দ্বাদশ মাস গণনা করা হইয়া থাকে; যথা, সূর্য্যের মেষরাশি পরিক্রমণ করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহাকে বৈশাখ মাস, বৃষরাশি পরিক্রমণ করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহাকে জ্যৈষ্ঠ মাস কহে। এই দ্বাদশ ভাগকে সৌরানুক্রমিক রাশিবিভাগ বলা যায়। কিন্তু এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে আরও এক প্রকার রাশিবিভাগ রহিয়াছে; তাহা চন্দ্রানুক্রমিক। এই অনুক্রমানুসারে, রাশিচক্রকে সম সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'নক্ষত্র' কহে। চন্দ্রের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনবশতঃ, একবার রাশিচক্র পরিক্রমণ করিতে সৌর ২৭ দিবস, ১৯ দণ্ড, ১৮ পল অতীত হয়; অতএব দেখা যায় যে, চন্দ্র প্রতি সৌরদিবসে রাশিচক্রের যে ভাগ অতিক্রম করে, তাহা প্রায় সমস্ত চক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ; ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, চন্দ্র এক দিবসে যে স্থান পরিক্রমণ করে, তাহাকে 'নক্ষত্র' কহা যায়।

সাধারণ পৌরাণিক ভাষায় ইহা কথিত আছে যে, চন্দ্রের ২৭টি স্ত্রী আছে, তাহারা প্রত্যেকে এক একটি নক্ষত্র; এবং চন্দ্র তাহাদের প্রত্যেকের গৃহে যথাক্রমে এক এক রজনী যাপন করিয়া থাকেন।

নক্ষত্রগণ রাশিচক্রের এক একটি বিভাগ মাত্র; ঐ বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী বা সন্নিকটবর্ত্তী কোনও তারকাসমষ্টির নামানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়া থাকে। নক্ষত্রপ্রজাপতি এই ২৭ নক্ষত্রের পিতা, এবং তিনি স্বয়ং রাশিচক্র। এই চক্রের একটি বিন্দু এমন হওয়া আবশ্যক, যেখান হইতে রাশি নক্ষত্রাদি গণিত হইতে পারে; পৌরাণিক মতে তাহা দক্ষের 'ছাগমুণ্ড', জ্যোতিষের মতেও তাহা 'মেষরাশির মস্তক' হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।* এই আদি বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় নক্ষত্রের সন্নিহিত যে তারকাসমষ্টি, তাহার নাম 'কৃত্তিকা'। ইহাকে লৌকিকভাষায় 'সাত ভাই' বলা হইয়া থাকে। 'সাত ভাই' বোধ হয় সকলেরই পরিচিত, এবং তাহারা সকলেরই সাত ভাই; অতএব পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, কৃত্তিকা নক্ষত্র তাঁহাদের অপরিচিত নহে।

আকাশের এক প্রান্তে সাতটি তারা একত্র হইয়া যেন পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদিগকে কখনও স্থানচ্যুত হইতে দেখা যায় না; কালবশে ইহাদের কোনরূপ স্থিতি-বৈচিত্র্যও ঘটিতেছে না। এই আজন্ম সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে বলিয়াই ইহারা জগতের নিকট 'সাত ভাই' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মুক্তনেত্রে ইহাদের ছয়টি বই দেখা যায় না; বৃদ্ধা বহুমহিলাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ রহিয়াছে যে, উক্ত কৃত্তিকাসমষ্টির সাতটি তারকা একত্রে মুক্তনেত্রে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলে রাজা হওয়া যায়; কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, 'সাত ভাইয়ের' মধ্যে একটি তারকা পৃথিবীর পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত প্রবাদটি ইয়ুরোপের অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যেও শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও সাধারণতঃ ছয়টি বই তারকা মুক্তনেত্রে দেখা যায় না, কিন্তু কেহ কেহ তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখিয়াছেন;—একটি ইংরাজমহিলা কৃত্তিকাসমষ্টিতে ১২টি তারকা মুক্তনেত্রে দেখিতে পাইতেন, এবং কেম্ব্রিজের শিক্ষাগুরু মীস্তলীন (ইনি একজন সুবিখ্যাত জ্যোতিষী এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টির জন্য সমধিক

* এ বিষয়ে ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষের সহিত হিন্দু জ্যোতিষের যে বিশেষতম পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা প্রস্তাবান্তরের আলোচ্য বিষয়।

খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন।) ঐ সমষ্টিতে ১৪টি তারকা নেত্রগোচর করিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ ব্যবহারপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কৃত্তিকাতে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক তারকা রহিয়াছে; এমন কি, কোনও সাধারণ দূরবীক্ষণের সাহায্যে অন্যূন ৫০টি তারকা নেত্রগোচর করা গিয়াছে। সম্প্রতি গগনের নানাস্থানে অস্পষ্ট নক্ষত্রমালা পর্য্যবেক্ষণের জন্য এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে; তাহাতে দূরবীক্ষণের দৃষ্টিখণ্ডের পরিবর্ত্তে ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র সংযোজিত করিয়া নক্ষত্রমালার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া থাকে। এইরূপ ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত কৃত্তিকাসমষ্টিতে প্রায় ১৪০০ তারকার সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ নক্ষত্রদিগের ঔজ্জ্বল্যানুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে; যথা,—গগনে যে কয়টি তারকা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং প্রায় একরূপ দেখায়, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর, তৎপরে ঔজ্জ্বল্যের ক্রমানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীর তারকা কহা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকই ষষ্ঠ শ্রেণীর তারকা পর্য্যন্ত অনায়াসে নেত্রক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া থাকে; তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূনসংখ্যক লোক সপ্তম তারকা পর্য্যন্ত নেত্রগোচর করিতে পারে; কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক অতি বিরল, যাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আকাশের ঘন-নীলিমা ভেদ করিয়া অষ্টম শ্রেণীর তারকা পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারে। কৃত্তিকাসমষ্টির প্রধান তারকা তৃতীয় শ্রেণীর, তৎপরে যথাক্রমে দুইটি চতুর্থ, দুইটি পঞ্চম, একটি ষষ্ঠ, এবং একটি অষ্টম শ্রেণীর অন্তর্ভূত; অবশিষ্ট তারকাগুলি সমস্তই দশম হইতে বিংশ শ্রেণী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দূরবীক্ষণের ক্রমোৎকর্ষ অনুসারে তারকাদিগের শ্রেণীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ, দূরবীক্ষণের শক্তি যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহা গগনের গভীরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া ঘন নীলাম্বরে পূর্ব্বাদৃষ্ট বহুসংখ্যক লুক্কায়িত ক্ষুদ্রাবয়ব জ্যোতিষ্কমালা মানবের জ্ঞানগোচর করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমানে তারকাদিগের শ্রেণীবিভাগ বিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। কৃত্তিকাসমষ্টির তারকাদিগের শ্রেণী দেখিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, সাধারণতঃ সকলেই ছয়টি তারকা নেত্রগোচর করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে, অষ্টম শ্রেণীর তারকা দেখা সম্ভবপর নহে; এই হেতু, এমন লোক অতি বিরল, যাঁহারা ৭টি তারকা দেখিতে পারেন। পূর্ব্বকালে বোধ হয় মানবের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণতর ছিল (অথবা সপ্তম তারকাটি ক্রমশঃ

ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে) তাই সচরাচর সকলেই সাতটি তারকা দেখিতে পাইতেন বলিয়া, ইহাদের 'সাত ভাই' নামকরণ হইয়াছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত র‍্যাড্‌ক্লিফ্ (Radcliffe) মানমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক প্রিচার্ড সাহেব তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুকাল যাবৎ কৃত্তিকাসমষ্টির দূরত্বনির্দ্ধারণকল্পে কার্য্য করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং তাঁহার জীবিতকালেই ইহা সপ্রমাণ করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, কৃত্তিকাসমষ্টির সর্ব্বপ্রধান তারকা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ২৫০ বৎসর অতীত হয়। আলোক প্রতি-সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করে; ইহা হইতে আশা করি, পাঠকগণ গণনা করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন যে, আলোকের কত মাইল পথ অতিক্রম করিতে ২৫০ বৎসর লাগিতে পারে। ইহাই কৃত্তিকানক্ষত্রের প্রধান তারকার দূরত্ব!

রুষিয়ার জ্যোতির্বিদ্ তারকাকে সূর্য্যসিদ্ধান্তে 'যোগতারা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্ 'স্ত্রুভ্' (Struve) সাহেব নক্ষত্রদিগের 'স্বকীয় গতি' (Proper motion) পর্য্যালোচনা করিয়া, এবং তাহা হইতে অসীম জগতের অবিরাম গতি সিদ্ধান্ত করিয়া, ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, কৃত্তিকানক্ষত্রের যোগতারা একটি "মহাসূর্য্য"—ইহা সৌরজগৎ ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, এবং ইহাই সূর্য্যের ভ্রমণকক্ষের কেন্দ্র।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

কালিদাস।

পথে কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি—কিন্তু কখন বুঝিলাম না। চকিতদৃষ্টি স্বতই আকৃষ্ট হয়—খোলা মাঠের মধ্যে যেমন দেখা যায়। কিন্তু অবগুণ্ঠনগুণ্ঠিত রমণীমুখের সৌন্দর্য্য যেমন অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বসিয়া কুহকলরবে চিরদিন বিমোহিত করিবেন,—কোথায় তিনি, কে তিনি,—জানিতে জগদ্বাসী চিরদিন প্রয়াস পাইবে। কিন্তু এ-কুহকের মীমাংসা কখন হইবে, বোধ হয় না।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে জুন মাসে ইনি স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গত বৎসর নেপাল হইতে একখানি রঘুবংশের পুঁথি আমি সংগ্রহ করি। পুঁথিখানির প্রথম দুই পৃষ্ঠা নাই। অবশিষ্ট সমুদয় আছে। পুঁথিখানির শেষে একটি তারিখ দেওয়া আছে।

"ইতি মিশ্রশ্রীকালিদাসকৃতে রঘুবংশে মহাকাব্যে একোনবিংশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ লসং ৪১৭ মাঘীপূর্ণিমায়াম্ তিথৌ কজেএ (?) দিনে বীরপুরগ্রামে লিখিতমিদং পুস্তকং শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মভিরিতি॥"

লসং লক্ষ্মণ সম্বতের ইঙ্গিত। লক্ষ্মণাব্দ কখন আরম্ভ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। আচার্য্য কিলহরণ ঊনবিংশ খণ্ড Indian Antiquary নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, ৭ই অক্টোবর ১১১৯ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক সুদী ১ অতীত শকাব্দ ১০৪১ এ লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হয়। এ হিসাবে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে এই পুঁথিখানি লেখা হইয়াছিল। অর্থাৎ, পুঁথিখানি ৩৫৮ তিন শত আটান্ন বৎসর প্রাচীন।

পুঁথিখানি ত্রিহুতী বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। র-এর নীচে পুঁটলি আছে, কোনটার বা পেট কাটা, অন্তঃস্থ ও বর্গীয় ব-এর আকারে কোনও প্রভেদ নাই। ই, ঈ, শ প্রভৃতির আকার, বাঙ্গলা ও নাগরী উভয় হইতে ভিন্ন। বানানে কিছু কিছু অশুদ্ধি আছে। কালীর রঙ্গ কিছু মলিন হইয়াছে। কোনও কোনও স্থান আমি এখনও পড়িতে পারি নাই।

মিশ্র কালিদাস কৃত—সুতরাং কালিদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। আমি যত দূর জানি, উড়িষ্যা ও বিহারে ব্রাহ্মণের মিশ্র উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মিশ্র, বাজপেয়ী, শতপথী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে কনোজী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। সুতরাং, কালিদাসকে কনোজী ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। তিনি মহারাষ্ট্রীয় নহেন, বাঙ্গালীও নহেন। বোধ হয়, কাশী কোশলার কোথাও তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। শেষে তিনি উজ্জয়িনীর সভাসদ হন।

এই পুঁথিখানিতে অনেক স্থলে শ্লোকের পর্য্যায়ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমি কেবল এ পর্য্যন্ত প্রথম সর্গ মিলাইবার অবসর পাইয়াছি। এই সর্গে ৩৭ শ্লোকের পর মুদ্রিত পুস্তকের ৪৫,৪৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৯ শ্লোকের পর ৫১ ৫২, তাহার পর ৫০, ৬৫র পর ৬৭, তাহার পর ৬৬, এইরূপ পর্য্যায়ে শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ পর্য্যায়ভিন্নতার কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

কিন্তু পর্য্যায়ভিন্নতা অপেক্ষা পাঠান্তরের বিস্তরতা অনেক অধিক। আমার পুঁথির কোনও কোনও পাঠ যে প্রশস্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠে ছন্দোভঙ্গ, কূটার্থ প্রভৃতি অনেকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারেরা চলিত পাঠের সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কলেজ ও চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা সে সম্বন্ধে ক্বচিৎ বিরুক্তি করিয়া থাকেন। কোন পাঠ ভাল, পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক ও তাহার নীচে আমার পুঁথির শ্লোক ছাপিতে পারিলে পাঠক মহাশয়ের পরিশ্রমের লাঘব হয়, কিন্তু প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায়, এ সমস্যার মীমাংসাভার সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে দিয়া, আমি কেবল পাঠান্তর নির্দ্দেশ করিলাম।

৯—প্রণোদিতঃ—প্রভাবিতঃ। ১১—মহীক্ষিতাং—মহীভৃতাং। ১৫—আরম্ভ—প্রারম্ভ। ৩৭—সেনাপরিবৃতা—সেনাপরিগতা। ৪৯—সমিৎকুশফলাহরৈঃ—স্রুক্কাসম্ভসমিৎকুশৈঃ। ৫০—তৎফলোজ্জিতঃ—বিবিক্তীকৃতঃ। ৫৩—অভ্যুথিতাগ্নি—প্রত্যুদ্ভাগ্নি। ৫৯—অথর্ব্বনিধি—অথর্ব্ববিদ, পুরঃপুরঃ—পুরঃসরঃ। ৬৫—প্রশমিতা—সংযমিতা। ৬৩—তন্ত্র—তন্ত্র। ৬৭—সনিশ্বাসৈঃ—সনিশ্বাস। ৬৮—অপ্রকাশ—অন্ধকার। ৭০—বিধাভি—বিনেত, বৃক্ষকং, পাদপং। ৭১—অনির্ব্বাণস্য—নরবন্ধস্য। ৮৫—মহীক্ষিতঃ—মহীপতেঃ। ৮৬—তপোনিধি—তপোধন, যাজ্য, যাচ্য, প্রার্থনং পার্থিবং। ৮৮—আত্মানুগমনেন গাং—সম্যগারাধনেন গাং। ৯০—প্রযতা—প্রযাতা।

আর কয়েকটি শ্লোকের কথা একটু বিস্তার করিয়া বলিতে হইবে। ৩৪ শ্লোকটি একটু নূতন ধরণে লিখিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইহার প্রথম কথাটি ঠিক্ পড়িতে পারিতেছি না।

সহতে (?) হুতলাভায় স্বভূজাদবতারিতা।
তেনধুর্জগতো গুর্ব্বী সচিবেষু নিবেশিতা॥

ইহার পরেই একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্লোক আছে, সেটিও আমি ভাল পড়িতে পারিতেছি না।

গঙ্গা ভগীরথেনেব সর্ব্বেষাং পারনক্ষমা।
গজতা (?) সন্তনিস্তস্তাঃ তেন মন্ত্রী সুকোশলা॥

৪৮ শ্লোকের পরে আর একটি নূতন শ্লোক আছে—

আকীর্য্যারনমাসন্নবিধিভিঃ সমিদাহরৈঃ।
বৈখানসৈর্বধূস্যাগ্নি প্রলুব্ধমনবৃত্তিভিঃ॥

৫৮ শ্লোকের প্রথম চরণটি এইরূপ আছে—

আতিথেয়স্তমাতিথ্য বিনীতাল্পপরিশ্রমঃ।

৭৭ শ্লোকটি এইরূপ আছে—

ইমাং দেবীং ঋতুস্নাতাং স্মৃত্বা সপদি সম্ভবঃ।
প্রদক্ষিণক্রিয়াতীতস্তস্থৌ কোপনজীবনঃ॥

৭৯ শ্লোকটি এইরূপ—

অবেহিতদ্রব্যজ্ঞানাদ্যুনো পেক্ষং মনোরথং।
প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ॥

৮১ শ্লোকটি এইরূপ—

স ত্বমেকান্তরাং তস্যাং মদীয়াং বৎসমাতরম্।
আবাধষ সপত্নীকঃ সারাৎকামং বিধাস্যতি॥

৮৩ শ্লোকের পর আর একটি নূতন শ্লোক আছে, এটি পড়িতে বড়ই ভুল হইল।

তাংস্রাললাটজারাজীং বিভ্রতী শ্বেতকুণ্ডলা (?)
সংধ্যাপ্রতিপদেনেব দ্যুতিভিন্না হিমাংশুনা॥

এই সকল ভিন্ন পাঠ ও নূতন শ্লোক পড়িতে, প্রাচীন অক্ষরে প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিতে, অনেক কথা মনে হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বঙ্গের আদিগৌরব শীলভদ্র।

শকাব্দার পঞ্চমশতাব্দীতে ব্রাহ্মণ নরপতিগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। সমতট নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই সমতট অধুনা রামপাল নামে পরিচিত।

সম্ভবতঃ ৪৪৭ শকাব্দে, সমতটনগরে সেই রাজবংশে একটি বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম দন্তভদ্র বা দন্তদেব। কোনও কোনও গ্রন্থে তিনি দন্তসেন আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও গ্রন্থেই এই বালকের পিতা মাতার নাম লিখিত হয় নাই। বালক দন্তভদ্র অসাধারণ প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ব্ব, সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি সেই পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভারতের দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নালন্দা সঙ্ঘারামে উপনীত হইলেন। তৎকালে ধর্ম্মপাল নালন্দা

সঙ্ঘারামের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।* নবীন যুবক দন্তভদ্র, জ্ঞানী বৃদ্ধ ধর্ম্মপালের ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মপাল দন্তভদ্রকে শিষ্যশ্রেণীতে স্থান প্রদান করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই, গুরু নবীন শিষ্যের অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

যুবক দন্তভদ্র সর্ব্বদা গুরুকে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিতেন। বিতর্কিত বিষয়ে হৃদয়ে ধ্রুবসত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেন না। এইরূপে ধর্ম্মপালের উপদেশ দ্বারা তিনি নির্ব্বাণমুক্তিমার্গ নির্ণয় করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণাপথনিবাসী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জনৈক ব্রাহ্মণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া, নালন্দার প্রধান অধ্যাপক ধর্ম্মপালের খ্যাতিশ্রবণে মগধদেশে উপনীত হন। তিনি মগধাধিপতির সমক্ষে উপনীত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মপাল নামে জনৈক বৌদ্ধ অসাধারণ পণ্ডিত আছেন। তাঁহার খ্যাতিশ্রবণে আমি দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য আসিয়াছি। আমি নিতান্ত অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সহিত একবার বিচার করিতে অভিলাষ করি।"

রাজা বলিলেন, "ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি এখনই তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিতেছি। আপনি বিশ্রাম করুন।" যথাসময়ে রাজদূত নালন্দায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মপালকে বলিলেন, "দক্ষিণাপথ হইতে জনৈক বিধর্ম্মী পণ্ডিত আপনার সহিত বিচার করিবার জন্য আসিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচারমন্দিরে উপনীত হইবেন কি না, ইহা মহারাজ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন।" মহারাজের আদেশপ্রতিপালনে তিনি প্রস্তুত আছেন বলিয়া, দূতকে বিদায় করিলেন।

তদনন্তর যথাসময়ে তিনি ভিক্ষুপদোচিত কৌষেয় অঙ্গাবরণে ভূষিত হইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দন্তভদ্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! আপনি কোথায় যাইতেছেন।" ধর্ম্মপাল বলিলেন, "বৌদ্ধ জ্ঞানসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। তাহার প্রচারিত ধর্ম্মরূপ দীপ শান্তভাবে আলোকদান করিতেছিল। এক্ষণে সেই প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবার জন্য

* ধর্ম্মপাল কাঞ্চীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "শব্দবিদ্যাসমৃদ্ধ শাস্ত্র" নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

বিধর্ম্মীগণ মেঘমালার ন্যায়—কিম্বা পঙ্গপালের ন্যায়—অথবা মধুমক্ষিকার ন্যায়, তাহা আচ্ছাদন করিয়াছে। আমি এরূপ একজন বিধর্ম্মীকে জয় করিবার জন্য রাজধানীতে যাইতেছি।" গুরুর বাক্যশ্রবণে দন্তভদ্র বলিলেন, "ভগবন্! আমি অনেকবার বিচারসভায় উপস্থিত থাকিয়া তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি। অতএব বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, উপস্থিত বিধর্ম্মীকে জয় করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করুন।" ধর্ম্মপাল বিশেষরূপে দন্তভদ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অম্লানবদনে দন্তভদ্রকে শত্রুবিজয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপালের অন্যান্য শিষ্যগণ এই সংবাদশ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যুবক দন্তভদ্র একাকী সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।" শিষ্যবর্গের এইরূপ জল্পনা শুনিয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন, "বয়ঃক্রম অনুসারে প্রজ্বলিত প্রতিভার বিচার করিতে হয় না। দন্তভদ্রের দন্ত স্খলিত হয় নাই বলিয়া তোমরা অমূলক সন্দেহ ও জল্পনা করিতেছ; আমার ধ্রুব বিশ্বাস, দন্তভদ্র নিশ্চয়ই বিধর্ম্মীকে জয় করিতে পারিবে।" এই সময়ে দন্তভদ্রের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর মাত্র।

প্রাচীনভারতে পণ্ডিতবর্গের বিচার তর্কের জন্য প্রত্যেক রাজধানীতে একটি নির্দ্দিষ্ট সভামণ্ডপ থাকিত। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয় উপস্থিত হইলে, একটি দিন স্থির করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইত। সেই প্রথা অনুসারে দক্ষিণাপথনিবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত নালন্দা সঙ্ঘারামের একটি যুবক ছাত্রের বিচারের দিন স্থির করিয়া, নগররাজ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন; নিরূপিত সময়ে সেই বিচারমন্দির লোকপরিপূর্ণ হইল। যথাসময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয় স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমেই দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া হিন্দুমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বাক্য শেষ হইলে, বঙ্গের আদিগৌরব দন্তভদ্র, ধীর ও প্রশান্তভাবে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যুক্তিতর্কসমূহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া প্রবল যুক্তি দ্বারা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার যুক্তিতর্কসমূহ শুনিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নীরবে সভাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সভাগৃহে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে দন্তভদ্রের জয়ঘোষণা হইতে লাগিল। দন্তভদ্রের বিজয়বৃত্তান্ত ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, ৮২৩ শকাব্দে (১৫৪ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

এই সময়ে * মৌখরী বর্ম্মণ রাজগণ পূর্ব্ব মগধের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। ভদ্রবংশীয় যজ্ঞবর্ম্মণ, শার্দ্দূলবর্ম্মণ, অনন্তবর্ম্মণ এবং পূর্ণবর্ম্মণের নাম, কোদিত লিপি ও গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যজ্ঞ, শার্দ্দূল এবং অনন্তবর্ম্মণ শাক্ত ছিলেন। অনন্তবর্ম্মণ বিন্ধ্যপর্ব্বতগহ্বরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন। আর পূর্ণবর্ম্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক দেব যৎকালে বৌদ্ধগয়ায় বুদ্ধিদ্রুমবিনাশের চেষ্টা করেন, তৎকালে এই পূর্ণবর্ম্মণ সেই জগদ্বিখ্যাত বটবৃক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে অন্য কেহ বুদ্ধিদ্রুম বিনষ্ট করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে, তাহার চতুর্দ্দিকে ৬৩ হস্ত উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিয়েনসাঙ স্বচক্ষে সেই বুদ্ধিদ্রুমপরিবেষ্টী প্রাচীর দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এই পূর্ণবর্ম্মণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অনন্তবর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ, রাজপতির সময়ে, দন্তভদ্র দক্ষিণদেশীয় দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণকে জয় করিয়াছিলেন।

মগধরাজ দন্তভদ্রকে পুরস্কৃত করিবার মানসে, গঙ্গার ৮।৯ মাইল দূরবর্ত্তী একখানি নগর, স্বীয় সমৃদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দান করিলেন। দন্তভদ্র সেই দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, যে ব্যক্তি পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুপদে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ব্যক্তি লোভরিপুকে দমন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবশ্যই শিক্ষা করিয়াছে, এ নগরে তাঁহার প্রয়োজন কি?"

নরপতি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-তরণী সময়ের স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে। যদি এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কোনও পুরস্কার না থাকে, যদি রিক্ত ও অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন জন্য কোনও উৎসাহজনক কার্য্য না করা হয়, তাহা হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ যুবকগণ উৎসাহবিহীন হইবে। অতএব মিনতি করি, আমার এই সামান্য দানটি আপনি গ্রহণ করুন।"

মগধাধিপতির বিনয়ে বাধ্য হইয়া, লোভ পরিহারপূর্ব্বক দন্তভদ্র সেই দান গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি সেই নগরে উপনীত হইয়া এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ

* এই সময় মগধের কিয়দংশ মৌখরি বর্ম্মণদিগের ও অবশিষ্টাংশ গুপ্ত নরপতিদিগের অধীন ছিল। উভয় বংশের রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ। বিশেষতঃ, সেই তর্ক এক্ষণে উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বক, তাহার সমস্ত উপস্বত্ব যাহাতে চিরকালের জন্য ধর্ম্মার্থ ব্যয়িত হইতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বোধ হয়, এই সময়ে দন্তদেব বা দন্তভদ্র, "শীলভদ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হন। চীনদেশীয় গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে শীলভদ্র নামেই পরিচিত করিয়াছেন।

কালক্রমে ধর্ম্মপাল নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। শীলভদ্র, নালন্দা সঙ্ঘারামের সর্ব্বপ্রধান উপাধ্যায়ের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এক্ষণে আমরা বীণাপাণির বিহারক্ষেত্র নালন্দা বিহারের বর্ণনা করিব। পাটনা জেলার অন্তর্গত বিহার সবডিবিসনের অধীন, নবরাজগৃহের * ৬ মাইল দূরে, বোড়গাও নামে এক পরিত্যক্ত নগর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এস্থানে একটি মনোরম আম্রকানন ছিল; সেই কাননের পার্শ্বে এক সরোবর ছিল। সেই সরোবরে এক নাগ বাস করিত, তাহার নাম নালন্দ। মতান্তরে নাগের নাম নন্দ। এই নাগনন্দ বা নালন্দ হইতে, সেইস্থান নালন্দা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মতান্তরে "ন+অলং+দা" হইতে নালন্দা নামের উৎপত্তি। ভগবান শাক্যসিংহ যৎকালে মগধদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কয়েক জন বণিক দশকোটী স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা সেই আম্রকানন ক্রয় করিয়া, এক বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক, সেই বিহার বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করেন। ভগবান তথাগত, তিন মাস কাল সেই বিহারে অবস্থানপূর্ব্বক শিষ্যবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের দীর্ঘকাল অন্তে, শকাব্দপ্রবর্ত্তক মহারাজ কনিষ্কের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, শক্রাদিত্য নামক জনৈক নরপতি সেই বিহারের পূর্ব্ব পার্শ্বে এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। এই সঙ্ঘারামের ভিত্তি সংস্থাপন-কালে নাগের অঙ্গ ক্ষত হইয়া কুধির নির্গত হয়। তদ্দর্শনে জনৈক জৈন ভবিষ্যৎবক্তা বলিয়াছিলেন, "এই সঙ্ঘারাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার সুপ্রসিদ্ধি ও উন্নতি, সহস্র বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার্থীগণ অনায়াসে এস্থানে জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে। কিন্তু এস্থান বারংবার জীবরুধিরে রঞ্জিত হইবে।"

শক্রাদিত্যের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বুদ্ধগুপ্ত উক্ত সঙ্ঘারামের উন্নতির জন্য

* রাজগৃহ দুইটি; পুরাতন রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী। মহাভারতে ইহার বর্ণনা আছে। ইহার অন্য নাম কুশাগারপুর। কুশাগারপুরের উত্তর দিকে মহারাজ অজাতশত্রু নবরাজগৃহ নগরে রাজপাট স্থাপন করেন।

বিবেচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্ঘারামের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। তদনন্তর, মহারাজ তথাগত-গুপ্ত (?) এবং মহারাজ বালাদিত্য দ্বারা প্রধান সঙ্ঘারামের যথেষ্ট উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। কোনও উৎসব উপলক্ষে মহারাজ বালাদিত্য তাঁহার সঞ্চিত ধনরত্নাদি সমস্তই সঙ্ঘারামের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দান করিয়াছিলেন। তথাগত গুপ্ত প্রাচীন সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকে একটি, এবং বালাদিত্য তাহার উত্তরপূর্ব্বদিকে আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। বালাদিত্যের পুত্র বজ্র (?) নরপতি তাহার পশ্চিম দিকে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, মধ্যভারতের অন্য এক জন নরপতি প্রাচীন সঙ্ঘারামের উত্তর দিকে আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন নরপতিনির্ম্মিত সকল সঙ্ঘারাম পরিবেষ্টন করিয়া, এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল একটিমাত্র দ্বার রাখা হইয়াছিল। এইরূপে জগদ্বিখ্যাত নালন্দা সঙ্ঘারাম গঠিত হইয়াছিল। মগধ ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বিবিধ রাজ্যের অধিপতি দ্বারা এই সঙ্ঘারামের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূমি, গ্রাম, নগর ও ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ, তৎকালে সমস্ত ভারতে ইহার ন্যায় উন্নত, প্রকাণ্ড ও সৌধমালাপরিপূর্ণ মনোহর সঙ্ঘারাম আর একটি ছিল না। বৌদ্ধ স্থবিরগণ আজীবন এই সঙ্ঘারামে বাস করিয়া স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে উপদেশ প্রদান করিতেন। ভিক্ষুজীবনের যাহা প্রয়োজনীয়, ভিন্ন ভিন্ন নরপতিদত্ত ধন ও ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তাহা সংগৃহীত হইত। সুতরাং তাঁহাদের কোনও অভাব ছিল না। ইহাতে মনের কোলাহল কিম্বা ইন্দ্রিয়বিনোদন প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। মহা-যান-সম্প্রদায়ের দশ সহস্র শিষ্য, এই সঙ্ঘারামে বাস করিয়া, উপাধ্যায়বর্গের নিকট ধর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই সঙ্ঘারামের উপাধ্যায়গণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে দশজন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চশত এবং তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক এক সহস্র। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকগণ বিংশতি প্রকার সূত্র ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে সক্ষম ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকগণ ত্রিংশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। প্রথম-শ্রেণীর অধ্যাপক-গণ দশ প্রকার সূত্রও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ছিলেন। সর্ব্বোপরি সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র প্রধান অধ্যাপক। তদানীন্তন ভারতে এমন কোনও শাস্ত্র ছিল না, যাহা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। শীলভদ্র কিম্বা তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল মহাত্মা নালন্দা সঙ্ঘারামের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকের আসনে

উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মধ্যাস্তিক মত প্রচার করিয়া যে নাগার্জ্জুন অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই নাগার্জ্জুন এক দিন এই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কীকরাজ মীনানাস্কর জ্ঞাননেত্র-উন্মীলনকারী মহাত্মা নাগসেন, এক দিন এই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। যে মহাত্মা সাঙ্খ্যমত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন, সেই গুণমতী বোধিসত্ত্ব এক দিন এই আসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যিনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের জন্য চীনদেশে যাইয়া ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই প্রভামিত্র এক দিন এই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। যে মহাত্মা তিব্বতাধিপতি স্রোঙ্গ-চ্যন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, সেই মহাত্মা জিনমিত্র এক সময়ে এই আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, জ্ঞানচন্দ্র, শীলবুদ্ধ প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এই আসনে উপবেশন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধজগতের খ্যাতিমান গ্রন্থকার ও আচার্য্যগণের প্রায় অধিকাংশই নালন্দা সঙ্ঘারামের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন।

এক সময়ে যেরূপ বঙ্গদেশে নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল,—তৎকালে সমস্ত ভারতে কেন—সমস্ত বৌদ্ধ জগতে নালন্দা সঙ্ঘারামের তদ্রূপ খ্যাতি ছিল। নালন্দায় আসিয়া যিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন নাই, কেহই তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গ্রাহ্য করিত না। সর্ব্বত্রই নালন্দা সঙ্ঘারামের অধ্যাপক ও ছাত্রের সম্মান অপ্রতিহতভাবে প্রবল ছিল। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এ হেন নালন্দা সঙ্ঘারামের উপাধ্যায়মণ্ডলীর শীর্ষদেশে কে বিরাজ করিতেছিলেন; বলিতে হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে—তিনি এক জন বাঙ্গালী; বিশেষতঃ, পূর্ব্ব বঙ্গ তাঁহার জন্মস্থান। হায় হতভাগ্য রামপাল! তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কিন্তু এক দিন তোমার ক্রোড়ে তদানীন্তন বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত শীলভদ্রের শৈশবজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। হায় হতভাগ্য বিক্রমপুর! তুমি অদ্য প্রস্তরের নাম উল্লেখ করিয়া গৌরব করিয়া থাক। কিন্তু জান না, এ হেন শত সহস্র প্রসন্ন যাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে স্থান পাইবার জন্য লোলুপ হইত, সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শীলভদ্র এক দিন তোমার ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন।

৮৩ বৎসর বয়ঃক্রমে শীলভদ্র শূলরোগে আক্রান্ত হন। ১০৩ বৎসর বয়ঃক্রমে সেই রোগ নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। ক্রমে রোগের যন্ত্রণায় তিনি

এরূপ অধীর হইলেন যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মহত্যার বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল। এই অবস্থায় একদা মধ্যরাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন।

উজ্জ্বল ভূষণে বিভূষিত তিন জন পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। একের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ফটিকের ন্যায় জ্যোতিষ্মান, তৃতীয় ব্যক্তি রজতের ন্যায় শুভ্র। তাঁহারা বলিলেন, বৎস! তুমি তোমার এই দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর। ভগবান তথাগত বলিয়াছেন, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবার জন্য এ দেহের উৎপত্তি। কেহ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিবে, এরূপ তিনি বলেন নাই। পূর্ব্বজন্মে তুমি এক রাজ্যের অধিপতি ছিলে, সেই জীবনে তুমি প্রজাপীড়ন দ্বারা যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছিলে, ইহ-জীবনে সেই কৃতকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ। বৎস! আত্ম-হত্যা দ্বারা এই যন্ত্রণা হইতে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে উক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এ জন্যই বলি-তেছি, আত্মহত্যারূপ মহাপাপে নিমগ্ন না হইয়া, জন্মজন্মান্তরে কৃত দুষ্কার্য্যের অনুসন্ধান পূর্ব্বক, অনুতাপ দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর। প্রশান্তভাবে, এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, সূত্র ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতিসাধন কর, ইহা দ্বারাই যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে। শীলভদ্র এই বাক্যশ্রবণে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তপ্তকাঞ্চনসদৃশ জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ, স্ফটিকজ্যোতির্বিশিষ্ট পুরুষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তুমি কি জান না যে, ইনি অব-লোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব।* তৎপরে রজতের ন্যায় শুভ্র মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব।†"

ইহা শুনিয়া শীলভদ্র মৈত্রেয়কে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন! আপনার দাস শীলভদ্র কায়মনে আজীবন ইহাই প্রার্থনা করিয়াছে যে, অন্তিমে আপনার স্বর্গীয়নিবাসে যেন তাহার স্থান হয়। ভগবন! দাসের এই কামনা পূর্ণ হইবে কি?" মৈত্রেয় বলিলেন, "বৎস! পাপসঙ্কল্প পরিহারপূর্ব্বক অবিচলিতচিত্তে সনাতনধর্ম্ম প্রচার কর। চরমে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

তৎপরে তপ্তকাঞ্চনসদৃশ জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বলিলেন, "বৎস! আমি মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব, তোমার হৃদয়ে অমঙ্গলকামনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য অদ্য আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। পাপসঙ্কল্প পরিহার-

* অন্য নাম লোকেশ্বর। † ইনি ভাবী বুদ্ধ।

পূর্ব্বক আমাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর। সত্যধর্ম্মপ্রচারে যত্নবান হও! যোগ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যাহারা অদ্যাপি জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে সেই সকল শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান কর; ইহা দ্বারাই শূল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বৎস! আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে, চীনদেশ হইতে জনৈক ভিক্ষু ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তোমার নিকট আসিতেছেন, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষাদান করিবে।"

আচার্য্য শীলভদ্র এই সকল বাক্যশ্রবণে তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্! এ দাস প্রাণপণে আপনাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।" তদনন্তর বোধিসত্ত্বগণ অদৃশ্য হইলেন। প্রভাতে শীলভদ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তখন তাঁহার যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি শূলরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সেবক বুদ্ধভদ্রকে আহ্বান করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিন বৎসর অতীত হইল। একদা নালন্দা সঙ্ঘারামে এই কথা প্রচারিত হইল যে, চীনদেশীয় জনৈক অসাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন ভিক্ষু বজ্রাসন (বুদ্ধ-গয়া) তীর্থে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য নালন্দা হইতে ৪ জন শ্রমণ প্রেরিত হইলেন। হিয়োনসাঙ নালন্দা সঙ্ঘারামের নিমন্ত্রণ-পত্র সাদরে ও বিনীতভাবে গ্রহণ করিলেন।

বজ্রাসনতীর্থে ৯ দিবস অবস্থানপূর্ব্বক হিয়োনসাঙ নালন্দা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদী পার হইয়া তিনি বনমধ্যে গন্ধহস্তীর নিবাসভূমি দর্শন করেন। গন্ধহস্তীর বিবরণ অতীব কৌতুকাবহ, কিন্তু এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। তথা হইতে কিয়ৎদূর গমন করিয়া হিয়োনসাঙ কশ্যপবুদ্ধের সিদ্ধপীঠ দর্শন করেন। সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়ৎদূর গমন করিয়া মাহী নদী পার হইয়া ওড়রামপুত্রের নিবাসভূমি দর্শন করিয়াছিলেন। মাহীতীর হইতে পূর্ব্বদিকে ১০০ লি (১৭—২০ মাইল) গিয়া হিয়োনসাঙ কুক্কুটপদগিরি দর্শন করেন। ভগবান শাক্যসিংহের নির্ব্বাণের পর যে মহাত্মা বৌদ্ধদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, সেই মহাকশ্যপ এস্থানে নির্ব্বাণলাভ করেন। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ কুক্কুটপদগিরিকে গুরুপদগিরি আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তথা হইতে ১০০ লি উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক হিয়োনসাঙ বুদ্ধবল দর্শন করেন। সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ৫।৬ মাইল (৩০ লি) যাইয়া পরিব্রাজক বহ্নিবান অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ দর্শন করিলেন। তথা হইতে প্রায় এক

মাইল দূরে একটি বৃহৎ পর্ব্বতে উপনীত হন। এই পর্ব্বতের ৩।৪ মাইল উত্তরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সানুদেশে এক আশ্রমে ব্যাসদেব কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে ১০।১২ মাইল পূর্ব্বদিকে গিয়া পরিব্রাজক মগধের প্রাচীন রাজধানী কুশাগারপুরে (রাজগৃহ বা গিরিব্রজে) উপনীত হন। গিরিব্রজের উত্তরদ্বার হইতে ১লি গমন করিয়া হিয়োনসাঙ আদি বুদ্ধবিহার "কালন্দকনিবাস বেণুবনবিহার" দর্শন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত সপ্তপর্ণির সুবিখ্যাত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ তিনি দর্শন করেন। এই প্রাসাদমধ্যে প্রথম সঙ্গিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার ৩।৪ মাইল পশ্চিমদিকে অশোকনির্ম্মিত স্তূপ দর্শন করেন,—এই স্থানেই ত্রিপিটক সঙ্কলিত হইয়াছিল। তদনন্তর ২০০ পদ উত্তরদিকে গমন করিয়া পরিব্রাজক করণ্ড হ্রদ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ মাইল উত্তরদিকে অশোকনির্ম্মিত ৪০ হস্ত উচ্চ একটি স্তম্ভ হিয়োনসাঙের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তথা হইতে কিঞ্চিৎদূর উত্তর দিকে গিয়া পরিব্রাজক নবরাজগৃহ নগর দর্শন করেন। তথা হইতে ৫।৬ মাইল গমন করিয়া হিয়োনসাঙ নালন্দা সঙ্ঘারামের ভাণ্ডারাগারে উপনীত হন।

হিয়োনসাঙকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য দুইশত শ্রমণ তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সহস্র মানব চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, নবাগত অতিথির গুণগান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ছত্র, কেহ পতাকা, কেহ দণ্ডধারণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অন্যেরা গন্ধচর্চ্চিত কুসুমরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সম্মান ও সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বীণাপাণির বিহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ তাঁহাকে বিশেষ আসন প্রদান করিলেন। "কর্ম্মদান"* ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করিলেন, "যতকাল আচার্য্য হিয়োনসাঙ এই সঙ্ঘারামে বাস করিবেন, ততকাল তিনি ভিক্ষু ও উপাধ্যায়দিগোচিত সম্মান ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।"

কিছুকাল বিশ্রামের পর ২০ জন উপাধ্যায় হিয়োনসাঙকে মহাস্থবির শীলভদ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন। পরিব্রাজক সেই পলিতমুণ্ড স্খলিতদন্ত ১০৬ বৎসর বয়স্ক মহাপুরুষকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম ও তাঁহার পাদপদ্ম চুম্বন করিলেন। সেই বর্ষীয়ান মহাপুরুষ তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ

* বিহারস্বামী অথবা বিহারপাল।

করিলেন। হিয়েনসাঙ এবং অন্যান্য ভিক্ষুবর্গ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর শীলভদ্র হিয়েনসাঙকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কোন দেশ হইতে আসিয়াছ?" হিয়েনসাঙ বলিলেন, "আমি চীনদেশ হইতে যোগশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।"

এই বাক্যশ্রবণে সেই মহাপুরুষের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য—সপ্ততিবৎসরবয়স্ক বুদ্ধভদ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার শূলরোগের ইতিহাস এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি যে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যেরূপে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে বর্ণনা কর।"

গুরুদেবের বাক্যশ্রবণে বুদ্ধভদ্র রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া শীলভদ্রের শূলরোগের বিবরণ এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সেই বৃত্তান্তশ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

হিয়েনসাঙ উল্লিখিত বৃত্তান্তশ্রবণে আনন্দাশ্রু-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি এরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শিষ্যশ্রেণীতে স্থান প্রদান করুন।"

হিয়েনসাঙ প্রথম সাত দিবস বুদ্ধভদ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হিয়েনসাঙ স্বীয় গুরুর নিকট শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, নালন্দার নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানগুলি বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

হিয়েনসাঙ প্রথমতঃ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ক্রমে তিনবার তিনি স্বীয় গুরুর নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ন্যায় অনুসার শাস্ত্র একবার, "হিন-হিয়াং-তুই-ফা-মিং (?) একবার, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা এবং প্রমাণ (?) শাস্ত্র দুইবার অধ্যয়ন করেন, তৎপরে প্রাণ্যামূল শাস্ত্রটীকা তিনবার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিয়েনসাঙ কাশ্মীরে অবস্থানকালে কোশ এবং বিভাস প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ সকল গ্রন্থের যে যে স্থানে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে শীলভদ্রের নিকট পুনর্ব্বার সেই সকল অংশের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্দেহ দূর করিলেন। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের পর হিয়েনসাঙ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রণাদি

অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই তিনি গান্ধারদেশস্থিত শালাতুর নগরনিবাসী পাণিনি ঋষিকৃত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ব্যাকরণশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ ও (কলাপ, মস্তক, উণাদি, অষ্টধাতু প্রভৃতি) তিনি অনুশীলন করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি যে শীলভদ্রের নিকট দর্শনশাস্ত্রগুলি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিয়োনসাঙ সাঙ্খ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থানেই সর্ব্বদর্শনশ্রেষ্ঠ বেদান্তর উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না।

এইরূপে পাঁচ বৎসর মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া হিয়োনসাঙ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

Thus he penetrated, and examined completely, all the collection *(of Buddhist books)*, and also studied the sacred books of Brahmans during five years.—*(Life of Heuen-Tsiang p. 125.)*

তদনন্তর হিয়োনসাঙ নালন্দা হইতে বহির্গত হইয়া, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার নালন্দায় উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত এস্থলে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্রের ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হিয়োনসাঙ স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ইহার কত বৎসর পরে বঙ্গের আদিগৌরব মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন।

পরিব্রাজক ই—সিং ভারতভ্রমণাভিলাষে ৬৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে (৫৯৪ শকাব্দে) চীনদেশ হইতে যাত্রা করেন। ভারতের অন্তর্গত বিবিধ স্থান দর্শন করিয়া ৬৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে (৬১৬ শকাব্দে) স্বদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণকালেও জনৈক বিশেষ বর্ষীয়ান পুরুষ নালন্দা সঙ্ঘারামের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি নালন্দা সঙ্ঘারামের বর্ণনায় একস্থলে লিখিয়াছেন:—

The Superior is a very old man.

এই বর্ষীয়ান পুরুষ যদি শীলভদ্র হন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, তিনি কিঞ্চিদূনাধিক দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

নিবন্ধমালা।

অদ্য আমরা যে মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থকারের সহিত পাঠকবর্গকে পরিচিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নাম "বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লুণকর।" আমাদের সমালোচ্য "নিবন্ধমালা" ইহারই লেখনীপ্রসূত।

বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লুণকর যে সময় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রবন্ধরচনার জন্য লেখনী ধারণ করেন, সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল।

"ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষাকে ঘৃণা ও কৃপার পাত্র মনে করিতেন। তাঁহাদের মাতৃভাষা অসম্পূর্ণ, দরিদ্র ও গ্রন্থাদিরচনার অনুপযুক্ত—ইহাতে মনের সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, তখনকার অনেকেরই এইরূপ ধারণা ছিল। মাতৃভাষার কথা কহিতেও অনেকে অপমান (ও কষ্ট) বোধ করিতেন। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। মাতৃভাষায় গ্রন্থরচনা তখন এত অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য মনে হইত না। ইংরাজীর সাহায্যে স্বদেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন করিতে কাহারও কাহারও আগ্রহ দেখা যাইত। তার পর এদিকে ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার সহসা অত্যধিক প্রসার হওয়ায়, মহারাষ্ট্র দেশে এক নবযুগের সঞ্চার হইল। এই নবযুগের আবির্ভাবের সহিত, নব শিক্ষিতগণের মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা, শুধু মাতৃভাষার প্রতি কেন, স্বদেশীয় বস্তুমাত্রের প্রতি ঘৃণা ও বৈদেশিক পদার্থমাত্রের প্রতি অন্ধভক্তি জন্মিতে লাগিল। যাহা কিছু ইংরাজী ভাষায় লিখিত বা ইংরাজগণের মুখোচ্চারিত, তাহাই পরম সত্য ও হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইত।"

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, শাস্ত্রী মহাশয় স্বজাতির উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৭২, খৃষ্টাব্দে দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য তিনি "নিবন্ধমালা" নামক এক সুলভ অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়া, নূতন সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষা যে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগিনী, ইহা যে ভারতের অপর কোনও ভাষা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে, নিবন্ধমালাপাঠে সাধারণের এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সংস্কার করিয়া তাহাকে যে নূতন পরিচ্ছদে নূতন পথে পরি-

---

* উদ্ধৃত চিহ্নের অন্তর্গত কথাগুলি ঐ মহোদয়ের স্বরচিত একটি প্রবন্ধ—"মহারাষ্ট্রীয় ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা" হইতে গৃহীত হইল। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রাদুর্ভাবকালে সকল প্রদেশেই এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, প্রণীত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

চালিত করেন, এখনও তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচনাপ্রণালী অতিশয় প্রাঞ্জল, মধুর, হৃদয়গ্রাহী ও পারিপাট্যবিশিষ্ট। তাঁহার ভাষার সরসতা, রচনার পারিপাট্য, বক্তব্য বিষয়ের সারবত্তা ও মনোরঞ্জকতা প্রভৃতি গুণের জন্য অনেকে তাঁহাকে মহারাষ্ট্রদেশের মেকলে বলিয়া থাকেন। অপর এক সমালোচক তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বলেন,—"তাঁহার ভাষা—'সরস, সালঙ্কার সুপদন্যাসা সুবর্ণময় মূর্ত্তির'।" তাঁহার গ্রন্থপাঠে ভাষার সৌন্দর্য্য অনুভূত, জ্ঞান বর্দ্ধিত ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সাত বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত "নিবন্ধমালা" সম্পাদন করেন। তিনি একক ইহার লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। আট বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও অপরের এক পংক্তি রচনাও তাঁহার পত্রিকায় স্থান পায় নাই (১)। সমগ্র পত্রিকা একাকী নিজের রচনায় পরিপূর্ণ করিতেন। অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সকলের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জাতীয় সাহিত্যে উন্নতির জন্য তাঁহাকে সরকারী চাকরীতে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। দেশের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তিনি তৎসমস্তের অধিকাংশই করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও সহায়তায় "কেসরী" ও "মারাঠা" নামক দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। "মারাঠা" ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত। "কেসরী" এখনও, এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, চিন্তাশীলতা ও ভাষার বিশুদ্ধতাবিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রথমশ্রেণীর কাগজ। "কাব্যেতিহাসসংগ্রহ" নামক এক মাসিক পত্র ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় কবিতা ও বখরসমূহ এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য প্রকাশিত হইত। তন্মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত কাব্য নানাপ্রকার টীকাটিপ্পনী সহ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অতিশয় উদার ছিল। খৃষ্টান মিশনরীগণের সহিত মসীযুদ্ধে তাঁহার ন্যায় রণপণ্ডিত আর কেহ সেকালে ছিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুণাতে "নিউইংলিশ স্কুল" তিনি স্থাপন করেন। এখানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কেবল স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণের দ্বারা নূতন প্রণালীতে

(১) কেহ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়া নিবন্ধমালায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিলে, তাহা তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন।

শিক্ষাদান করা হইত। বলা বাহুল্য, ইহার ফল গভর্মেণ্টের স্কুলের অপেক্ষা প্রতি বৎসর সর্ব্বাংশে সন্তোষকর হইত। নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও, পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও, দেশীয় চিত্রবিদ্যার উন্নতির জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "পুণা চিত্রশালা" (Lithographic Press) স্থাপন করেন। হিন্দু দেবদেবী ও ভারতীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের সুরঞ্জিত চিত্র সাধারণে যাহাতে সুলভ-মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত সাধারণের সুবিধার জন্য পুণায় "আর্য্যভূষণ প্রেস" ও "কিতাবখানা" (Book Depôt) স্থাপন করেন। এইরূপে এই মহাপুরুষ স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণসাধনার্থ কঠোর পরিশ্রম ও প্রাণপণ যত্ন করিয়া, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে (৩২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে) ১৭ই মার্চ্চ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহারাষ্ট্রবাসিগণ ইহার অকাল-মৃত্যুতে অতিশয় শোকপরিতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনের জন্য একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের "নিবন্ধমালা" পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হই-য়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক পাইয়াছি। ইহার প্রথম ভাগে (প্রথম বর্ষে) নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি আলোচিত হইয়াছে। যথা,—১. মহারাষ্ট্রীয় ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা। ২ নিবন্ধমালার উদ্দেশ্য। ৩ বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব। ৪ সম্পত্তির উপভোগ। ৫ ইতিহাস। ৬ ভাবাদূষণ (ভাষার দোষ)। ৭ লেখনশুদ্ধি ৮ গ্রন্থপাঠ। ৯ ভাষান্তর (অনুবাদ)। প্রবন্ধগুলির নামেই বিষয় পরিব্যক্ত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে পৃথক্ কিছু বলা অনাবশ্যক।

প্রথম প্রবন্ধদ্বয়ে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটি আবশ্যকীয় অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা দ্বারা দ্বাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বের মহারাষ্ট্র সমাজের অবস্থা কতকটা জানা যায়। লেখক বলেন;—

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রকৃত যোগ্যতা।

"জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির উপর দেশের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল অনেকেই মহারাষ্ট্রীয় ভাষাকে অসম্পূর্ণ বিবেচনায় অনাদর করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যে ভাষায় তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতি অসংখ্য ঋষিগণ শ্রুতিরহস্যপ্রকাশক অমৃতসমূহ গ্রথিত করিয়াছেন। যে ভাষা জ্ঞানেশ্বর, মুক্তেশ্বর, বামন পণ্ডিত, ও মযুর পন্থ প্রভৃতি কবিবৃন্দের সরস ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনা দ্বারা সংস্কৃতের ন্যায় প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভাষাকে যে অর্থব্যঞ্জকতা, বর্ণসৌন্দর্য্য, আবেগ, গাম্ভীর্য্য ও সুরসত্যাদি গুণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, এরূপ মনে করা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার যোগ্যতা ও প্রৌঢ়তা

সংস্কৃতে যাঁহারা সন্দিহান, তাঁহারা Molesworth সাহেবের সংকলিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অভিধানের ভূমিকাটি পাঠ করিলে, তাঁহাদের সংশয় দূরীভূত হইবে।" (১)

"মহারাষ্ট্রীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য বিগত ৫০ বৎসর কাল গভর্মেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট অভিধান ও ব্যাকরণ ভিন্ন ভাষার উন্নতির স্থায়িত্ব সম্ভাবিত নহে।

গভর্মেণ্টের চেষ্টা।

বোম্বাই গভর্মেণ্ট প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিয়া উৎকৃষ্ট অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করাইয়া দিয়া, মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উন্নতির সোপান পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। গদ্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তি দিবার জন্য গভর্মেণ্ট নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি" স্থাপিত হইয়াছে। (২) এই সকল চেষ্টার ফলও কতকটা দেখা গিয়াছিল। তার পর এ দিকে

অবনতি।

১০।১৫ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার স্রোত সহসা অত্যধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় মাতৃভাষা সাধারণের ঘৃণার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে ও নামাবিধ ইংরাজী ভাব মহারাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার মৌলিকতা নষ্ট করিয়াছে। তার পর আজ কাল যদি বা দু একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের কৃপায়, পুস্তকবিক্রেতার দোকানে চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া কীটদংশনে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।"

এই অবস্থাতেও সংবাদ ও মাসিকপত্র মহারাষ্ট্রীয় ভাষাকে কিয়ৎপরিমাণে জীবিত রাখিয়াছে। সংবাদপত্রের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণের সহিত উহাদের উন্নতির বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষাসম্বন্ধেও প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমালোচনাদি থাকিত। কিন্তু এখন আর সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। মাসিকপত্রিকার সংখ্যাও কম, অবস্থাও ভাল নহে। চারিটির মধ্যে তিনটির অবস্থা শোচনীয়, ইহার প্রধান কারণ, শিক্ষিত

সংবাদপত্র।

সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি অনাদর। সুতরাং সরস ও সুখপাঠ্য সাহিত্যের অভাবে, সংবাদপত্রপাঠের দিকে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে ত সংবাদপত্রকে জ্ঞানের আকর বলিয়াই মনে করেন। এটা অবশ্যই দোষাবহ। যাহা হউক, মাসিকপত্রসম্পাদনের কষ্টসাধ্যতা ও সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধিও মাসিকপত্রের অসদ্ভাব এক প্রধান কারণ।

মাসিকপত্র।

"এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে মাসিকপত্রের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। মহারাষ্ট্রীয়

---

(১) কলিকাতার "মেটকাফ্ হল পব্লিক লাইব্রেরীতে" এই বৃহৎ অভিধান আছে। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা।

(২) প্রথম বাজীরাও পেশওয়ে যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি এই,—তিনি প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে দক্ষিণা দান করিতেন। এই কার্য্যে বৎসরে প্রায় ৬০।৭০ সহস্র টাকা ব্যয়িত হইত। ভবিষ্যৎ পেশওয়ে-বংশীয়েরা শেষ পর্য্যন্ত, ও ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত, এই প্রথা সুশৃঙ্খলায় রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে নূতন লোককে আর দক্ষিণা প্রদত্ত হইতে দেওয়া যাহারা পূর্ব্ববধি পাইতেছিলেন, তাঁহারাই পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বায়সংকোচ করায় যাহা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য গভর্মেণ্ট "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি" নামক বিদ্বৎসভা স্থাপন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতাকে এই প্রাইজ ফণ্ড হইতে পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ভাষার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র—'ত্রৈমাসিক জ্ঞানদর্শন'। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ মহাত্মা বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকর মহোদয় এই পত্র প্রকাশ করেন। 'এডিনবরা', 'কোয়ার্টার্লি' প্রভৃতি ইংরাজী পত্রিকার ধরণে ইহা পরিচালিত হইত। এই উচ্চ-অঙ্গের ত্রৈমাসিক পত্রে অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, পাশ্চাত্যদেশ-সমূহের ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইত। এই সকল জটিল ও দুরূহ বিষয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ও তাদৃশ প্রীতিকর না হওয়ায়, 'ত্রৈমাসিক জ্ঞানদর্শন' অচিরেই অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হইল। 'দিগ্‌-দর্শন,' 'জ্ঞানপ্রসারক' ও 'চন্দ্রিকা'—এই কয়েকটি মাসিকপত্র এই সময়ে প্রকাশিত হইত। প্রথম প্রথম যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্য চিন্তা বিশুদ্ধ ভাষায় এই সকল পত্রিকার সাহায্যে সাধারণ্যে প্রচারিত করিতেন। এতদ্ব্যতীত, নানাবিধ মনোরঞ্জক ও জ্ঞাতব্য বিষয় এই সকল পত্রিকায় যত্নসহকারে লিখিত হইত। এই সকল কারণে ও তৎকালে সংবাদপত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকায়, এই মাসিকপত্রগুলি সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

ত্রৈমাসিক জ্ঞানদর্শন।

অপরাপর পত্রিকা।

"কিছুদিন পরে 'সর্ব্বসংগ্রহ' নামক এক অতি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় কবিতাসমূহ বহু যত্নে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় 'পরশুরাম পন্ত গোড়বোলে' ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরশুরাম পন্তের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় কবিতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা আর কাহারও দেখা যায় না। ইনি বীয় জীবন স্বজাতীয় কবিতার আলোচনা ও জীর্ণোদ্ধারকার্য্যে সর্ব্বাংশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'সর্ব্বসংগ্রহ' ৬।৭ বৎসর বেশ চলিয়াছিল। আরও কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলিলে, অধিকাংশ প্রাচীন কবিতার লুপ্তোদ্ধার হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময় পূর্ব্বকথিত ইংরাজীশিক্ষার স্রোত প্রবল হওয়ায়, সাধারণের সাহায্য ও উৎসাহের অভাবে, ইহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

সর্ব্বসংগ্রহ।

নিবন্ধমালার তৃতীয় প্রবন্ধ—"বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিত্বশক্তি যে বিদ্যাবত্তার মুখাপেক্ষী নহে, ইহা প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে লেখক বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত কবি ও কাব্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজীর ন্যায় কাব্যসমালোচন গ্রন্থের বিশেষ অভাবের নির্দ্দেশ করিয়া, কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া যাহা বলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—

"প্রকৃত কবিতা কাহাকে বলে, তাহা অনেকেই জানেন না। দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ ও অনেকার্থকেই উৎকৃষ্ট কবিতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং কবিত্বকে পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁরা কবিতার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, উহার সরল প্রসন্নার্থত্ব ও একার্থত্বে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, নানাপ্রকার কষ্টকল্পনা ও একাক্ষরী কোষের সাহায্যে, আদিরসাত্মক কবিতার বৈরাগ্যপূর্ণ, ও হাস্যরসাত্মক কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় 'জগদ্গুরুশতক' ও 'আনন্দলহরী' নামক দুইখানি আদিরসাশ্রিত উৎকৃষ্ট কোষকাব্য আছে।

ইহা ধর্ম্মাচার্য্যের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ দেশের কোনও পণ্ডিত এই গ্রন্থদ্বয়ের আদ্যোপান্ত শাস্ত্রিয়সাশ্রিত-ব্যাখ্যা-সম্বলিত এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বস্তু কথা, ইহারা প্রকৃত কবিদের সরল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অপরে শব্দলালিত্য, বর্ণবিন্যাস ও বিচিত্রছন্দোযুক্ত পদ্যমাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ এই সকল গুণ প্রকৃত কবিতার প্রধান অঙ্গ নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, ছন্দোবৈচিত্র্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইলেও, উহা প্রকৃত কবিত্বের লক্ষণ নহে।

কাব্যের লক্ষণ।

"তবে প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ কি? যাহা পাঠ বা শ্রবণমাত্র চিত্ত ব্যাপ্ত হইয়া বর্ণনীয় বিষয় ও রস হৃদয়পটে সহজে ও সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই প্রকৃত কাব্য। এবং যে শক্তি অপর কোনও বিষয়ের সাহায্য ব্যতীত, কেবলমাত্র সরল অর্থের অনুরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও তদ্ব্যঞ্জক শব্দের অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবে মনকে চমৎকৃত করিতে পারে, তাহাকে কবিত্বশক্তি বলে। কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকির নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে, এই তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা,—

কবিত্বশক্তি।

"তত্ত তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দ্দমম্॥
অকর্দ্দমমিদং তীর্থং ভারদ্বাজ নিশাময়।
যথা মমৈষ প্রহ্লাদঃ চ সজ্জনানাং মনো যথা॥
ইদং তীর্থং সখে সৌম্যং সুজলং শুভ্রবালুকং।
ভরদ্বাজাত কলশমাত্ত দীয়তাং বল্কলং মম॥"

বালকাণ্ড—২ সর্গ।

"এই নিদর্শিত এই শব্দালঙ্কারাদি-আড়ম্বরশূন্য কবিতা কাহার না "রসদীর্ণ" বলিয়া বোধ হয়। ইহা কাহার চিত্তকে "সৌম্য" ও "প্রসন্ন" না করে। জ্ঞানেশ্বর, মুক্তেশ্বর ও তুকারামাদির কবিতাও এইরূপ গুণবিশিষ্ট। এইরূপ গুণযুক্ত রচনা পদ্যাত্মক না হইলেও, কাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। আর যাহা এই গুণযুক্ত নহে, তাহা শব্দ-যমক-প্রাস-প্রচুর ও বিবিধ-ছন্দোযুক্ত হইলেও কাব্য নহে।

কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য।

"কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী। কবিত্ব ঈশ্বরদত্ত, পাণ্ডিত্য কৃষ্টি-পার্জ্জিত। কবিত্ব কল্পনাপ্রধান, পাণ্ডিত্য তত্ত্বজ্ঞানমূলক। ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসাদি শাস্ত্রে পারদর্শিতা অনেক স্থলেই কবিত্বের পক্ষে অন্তরায়কর। শ্রীহর্ষাদির কাব্য এই সকল শাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, প্রথম শ্রেণীর কাব্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয় নাই।

প্রাচীন কবিগণের উৎকর্ষের কারণ।

"কল্পনাশক্তির বিকাশের পর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই কারণে, আদিম অবস্থার লোকের মধ্যে কল্পনাপ্রিয়তা কিছু অধিকপরিমাণে দৃষ্ট হয়। কল্পনা কবিগণের প্রাণ ও প্রধান অবলম্বন। কবিতা সেই কল্পনার বিকাশমাত্র। জগতের আদি গ্রন্থগুলি যে গদ্যময় না হইয়া কবিতাময় হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রধান কারণ বোধ হয়। এবং এই নিমিত্ত সেই কল্পনাপ্রধান প্রাচীনকালে এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের চাপেতে কল্পনার গতি কুণ্ঠিত বলিয়াই, অধুনা ব্যাস, বাল্মীকি বা হোমারের ন্যায় কবির জন্মগ্রহণ সম্ভবপর নহে।

কবির প্রধান গুণ—সহানুভূতি। পুত্রাদি, জীব, জড়াদি নানাবিধ বাহ্যবস্তুর অবস্থা ও

ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। চিন্তামাত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন বৃত্তির ক্রিয়া ও অবস্থা, স্পষ্ট ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাঁহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয়। উক্ত বৃত্তিগুলির বিষয়ীভূত কোনও কোনও ঘটনা ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র কবির মন মুগ্ধ হইয়া যায়; এবং তজ্জনিত ভাবের আবেগে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হয়, তাহাই প্রকৃত কবিতা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিতার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.' আদিকবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চবধদর্শননিমিত্তক করুণোক্তি, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভক্ত কবি তুলারামের 'অভঙ্গ'গুলিও এইরূপ উৎকৃষ্ট কবিতার উদাহরণ-স্বরূপ। অতএব, যাঁহার হৃদয় যে পরিমাণে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হইবার উপযুক্ত, তিনি সেই পরিমাণে কবি। অর্থাৎ, যাঁহার যে পরিমাণে সহৃদয়তা আছে, তিনি সেই পরিমাণে কবি।

কবির গুণ—সহৃদয়তা।

'এই সহৃদয়তা বা হৃদয়ের কোমলতা তরুণবয়সে যত অধিক, প্রৌঢ়াবস্থায় তত নহে। মানবসমাজের আদিম অবস্থায় ইহা যেরূপ সুলভ, প্রৌঢ়াবস্থায় তাদৃশ সুলভ নহে। এই নিগিত, আদিম অবস্থার সরল কল্পনাপ্রিয়, কৃত্রিম-সংস্কার-রহিত, বিশুদ্ধ মানসপটে, বাহ্য ও অন্তঃসৃষ্টির চিত্র—'রঙ্গঃ শুক্লপটে যথা'—এই ন্যায়ানুসারে যেরূপ অবিকল প্রতিফলিত হইয়াছিল, প্রৌঢ় সমাজে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। ইহাও প্রাচীন কালের কবিগণের উৎকর্ষের এক প্রধান কারণ।

প্রাচীন কালের সহৃদয়তা।

'জনসন, পোপ ও ড্রাইডেন এককালে মহাকবির মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব-সহৃদয়তার অভাবে এক্ষণে কবিসম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। পোপ ও ড্রাইডেন আজীবন কবিতার উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াও, উপযুক্ত সহৃদয়তালাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ড্রাইডেন, স্বপ্রণীত Indian Emperor নামক নাটকের এক স্থলে যে রাত্রি-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতে 'vague, bombastic and senseless!' হোমারের ইলিয়ডের ৮ম সর্গের শেষে জ্যোৎস্নারাত্রির যে বর্ণনা আছে, তাহার পোপ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ এরূপ বিসদৃশ হইয়াছে যে, মেকেলের মতে 'ইহাতে যত ভ্রম আছে, সমগ্র ইলিয়ডে তত নাই।' গ্রীক ও লাটিন ভাষাভিজ্ঞ বেন্টলী একদিন পোপকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুবাদে হোমারের কবিত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত কবিগণের রচনা তাদৃশ সরস না হইবার কারণও এই সহৃদয়তার অভাব। তাঁহাদের কবিতায় স্বানুভূত বিষয়ের বর্ণনা অপেক্ষা কষ্টকল্পনা, অত্যুক্তি ও পূর্ব্বকবিগণের বর্ণনার অনুকরণ ও সরল অর্থসৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে ছন্দোবৈচিত্র্য, শব্দার্থালঙ্কার ও পদলালিত্যসাধনের চেষ্টাই অধিক দৃষ্ট হয়।

পোপ, জনসন, ড্রাইডেন।

ড্রাইডেন ও পোপের দোষ।

সংস্কৃত কবির দোষ।

'এই যে সহৃদয়তা বা স্বানুভূতির উল্লেখ করা গেল, তাহা প্রকৃত কবিরও সর্ব্বথা আয়ত্ত নহে। মিল্টন নিজের সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন, বৎসরের মধ্যে কতবিশেষে তাঁহার প্রতিভা বিশেষ পরিস্ফুটিত হইত; তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যাদির অধিকাংশই এই সময়ে রচিত। পোপের সম্বন্ধে জনসন বলেন, বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, জীবনে আর কখনও তদ্রূপ কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই।' বায়রনের ২৩।৩০ বৎসর বয়সে রচিত কবিতাগুলিই তাঁহার অপর কালে রচিত কবিতা অপেক্ষা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ।

মিল্টন, পোপ, বায়রন্।

"সুতরাং সহৃদয়তাই কবিত্বের প্রধান অঙ্গ। ছন্দোলালিত্য, বর্ণসামঞ্জস্য ও অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার কবিতার শোভাবর্দ্ধক হইলেও, কাব্যের প্রধান অঙ্গ নহে; এই সকলের অভাবেও অনেক কাব্য জগতে চিরকাল সমান সম্মান লাভ করিয়াছে, দৃষ্ট হয়। অলঙ্কারাদির অভাবেও কাব্যের আদর, এরূপ উদাহরণস্বরূপ রামায়ণের উল্লেখ করিতে পারা যায়। রামায়ণের আদ্যোপান্ত সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত। উহার পদরচনার দিকেও কবির বিশেষ লক্ষ্য দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে। মহাভারতের স্থানে স্থানে বড় বড় ছন্দ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তৎসমুদয়ের অধিকাংশ স্থলেই ছন্দোভঙ্গ দোষ পরিলক্ষিত হয়।

অলঙ্কারাদি শোভাবর্দ্ধক মাত্র।

রামায়ণ ও মহাভারত।

সেক্‌স্‌পীয়রের গ্রন্থে ত প্রায় সর্ব্বপ্রকার দোষ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। তাঁহার গ্রন্থে ব্যাকরণদুষ্ট কর্ত্তায় এক বচনের ক্রিয়া সংযোজিত, নোহিমিয়া সেখ বীরত্বরূপে বর্ণিত ও লেক্‌টারের মুখে তাঁহার বহুশতবর্ষপরবর্ত্তী আরিষ্টটলের বাক্য সংস্থাপিত হইয়াছে (৩)। মাধুর্য্য, মৃদুতা ও প্রসাদাদি গুণেরও বিশেষ সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। বরং, ড্রাইডেন, পোপ ও ডাঃ জনসন পড়তির সময়ে, ক্লার্কস্, ষ্টিভেন্সাদি দোষের জন্য ইহা সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই। এখনও তাঁহার নাটকগুলি দুর্ব্বোধতাদি দোষের জন্য প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অশ্লীল ও শ্লেষাত্মক রচনার প্রাচুর্য্য তাঁহার নাটকের এক মহদ্দোষ; জনসন বলেন, 'Our author can never resist the temptation of a pun.' অশ্লীলতার বাড়াবাড়িও কিছু বেশী। সেক্‌স্‌পীয়র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যগুলি বিবিধদোষযুক্ত। এতৎসম্বন্ধে এক জন সমালোচক (মিঃ হালম্) বলেন, 'এই কাব্যগুলি কবির বিশাল কীর্ত্তির কলঙ্কস্বরূপ। কবি এগুলি না রচনা করিলেই ভাল করিতেন।' মহারাষ্ট্রীয় কবিগণের রচনাও অর্থক্লিষ্টতা, ছন্দোভঙ্গ, ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধদোষযুক্ত। পদলালিত্য ও অর্থপারিপাট্যাদি গুণেরও সর্ব্বত্র সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। এই সকল দোষ সত্ত্বেও রামায়ণ, মহাভারত, সেক্‌স্‌পীয়র কৃত নাটকসমূহ ও তুকারাম প্রভৃতি মহারাষ্ট্র কবির রচনা চিরকাল সর্ব্বত্র সমাদৃত। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, পদলালিত্য ও ছন্দোলঙ্কারাদি ঐ কাব্যের শোভাবর্দ্ধক ও উৎকর্ষসাধক হইলেও, উহার প্রাণস্বরূপ নহে। প্রকৃত সহৃদয়তাই কবিতার প্রাণ।"

সেক্‌স্‌পীয়রের দোষ।

সিদ্ধান্ত।

(৩) ব্যাকরণাশুদ্ধির একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ এই,—"There is *tears* for his love."—জুলিয়স্ সীজর নাটক। জনসন বলেন, "Our author seldom escapes well when he is entangled in Geography."

নিবন্ধমালার "ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও, অতিবিস্তৃত বলিয়া উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরাও স্বতন্ত্র প্রস্তাবে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। উপসংহারে, "লেখনশুদ্ধি" প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ ভ্রম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় আজ কাল "নব্যভারতে" যে আলোচনা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সাহিত্যসম্পাদক বিগত পৌষ মাসের "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন,

তাহার সহিত নিবন্ধমালা-লেখকের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রী মহোদয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রচলিত অশুদ্ধপ্রয়োগসংশোধনেচ্ছু লেখকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভাষার প্রচলিত অশুদ্ধপ্রয়োগগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। কারণ, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সমস্ত অশুদ্ধ প্রয়োগকে শুদ্ধ করিয়া ভাষাকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাপ্রচারের পথ রুদ্ধ করিলে, তাহার অর্থব্যঞ্জকতা, মাধুর্য্য ও সারল্যাদি গুণ বিনষ্ট হইয়া উহা নিতান্ত কৃত্রিম ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত সংস্কৃত বিজ্ঞ বৈয়াকরণেরা, "প্রয়োগশরণাঃ বৈয়াকরণাঃ" এই সূত্র দ্বারা, প্রচলিত নূতন প্রয়োগগুলিকে ব্যাকরণের অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন। পাণিনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণও প্রাচীন ছান্দস ও আর্ষ প্রয়োগগুলিকে ব্যাকরণের নিয়মাধীন করিতে চেষ্টা না করিয়া, ভাষার সরসতা রক্ষা করিয়াছেন।

* * যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক, তাহাদিগকে সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী করিবার চেষ্টাও অনাবিশ্যক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, তদ্দ্বারা ভাষার বিপ্লবসাধন ব্যতীত আর কিছুই ফললাভ হয় না। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বর্ত্তমান কালে যে সকল নূতন শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে, সেগুলির ব্যাকরণশুদ্ধি ও অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা গ্রন্থকারগণের কর্ত্তব্য।"

লেখক বিবিধ উদাহরণ দ্বারা উদ্ধৃত মতের সমীচীনতা প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তি।

১২৯৯ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্যে'—আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্যের এবং তন্নিম্নবর্ত্তী অন্যান্য অনেক জীবের দৈহিক গঠন ও সংস্থান অনেকটা একরকম। এই সাদৃশ্য বানরশ্রেণীর জীবের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু সকলজাতীয় বানরের সহিত সমান নহে। যে কয়েক জাতীয় বানর দৈহিক গঠনসম্বন্ধে মনুষ্যের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্যের সহিত

সাদৃশ্যের আধিক্য থাকায়, ইহারা 'মানবভাবাপন্ন বানর' (anthropoid apes) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, এবং গিবন্ বা দীর্ঘবাহু বানর, এই শ্রেণীভুক্ত। দৈহিক সংস্থান বিষয়ে ইহারা সকলেই মনুষ্যের অতি নিকট জ্ঞাতি; কিন্তু বিশেষ কেহই, নিকটতম বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কোনও বিষয়ে শিম্পাঞ্জি, দ্বিতীয় কোনও বিষয়ে গরিলা, তৃতীয় কোনও বিষয়ে ওর‍্যাং, চতুর্থ কোনও বিষয়ে গিবন, মনুষ্যের নিকটতম। কেবল কঙ্কালমাত্র দেখিয়া বিচার করিলে শিম্পাঞ্জি এবং গরিলাকে নিকটতম বলিয়া প্রতীত হইবে; কর্ণের গঠন দেখিলে গরিলাকেই নিকটতম বোধ হইবে—মনুষ্যের সহিত জিহ্বার সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা ওর‍্যাংয়ের অধিক; পাকাশয় এবং যকৃতের সাদৃশ্য গিবনের ন্যায় আর কাহারও নহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সকল জাতীয় বানরের নাম উপরে করা গেল, তাহাদের কেহই মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ নহে। ইহাও বুঝায় যে, এই সকল বানর এবং মনুষ্য, উভয়ই এক অভিন্নবংশসম্ভূত। যে জাতীয় জীব হইতে ইহারা উভয়ে উৎপন্ন, পৃথিবী হইতে সে জাতির তিরোভাব হইয়াছে—কত যুগ হইল, কে জানে।

মনুষ্যের নিকট জ্ঞাতি বলিয়া যে সকল জাতীয় বানরের নাম উপরে করা গেল, শরীরসম্বন্ধে তাহাদের সহিত মনুষ্যের পার্থক্যও বিস্তর। যাহাকে 'কুকুর দাঁত' বলে, বানরে তাহা অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা অনেক বড়; মনুষ্যে তাহা অন্যান্য দন্তের সমান—ছেদন-দন্ত বা চর্ব্বণ-দন্ত অপেক্ষা কোনও অংশে বৃহত্তর নহে। মনুষ্যের অপেক্ষা বানরের বাহু দীর্ঘতর, উরুদেশ ক্ষুদ্রতর—আজানুলম্বিত বাহুর গৌরব কাব্যাদিতে পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা বানর ভিন্ন মনুষ্যে দেখা যায় না। পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া সরলভাবে দাঁড়ান এবং চলাফেরা করাই মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; বানরে চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে না—তাহাদের পায়ের গঠন সেরূপ নহে। তাহাদের পদ প্রায় মনুষ্যের হস্তের ন্যায়। বানরেরা যখন বসিয়া থাকে, কেবল তখনই তাহারা তাহাদের হাত মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে—তাহাও ভাল করিয়া পারে না। সংক্ষেপতঃ, বানরশ্রেণীর জীবের হস্তপদাদির গঠন বৃক্ষাশ্রয়ী জীবেরই উপযুক্ত—সমতল ভূমিতে বিচরণ করিবার উপযোগী নহে। এতদ্ব্যতীত বানরদিগের দেহ লোমাবৃত; মনুষ্যের দেহ প্রায় লোমহীন। এই সকল পার্থক্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে কতকটা উপলব্ধি হয় যে, কি অভাবনীয় দীর্ঘকালে

ইহা ঘটিয়াছে—যে জাতি বিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে, সেই জাতি প্রথম যখন মূল বংশ হইতে পৃথক হইয়া পৃথক পথ অবলম্বন করে, সে কি অচিন্তনীয় অতীতের পরপারবর্ত্তী কাল—তাহার পর কত শত যুগ, কত কল্প যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সীমা নাই।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, এবং এই প্রবন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য যে কোনও নিম্নতর জীব হইতে উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে সংশয়ের স্থল থাকে না। তবে মানুষের ন্যায় মহামহিমান্বিত জীব—যে আপনাকে সৃষ্টির অধীশ্বর (Lords of creation) বলিয়া স্পর্দ্ধা করে;—সে যে কোনও নিকৃষ্টতর জীবের বংশধর বা নিকট জ্ঞাতি, ইহা স্বীকার করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা করে না। মনুষ্যেতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে লোকে আপনাদিগকে দেবতা বা অর্দ্ধ-দেবতার বংশধর বলিয়া প্রচার করিতে লালায়িত হইত—অনেক সময় কৃতকার্য্যও হইত; সেই মনুষ্য কি আপনাকে বানর বা তজ্জাতীয়, বা তদ্রূপ কোনও জীবের বংশধর বলিয়া স্বীকার করিতে সহজে পারে? মনুষ্য যে কোনও নিম্নতর জীব হইতে উৎপন্ন, মনুষ্য যে বানরের জ্ঞাতি, এ তত্ত্বটা বিশ্বাস করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়—এই আত্মগৌরব। শত সহস্র প্রমাণ-চক্ষের উপর বিরাজিত, চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান, তবু কেবল এই আত্মগৌরবের দায়ে আমরা চক্ষু মুদিত করিয়া প্রমাণের হাত এড়াইতে প্রয়াস পাই—যেন তুমি-আমি চোখ বুজিলেই প্রমাণও তিরোহিত হইবে, সত্যও আত্মগোপন করিবে।

সে যাহা হউক, মনুষ্যের এই সর্ব্বতত্ত্বানুসন্ধায়ী বুদ্ধি, এই সূক্ষ্মতম-প্রবেশী দৃষ্টি, এই বৈকুণ্ঠস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা, ইহা লইয়া বানরের বা তদ্রূপ কোনও জীবের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করা অতীব দুরূহ, সন্দেহ নাই; কিন্তু না স্বীকার করিলে একটা দুরূহতর কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। কথাটা এই—যে প্রমাণ উপস্থিত আছে, তাহাতে হয় স্বীকার কর যে, মনুষ্য কোনও নিকৃষ্টতর জীব হইতে উৎপন্ন; না হয় বল যে, মনুষ্য স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মনুষ্য যদি স্বতন্ত্র সৃষ্টিই হয়, তবে অব্যবহিত নিম্নতর অন্য জীবের সহিত এতটা সাদৃশ্য কেন? স্রষ্টা কি আমাদিগকে ভ্রমে ফেলিবার জন্য এই ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন? স্রষ্টা কি বঞ্চক? তাহা ত হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দৈহিক সাদৃশ্যে যাহা বুঝায়, তাহাই সত্য। স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের শরীর যখন নিম্নতর জীবের শরীরের অনুরূপ, তখন মনুষ্যও নিম্নতর

জীবের ন্যায় উৎপন্ন। ইহা অস্বীকার করিলে সৃষ্টিতে প্রতারণার আরোপ করা হয়।

কিন্তু নিম্নতর জীব হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিতে কেবল দৈহিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না; মানসিক ও নৈতিক সাদৃশ্যও দেখাইতে হইবে। দেখাইতে হইবে যে, নিম্নতন জীবে এমন সকল বৃত্তি আছে, যাহা প্রাকৃতিকনির্ব্বাচননিয়মে বিবর্ত্তিত হইয়া, মনুষ্যোচিত বৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে। ডারউইন প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা এ বিষয়েরও ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা আমরা ক্রমে বিবৃত করিতেছি।

যে সকল জাতীয় বানর 'মনুষ্যভাবাপন্ন' বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সহিত মনুষ্যের যে দৈহিক প্রভেদ আছে, তাহার কতকটা পরিচয় আমরা দিয়াছি। এই প্রভেদ অপেক্ষাও মানসিক প্রভেদ আরও অধিক। নিম্নতম মনুষ্যের সহিত উচ্চতম বানরের তুলনা করিলেও বোধ হয়, যেন এই প্রভেদ দুরতিক্রম্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে প্রভেদ আছে, তাহা বিস্তর হইলেও, কেবল পরিমাণে—প্রকারে নহে। মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমন প্রভেদ আছে। এক চুপ্‌ড়ি মাছ ফেলিয়া দিয়াছিল বলিয়া যে অসভ্য আপন পুত্রকে পাহাড়ের উপর আছড়াইয়া মারিয়াছিল, তাহাতে আর শাক্যসিংহ বা যিশুখৃষ্টে কত প্রভেদ, মনে কর দেখি। যে অসভ্যের ভাষায় চারির অধিক সংখ্যা নির্দ্দেশক কথা নাই, তাহাতে আর শঙ্করাচার্য্যে কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদ, ভাব দেখি। প্রভেদ যে বিস্তর আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসল কথা—এই প্রভেদের ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না। ডারউইন এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন—হইতে পারে।

মনুষ্য এবং তন্নিম্নতর জীবের বহিরিন্দ্রিয় সকল যখন একই বিধ, তখন উভয়ের মৌলিক সংস্কার সকল যে একই প্রকার হইবে, তাহা প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই; কেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৃত্তি ও সংস্কার এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিরাজমান। আত্মরক্ষার বৃত্তি, অপত্যস্নেহ, যৌনপ্রীতি—এ সকল যেমন মনুষ্যে, তেমনি ইতর জীবেও বিদ্যমান। তবে কোন্‌টা জ্ঞানের কার্য্য, কোন্‌টা সংস্কারের কার্য্য, ইহা নির্দ্দেশ করা অধিকাংশ স্থলেই অতি কঠিন। এসিয়া ও আফ্রিকাবাসী বানরেরা—ওরাং, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি—গ্রীষ্মপ্রধানদেশজাত বিষাক্ত ফলমূল স্বভাবতঃই পরিহার করে। মনুষ্যের এরূপ জ্ঞান নাই। ইহা

কি সহজাত, না উপার্জ্জিত সংস্কার? প্রথম দৃষ্টিতে, সহজাত-সংস্কার বলিয়াই প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বিবেচ্য। শীতপ্রধান দেশের পালিত পশু সকলকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যথেচ্ছ ছাড়িয়া দিলে, তাহারা বিষাক্ত ফল খায়, এবং তন্নিবন্ধন মরে। কিছুকাল পরে অভ্যস্ত হইলে, তাহারা আর সে সকল ফল খায় না। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর বানরদিগের বিষাক্ত ফল পরিহারের ব্যাপারকে সহজাত-সংস্কার বলা যায় না। খুব সম্ভব যে, ইহা উপার্জ্জিত সংস্কার। কুভিয়র লিখিয়াছেন যে, যে সকল জীবের বুদ্ধি অধিকতর পরিস্ফুট, তাহাদের সংস্কার অধিকতর দুর্ব্বল। ফরাসী লেখক পুগে এই কথায় আপত্তি করিয়াছেন, এবং বোধ হয়, কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধি ও সংস্কারের ভিতর এরূপ বিরোধ কিছু নাই। অনেক জীবের মধ্যে দেখা যায় যে, যেখানে বুদ্ধি অধিক, সেখানে সংস্কারও অধিক। 'বিভর' ইহার দৃষ্টান্ত। কেবল মনুষ্যের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। সংস্কারসম্বন্ধে মনুষ্য বড়ই হীন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মনুষ্যের বুদ্ধি ও সমাজনিয়ম এতই সুন্দর ও উন্নত যে, তাহার পক্ষে সংসার-সংগ্রামে সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। অপ্রয়োজনে, সুতরাং অব্যবহারে, সকলই লুপ্ত হয়। মনুষ্যের ভিতর সংস্কারও বোধ হয় সেই কারণেই লুপ্ত হইয়াছে, বা হইতে বসিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পাঁচ ফুলের সাজি।

শতাব্দী গণনা।—আমরা শতাব্দী, বৎসর, মাস প্রভৃতি দ্বারা কালগণনা করি। ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করিতে হইলে, আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, অমুক ঘটনা অমুক শতাব্দীতে হইয়াছিল, টেনিসন্ ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি, ইত্যাদি। পাঠক ভাবিতে পারেন, বেশ, ইহা ত সহজ কথা, ইহাতে এমন কি গোল থাকিতে পারে? সত্য, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডেও জনসাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়াছিল কথাটা এখনও উঠিতে পারে; কারণ বর্ত্তমান শতাব্দীও শেষ হইতে চলিল। কথাটা এই:— আর ৬ বৎসর পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পড়িবে, এখন এই বৎসরটিকে ঊনবিংশ অথবা বিংশ শতাব্দীর অন্তর্গত বলিব? একটু ভাবিয়া দেখিলে কথাটার সীমাংসা সহজেই হইবে। খৃষ্টাব্দ ১, ১লা জানুয়ারি রাত্রি ১২টা হইতে খৃষ্টীয় অব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ঠিক এই মুহূর্ত্ত হইতে প্রথম শতাব্দীর আরম্ভ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্য সেই মুহূর্ত্ত হইতে পূর্ণ এক শত বর্ষ অতীত হইলে, প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ গণিতে হইবে। সুতরাং খৃঃ ১০০, ৩১শে ডিসেম্বর, এবং খৃঃ ১০১, ১লা জানুয়ারি, এই দুই দিবসের অন্তর্গত

রাত্রি ১২টা হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইল। এইরূপে খৃঃ ২০০ ৩১শে ডিসেম্বর, এবং খৃঃ ২০১, ১লা জানুয়ারি, এই দুই দিবসের মধ্যগত রাত্রি ১২টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ এবং তৃতীয়ের প্রারম্ভ গণনা করিতে হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইবে, ১০০ খৃষ্টাব্দের সমুদায় বৎসরটি প্রথম শতাব্দীর অন্তর্গত, ২০০ খৃষ্টাব্দের সমুদায় বৎসর দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তর্গত, এবং এই নিয়মানুসারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সমুদায় বৎসরটি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্গত। ১লা জানুয়ারি ১৮০১ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ, এবং ইহার সমাপ্তি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০০। ১লা জানুয়ারি ১৯০১ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ৮

* *

পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা।—সার টমাস ব্রাউন্ বলিয়াছিলেন, "আমি বুঝি না, কোন্ যুক্তিতে ব্যাঙ, হাতী অথবা ভালুককে আমরা কুৎসিত বলি"। তিনি ইহা না বুঝিলেও আমাদের মধ্যে ইতর জীব জন্তুর প্রতি প্রায় একটা সাধারণ ঘৃণার ভাব আছে। অনেক সময়ে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের ইহাই একটি প্রধান কারণ। কোনও পাখী বা কোনও পশু নিতান্ত সুশ্রী না হইলে, আমরা বালকবালিকাদিগকে তাহাদের স্পর্শও করিতে দিই না; এবং শৈশব হইতেই নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুকে সাধারণতঃ ঘৃণা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিতে শিক্ষা দিই। কোনও কৌতূহলাবিষ্ট বালক যদি একটি ব্যাঙ অথবা একটি পোকা হাতে করিয়া ধরিল, আর আমরা অমনি লগুড়হস্তে তাড়না করিলাম, এবং দূর দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য করিলাম। এই চিরাভ্যস্ত ঘৃণা এবং ভয়ের জন্যই বালক বালিকারা অনেক সময়ে ব্যাঙ পোকা মাকড় ইত্যাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে ত্রুটি করে না। এতদ্ব্যতীত, অনেকেই মাংসাশী বা হিংস্রজন্তুদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া কিছুই অন্যায় মনে করেন না, এবং তাহাদিগকে ক্রূর প্রভৃতি নানা অভিধানে অভিহিত করেন। সে যাহা হউক, অনেক সময় বালকদিগকে এই শ্রেণীর জন্তুর সম্বন্ধে বড়ই ভুল শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা দেখে, ক্রূরবুদ্ধি মাকড়শা কিরূপে জালের মধ্যে থাকিয়া মাছি ধরিয়া ভক্ষণ করে, নিষ্ঠুর অধার্ম্মিক বক কিরূপে সুন্দর ছোট মাছগুলি মারিয়া ফেলে, ইত্যাদি। এরূপ শিক্ষা শুধু যে হাস্যাস্পদ, তাহা নয়, ইহা ভ্রান্তিজনক এবং কতকটা ধর্ম্মহীন। মানুষ তাহার বিবেচনাশক্তির এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্পষ্ট বিরোধ সত্ত্বেও যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা বৃথা কোনও প্রাণীকে কষ্ট দেয়, তবে তাহাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারি, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জন্তু তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ সহজজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্য অন্বেষণ অথবা নিয়মিত কার্য্য করিলে, তাহাকে নিষ্ঠুরতাদোষে দুষ্ট করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। অনুসন্ধান করিলে বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকে এবম্বিধ গল্প এবং শিক্ষার প্রাচুর্য্য পাঠক দেখিতে পাইবেন।

* *

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ধ্রুবতারা।—পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ব্যাবর্ত্তন হেতু ক্রান্তিপাতদ্বয়ের অগ্রগতি হয়, ইহাকেই ক্রান্তিপাতগতি অথবা অয়নচলন বলে, (Precession of the equinoxes)। এই জন্য পৃথিবীর অক্ষরেখা সর্ব্বদাই আকাশের এক দিকে নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তাহার একটা সাময়িক গতি উৎপন্ন হয়। আজ ধ্রুব আকাশের যে বিন্দুর অভিমুখ হইয়াছে, কয়েক শত বৎসর পরে আর তাহা থাকিবে না, খগোলকের অপর কোনও বিন্দুর সম্মুখীন হইবে। আজ আমরা যে নক্ষত্রটিকে ধ্রুবতারা বলি, এবং চঞ্চল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিশ্চল এবং স্থির বলিয়া মনে করি (যদিও বর্ত্তমান ধ্রুবতারা ঠিক অক্ষরেখার সম্মুখীন হয় নাই), কয়েক শতাব্দী পরে তাহাকে আর স্থির বলিতে পারিব না, তখন আবার আর একটি নক্ষত্র

---

* Dr. Lardner's "Common Things Explained."

আমাদের ধ্রুবতারা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপে ধ্রুবতারার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং ২৫৮০০ বৎসরে এই পরিবর্ত্তনচক্রের একটি আবর্ত্তন পূর্ণ হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ সার্ জন্ হার্শেল তাঁহার Outlines of Astronomy নামক গ্রন্থে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন্‌টি আমাদের ধ্রুবতারা ছিল, এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি লিখিয়াছেন :—

গিজের (Gizeh) পিরামিড নির্ম্মাণকালে (বর্ত্তমান সময়ের ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে) নক্ষত্রসমূহের রেখাংশ (longitude) তাহাদের বর্ত্তমান রেখাংশ অপেক্ষা প্রায় ৫০°১৫′ কম ছিল। ইহা হইতে গণনা করিলে দেখা যাইবে, তারকাবলীর মধ্যে ধ্রুবের অবস্থান আল্‌ফা ড্রেকনিস্ নামক নক্ষত্রের নিকটে, বস্তুতঃ ধ্রুব হইতে উক্ত নক্ষত্রের দূরত্ব ৩°৪৪′২৫″। নিকটস্থ তারকাপুঞ্জের মধ্যে এইটিই অতি উজ্জ্বল বলিয়া, ইহাই তখনকার ধ্রুবতারকা ছিল। আর একটি ঘটনাতে এই অনুমানের অতি সুন্দর সমর্থন পাওয়া যায়। গিজের অক্ষাংশ ৩০° উত্তরে, অতএব সেখানে ধ্রুবের উচ্চতাও ৩০° এবং উক্ত তারকার অতুঙ্গাবস্থায় (at lower culmination) উচ্চতা ২৬°১৫′৩৫″ হইবে। এখন আশ্চর্য্যের বিষয় এই—গিজের নয়টি পিরামিডের মধ্যে বৃহৎ ছয়টি সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথগুলির (এবং সকলগুলিই পিরামিডের উত্তর ভাগে অবস্থিত) কোনটিই horizonএর সহিত সমতল নয়, তাহাদের horizonএর সহিত বক্রতা গড়ে প্রায় ২৬°৪৭′। অতএব এই সকল প্রবেশপথের প্রত্যেকের ঠিক নিম্নেই ধ্রুবতারা (ড্রাকোনিস্) অতুঙ্গাবস্থায় দেখা যাইত। এই ঘটনাকে একটা কাকতালীয় সন্নিপাত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, এবং নিশ্চয়ই উক্ত নক্ষত্রদর্শনের সহিত কোনও কুসংস্কারগত সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই পিরামিডগুলি এমন বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত সূত্রগুলি এইরূপে অতি আশ্চর্য্য এবং অলান্তরূপে তৎকালীন ধ্রুবতারকার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বৃষ্টিবিন্দুর আয়তন এবং বেগ।—বৃষ্টিবিন্দুর আয়তন সর্ব্বদা সমান থাকে না, ইহার ব্যাস ১/৫ ইঞ্চ হইতে ১/৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রথম যখন একটি বিন্দু মেঘ হইতে পড়ে, তাহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং বায়ুর প্রত্যাঘাতও (resistance) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিয়দ্দূর আসিবার পর যেই একবার বায়ুর প্রত্যাঘাত বিন্দুর ভারপরিমাণের সহিত সমান হইল, অমনই তদবধি ইহা সমান (uniform) বেগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল। অতএব এই শেষোক্ত বেগের সহিত বিন্দুর আয়তনের (অতএব তাহার ব্যাসের) একটা অনুপাত আছে, ইহার দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যায়। "গুঁড়ি নি" বৃষ্টির সময় ফোঁটাগুলিও খুব ছোট এবং বৃষ্টিপতনের বেগও খুব কম, কিন্তু বড় এক পশলা বৃষ্টি হইলে ফোঁটাও বড় হয়, এবং পতনবেগও খুব বেশী হয়।—Leslie।

চন্দ্ররশ্মিতে উত্তাপ।—বহুকাল হইতে বিজ্ঞ সুধিবর্গ চন্দ্রকিরণে উত্তাপ অনুভব করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাতে যে প্রকৃতপক্ষেই উত্তাপ আছে, অল্পদিন হইল, মেলোনি তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন। চন্দ্ররশ্মিসমূহ একটি বৃহৎ লেন্সের দ্বারা কেন্দ্রগত করিয়া, মেলোনি তাঁহার বিখ্যাত থার্ম্মপাইল যন্ত্রের সাহায্যে, তথায় উত্তাপের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। চন্দ্রের কলানুসারে তিনি ০°৬′ হইতে ৪°৮′ পর্য্যন্ত তাঁহার যন্ত্রস্থ শলাকার বিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সাহায্যে কালনির্ণয়।—প্রাচীন স্তম্ভ, মন্দির প্রভৃতির কালনির্ণয়,

অনেক সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে করা যাইতে পারে। তাহাতে যে সমুদায় কোদিত ছবি অথবা চিত্র থাকে, তাহাতে কখনও কখনও নক্ষত্রাদির তদানীন্তন অবস্থান অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অপর কোনও বিষয় জানা যায়। এই জ্ঞাত বিষয় লইয়া গণনা করিলে তখনকার সময় নিরূপণ করা যায়। টেন্‌টাইরিস্ নামক স্থানের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি ভগ্ন অট্টালিকার ছাদে রাশিচক্রের একটা প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, সূর্য্য সিংহরাশি আক্রমণ করিলে তখনকার উত্তরায়ণ হইত। বিষুবদ্বিন্দুদ্বয়ের অগ্রগতি বৎসরে ৫০".২; ইহা হইতে গণনা করিলে সহজেই দৃষ্ট হইবে যে, টেন্‌টাইরিস্‌স্থিত রাশিচক্র প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মিসেস্ সমারভিল্ বলেন, তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে একবার একটা প্রাচীন হস্তলিপির সময় নিরূপিত হইতে দেখিয়াছিলেন। হস্তলিপিটি ইজিপ্টের একটা mummy-caseএর মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, এবং ইহা হইতে নক্ষত্রাদির তদানীন্তন অবস্থান অবগত হইবার পর ইহার কালনির্ণয় হইয়াছিল। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে, হস্তলিপিটি টলেমির আমলের একটি জন্মপত্রিকা।*

বেদের কালের একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জ্যোতিষ বেদাঙ্গের দুইটি শ্লোকে, রবির উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ এবং তদনুসারে অহোরাত্রের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।† এই দুইটি শ্লোক লইয়া বেদের কালনির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এই সম্বন্ধে মহা তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কোলব্রুক্ বলেন যে, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণের উক্তরূপ অবস্থা ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পরে কিছুতেই হইতে পারে না।

শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী।

---

* এই প্রসঙ্গগুলি জন্ টিম্‌স্ কৃত Curiosities of Science-প্রভৃতি পুস্তক হইতে গৃহীত।

† See Monier Williams's "Indian Wisdom" pp. 130 and 181. wherein Colebrooke's translation of the two verses is given. He also refers to Whitney who infers, from the mention in the verses of a difference of six Muhurtas (4 hrs. and 48 mins.) between the longest and shortest day or night, that this suits the latitude of only one part of India, viz. the extreme North-western corner.

We also quote the following from R. C. Dutt's "Ancient India." (on this point):—

"Tradition, again, has it that when the Vedas were compiled, the position of the solstitial points was observed and recorded to mark the date. The Jyotisha in which this observation is now found is a late work,—not earlier than the third century B. C.—but the observation was certainly made at an ancient date, and Bentley and Archdeacon Pratt—both able mathematicians—have gone over the calculation and found that it was made in 1181 B.C." Again—"We are inclined to believe that the observation marks approximately the true date of the final compilation of the Vedas."

See also the same work, pp. 6, 10 and 190.

The reader is also referred for full information of the discussion of the question to Max Muller's edition of the Rigveda, Preface to vol. IV.

সন্ধ্যা।

ধীরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল দুকূলে ঢাকি ফুলতনু খানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে,
কম্পিত কঞ্চুলী-ধারে হৃদয়ের বাণী।

নব নীলোৎপল মত
লাজে দিঠি অবনত,
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ।
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।

নয়নে সুনীল তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-নম্রতা-দীপ্তি,
অধরে চন্দ্রিকা হাসি—বিজয়-বিশ্রাম;
নিশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুকতারা-সুবেশবে নৃত্য অভিরাম।

আসে ধনী আধিবিধি—
কপালে তারকা-সিঁথি,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত তপন;
গুচ্ছে গুচ্ছে কাল চুলে
তন্ধ অন্ধকার দুলে,
শয়ন বসনাঞ্চলে কত না বতন।

গলে নীহারিকা-মালা,
কবে সপ্ত-ঋষি বালা,
বাশিচক্র-মেখলার কি ক্রীড়া মঙ্গল।
জলদ চরণতলে
কাঁদিছে মঞ্জীরচ্ছলে,
বরাঙ্গী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝলমল।

অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব দৃশ্য,
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির,
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে প্রীতি,
অগুরু চন্দনে ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে,
পুলিনে তুলসীতলে,—
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী।
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী গলবস্ত্রে দেয় হুলুধ্বনি।

এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা—
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা!
দিবসের পাপ তাপ হোক্ হতমান।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে—বাহুবন্ধে
আবার জাগুক—মনে আমি যে মহান্,
একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্ত-প্রধান।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

অতিপ্রকৃত কথা। (প্রথম)

কেহ পর্য্যটনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হয়, কেহ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে। কিন্তু পৃথিবীর সকলে সমান নয়; এমনও দেখা গিয়াছে, কেহ কেহ তহবিল তছরূপাত করিয়া, কেহ বা নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত

করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ সকল ভিন্ন এমনও দুই একজন হতভাগ্যলোকের অভাব নাই, যাহারা শ্মশানক্ষেত্র জীবনের যথাসম্বল বিসর্জ্জন দিয়া, উদাসহৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে, লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর ন্যায়, এক অনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে; সেই রমণীয় নেপথ্য তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন, কুসুমসুরভি-পরিব্যাপ্ত, সুমধুর সমীরণ হিল্লোলিত এবং বিহঙ্গকুলকাকলীমুখরিত বাহ্যপ্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সজ্জিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় সে সৌন্দর্য্যগ্রহণের অধিকারী নহে, সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র-শোভাসন্দর্শন করিয়া আসিলেও তাহার মুখ হইতে তৎসম্বন্ধে কোনও প্রয়োজনীয় কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। উত্তরভারতের বিভিন্নপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, অনেকেই তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু সেই সমস্ত মহান্ সুন্দর দৃশ্য, প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্ত সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে পাই নাই; কিন্তু তথাপি দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। জীবনে কখনও কবিতার সেবা করি নাই, প্রভাত-বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা, কখনও আমাকে ব্যাকুল করে নাই, বজ্রকঠোর হৃদয় লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ এক দিন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ায় যে দিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে চলিলাম; ইহাই আমার ভ্রমণের ইতিহাস। ইহাতে এমন কিছু নাই, যাহাতে অপরের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে, কিন্তু হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন দুই একটি ব্যাপার আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, যাহা আমার নিকট নিতান্ত দৈবঘটনা ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে "অতিপ্রকৃতে" বিশ্বাস করিলে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। যাহা হউক, আজ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, ইহা বৈজ্ঞানিক পাঠকের মনে যে সিদ্ধান্তই উপস্থিত করুক, অনেকের নিকট ইহা রহস্যাবৃত একটি জটিল তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হইবে না; আমি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারি নাই।

একবার আমি গাড়োয়ালরাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর হইতে তিহরী হইয়া গঙ্গোত্রীর পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমরা যে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, তাহা ইংরেজসীমার বাহিরে অবস্থিত; তিহরীর রাজার রাজ্য, অর্দ্ধস্বাধীন হিন্দুরাজ্য। পর্ব্বতের মধ্যে পথের অবস্থা বড় ভাল নহে, বিশেষ আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, সে পথ অত্যন্ত দুরারোহ এবং সঙ্কটপূর্ণ বলিয়া তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্য পথিকগণ সাধারণতঃ এ পথে ভ্রমণ করে না, কেবল কষ্টসহ

সাধু সন্ন্যাসীর দল পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য এই পথে গমন করে; লোকযাতায়াতের অল্পতাহেতু অনেক অনিমন্ত্রিত কণ্টকলতা রাস্তায় অনধিকারপ্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূতভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং পরিব্রাজকবর্গের কঠিন পাদচর্ম্মের সহিত কোমলসম্বন্ধস্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে। আমরা অবিশ্রান্ত সেই তীক্ষ্ণ কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে করিতে চলিলাম; পদাহত হইয়া শুধু যে তাহারাই ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহা নহে, তাহাদের প্রজাবৃন্দও নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাকুলের তাড়নায় আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম; ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া যখন তাহারা বিপক্ষকে আক্রমণ করে, তখন বড় বড় বীরপুরুষকেও আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে করিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় এক সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলাম। চলিতে আরম্ভ করিয়া লোকালয়ের চিহ্নমাত্র পাই নাই; এমন কি, কোনও দিকে সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষশ্রেণী, শাখাপল্লব বিস্তারপূর্ব্বক সেই নির্জ্জনপ্রদেশের নীরবতা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া, কত কাল হইতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যোগনিমগ্ন যোগীর ন্যায় কতকাল হইতে তাহারা সমাধিমগ্ন! নিম্নে পাষাণস্তূপ কোমল লতাপল্লবে সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণীর মধুরিমাময় ঝরঝর শব্দ! এখানে লোকালয় নাই, পার্ব্বত্য অসভ্যগণও এত দূরে আসিয়া বাস করিতে চাহে না; যদি সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পর্ব্বতের অনুর্ব্বর গাত্রে, কিম্বা বায়ুতাড়িত শরৎকম্পিত বৃক্ষপত্রে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া রাখিলে ক্ষুধার লাঘব হইত, তাহা হইলে এই স্থানে লোক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত, কিন্তু এখানে জীবনসংগ্রামোপযোগী কিছু আয়োজন না থাকায়, লোকের বসবাসের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই বিজনপ্রদেশের গভীর অরণ্যে যদি কাহারো বাসের আবশ্যক কিম্বা ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে 'অতিমানুষ' বা 'অমানুষ' বলা যাইতে পারে। হয় সে মানুষের ভয়ে এরূপ স্থলে লুক্কায়িত থাকে, না হয় সে মনুষ্যসমাজ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া, এইরূপ নির্জ্জনপ্রদেশকেই আপনার সাধনার উদ্‌যাপনক্ষেত্রে পরিণত করে।

উপরে যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, তিনি যে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।

কথোপকথনে জানিতে পারিলাম, তিনি পরম জ্ঞানী; তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার আশ্রমের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আশ্রমের কথা শুনিলে দুইটি বিভিন্ন চিত্র আজ কাল মনে উদিত হইয়া থাকে। একটি চিত্র আর্য্যঋষিগণের অনুপম, উজ্জ্বল, পবিত্রতাপূর্ণ, পরমশান্তি-রসাস্পদ পুণ্যতপোবনের,—যাহার অমর মহিমা কীর্ত্তন করিতে কালিদাসের সকল প্রতিভা ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং যাহার মাধুর্য্য এই জনকোলাহলসংক্ষুব্ধ রৌদ্রোত্তপ্ত ধূলিময় সংগ্রামক্ষেত্রেও কোনও যুগান্তর হইতে স্মৃতির সুমন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া তাপক্লিষ্টহৃদয়ে বিপুল আনন্দ প্রদান করিতেছে। আর একটি চিত্র,—স্থূলোদর, মুক্তকচ্ছ, শিখাকৌপীনসমন্বিত বৈরাগীবৃন্দের বৈষ্ণবীপরিবেষ্টিত আখ্‌ড়ার। কিন্তু এই সন্ন্যাসীর 'আশ্রম' এই উভয় প্রকার আশ্রম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন বলিয়াই ইহাকে আশ্রম বলিলাম, নতুবা ইহা এক খানি ক্ষুদ্র পত্রকুটীর ভিন্ন আর কিছু নহে। কুটীরে কিছুমাত্র পরিপাট্য নাই, সপ্তাহের মধ্যে এক দিনও কুটীরপ্রাঙ্গণস্থ স্তূপাকার বৃক্ষপত্রগুলি অপসারিত হয় কি না সন্দেহ, হইলেও দুই দিনের মধ্যেই প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যায়। কুটীরের বাহিরের অবস্থা এইরূপ; ভিতরের অবস্থা ততোধিক সুন্দর; হয় ত সন্ন্যাসীঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে কুটীরে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, এখনও অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড এবং শুষ্ক পত্র কুটীরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে, আবার কোনও দিন অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন হইলে সেগুলি কাজে লাগিতে পারে। গৃহের সাজসজ্জার মধ্যে একখানি জীর্ণ চর্ম্ম,—কিন্তু তাহা কোনও ব্যাঘ্রের দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, অথবা কোনও দুর্ব্বলহৃদয় মৃগের দেহাবরণ ছিল, আমি ত দূরের কথা, প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও তাহার নিরূপণ করিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চর্ম্মখানি যে কত কালের পুরাতন, তাহাও স্থির করা দুরূহ, ক্রমাগত ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্লোম হইয়া গিয়াছে। এই আসনে সন্ন্যাসীর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ ইহা শত শত ছিদ্রে পরিশোভিত এবং ইহার যে অংশে ছিদ্রসংখ্যা কিছু কম ছিল, তাহা মৃত্তিকাধূলিপ্ত, কিন্তু তথাপি সন্ন্যাসী ঠাকুর এই আসনের মায়া কাটাইতে পারেন নাই; সংসারে এরূপ মায়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, শুনিয়াছি, শুকদেব গোস্বামীও একবার তাঁহার অদ্বিতীয় সম্বল কৌপীনখানিকে অগ্নিমুখে পতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই নিভৃত পত্রকুটীরে জীর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসী কাম্যফললাভের আশায় চিরবাঞ্ছিতের উদ্বোধনে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছেন, শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, উৎসাহের অভাব নাই। প্রাবৃটের প্রচণ্ড বর্ষণ, এবং ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ইনি নিবিষ্টচিত্তে কাল-যাপন করিতেছেন-দেখিয়া, মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমরা বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিয়া অনেক সময় মনে করি—পারত্রিক ফললাভের জন্য দেহের নির্য্যাতন মূঢ়তামাত্র, এ কথা কতদূর যুক্তিযুক্ত, বলা যায় না; কিন্তু কঠোরতা ভিন্ন কোনও কালে কোনও দেশে সিদ্ধিলাভ হয় নাই, এ কালেও হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কঠোরতা বা ত্যাগস্বীকার প্রয়োজনীয়। এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার একবারও মনে হয় নাই যে, নিদারুণ কঠোরতায় তাঁহার দেহ ভগ্ন, মন অপ্রসন্ন বা আনন্দশূন্য হইয়াছে, হয় ত তিনি সচ্চিদানন্দের চিরপ্রসন্নভাব বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাই তাঁহার এত আনন্দ।

কুটীরে কয়েকখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। পুঁথিগুলি মৃত্তিকায় পরিণত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু সে জন্য সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎমাত্রও উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না। পুঁথিগুলি পড়িবারও কোনও উপায় দেখিলাম না, অক্ষরগুলি অনেক দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাসীর কুটীরে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন কি, একটি লোটা কি কমণ্ডলু পর্য্যন্ত নাই।

কুটীরের পার্শ্বেই একটি ঝরণা, অবিশ্রাম ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে; এই শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষপত্রের শর্শর্ কম্পন, আর চতুর্দ্দিকের মহান্ গম্ভীর দৃশ্য আমার অশান্ত চঞ্চল হৃদয়েও এক অভিনব স্বর্গের সুরম্য কল্পনা জাগ্রত করিল। হায়, পার্থিব সুখ ও শান্তি, উপভোগ ও বিরাম কি অবিলতাপূর্ণ! কিন্তু তাহাতেই আমরা মুগ্ধ; এই নির্ঝরিণীর কলতানের সহিত হৃদয় মিশাইয়া—তদ্গতচিত্তে যখন সন্ন্যাসী অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে মগ্ন হন, তখন তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ উপকূল কোন্ অনাবিল আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহা অনুভব করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত।

কুটীরের প্রতি সন্ন্যাসীর যত্নের অভাব হইলেও দেখিলাম—এই নির্ঝরিণীর প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ। কুটীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর তিনি আমাদিগকে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ঝরণার

কাছে যাইবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলাম; বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিয়া শরীর যেরূপ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। সন্ন্যাসীর অনুমতি-মাত্রেই আমি এবং আমার সহচর সন্ন্যাসী নির্ঝরের ধারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সজ্জিত করিয়া আবক্ষ-উচ্চ চক্রাকার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বেদীতে উঠিবার জন্য আলগা পাথর স্তূপাকারে রাখিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার পরই ঝরণার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সুপ্রশস্ত ঘাট, কিন্তু এ সমস্তই আলগা পাথর সুন্দররূপে বিন্যস্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই ঘাটের শোভা অতি রমণীয়, যেখানে যে পাথর স্থাপন করিলে শোভাবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ করিয়া সন্ন্যাসী ঘাট সাজাইয়াছেন; কোনও স্থানে কাল পাথর,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আবলুস্ বিনিন্দিত; কোথাও তুষারধবল শ্বেতপ্রস্তর; কোথাও অত্যুজ্জ্বল লোহিত। এইরূপ নানা আকার ও নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা এমন সুন্দর সুন্দর লতা পাতা ও ফুল অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, দেখিলে কখনই মনে হয় না,—এই সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ জীবন কেবল-মাত্র তপশ্চর্য্যাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাজমহলের মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যে সমস্ত লতা ও পুষ্প অঙ্কিত আছে, সন্ন্যাসী এই নির্জ্জন পর্ব্বতের একটি রমণীয় উপত্যকায় তাঁহারই অনুকরণে এ সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। নির্ঝরিণীর অতি নিকটে একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষ, তাহার তলদেশ প্রস্তরবদ্ধ; এই বৃক্ষের ত্বক্ অত্যন্ত মলিন, সন্ন্যাসী বহু দিন ধরিয়া বোধ হয় এই বৃক্ষে হেলান দিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। ঘাটের নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল,—সন্ন্যাসীর তপোবলে কি হস্তকৌশলে, কি উপায়ে জানি না,—বৃক্ষগুলি এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যে, তাঁহার রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সমস্ত দেখিয়া বুঝিলাম, সন্ন্যাসী এই রমণীয় নির্ঝরিণীর তীর, দীর্ঘপত্রপরিশোভিত সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতল, আর স্বহস্তরচিত রম্য প্রস্তর-বেদীকেই আপনার বাসস্থানে পরিণত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিরাম-কুঞ্জ; কুটীর উপলক্ষ মাত্র।

বৈশাখ মাসের দিন, মধ্যাহ্ন কাল, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। রাত্রে অত্যন্ত শীত পড়ে বটে, কিন্তু দিবসের সমুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে পর্ব্বত ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়াছে। আমি এখনও কম্বলধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া উঠিতে পারি নাই, অতএব পাত্রবস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলাম, আমার সঙ্গী

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাচ্চা, তুম্হারা খানে কি ওয়াস্তে ইয়ে মূল লায়া"। এই ভীষণদর্শন কচু কিরূপে খাইব, এই চিন্তাতেই আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। বহুদূর পর্য্যটন এবং পরিপাকশক্তির বাহুল্যবশতঃ ক্ষুধার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সেই দারুণ ক্ষুধানলের যে ইন্ধন সংগ্রহ হইল, তাহা অত্যন্ত অসাধারণ; বুঝিলাম, "যেমন বাঘা তেল, তেমনই বুনো হেঁতুল"—এই বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রবচন সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা যায় না। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। নিকটে যে সকল শুষ্ক কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া তিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন ও সেই অগ্নিতে তাঁহার সংগৃহীত উক্ত কচুজাতীয় উদ্ভিদমূল নিক্ষেপ করিলেন; বুঝিলাম, ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া পড়িল। দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট বহুদিন পূর্ব্বে যে নিরাকার-আহারের ব্যবস্থা পাওয়া গিয়াছিল, এতদিন পরে এই বিদেশে সন্ন্যাসীর কৃপায় তাহা সাকার দেহ ধারণ পূর্ব্বক আমার দক্ষোদরপরিতৃপ্তির উপায় হইয়া দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত অনেক দুরারোহ, বিপদসঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, আহারসামগ্রীর অভাবে ক্রন্দনগর্ভ দুই তিন দিন সামান্য বিল্বপত্রমাত্র চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসার প্রশমন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ দগ্ধভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই এমন কচুপোড়া জুটিয়া উঠে নাই; আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে সন্ন্যাসী সেই অর্দ্ধদগ্ধ কচু অগ্নি হইতে তুলিয়া তাহার উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলেন, ভিতরে যে সুসিদ্ধ শ্বেত পদার্থ পাওয়া গেল, সন্ন্যাসী তাহাই আমাকে খাইতে দিলেন; আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীকেও কিয়দংশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা আহার করিলেন না। খাওয়া উচিত কি না, এবং খাইলে মুখের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়া সম্ভব, এই সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় সন্ন্যাসী তাহা খাইবার জন্য পুনর্ব্বার আমাকে অনুরোধ করিলেন; তাঁহার অনুরোধ আর উপেক্ষা করা উচিত নহে মনে করিয়া, আমি সসঙ্কোচে সেই কচুর জিহ্বা দন্তসংযোগ করিয়া তাহার আস্বাদগ্রহণের দুঃসাহস প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য! কচুপোড়ার অমৃতের আস্বাদন অনুভব করিলাম, এমন সুস্বাদু, মিষ্ট, রুচিকর দ্রব্য আর কখনও খাইয়াছি বলিয়া মনে হইল না, নবনীর ন্যায় সুকোমল, কিন্তু যেন মিছরি-মাখানো, অথচ সেই মিষ্টতায় উগ্রতা নাই। কাহার সহিত তাহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, আজও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই; তেমন দ্রব্য আর কখনও খাই নাই, সুতরাং

তাহার সহিত কাহারও তুলনা দিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, কলিকাতার উৎকৃষ্ট আম্র ও সন্দেশ দ্বারা উত্তম জলযোগ হইতে পারে, যদি কোনও পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক কোনও দিন আমার প্রতি সেইরূপ জলযোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সেই পরমরমণীয় কচুপোড়ার সহিত তাহার এক দিন তুলনা করিয়া দেখি! দুইটি কচুপোড়া (আধসেরেরও অধিক হইবে) ভক্ষণপূর্ব্বক গণ্ডুষে করিয়া নির্ঝরিণীর জলপান করিলাম, মনে হইল, জীবনে আর কখনও এমন পরিতৃপ্তি লাভ করি নাই; এখন মনে হইতেছে, আমার সহৃদয় পাঠকগণকে যদি এই কচুপোড়ার অংশ দান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অধিকতর পরিতৃপ্ত হইতাম!

সেই বৃক্ষতলে বসিয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীতে কত কথাই হইতে লাগিল, নির্জ্জন মধ্যাহ্ন এবং চতুর্দ্দিক অত্যন্ত স্তব্ধ, শুধু মধ্যাকাশ হইতে এই নিদাঘের মার্ত্তণ্ড ধূসর পর্ব্বতগাত্রে অগ্নিকণার ন্যায় তীক্ষ্ণ কিরণ বর্ষণ করিতেছে, এবং উত্তপ্ত বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল হিল্লোল বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমি গৃহীও নহি, সন্ন্যাসীও নহি, এবং ধর্ম্মের কোনও নিগূঢ় তত্ত্বও অবগত নহি, অতএব সসম্ভ্রমে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা শুনিতে লাগিলাম। কথা কহিতে কহিতে যখন তাঁহারা একটু চুপ করিলেন, তখন আমার মনে গান গাহিবার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল, আমি সেই মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

"কবে সমাধি হ'বে শ্যামাচরণে"—

গান শেষ হইলে আমি উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, এবং অল্পকাল পরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন: এই প্রখর রৌদ্রে বাহির হইবার কোনও আবশ্যক নাই, বিশ্রাম এখান হইতে একটি ৪ মাইল দীর্ঘ বাঁধ আছে, এবং এই পথের মধ্যে একটিমাত্রও বৃক্ষ কিম্বা নির্ঝর নাই, সুতরাং যে সকল সাধুসন্ন্যাসী এই পথে বিচরণ করে, তাহারা হয় অত্যন্ত প্রত্যূষে, না হয় অপরাহ্ণে, এই পথে বাহির হয়। কিন্তু গন্তব্য পথের মধ্যে বসিয়া থাকা আমার নিকট বিষম বিরক্তিকর, অতএব সন্ন্যাসীর নিষেধ সত্ত্বেও আমি রওয়ানা হইলাম; সদী সন্ন্যাসী বলিলেন, তিনি অপরাহ্ণে যাত্রা করিবেন, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলাম।

আমি একটি পর্ব্বতের পশ্চিম গা বহিয়া নামিতেছিলাম, সুতরাং পশ্চিম আকাশের সূর্য্য আমার উপর প্রখররশ্মিকিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অল্পদূর অগ্র-

সব হইয়াই সন্ন্যাসীকথিত সেই প্রকাণ্ড বাঁক দেখিতে পাইলাম—জ্যা-পথে অর্দ্ধ-মাইলের অধিক নহে বটে, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সে পথে যাওয়া অসম্ভব, অতএব পরিধিবেষ্টন করিয়াই যাইতে হইবে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিতে পাওয়া গেল; রাস্তা যদিও ৪ মাইল, কিন্তু দৃষ্টি-রোধ করিবার কিছুই ছিল না, বিশেষ পথটি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসাতে তাহার দূরত্ব অধিক বলিয়া বোধ হয় নাই।

গাত্রে ভয়ানক রৌদ্র লাগিতে লাগিল; বৃক্ষলতাহীন, মরুময়, কঠিন প্রান্তরের উপর দিয়া পথ, রৌদ্রতাপে তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে; ইহার উপর স্থানে স্থানে শৈবালের ন্যায় ক্ষুদ্র কণ্টকভরু এবং ক্রমাগত "চড়াই ও উতরাই"। কিয়দ্দূর যাইবার পর বুঝিলাম,—বিজ্ঞ, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা অবহেলা করিয়া ভারী ভুল করি নাই। প্রায় এক মাইল যাইতেই আমরা ভয়ানক পিপাসা পাইতে লাগিল, কিন্তু নিকটে জল পাইবার কোনও উপায়ই নাই; যদি অগ্রে কোথাও জল পাইবার উপায় থাকে, এই আশায় প্রাণপণে চলিতে লাগিলাম; এক একবার অগ্রসর হই, আর পশ্চাতে ও সম্মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, কোনও দিকেই জনমানবের সাড়া শব্দ নাই; সম্মুখে বক্র, দীর্ঘ, সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ এবং দুই পাশে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ। নিরুপায় হইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম, পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেল, মুখে কিছুমাত্র রস নাই, বুকের মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও চলচ্ছক্তিহীন হই নাই; জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তখনও চলিতেছিলাম, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আর কতক্ষণ চলিতে পারা যায়? ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পদদ্বয় শরীরের ভারবহনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, গাত্রবস্ত্র খানি সেইখানে ফেলিয়া সেই প্রবল রৌদ্রের মধ্যেই শুইয়া পড়িলাম; বুঝিতে পারিলাম, আমার জ্ঞান অপহৃত হইতেছে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আর অধিক ব্যবধান নাই।

পাঠক মহাশয় বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, না করিলেও তাঁহাদের দোষী করিতে পারি না, তাহার পর যাহা হইল, তাহা সময়ে সময়ে আমার নিকটই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, অন্যে ত দূরের কথা। যখন আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত আমার চৈতন্য অপসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় সহসা আমার কর্ণমূলে কাহার যেন নিশ্বাসপতনের শব্দ অনুভব করিলাম। বতাস

ভিন্ন তাহা যে আর কিছু হইতে পারে, তখন তাহা মনে হয় নাই, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বড়ি পিয়াস লাগা?"—চক্ষুর উপর কুয়াশাজাল বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু এমন সময়ে কর্ণকে কে প্রবঞ্চিত করিবে? জনমানবশূন্য এই ভীষণ পথপ্রান্তে, এই ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে কাহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে আমার রক্ষাকর্ত্তার আবির্ভাব হইবে?—তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি মরণাপন্ন জীবনের প্রাণপণ শক্তিতে কম্পনয়ন ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ বিস্ময় যুগপৎ আমার হৃদয় অধিকার করিল। দেখিলাম, আমার শিরোদেশে আমার সেই সঙ্গী সন্ন্যাসী, হস্তে একটি ছোট লাল নূতন কমণ্ডলু; আমার ঠিক তখনকার মনের ভাব এখন বর্ণনা করা অসম্ভব, এবং মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় হইয়া তখন কিরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহাও যথাযথ মনে নাই। তবে বোধ হয় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার মনে হর্ষ ও বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি সন্দেহেরও উদয় হইয়াছিল,—হয় ত মনে হইয়াছিল, আমার কল্পনা আমাকে ছলনা করিয়াই নয়নসমক্ষে এই অসম্ভব মরীচিকার বিস্তার করিয়াছে। সন্দেহে ও বিশ্বাসে আমি মুখ বাড়াইলাম, তিনি সেই কমণ্ডলু আমার মুখের কাছে ধরিলেন, আমি এক নিশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনও আমি কথা কহিতে সম্পূর্ণ অশক্ত, গভীর ক্লান্তি ও অবসাদ এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয় না; রসনেন্দ্রিয়ের জড়তা দূর হইলে, আমি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমি বরাবর পথের দিকে চাহিয়াছিলাম, কাহাকেও আসিতে দেখি নাই, যখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছিল, তখনও তাঁহার আশাপথ চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, অবশেষে এই জীবনান্তকালে কোন্ অমানুষিক বলে, আমার বিপদের কথা জ্ঞাত হইয়া আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অজ্ঞাত পথে এখানে উপনীত হইলেন? আমি এক নিশ্বাসে তাঁহাকে কথা বলিয়া গেলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, উত্তর দিলেন না; এদিকে কঠোর পথশ্রম এবং ক্লান্তির পর প্রচুর জল ায়, আমার শরীরে সর্দ্দীগর্ম্মির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, আমি অত্যন্ত বোধ করিতে লাগিলাম, উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উঠিতে পারি- সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল। রৌদ্রের তেজ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল, ক বলিলাম, "আপনি একটু বসুন, আমি বড় অসুখবোধ করিতেছি।"

বাস্তবিক আত্মোন্নতি হইতে বিযুক্ত হইলে সুখবাদ আত্মবিকৃতির পরিপোষক ধর্ম্ম বলিয়াই অনুমিত হয়। অ্যালেন সাহেব বোধ হয়, তাহা স্বীকার করেন। সেই জন্য এই বিচূড়ীকরণে অগ্রসর হইয়াছেন। সুখবাদের যিনি মুখ্য পুরোহিত, সেই মিল আপনার হিতবাদ গ্রন্থে উচ্চতর ও নীচতর সুখ, এই প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন, এবং উচ্চতর সুখের কণিকা যে নীচতর সুখের স্তূপ অপেক্ষা স্পৃহনীয়, তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই উচ্চতর সুখ, উন্নতির সোপান বৈ আর কিছু নহে। আমাদের দেশে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু সুখকে ধর্ম্মের কষ্টিপাথর স্থির করিয়া, স্থায়ী অনশ্বর সুখোদর্ক সুখ এবং ক্ষণিক বিনশ্বর দুঃখোদর্ক সুখ, এই ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের অভ্রান্ত লক্ষ্য আত্মোন্নতি, সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি পরিণতি এবং সামঞ্জস্য। এ মতের সহিত প্রকৃত কঠোরবাদের কোনও প্রভেদ নাই। বুঝিয়া দেখিলে, কঠোরবাদীর অনুমত যে দুঃখ ক্লেশ তিতিক্ষা, আত্মসংযম, উপবাস নিয়ম আসন প্রভৃতি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি। এ সকল সাধন; সাধ্য নহে। কারণ, সিদ্ধিলাভ ঘটিলে, এ সকলের পরিহার ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক যদি সুখবাদ অনুশীলন ধর্ম্মের (Culture) অপর নাম হয়, (অ্যালেন সাহেব এইরূপই বলিতেছেন), তবে তাহার সহিত কঠোরবাদীর কোনও মতভেদ নাই। কারণ কঠোর ধর্ম্মেরও লক্ষ্য ঐ। কেবল সাধনের প্রভেদ—সুখবাদীর মতে এক পন্থায় অনুশীলন সিদ্ধি হয়, কঠোরবাদীর মতে অন্য পন্থায়।

আত্মোন্নতি না আত্মবিকৃতি?

মিল ও বঙ্কিমচন্দ্র।

কঠোরবাদের উন্নতি।

অবশেষে অ্যালেন সাহেব সুখবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য সুখবাদীর ঈপ্সিত ও কঠোরবাদীর জুগুপ্সিত কামবৃত্তির কিছু গুণানুবাদ করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, জড় ও জীব জগতে, বৃক্ষলতায় পশুতে পক্ষীতে মানুষে, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম উচ্চতম, তাহাই কামবৃত্তির অনুশীলনের ফল। একথা স্বীকার করিলেও ইহাই শুদ্ধ প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় অতি জঘন্য পদার্থের সহায়তায়ও তাঁহার সৃষ্ট জগতের অগ্রে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অ্যালেন সাহেবের অনুকরণে বোধ হয়, অতঃপর কোনও উদরিক বলিবে যে, দেখ, ভাগ্যে মানুষের উদরে বৈশ্বানর বসতি করিতেন, তাহাতেই না বাণিজ্য, শিল্প, কল কারখানা কেরাণি প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব আইস, আমরা উদরের জয়গান করি।

অ্যালেন সাহেব বিলাতী সভ্যতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মর্ম্মাহত হইতে হয়—"A system which culminates in the Divorce court, the action for breach of promise, seduction, prostitution, infanticide, abortion, desertion, cruelty, husband-poisoning, wifekicking, contagious disease, suicide, illegitimacy, unnatural vice, the strand by night, the London Music halls might surely be bettered by the wit of man," ইহার আর অনুবাদ করিব না।

সাহিত্য।

প্রোফেসার ভাম্বেরী, মার্চ মাসের "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে, ইংলণ্ডে পারস্যের শাহ" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পারস্যের বর্ত্তমান অধিপতি নাসিরুদ্দীন শাহ, ততটা প্রাচ্যভাবাপন্ন নন, তিনি ইতিমধ্যে তিন বার ইয়ুরোপ দর্শন করিয়াছেন, ভ্রমণকালে যাহা দেখি-

ভেন, যে অভিজ্ঞতালাভ করিতেন, তাহা নিজের রোজনামচায় টুকিয়া রাখিতেন। পারস্যে-

পারস্যের শাহ।

লিখিয়া গিয়া, যাঁর প্রজাবৃন্দের কল্যাণকামনায়, সেই দৈনিকলিপি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রভাবে ও প্রভায় পারসীক প্রজার হৃদয় আলোকিত হয়, পারস্যাধিপতির সে বিষয়ে বিশেষ আকিঞ্চন। ইয়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি যে দৈনিকলিপি অক্ষরবদ্ধ করিতেন, তাহার প্রচারের উদ্দেশ্যও এই। শাহের শেষ ইয়ুরোপ পর্য্যটনের সময় তিনি যখন বুদাপেস্ত দেখিতে যান, তখন তাঁহার দিন কয়েক তাঁহার সিভানী ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহারা বলিতেছেন,—সমস্ত দিন অনবরত দেখা সাক্ষাৎ, যাওয়া আসা করিয়া, এবং দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য কষ্টকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা যখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতাম,—তখনও

পারস্যাধিপতির অক্লান্ত অধ্যবসায়।

পারস্যাধিপতির আহ্বানে আমাদিগকে উপস্থিত হইয়া পড়িতাম। এত ক্লান্তির পরও তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে রাত্রি দশটার পর ডাকিয়া পাঠাইতেন, এবং দিবসে যে সকল ব্যক্তি, বা স্থান প্রভৃতি দেখিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম ও সঠিক খবর জানিবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায়-তত্ত্ব অবগত হইয়া, পারস্যভাষায় রোজনামচা লিখিতেন। আরবী অক্ষর ইংরাজী শব্দ লিখিবার পক্ষে তেমন পর্য্যাপ্ত নয় বলিয়া, শাহ স্থান বা ব্যক্তিবিশেষের নাম ইয়ুরোপীয় অক্ষরে, অধিকাংশ স্থলে ফরাসীভাষার বর্ণমালায়, লিপিবদ্ধ করিতেন।"

সেকালে বাদসাহী রোজনামচা লিখিতেন বটে, কিন্তু একালে তাহার আর বড় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এসিয়ার একটি অপবাদ এই যে, এখানকার রাজন্যমণ্ডলী বিলাসরসে নিমগ্ন,—সুখস্বপ্নে বিভোর, প্রজার কল্যাণকামনায় পরাঙ্মুখ। কিন্তু বর্ত্তমান পারসরাজে তাহার

সেকাল ও একাল।

বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। বিলাসী বিলাতীয়গণের বিজন-বিলাসময় সমাজের উৎসবানন্দের মধ্যে থাকিয়াও শাহ নিশ্চিন্ত হন নাই, সেখানেও সযত্নে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন,—ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজে ও বিবিধ সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবাহে পড়িয়াও যেখানে যা কিছু দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, এবং স্বীয় রাজ্যের জ্ঞানপ্রসারবর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এসিয়ার পক্ষে, পারসের পক্ষে, ইহা এক নূতনতর সংবাদ।

প্রোফেসার ভাম্বেরী বলিতেছেন, "শাহের আদেশে তাঁহার রোজনামচা পারস্যের রাজধানী তিহরাণে প্রকাশিত হইয়াছে। শাহ পারসীভাষায় লিখিয়াছেন বলে নয়, এই নূতন সাহিত্য-ব্যাপারে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টসহ কর্ম্মী বলিয়া বোধ হয়। নগর, প্রাসাদ বাগান, বাগিচা, চিত্রশালা, যাহা

রাজকীয় রোজনামচা।

দেখিয়াছেন, এবং যেখানে যে গণ্যমান্য লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, অত্যন্ত সাবধানে তাহার সঠিক বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। শাহ এদিকে আবার বড় সাবধান, যাহা ভাল লাগে নাই, সে বিষয়ে তাঁহার মতের আভাষ মাত্রও,—ছায়াটুকুও, দেখিতে পাইবার যো নাই। বলাবাহুল্য কি অপ্রীতিকর বিষয় কেবল তিনি স্পর্শ করিয়া যান মাত্র,—পাঠক ইঙ্গিতে মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন ত যথেষ্ট।"

এ মুন্সিয়ানা, রাজনীতিচক্ষুরী দেশাধিপতির চরিত্রানুমোদন, চাতুরীব্যঞ্জক ও চমৎকারও বটে। এখন আমরা পারসাধিপের কথা ছাড়িয়া তাঁহার রোজনামচার দিকে দৃষ্টি দিব।—

শাহ লণ্ডনে পঁহুছিয়া খুব অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। লণ্ডনের লোকে তাঁকে দেখিতে ভাঙ্গিয়াছিল। লোকের ভিড়ে শাহ যানবাহনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। অপর্য্যাপ্ত জনতার এই সম্বর্দ্ধনে অতিশয় প্রীত হইয়া রোজনামচায় লিখিয়াছেন, "আমি

নলের যে উক্তিটি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই;—"ইহারা নিজের ইচ্ছায় ও সাগ্রহে আপনার অভিনন্দন করিতে আসিয়াছে,—আমরা জোর করিয়া ইহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছি।"

পাহ, মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের বর্ণনা করিতেছেন;—"মহারাণী তাঁহার সহচরী ও দুহিতৃগণে পরিবৃত হইয়া, সোপানমূলে আমায় গ্রহণ করিলেন। তিনি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত ও বহুভূষণে ভূষিত হইয়া ছিলেন,—হাতে ছিল একগাছি কৃষ্ণ যষ্টি। গাড়ী হইতে নামিয়া আমি অগ্রসর হইলাম, এবং আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম। মহারাণী আমার হাত ধরিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেলেন। আমরা একটা গ্যালারীর মধ্য দিয়া, নানাবিধচিত্রসজ্জিত একটা বড় হল অতিক্রম করিয়া, একটা কক্ষে প্রবেশ করিলাম—সোল বৎসর পূর্ব্বে একবার এই ঘর দেখিয়াছিলাম। এই গৃহে আমরা পরিগ্রহ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনে যাপন করিলাম। প্রিন্স ও প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ান্, প্রিন্সেস বিয়াট্রিস্ ও প্রিন্স ব্যাটেনবর্গ, এবং লর্ড স্যালিসবারীর সহিত পরিচয় শেষ হইবার পর আমি লক্ষ্য করিলাম,—সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে দু জন কি তিন জন হিন্দুস্থানী,—তাহারা ভারতীয় প্রথায় কাপড় পরিয়াছে, এবং পাবসী কহে। মহারাণী বলিলেন, 'আমি ভারত হইতে ইহাদিগকে আনাইয়াছি; ইহারা এখন আমায় উর্দ্দু শিখাইতেছে।' আমি উঠিলে মহারাণী আমায় একটি ফুলের তোড়া দিলেন,—এবং পুনরায় সোপান পর্য্যন্ত রাখিয়া গেলেন,—আমি সম্রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইলাম।"

মহারাণী ও পাহ।

প্রাচ্য বিলাসভূমির অধীশ্বর, প্রতীচ্য বিলাসপুরী পারিস দেখিয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—"চরিত্রে, বর্ণে ও যৌবন-ধারণে পারসিকদের সহিত পারিসবাসীদের খুব সৌসাদৃশ্য আছে। আমি ইংলণ্ডে ও রুসিয়ায় যেমন নজরবন্দ ও 'নিহেট-গোছ' অট্টালিকা দেখিয়াছি,—পারিসে তাহা দেখা যায় না। কথিত আছে,—'পারস্য দেশ প্রাচ্যভূমির পারিস।' ইতিপূর্ব্বে আমি এই প্রবাদের অর্থগ্রহণ করিতে পারি নাই, কিন্তু এবার, চলাইয়া দেখিয়া পূর্ব্বকথিত প্রবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি—আমিও ইহার অনুমোদন করি;—কেন না, পারস্যের সহিত পারিসের প্রত্যেক পদার্থের সরিশেষ,—চমৎকার—সাদৃশ্য আছে।"

পারিস ও পারস।

'নিউ রিবিউ' পত্রিকায় ফ্রান্সিস্ আডাম্‌স্ সাহেব কবিবর টেনিসন সম্বন্ধে এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি প্যারা অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"কিটস্ ও সেলীর যাহা দুর্ব্বলতা, টেনিসন্ তাহারই পরম ভক্ত। জীবন-সংগ্রামে সম্মুখযুদ্ধে তিনি বড়ই নারাজ। তিনি মানুষের জীবনটাকে একটা খেলামাত্রে পরিণত করিতে চান। তাঁহার লেখনী আনন্দদায়িনী বটে, কিন্তু সে আনন্দ নিতান্ত নিকৃষ্ট রকমের। তিনি প্রকৃত চিত্রকর নহেন; কেবল 'এনামেল' (Enamel) করিতে পারেন। তাঁহার রচনার সর্ব্বস্থলে কেবল শঙ্কাকুল কৃত্রিমতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

টেনিসনের রচনা।

"যে সকল রচনার সাহায্যে তিনি লোকপ্রিয় হইবার নিশ্চিত আশা করেন, তাঁহার May Queen নামক কবিতা তাহারই অন্যতম। এই প্রসিদ্ধ কবিতাটিতে উনবিংশটি শ্লোক আছে। ইহাতে এক সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা ক্ষুদ্র বালিকার চিত্র নিবদ্ধ হইয়াছে। সে মরিতে যাইয়াও মরিতে পারিতেছে না। এ অর্দ্ধে তাহার দ্বিতীয় চার্লসের অপেক্ষাও বেশী সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে।

May Queen.

"টেনিসনের In Memoriamকে কেহ কেহ বর্ত্তমানযুগোপযোগী চিন্তাশীলতার পরিচায়ক একখানি প্রকৃষ্ট গ্রন্থ বলিতে চান। কিন্তু চিন্তাশীলতার টেনিসনের কোনও অধিকার

নাই। তিনি কখনও কোনও বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কয়েক স্থলে তাঁহার হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশ হইতে বন্ধুর প্রতি যে মধুর এবং প্রকৃত স্নেহের উৎস ছুটিয়াছে, তাহা বাদ দিলে, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি কাপট্যের একশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুর প্রধান গুণ ছিল—"the imitative will"; এই একটিমাত্র বাক্যে আমরা টেনিসনেরই চরিত্রের সম্পূর্ণ চিত্র পাইতেছি।

In Memoriam.

"কিন্তু তাঁহার শোক-কাব্যের ভিতর তিনি শান্ত, উজ্জ্বল, অমাবিল প্রেমের কি মনোহর চিত্রই প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমকাব্যসমূহে আমরা এই অকপট, অবিনশ্বর বীণারই ঝঙ্কার শুনিতে পাই। ইহাই টেনিসনের বিশেষত্ব।

"Sixty years After ইত্যভিধেয় কবিতায় তিনি যে উন্মাদ মস্তিষ্কের বিষাদপূর্ণ বিষম বিকারের পরিচালনা, অসম্বদ্ধ প্রলাপকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপার্শ্বে স্থাপন করিলে, তাঁহার যৌবনের ঐ সকল অঙ্ক পদস্খলন অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার এই দুর্গতির দৃষ্টান্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বড় অল্প নহে।

"আর্থরের চরিত্রকে আমরা পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না। কারণ, টেনিসন্ তাঁহাকে সামাজিক মনুষ্যত্বের আদর্শস্বরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আর্থর একজন "modern gentleman of stateliest port." যিনি বর্ত্তমানকালোপযোগী মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে Idyll of Gulneuvrএর নায়ক আর্থারকে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি যে মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের অর্থ আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। প্রকৃত নীতি এবং ন্যায়পরায়ণতার যে ভাব আমাদের মনে জাগিতেছে, তাহার এরূপ বিসদৃশ চিত্র বর্ত্তমানকালে এবং বোধ হয় কোনও কালেই, কেহ কখনও প্রদান করেন নাই। টেনিসনের গ্রন্থাবলীতে লোপ পাইবার উপযোগী জিনিষের এতই প্রাচুর্য্য যে, উহা নিতান্ত লজ্জার কথা। ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ বৎসর পরে যখন সেই সময়কার ম্যাথু আর্ণল্ড-হীন কোনও লোক টেনিসনের এক সংগ্রহ বাহির করিবেন, সে পুস্তকের আয়তন বড় বৃহৎ হইবে না। বীরত্ববৎ প্রতীয়মান যে পাশব-বলের সাহায্যে আমরা এই বসুন্ধরার অর্দ্ধাংশ জয় করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছি, তাঁহার "The Revenge" নামক গাথায় তাহাই ভিত্তি। "Crossing the Bar" কবির শেষ কথা—"last words"; ইহার ন্যায় গীতিকবিতা শুধু ইংরাজী ভাষায় কেন, অপর কোনও ভাষাতেও কখনও লিখিত হয় নাই। এইখানে আমরা আবার টেনিসনের সেই উচ্চতম মহত্ত্বম, জ্যেষ্ঠতম বীণার সাক্ষাৎ পাইতেছি।"

টেনিসনের মতামত।

নানা মুনির নানা মত। অনেকে অনেক রকমে টেনিসনের সমালোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের মত গ্রহণযোগ্য কি না, পাঠকেরা তাহার বিচার করুন। বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক টেন সাহেবও টেনিসনের শোক-গাথা সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া থাকেন। টেনিসনের বিলাপ এক জন বিলোলকটাক্ষসুন্দরীর সুরভিত অঞ্চল দ্বারা অশ্রুমোচন মাত্র। টেনিসনের বিরহগীতে ছন্দের সুমধুর ঝঙ্কার আছে। কিন্তু প্রাণের নিতান্ত অভাব। তবে আমরা টেনিসনের কাছে এক বিষয়ের জন্য ঋণী। স্বদেশের যাহা কিছু সুন্দর, তিনি সুললিত গাথায় তাহা গাহিয়াছেন। ইংরাজ-জীবনের প্রশান্ত অংশ তাঁহার কবিতায় প্রস্ফুটিত। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে ইংলণ্ডের অনন্ত শ্যামলক্ষেত্রব্যাপী নব তৃণাঙ্কুর ও ডেজির সঙ্গে আকুল হইয়া পড়ি।

Mr. Frederic Harrison ফেব্রুয়ারির Forum পত্রিকায় "ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরাজী সাহিত্য" শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ইংরাজী পদ্যে ও গদ্যে অগ্রণী অনেকগুলি গ্রন্থকার, অল্প দিন হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রাচীনবয়স্ক। ইহা ভাবিলে স্বতঃই মনে হয়, সাহিত্যের একটি মহাযুগ শেষ হইতে চলিল। অনেকে এই যুগের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

মহারাণীর রাজত্বে সাহিত্য।

"মহারাণীর রাজত্বকালে Tennyson, Browning দম্পতী, Thackeray, Dickens, Bronte ভগিনীদ্বয়, George Eliot, Kingsley, Trollope, Spencer, Mill, Darwin, Ruskin, Grote, Macaulay, Freeman, Froude, Lecky, Milman, Green, Maine, Mathew Arnold, Symonds, Rossetti, Swinburne, Morris, John Morley, এই সকল লেখকদিগের (সামান্য কয়েকখানি গ্রন্থ বাদ দিলে) সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রণীত হইয়াছে। এ স্থলে অপেক্ষাকৃত যুবক গ্রন্থকারদিগের নাম উল্লিখিত হইল না। ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে যতই ভেদ থাকুক না কেন, ইহাঁদিগের সাধারণ কতকগুলি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা ইহাঁদিগকে অষ্টাদিংশ শতাব্দীর ও Goethe এবং Scottএর কালের লেখকগণ হইতে ভিন্ন করা যায়।

এ যুগের লক্ষণ।

"বর্ত্তমান সাহিত্যের অনেকগুলি লক্ষণ আছে; কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজবিজ্ঞানের আধিপত্য—সমাজসংস্কারের উপায় হেতু সমাজতত্ত্বে অত্যধিক অনুরাগ। এই যুগের সাহিত্য বিজ্ঞানপ্রিয়, অন্তর্বিষয়ক (Subjective) অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ (Introspective), ঐতিহাসিক, প্রত্নপ্রিয় (archæological);—জীবশক্তি সম্পন্ন, অনেক বুদ্ধি (Versatile), অধ্যবসায়শীল;—ব্যক্তিত্বপূর্ণ (personal) বিধি, আদর্শ, এবং প্রথার বিরোধী;—প্রসর্পশীল, সূক্ষ্মদর্শী, কিন্তু অনেক সময়ে গাম্ভীর্য্য, গঠন-শুদ্ধি (symmetry) অথবা বর্ণবিকাশসম্বন্ধে উদাসীন;—বিদ্যানুসেবী, সমালোচননিপুণ, অনুশীলনপরায়ণ (cultured) ইহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সূক্ষ্মানুভূতি (fine feeling) থাকিলেও, ইহার সহিত অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার তত্টা সহানুভূতি নাই, এবং ক্রিয়াপ্রধান নাটকের সহিত ইহার আদৌ পরিচয় নাই।

বাহ্য ও স্পষ্ট পরিবর্ত্তন।

"১৮৩২ খৃষ্টাব্দে Scott এবং Goetheএর মৃত্যু হয়, এবং Reform Act বিধিবদ্ধ হয়। ঐ সময় হইতে এই নূতন যুগের, এই রেলওয়ে এবং শিল্পজ পদার্থের বাণিজ্যবিস্তার যুগের প্রারম্ভ। গত ষাট বৎসরের মধ্যে শিল্পপদার্থের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্যেও এক মহা বিপ্লব ঘটিয়াছে।

"রূপবৈচিত্র বর্ত্তমান সাহিত্যের বাহ্য ও সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন। আজ কাল সাহিত্যে কোনও নমুনা নাই, কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত আদর্শ নাই, কোনও ভাল 'মডেল' নাই। এই যুগ বাছ-বাছি করিবার যুগ। Scott এবং Coleridgeএর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কি গদ্য কি পদ্য, কোনও পুস্তকের একখানি পাতা পড়িলেই রচনা-পদ্ধতি দেখিয়া উহার প্রকৃত উৎপত্তি নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া যুগের সাহিত্যে রচনা-রীতির (Styleএর) ছড়াছড়ি। লেখক যে রীতি পছন্দ করেন, সেই রীতিতেই তিনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

টেনিসন্ এবং ব্রাউনিং আদর্শ।

"কি গদ্যে কি পদ্যে পরস্পরবিরোধী দুইরূপ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এক আদর্শে সূক্ষ্ম নৈপুণ্য এবং ভাবাবিশুদ্ধি সময়ে সময়ে 'অতিবাদুতে' পরিণত। অপর আদর্শে সুরের বিশুদ্ধি বা ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য খুব কম। ইহাদের আসে-পাসে আর একটি আদর্শ মনটিকে হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইতেছে। Virgil, Racine এবং Miltonএ যে সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্পনৈপুণ্য

আছে, টেনিসনের 'In Memoriam'এ সেই সূক্ষ্ম পালিশ (polish) দেখিতে পাওয়া যায়—ভাষায় সেই পূর্ণ পটুতা, শত চেষ্টা দ্বারা যাহার আর উৎকর্ষ সম্ভবে না।

ব্রাউনিং।

আমরা ব্রাউনিংএর অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনার যতই প্রশংসা করি না কেন, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তিনি অনেক সময়ে অমসৃণ (uncouth), কর্কশ (crabbed), অপরূপ (grotesque) এবং এমন কি, সময়ে সময়ে শ্যাম্য (clownish)। তিনি যখন কাঁশর পিটিতে থাকেন, তখন তিনি টেনিসনের ঠিক বিপরীত। তখন যাহারা 'In Memoriam' এবং Maud'এর সুমধুর সংগীত ভাল বাসে, তাহাদের তিনি দাঁতকপাটি লাগাইয়া দেন। Browning-পাখা বা Browning সম্প্রদায় না থাকিলেও তাঁহার প্রভাব গভীর।

অপক্ক factএর রাশি।

পদ্যে যেমন, গদ্যেও সেইরূপ। Thackeary এবং George Eliot, Mathew Arnold এবং John Morley, Lecky এবং Froudeএর বিশুদ্ধ শিল্পনৈপুণ্যের আসে পাশে, Carlyleএর অতিবর্ণন (extravagance), শব্দোক্তি (slang), এবং বিকৃত হাস্যচিত্রে প্রবৃত্তির আশে-পাশে, ইংরাজী গদ্যসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবস, বিকৃপ, নিষ্প্রেজ রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যেন অপক্ক factএর বোঝা আমাদের মাথায় ছুড়িয়া মারিতেছে। Mill এবং Spencer, Bain এবং Sidgewick এই যুগকে অনেক শিখাইয়াছেন, সত্য; কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও একটিবার হাসিতে দেখা যায় নাই।

কার্লাইল।

Carlyle সম্বন্ধে Mr. Harrison বলিয়াছেন, "তিনি মৌলিক প্রতিভা এবং কলমের মেরাপুঞ্জ (mass of stroke) থাকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক যদি নাও হন, তথাপি তিনি ভিক্টোরিয়া যুগে গদ্য-সাহিত্যের Dictator।" Grote এবং Freeman এবং Gardinerকে লক্ষ্য করিয়া সমালোচক বলিয়াছেন, "দুই শি চারি বা আট কি দশ শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনাগুলি 'Times' পত্রিকার সংবাদস্তম্ভের মত বাড়াইয়া দেওয়া, বর্ত্তমান ইতিহাসলেখকের উদ্দেশ্য। এবং পর্ব্বতপ্রমাণ factএর রাশিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহা হইতে প্রাচীন কালের অনুমান ও কল্পনা ছাঁটিয়া দেওয়া, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য।"

"তথাপি Huxley এবং Tyndall তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃদিগকে বিশুদ্ধ, তেজস্বী এবং সুগঠিত রচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন।"

এই যুগে ক্রিয়াকুশল, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাবহেতু, উচ্চশ্রেণীর কল্পনা ও নাট্যপ্রতিভা প্রতিহত হইয়াছে। কেহই Shelleyর Prometheus কাব্যের কল্পনাপাল্যে বিচরণ করিতে সাহস পান নাই। বঙ্গভূমিতে School for Scandalএর যেরূপ আদর, বর্ত্তমান যুগের কোনও নাটকের সেরূপ আদর নাই। গাট বৎসরেরও অধিক সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের নাট্যমন্দিরে এক জন উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা সৃষ্ট হইল না। বহির্বিষয় অপেক্ষা অন্তর্বিষয়ের প্রাধান্য এই কালের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই জন্য Scott, wordswoth এর নিকট হীনপ্রভ হইয়াছেন। এই জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।"

কল্পনা ও নাট্য-প্রতিভা প্রতিহত।

Mr. Harrison এই যুগকে (১৮৩২—১৮৭৪) দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথম একত্রিশ বৎসরের রচিত সাহিত্যই পরবর্ত্তী একত্রিশ বৎসরের রচিত সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই আদ্য কালে Tennyson, Browning দম্পতী, Carlyle, Thackeray, Dickens, Lever, Reade, ভগিনীদ্বয়, Mrs. Garkel, Trollope, George Eliot,

Kingsley, Disraeli, Dr. Arnold, Thirlwal, Grote, Hallam, Milman, Macaulay, Mill, Froude, Layard, Kinglake এবং Ruskinএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি প্রণীত হইয়াছে। অন্ত্যকালে আমরা প্রধানতঃ Darwin, Spencer, Huxley, G. H. Lewes, Maine, Leslie Stephen, John Morley, Mathew Arnold, Lecky, Freeman, Stubbes, Bryce, Green, Gardiner, Symonds, Rossetti, Morris, Swinburneকে পাইয়াছি। কাব্য, উপন্যাস, সমালোচনা, কল্পনা, চিত্রাঙ্কণ-শক্তি এই আদ্য কালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, এই অন্ত্য কালের সম্পত্তি।

ভিক্টোরিয়া যুগের আদ্য ও অন্ত্য কাল।

"বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ (Evolution) সমাজতত্ত্বে অত্যধিক অনুরাগের সহিত মিলিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

সাহিত্য, সাংসারিক অন্যান্য ব্যাপার হইতে বিভিন্ন পদার্থ, সাহিত্য-সেবকেরা এক পৃথক সম্প্রদায়, সমাহিত চিত্তে যাবজ্জীবন গ্রন্থাধ্যয়ন জীবনের একটি মহৎ কার্য্য, এইরূপ পাশ্চাত্য সংস্কার লোপ পাইয়াছে। ভূত ও বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের অন্যূন ত্রিশ জন সদস্য অনেকগুলি করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। * * * এই হেতু 'বিদ্যা' এই শব্দটির অর্থ Casaubon, Scaliger, Bentley, Johnson এবং Gibbon, Littre, Dollenger, এবং Mommsen যেরূপ বুঝিতেন, তাহা এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাবীকাল ভালই হউক আর মন্দই হউক, বর্ত্তমান সাহিত্য সামাজিক প্রশ্নমধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে।

সাহিত্যের স্বরূপ ও বর্ত্তমান যুগ।

বঙ্কিমচন্দ্র।

১৬ই এপ্রেল তারিখের "নেশান পত্রে" সম্পাদক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের সহিত সকলাংশে একমত না হইলেও, প্রবন্ধটি যে বেশ সুলিখিত, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। নেশানসম্পাদক বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যরাজ্য রাজহীন হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালী জনসাধারণ সকলেই এ ক্ষতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে। সম্পাদক বলেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী তাঁহার উপন্যাস যে পরিমাণে পড়ে, বোধ হয়, রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়িয়া দিলে অন্য কোনও গ্রন্থ তত পড়ে না। অতএব বাঙ্গালীর হৃদয়গঠনে, তাহাদের জাতীয় জীবনের বিকশনে ৺ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সবিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছে। সম্পাদক তাঁহার উপন্যাসাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করেন নাই।

নারায়ণও ইহাই বলিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিণতির কালে সভ্য-জাতির মধ্যেও কদাচিৎ এরূপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, সুযোগ্য সম্পাদক একটু বিস্তৃতভাবে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশ করিবেন। সেই সঙ্গে বঙ্কিমবাবু পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট কি অংশে ঋণী এবং তাঁহার পরশ পাথর প্রতিভাস্পর্শে কিরূপে বিলাতী তাম্র দেশী সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহারও আলোচনা করিবেন। সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইলেও উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্য দর্শন-আলোচনা কালে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যত দিন বাঙ্গালীজাতি বা বাঙ্গালা ভাষা সজীব থাকিবে, তত দিন তাঁহার উপন্যাসের বিলোপ নাই। কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায় যে, বঙ্কিমবাবু ইদানীন্তন আপন উপন্যাসের তত পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, ইহাতে তাঁহার শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার ঘটিয়াছে। ইদানীং তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সনাতন ধর্ম্মের জীর্ণসংস্কার। বাঙ্গালাদেশের এবং বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, সকল কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গেল। সরকারী চাকুরীতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি অনেক কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর বলা হইল না।

সর্ব্বতোমুখিতা বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। কবির কল্পনাসৃষ্টি দার্শনিকের বিশ্লেষণী সমালোচনী সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার প্রতিভায় মিলিত দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, পঠদ্দশা হইতেই এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইতিহাস গণিত সাহিত্য তিনি সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুখের বিষয় যে অনেকের মত ইস্কুলেই তাঁহার কীর্ত্তির অবসান হয় নাই।

মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা বঙ্কিমবাবুর উৎকৃষ্ট ছিল। সামাজিক লক্ষণ নিরিচয়েও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। জাতীয় চরিত্র সংহতবুদ্ধির প্রকৃতি, মিশ্র জীবনের গুঢ়ে-দ্বিত তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অতীত ছিল না।

বঙ্কিমবাবুর প্রকৃতির এক প্রধান লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য—বাঙ্গালাদেশে এ পদার্থের বড় অসদ্ভাব। কি দেশী কি বিদেশী, সকলের কাছেই তিনি সমান স্বাধীন-চিত্তের পরিচয় দিতেন।

নেশন সম্পাদকের মতে ঘটনার বশে বঙ্কিমবাবুর চাকুরী গ্রহণে কোনও অনিষ্ট সংঘটন হয় নাই। ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইয়াছিল, এবং উচ্চাধ প্রতিভার যে উপযুক্ত রচনা-উদ্দীপন, তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। ইংরাজিতে

যাহাকে Pot-boiler বলে, সেরূপ উপন্যাসাদি প্রকাশিত করিতে হয় নাই। এ কথার আংশিক যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার করি। মহাকবি গেটে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সকল সাহিত্যসেবীর এক একটা নিয়মিত কার্য্য থাকা ভাল। কিন্তু যে অমৃতময়ী লেখনীমুখে বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তাহা যে খড়-চুরি মোকদ্দমার রায় লিখিয়া ভোঁতা হইয়াছে, এ খেদ আমরা কোথায় রাখিব, যে সুবুদ্ধির বুদ্ধি ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা যে উকীল মোক্তারের যৎকিঞ্চিৎ সওয়ালজবাবের মহিমা অনুধ্যানে ব্যাপৃত হইত, ইহা আমাদের সামান্য আক্ষেপের কথা নহে। এই শক্তি, এ প্রতিভা, যদি শুধুই সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত হইত, তবে আমাদের আজ ভাবনা কি?

অতঃপর নেশান-সম্পাদক বাঙ্গালীর যে বাঙ্গালাতেই কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ করা উচিত, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ মতের আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমাদের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই ইংরাজিতে লিখিত হওয়া উচিত নহে; দর্শন বিজ্ঞানও নহে। বঙ্কিমবাবু ইংরাজিতে গ্রন্থ রচনা করিলে আজ নগণ্য হইয়া থাকিতেন; কিন্তু বাঙ্গালা লিখিয়া তিনি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে বসিয়াছেন।

নেশান সম্পাদকের মতে বঙ্কিমবাবু প্রধান হইলেও সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী নহেন। কাব্যে মধুসূদন এবং প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল তাঁহার উর্দ্ধে। কিন্তু উপন্যাসে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। আর দার্শনিক আলোচনায় তাঁহার সমান হইতে পারে কে আছে? ভারতের অতীত সভ্যতার ভূত ইতিহাস তিনি যেরূপ রচনা করিতেন, সেরূপ আর কাহারও কাছে আশা করা যায় না। রমেশবাবুর ইতিহাস বিলাতী গবেষণা-রাজী হাঁচে ঢালা। ইহাতে কাহার মন উঠিবে?

স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা না হারাইয়া বাঙ্গালী কিরূপে ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা লাভ করিতে পারে, বঙ্কিমবাবু তাহার আদর্শস্থল। তাঁহার মত কে ইংরাজি সাহিত্যের অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিয়াছে? তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ইংরাজি ভাবে পূর্ণ। কিন্তু কয় জন তাঁহার মত স্বতন্ত্র ও জাতীয়তাময়?

ধর্ম্ম ও সামাজিক মত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভ করিবার পূর্ব্বেই, বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব অনুক্রমণিকা মাত্র। নেশান সম্পাদকের মতে, তিনি কিছু দিনে হয় Theosophist, না হয় Positivist হইতেন। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্কিমবাবুর Positivist হওয়া কোন ক্রমে

সঙ্গত হইত না। যোগ না মানিলেও বঙ্কিমবাবু হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্মে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। বোধ হয়, আর কিছু দিন বাঁচিলে গীতার পূর্ণ ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। সংক্ষেপে বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মমত গীতার অনুরূপ বলিলে বলা যায়। Theosophyর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ধর্ম্মকে অনুশীলনের অপর নাম বলাতে, নেশান সম্পাদক কিছু আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, অনুশীলন আত্মগত, ধর্ম্ম পরগত। অনুশীলনে আত্মোন্নতি, ধর্ম্মে অপরের ভাবময় ভক্তিময় উপাসনা। বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মে এই ভাব, ভক্তির অভাব। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, সাধ্যসাধনভেদে অনুশীলন ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইলেও, মূলতঃ তাহারা একই। আর বঙ্কিমবাবুর প্রচারিত অনুশীলনের মুখ্যসাধন নিষ্কাম ভক্তি, অর্থাৎ সকল বৃত্তির অফলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরমুখিত্ব। অতএব ভক্তিভাব তাঁহার ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত নহে। তাঁহার আদর্শ ধার্ম্মিক প্রহ্লাদ—যিনি কৃষ্ণনামের শান্ত অক্ষর চক্ষে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অতএব নেশন সম্পাদক যাহাকে white heat of ecstasy বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই নিষ্কাম ভক্তির বড় একটা প্রভেদ নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত "বৌদ্ধেরা কি নাস্তিক" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হইলেও উল্লেখযোগ্য। লেখক বেশ সহজভাবে বক্তব্য বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। 'আদিম আর্য্যজাতির ইতিহাস,' আর একটি গবেষণামূলক চিন্তাশীলতার পরিচায়ক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ বসু, ইংরাজী ভাষায় উক্ত প্রবন্ধটির রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলে বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে যাবও উপযোগী হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ বিষয়ের আলোচনা ইংরাজিতে হইলে একটি সুবিধা আছে, তাহা হইলে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও অনায়াসে এ সকল প্রবন্ধের পরিচয় পাইতে পারেন। এই ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় মাত্র এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই প্রবন্ধটি প্রাচীন তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বগৌরবের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর 'মার্ত্তাণ্ড সংবাদ' ইংরাজী প্রাণীতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত অনুবাদমাত্র। "তত্ত্ববোধিনীর" পাঠকগণ মার্জ্জারের 'তত্ত্ব' অবগত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক বলিয়া মনে হয় না, এ তত্ত্বের জন্য তত্ত্ববোধিনীর গৌরব বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। যাহুক এ বিষয়েরই একটি দেশকালপাত্রের উপযোগিতা আছে, মাসিকপত্রেই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন। তত্ত্ববোধিনীতে এমনতর ছেলেমানুষি দেখিলে বস্তুতই বড় ব্যথিত হইতে হয়। অশোকের অনুশাসন একটি এমন একাঙ্গ প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ইহার লেখক। অশোকের অনুশাসন আমাদের আদরের বস্তু,—একটু বেশী মাত্রায় পড়িতে পাইলে প্রাণ হয়।

ভারতী। চৈত্র। "বঙ্কিমবাবু" শ্রীমতী সরলা দেবীর রচনা। লেখিকা বলিতেছেন, "তিনি আমাদের হৃদয়ের অধীশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, আমাদের সমস্ত অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা আমাদের চিত্তের যে অংশ অধিকৃত ছিল, তাহা আর কেহ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না, তাই হাহাকার।" শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বাবু সংস্কৃত গদ্যকাব্য "দশকুমারচরিতের" গোমিনীবৃত্তান্তের প্লট "প্রাচ্য কোর্টশিপ" নাম দিয়া সরলন করিয়াছেন। গল্পটি কৌতুকজনক। লেখকের ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃতশব্দবহুল, এবং স্থানে স্থানে কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। "বাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা" শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধরের একটি মিষ্ট কবিতা। ছন্দের যতিস্থাপনে লেখিকা রবীন্দ্রবাবুর অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা প্রশংসনীয়। "চলিত গল্প" শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল সংগ্রহ করিয়াছেন। মনে পড়িতেছে, এই গল্পগুলি "সমাচারচন্দ্রিকা ও দৈনিক" নামক প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের সাহিত্যপাতায় ইতিপূর্ব্বে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করেন নাই। লেখকগণ এ বিষয়ে যদি একটু মনোযোগী হন, তাহা হইলে সম্পাদকদিগকে আর বিপদে পড়িতে হয় না। একই রচনা দুই তিন খানি কাগজে পাঠান, লেখকের পক্ষে অন্যায়। "অভিনব উপগ্রহ" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের একটি সুন্দর ও মনোহর জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়িলে আমোদের সঙ্গে জ্ঞানলাভ করা যায়। এরূপ বিষয় সাধারণের জন্য যে প্রকারে রচনা করা কর্ত্তব্য, অপূর্ব্ব বাবুকে সে বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী দেখা যাইতেছে। আশা করি, তাঁহার চেষ্টা যত্ন সফল হইবে। "শ্যামের রাজাগঞ্জপুর" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "মিনতি" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি কবিতা—সচরাচর যেমন কবিতা দেখা যায়, ইহাও তদ্রূপ। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "গ্রীণউইচ্ মানমন্দির"—পঞ্চম প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "সাহিত্যে পলিটিক্স" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রচনা। "মাঘ মাসের 'সাহিত্যে' সহযোগী সাহিত্যের অন্তর্গত 'প্রধানীতি—কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক" বলিয়া নগেন্দ্রবাবু এই প্রবন্ধটির রচনা করেন, এবং "সাহিত্যে" প্রকাশ করিবার জন্য পাঠান। "সাহিত্যে" প্রকাশিত করিবার জন্য প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থও হইয়াছিল,—কিন্তু সেই সময়ে শোনা গেল, "সাহিত্যে" "সাহিত্যে পলিটিক্সে" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ বাহির হইবে না, এই বুঝিয়াই নগেন্দ্র বাবু প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশ করিব, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ কর্ত্তব্য বোধ হইলেও করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধটি "সাহিত্যে" মুদ্রিত করিতে পারি নাই। দেখিতেছি,—"ভারতী" সেই প্রবন্ধটিকে স্থান দিয়াছেন। মান্যবর ভারতী-সম্পাদিকার নিকট আমাদের একটি জিজ্ঞাস্য আছে,—যদি কেহ "সাহিত্যে পলিটিক্সের" প্রতিবাদ করে, তিনি ভারতীতে তাহা স্থান দিবেন কি না? তিনি কি নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদপ্রবাশভয়ের আগেই নিরাস করিয়া তবে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন? কোনও সম্পাদক যে এমন প্রতিজ্ঞা এমন অভয়দান করিতে পারেন, তাহা ত বোধ হয় না। "সাহিত্যে পলিটিক্স" প্রবন্ধে নগেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বিদ্রূপ যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, এবং "সাহিত্যের" প্রতি লেখক ও পাঠকবর্গের বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে জন্য আমরা দুঃখিত নহি। তবে তাঁহার এই অসার হাস্যাস্পদ প্রবন্ধের যুক্তিশূন্য বৃথা তর্ক পড়িয়া আমরা যেমন আমোদিত হইয়াছি, তেমনই দুঃখ পাইয়াছি। তাঁহার প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শনের চেষ্টা বৃথা;—তাঁহার লেখার ভাবে, বোধ হয়, তাঁহার নিজের তিনি অলীক বলিয়া মনে করেন। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িতেছে। এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যে আমাকে এই ন্যায়ের কাঁকিটি বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে আমি সর্ব্বস্ব দান করিব।" ব্রাহ্মণী ত

রাখিয়া অস্থির—"এমন সর্ব্বনেশে প্রতিজ্ঞাও করিতে আছে?" ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাগলি! ভয় কি, আমি যদি না বুঝি ত কাহার সাধ্য আমায় বুঝায়!" নগেন্দ্রবাবুর ভাবটাও তদ্রূপ। তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না যে, আমরা কংগ্রেসের বিরোধী নহি। ফাল্গুন মাসের 'সাহিত্যে' আমরা স্পষ্টভাবে, স্বতন্ত্র প্যারায়, এ কথার বিজ্ঞাপন করিয়াছি, এবং ইণ্ডিয়ান মিরারের সমালোচক পর্য্যন্ত সমালোচনান্তে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু দেখিয়াও দেখিবেন না,—তিনি আমাদিগকে "কংগ্রেসবিরোধী' প্রতিপন্ন করিয়া তবে ছাড়িবেন। এরূপ স্থলে অগত্যা আমরা হাল ছাড়িয়া দিলাম। ভগবান্ কংগ্রেসকে 'এরূপ বন্ধুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।' শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত "পুরাতন-বর্ষের স্বপ্ন" আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "যোগীমঠ" বেশ হইয়াছে। আমরা বরাবর আগ্রহভরে জলধর বাবুর এই ধারাবাহিক ভ্রমণবৃত্তান্ত সাগ্রহে পড়িয়া আসিতেছি,—কিন্তু কখনও নিরাশ হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতের আর্থিক অবস্থা" দ্বিতীয় প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর "বঙ্কিমচন্দ্র—শোকোচ্ছ্বাস" একটি কবিতা। শোকোচ্ছ্বাসের কবিতায় যেমন 'হৃদি হাহা' থাকিতে হয়, ইহাতে তাহার অভাব নাই বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

সাধনা। চৈত্র। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের লিখিত "ভারতবর্ষে—জয়পুর" প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, এবারকার সাধনার প্রথম প্রবন্ধ। "জয়পুরের" এ অংশও বেশ প্রীতিপ্রদ। এবার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্বরলিপি" দিয়াছেন। গানটি মন্দ নয়, রচয়িতার নাম নাই। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহার 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে সাংখ্যদর্শনের ইন্দ্রিয়, সাংখ্যদর্শনের কার্য্যকারণতত্ত্ব, সাংখ্যের বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিতণ্ডাস্থলে কি বলেন কি বা না বলেন, নম্রতাসহকারে এই বিষয়ত্রিতয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এবারকার "সাধনার" সর্ব্বপ্রধান ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজসিংহের" সমালোচনা। লেখক প্রবন্ধটিকে সমালোচনা বলিতে সম্মত নন; সমালোচনার ধরণে ইহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু উপন্যাসের এমন উপন্যাসবৎ সুমিষ্ট সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। "রাজসিংহের" অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশলসহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা কেবল তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভবে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতা" এখনও শেষ হয় নাই। "এবার ফিরাও মোরে।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ মনোরম কবিতা। কবি বলিতেছেন,——

"শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
* * * * *
* হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।"

এবারকার "সাময়িক সাহিত্যসংগ্রহ" মন্দ হয় নাই। "রাজনীতির দ্বিধা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রাজনৈতিক আলোচনা। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পশুপ্রীতি" বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৃত্তিনির্ব্বাচন" একটি কাজের কথা বটে, প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রবন্ধবর্ণিত তথ্যগুলি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তরূপে পরিগণিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

নব্যভারত। চৈত্র। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "দধিবীজ" একটি উল্লেখযোগ্য উত্তম প্রবন্ধ। যোগেশ বাবু রসায়নের কূটতত্ত্ব এমন কোমলভাবে ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, গল্পের মত পড়িয়া যাওয়া যায়। এরূপ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের প্রচার দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "উপনিষদঃ" শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত সম্পাদিত পাঁচ খানি উপনিষদের সমালোচনা। সমালোচনাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক উপনিষদালোচনার একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস দিয়াছেন,—তদ্দ্বারা প্রবন্ধটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "পরিত্যক্তা" শ্রীযুক্ত চুনীলাল গুপ্তের একটি কবিতা। ছন্দোযতি দোষে দুষ্ট না হইলে কবিতাটি আরও ভাল হইত।

স্থানাভাবে অন্যান্য পত্রের বিষয়ে এবার কিছু বলা হইল না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পরিণয়-কাহিনী। এই পুস্তকখানি বিভিন্ন আয়তনের পাঁচটি উপন্যাসের সমষ্টি। পুস্তকে রচয়িতার নাম নাই। পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার আত্মগোপন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি লিপিকুশল—যেখানে যে ভাবের উদ্রেক করিতে চাহেন, পাঠকের মনে সেখানে তাহারই উদয় হয়। তিনি রসজ্ঞ—কিছু বলিতে হইবে বলিয়া একটা কথা কোথাও বলেন নাই। যেখানে যাহা বলা হইয়াছে, সেখানে তাহাই সুসঙ্গত। তিনি চরিত্র-চিত্রণকল্পে ক্ষমতাবান—ত্রিলোচন দত্ত ইহার সুন্দর উদাহরণ। তাই বলিয়া পুস্তক খানি দোষশূন্য নহে। স্বামীকে স্ত্রীর অনুগত করিবার যে উপায় তরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট কেমন বীভৎস ঠেকে; অথচ লেখার ভঙ্গীতে বুঝায় যে, এই প্রণালীর সহিত গ্রন্থকারের সহানুভূতি আছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, এস্থলে রসভঙ্গ হইয়াছে।

এরূপ দোষ দুই এক স্থলে থাকিলেও, গ্রন্থকার যে ক্ষমতাশালী লেখক, তাহার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শেষ গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অভিমানের ন্যায় অতুচ্ছ ভাবও অবিবেচনা ও অধর্ম্মের পথে গেলে কত কদর্য্য ও অনিষ্টপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা এই গল্পটিতে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল এই চিত্রটির জন্য গ্রন্থকারকে আমরা উৎসাহ দিতে পারি। আজ কালকার উপন্যাসলেখকদিগের অধিকাংশের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায় না।

শোকসংবাদ।

বিগত ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র রবিবার, বঙ্গদেশের চিরস্মরণীয় শোচনীয় দুর্দ্দিন। এই দিন নব্যবঙ্গের নবযুগের প্রাণস্বরূপ, জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিভার অবতার, বাঙ্গলার সাহিত্যগুরু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর বিয়োগে নবযুগের পূর্ণগৌরব অন্তর্হিত হইল।

বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে "সাহিত্যের" যাহা বক্তব্য, তাহা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

এবার আমরা সাশ্রুনয়নে বঙ্কিমবাবুর ছবি পত্রস্থ করিলাম। যখন যেখান হইতে বঙ্কিমবাবুর ছবি আনাই,—তখন জানিতাম না যে, এত শীঘ্র এই মহাপুরুষ চিত্রদেয় হইবেন।

বঙ্কিম বাবুর প্রভাব সমস্ত দেশে প্রসৃত হউক, তাঁহার কার্য্য-কলাপ তনু তাঁহার অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের নিয়ামক হউক।

মধুচ্ছন্দার আবির্ভাবকাল।

সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, অতঃপর মধুচ্ছন্দার অগ্নি কি পদার্থ, তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটি কথার যথাসম্ভব মীমাংসা আবশ্যক। মধুচ্ছন্দা কোন সময়ে জীবিত ছিলেন?

ইয়ুরোপীয়েরা মনে করেন, যাহা অতি প্রাচীন কাল, তাহা অতি অসভ্য কাল।—এ দেশীয় ভট্টাচার্য্যদের বিবেচনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা মনে করেন, যাহা অতি প্রাচীন কাল, তাহাই অতি সুসভ্য কাল।

ইহার মধ্যে কোন্ মত সমীচীন, তাহার বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইয়ুরোপ কিছুকাল হইতে উন্নতির পথে, আর ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে অবনতির পথে, অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের স্মৃতিতে প্রাচীন কাল, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত সংসৃষ্ট; আর ইয়ুরোপীয়দের স্মৃতিতে প্রাচীন কাল অসভ্যতা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অভাবের সহিত সংসৃষ্ট। তাই আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কালকে সত্যযুগ বলিয়া স্মরণ করেন, এবং ইয়ুরোপের পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কালকে কলিযুগ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাদৃশ বলিয়াই স্মরণ করেন। ইয়ুরোপের ইতিহাস, উন্নতির ইতিহাস—আমাদের ইতিহাস, অবনতির ইতিহাস।

মধুচ্ছন্দা সভ্য না অসভ্য ব্যক্তি ছিলেন?—এবং মধুচ্ছন্দা কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন?—এই দুই প্রশ্নের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, ভিন্ন ভিন্ন পাঠক অবশ্যই তাহার ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা করিবেন। যাঁহাদের বিবেচনায় অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যেরা অসভ্য ছিলেন বলিয়া পরিগণিত—তাঁহারা মধুচ্ছন্দাকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্থির হইলে অসভ্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। আর যাঁহাদের বিবেচনায় অতি প্রাচীন কালে ঋষিরা দিব্যজ্ঞানভূষিত ছিলেন বলিয়া পরিগণিত—তাঁহারা তাহার ঠিক বিপরীত নিশ্চয় করিবেন।

আমরা এ স্থলে প্রথমতঃ কালের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্ন দূরে রাখিয়া, মধুচ্ছন্দা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বরচিত "প্রাচীন ভারতবর্ষ" (Ancient India)

নামক গ্রন্থে, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকারের মতের উদাহরণ দিয়া, খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ২০০০ বৎসর হইতে ১৪০০ বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, একটি স্থূল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—আমরা এ প্রস্তাবে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতের প্রতিবাদে বা পোষকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। দেশীয় পণ্ডিতদের মতে বেদরচনার সময় কীদৃশ, আমরা এ স্থলে তাহারই আলোচনা করিব;—তবে ইয়ুরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহাদের মতানুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই জানাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিত মতের উল্লেখ করা হইল।

দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বেদকে "অনাদি" বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা একবারেই বলিয়া দিতেছি যে, এই মত, বিবেচক পাঠকের নিকট শ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; অবশ্যই কোনও না কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদ রচিত হইয়াছিল। ঋষিদের মধ্যে অনেকের পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ যখন দেখা যায়—তখন পিতার বেদের পর যে পুত্রের বেদ রচিত হইবে—ইহাতে আর কথা কি?

তবে এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যাঁহারা বেদকে অনাদি বলেন, তাঁহারা বেদকে মনুষ্যের রচনা বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ঋষিরা বেদরচনা করেন নাই; প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র।

যাঁহারা এই মতাবলম্বী, তাঁহাদের সহিত আমাদের বিবাদের প্রয়োজন নাই। যাহাকে তাঁহারা "প্রচার" বলেন, আমরা তাহাকেই রচনা বলিয়া ধরিলাম। যিনি কোনও নির্দ্দিষ্ট বেদাংশের আদিপ্রচারক—তাঁহাকেই তাহার রচয়িতা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—মধুচ্ছন্দার বেদ কোন্ সময়ে রচিত?

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র। আরও স্বীকার করেন যে, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ সমকালীন ব্যক্তি। ইহারা দুই জনে সুদাসের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সুদাস দিগ্বিজয়ান্তে যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। সুদাসের মহাভিষেকক্রিয়া বসিষ্ঠ সম্পন্ন করেন, ইহা ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রকাশ।

অধিকন্তু উক্ত পণ্ডিতেরা আরও স্বীকার করেন যে, বসিষ্ঠের পুত্র শক্তি; শক্তির পুত্র পরাশর, এবং পরাশরের পুত্র বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পরিণতবয়স্ক হইয়াছিলেন। এক্ষণে যদি কুরুক্ষেত্র-

যুদ্ধের সময়নির্ণয় করিবার উপায় থাকে, তাহা হইলে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবকাল ও সুদাসের রাজত্বকাল, মোটামুটি স্থির করিতে পারা যায়।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিবেচনায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল একটি অতি প্রসিদ্ধ যুগচিহ্নস্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা। যাহা এত কাল ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেই মহাভারত এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়াই লিখিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ; তাহার সহিত কলিযুগের অর্থাৎ ভারতবর্ষের অবনতির সময়েরও সূত্রপাত বলিয়া বিবেচিত হয়। পরীক্ষিত ও তক্ষকের উপাখ্যানে অনেকে বিবেচনা করেন যে, নাগোপাসক বর্ব্বর জাতিবিশেষ এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করে। কুরুক্ষেত্রের গৃহবিচ্ছেদমূলক ঘোরতর যুদ্ধে ক্ষত্রিয়সমাজ এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরীক্ষিত এই নাগোপাসকগণের হস্তে নিহত হয়েন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, আর্য্যজাতির আক্রমণকারী বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক পরাভবের এই সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন। অতএব ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলিকালের প্রারম্ভ বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নাগোপাসকগণকে পরাজিত করিয়া আর্য্য-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কথিত আছে, এই সময়েই মহাভারতের ইতিহাস প্রচারিত হয়।

যে ঘটনা এইরূপে যুগচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত, দেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার সময় অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে নানা কারণে তাঁহাদের অবধারিত সময়লিপি সন্দিগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন আরব্ধ হয়। অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতিষের সাহায্যে সময়নিরূপণের প্রথা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। সূর্য্যমণ্ডল যে সময়ে একবার পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই "অহোরাত্র" বা এক দিন বলিয়া গৃহীত হয়; চন্দ্রমণ্ডল যে সময়ে একবার ঐরূপ প্রদক্ষিণ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই মাস বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক মাস। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ কিছু কাল পরেই বুঝিতে পারেন যে, বাস্তবিক এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পরিমিত সময়,—তদপেক্ষা অল্প সময়ে চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; প্রথমোক্ত সময় প্রায় ৩০ দিন—কিন্তু শেষোক্ত সময় কিঞ্চিদধিক ২৭ দিন মাত্র। নভোমণ্ডলে

চন্দ্রের পরিভ্রমণ, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার প্রদক্ষিণকাল ২৭ দিন ধরিয়া, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা নভোমণ্ডল বা নক্ষত্রচক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন। এবং এক এক ভাগকে "নক্ষত্র" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন।

তাঁহারা মনে করিতেন, ভূমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয়। তাহার চারি দিকে নিশ্চল তারকাগণ যেন একটি মণ্ডলাকার চক্রে খচিত হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই চক্র যেন পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহারই নাম নক্ষত্রচক্র বা ভচক্র, এবং ইহার সাতাইশ ভাগের এক ভাগের নাম "নক্ষত্র"। তারাগণ সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময়, তাহারা কখনও অন্ধকারের দ্বারা "গ্রহীত" বা গ্রস্ত হয় না; কিন্তু অন্য কতকগুলি জ্যোতিষ্ক মধ্যে মধ্যে অন্ধকারগ্রস্ত হয়—তাহার কারণ, তাহারা নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে। তাই তাহাদের নাম "গ্রহ"।

প্রাচীনেরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে এই "গ্রহ" নামক জ্যোতিষ্কশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতেন। সর্ব্বসমেত তাঁহারা সাতটি গ্রহের অস্তিত্বনিরাকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রচক্রের নিম্নস্থ ও বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—ঊর্দ্ধস্থ বলিয়া গণ্য হইত। সমুদায় গ্রহেরই নক্ষত্রচক্রে এক এক বার ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট কাল আছে বলিয়া গণ্য হইত।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশে একটি নিশ্চল তারা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনেরা তাহাকে "ধ্রুব" বা নিশ্চল তারা বলিয়া অভিহিত করেন। নক্ষত্রচক্রের ন্যায় ইহা পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করে না, এবং গ্রহের ন্যায় ইহা নক্ষত্রচক্রেও ভ্রমণ করে না। ইহাই তাহার বৈচিত্র্য।

এই ধ্রুবতারার নিম্নে ও গ্রহসমূহের ঊর্দ্ধে, সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক সাতটি উজ্জ্বল তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীনেরা এই তারকাপুঞ্জকে বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতেন। কি কারণে তাঁহারা এই তারকাপুঞ্জকে নক্ষত্রমণ্ডল হইতে পৃথক করেন, তাহা এক্ষণে বুঝা যায় না। কিন্তু জানা যায় যে, তাঁহারা ভাবিতেন যে, নক্ষত্রচক্রে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক প্রকার অদ্ভুত গতি আছে। তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক এক নক্ষত্রে মনুষ্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন।

কৃতবিদ্য পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, এইরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমরা এক্ষণে বিলক্ষণ জানি যে, অন্যান্য তারকার ন্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলও নিশ্চল। বাস্তবিক, নক্ষত্রচক্রে ইহাদের গতি কিছুমাত্র নাই।

কিন্তু তা নাই থাকুক। প্রাচীনেরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরিবর্ণিত গতির

অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা সময়নিরূপণের একটি উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহারা দেখিয়া রাখেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে। এবং তাহার পর এক এক নক্ষত্রে এক এক শতাব্দ গণনা করিয়া গিয়া, অবশেষে যে সময়ে নন্দ মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, সেই সময়ে তৎকালের পঞ্জিকাকারেরা এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে দুই তারাকে ইংরাজী Pointers বলে—অর্থাৎ ধ্রুবের সহিত যাহা সমসূত্রপাতে অবস্থিত,—ইহারা নক্ষত্রে অবস্থান করে,—সপ্তর্ষিমণ্ডল সেই নক্ষত্রেই আছেন, ধরা যায়। স্বাভাবিক পাঠকবৃন্দ যদি এক্ষণেও নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিতে পান যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালেও সপ্তর্ষিমণ্ডল উপরিবর্ণিত নিয়মে, যেমন মঘা নক্ষত্রে * ছিল, আজিও তেমনি আছে, এবং অবশ্যই নন্দাভিষেকের সময়ে অবিকল তাই ছিল। ইহাতে প্রণিধানের যোগ্য কথা এই,—(১) গণনার প্রারম্ভে বাস্তবিকই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে আছে—ইহা দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের ও কলিকালের প্রারম্ভ নির্ণীত হইয়াছিল। এই সময় "দৃগ্‌গণিতৈক্য" (দর্শন ও গণনে ঐক্য) ছিল। (২) তাহার পর একটা বাঁধি নিয়মে ক্রমশঃ [illegible]া হইতে থাকে। বহুকাল এই রূপ নিয়মে গণনা হইতে হইতে, নন্দোদয় কেবল গণিতের দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আসিয়াছেন বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এই সময় ঘোর কলিকাল। নানা কারণে এই সময়ে বিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে কেহ আর "দৃগ্‌গণিতৈক্য" করিয়া দেখেন নাই যে, বাস্তবিক সপ্তর্ষিমণ্ডল কোথায়। এমন কি, ঐরূপ ঐক্য করিয়া দেখিতে যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, বোধ হয়, সে বিদ্যাই কাহারও ছিল না।

যাহা হউক, একটা বাঁধি নিয়মের অনুসরণ করিয়া নন্দাভিষেকের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় আছে বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এখন দেখা যায়, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া উভয়কে ধরিয়া ১১ নক্ষত্র। তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর কাল লব্ধ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে, গদ্যে এই সময়ের বর্ণনকাল "অত্র্যোচ্যতে" বলিয়া—অর্থাৎ চিরাগত কিম্বদন্তী বলিয়া, পদ্যে এইরূপ লিখিত আছে, দেখা যায়;——

* সিংহরাশির অন্তর্গত ইংরাজীতে Regulus নামক তারা মঘা নক্ষত্রের অন্তর্গত। যাঁহারা Regulus নক্ষত্রকে চেনেন, তাঁহারা সহজেই দেখিয়া লইবেন।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবৎ নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৪র্থ অংশ; ২৪, ৩২।

অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বা পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেককাল ঠিক ১০১৫ বৎসর।

ইহাই অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সমীচীন মত। *

পাঠকবৃন্দ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, নন্দাভিষেকের সময় এইরূপ প্রসিদ্ধ কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, নন্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপের নিন্দাবাদ করিয়া সমাজে হুলস্থুল ঘটান। পূর্ব্বে যাহারা হীনজাতি বলিয়া সমাজে পরিগণিত ছিল, তাহাদের এই সময়ে বড়ই বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। নন্দ শূদ্রানীগর্ভসম্ভূত। তিনি "নিখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম ইবাপরঃ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় সম্প্রদায়ই এই সময়ে মহা দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন। তাই এই সময় কলির মধ্যাহ্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে, তাই নন্দাভিষেক ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত।

সে যাহা হউক, আমাদের জানা আছে যে, নন্দাভিষেকের একশত বৎসর পরে, চাণক্যর মন্ত্রণায়, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। এই ঘটনার কাল

শকাব্দ পূর্ব্ব——৪০৩
খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব——৩২৫

তাহাতে নন্দাভিষেকের কাল—

শঃ পূঃ——৫০৩
খৃঃ পূঃ——৪২৫

এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল—

শঃ পূঃ——১৫১৮
খৃঃ পূঃ——১৪৪০

* অন্যান্য পুরাণের গণনার সময় কিছু বেশী। কিন্তু প্রামাণ্য হিসাবে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। ভাগবতপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা আধুনিক। ঐ পুরাণে অন্যান্য পুরাণের গণনার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য উল্লিখিত শ্লোকটি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখা যায়। তাহাতে "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং", এই পাঠের স্থলে "শতং পঞ্চদশোত্তরং" এই পাঠ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ ১১১৫—কেহ কেহ বা ১০১০ বুঝেন; কিন্তু উপরে যেরূপ নক্ষত্রগণনা দেওয়া আছে, তাহাতে বিষ্ণুপুরাণের পাঠই ঠিক এবং ভাগবতের জাল ধরা পড়ে।

এখন যদি এই সময়ে দ্বৈপায়নকৃষ্ণের বয়স ৭৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বৈপায়নের জন্মকাল

শঃ পূঃ——————১৫৯৩
খৃঃ পূঃ——————১৫১৫

তপন পরাশর ঋষি ৩০ বৎসরের যুবা পুরুষ ধরিলে, তাঁহার জন্মকাল

শঃ পূঃ——————১৬২৩
খৃঃ পূঃ——————১৫৪৫

সেইরূপ ৩০।৩০ বৎসর ধরিয়া গেলে শক্তি ঋষির জন্মকাল

শঃ পূঃ——————১৬৫৩
খৃঃ পূঃ——————১৫৭৫

এবং বসিষ্ঠের জন্মকাল (আনুমানিক)

শঃ পূঃ——————১৬৮৩
খৃঃ পূঃ——————১৬০৫

সুদাসের মহাভিষেককালে শক্তি ঋষি তরুণবয়স্ক ছিলেন, এবং বিশ্বামিত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, বৈদিক কিম্বদন্তী আছে। সুতরাং তৎকালে বসিষ্ঠের বয়স ৫০ বৎসর কল্পনা করিয়া, সুদাসের অশ্বমেধের কাল—

শঃ পূঃ——————১৬৩৩
খৃঃ পূঃ——————১৫৫৫

ইহারই কিছুকাল পরে মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত বেদে আপনাকে একজন "নবীন" ঋষি বলিয়া বর্ণনা করেন। বাস্তবিকই মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদরচনাকারী নবীন ঋষিদের মধ্যে একজন প্রধান ঋষি। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও অনেকটা সেই মতে সায় দিয়াছেন। কিন্তু "প্রথম মণ্ডল" বলিয়া উহা যে সময়ের হিসাবেও প্রথম, তাহা নহে। প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত—অর্থাৎ মধুচ্ছন্দার বেদ, খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক ১৫০০ বৎসরে বিরচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত অনুসরণ করিলেও, ইহা ঋগ্বেদরচনার সময়ের শেষভাগ।

যাহা হউক, উপরে যেরূপ দেখা গেল, তাহাতে দেশীয় পণ্ডিতদের মতানুসরণ করিলেও মধুচ্ছন্দা ঋষির আবির্ভাবকাল যেরূপ লব্ধ হয়, তাহাতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতের কোনও বিসম্বাদ নাই। ইহা দেশীয় পণ্ডিতদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কেন না, আজকাল যেখানে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের

সহিত তাঁহাদের মতের বৈষম্য ঘটে, সেখানে তাঁহারা গলহস্ত পাইবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়েন।

এক্ষণে মধুচ্ছন্দার "অগ্নি" কি পদার্থ, তাহা বিবেচনা করিবার অগ্রে

খৃঃ পূঃ ——— ১৫০০
} অব্দে
শঃ পূঃ ——— ১৫৭৮

আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে যথাসম্ভব বিবেচ্য। ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

রঙ্গমহল।

মোগল বাদসাহদিগের দিল্লী ও আগরার লোহিতপ্রস্তরময় দুর্গাভ্যন্তরে, কৌমুদীধবলমর্ম্মরমণ্ডিত রাজভবন, স্থপতির শিল্পকৌশলের অপূর্ব্ব নিদর্শন। দুর্গমধ্যে আমখাস, দেওয়ানখাস প্রভৃতি যেমন দেখিবার জিনিস, বাদসাহের "হারেম" বা অন্তঃপুরও সেইরূপ শিল্পকীর্ত্তির এক কমনীয় উদাহরণ। হারেমের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে, যথায় বাদসাহের রাজ্ঞী ও বেগমগণ এবং সাহাজাদীরা বাস করিতেন, তাহাই "রঙ্গমহল" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল।

"রঙ্গমহলের" নির্ম্মাণকৌশল অদ্ভুত,—ইহার কক্ষনধ্যস্থা সুন্দরী অধিবাসিনীরা অপূর্ব্ব—উপন্যাসের মনোহর ঘটনাবলীর ন্যায়, তাঁহাদের জীবনের দৈনিক কার্য্যগুলিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। রঙ্গমহল মোগলের সৃষ্টি, মোগলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমহলেরও ধ্বংস হইয়াছে।

বর্ত্তমানে, দিল্লী ও আগরা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃপুরের মর্ম্মরপ্রস্তরময় কক্ষগুলির স্থান ও অবস্থা যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

যাহা ছিল, তাহা আর নাই। রঙ্গমহলের মধ্যে যাহাতে মন ভুলাইত—তাহা এই দুই শত বৎসরের অতীত স্মৃতির মধ্যে লুকাইয়াছে। বিলাসবিভ্রমময়, ভূষণশিঞ্জনমুখরিত, কলকণ্ঠনিনাদিত, সেতারসারঙ্গসুরলয়সমন্বিত, সেই প্রমোদময় কক্ষ, এখন কঠোরকায়, পরুষদৃষ্টি, অস্ত্রধারী, শ্বেতকায় সেনাগণের নিবাসে পরিণত হইয়াছে।

"আকবরনামা" হইতে জানিতে পারা যায়, আকবর সাহের সময়ে মোগল

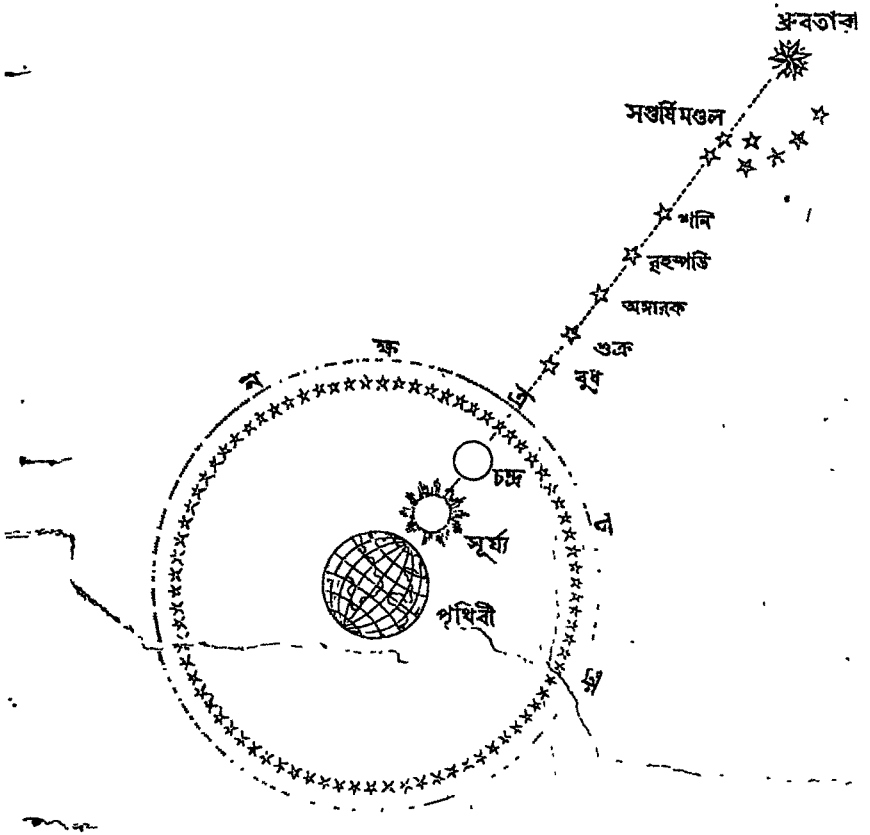
ধ্রুবতারা
সপ্তর্ষিমণ্ডল
শনি
বৃহস্পতি
অঙ্গারক
শুক্র
বুধ
চন্দ্র
সূর্য্য
পৃথিবী

হারেমে পঞ্চসহস্র অন্তঃপুরিকা অবস্থান করিতেছিল। আবুল ফজল একস্থানে বলিয়াছেন—"সম্রাট যে স্থানে বিশ্রাম করিতেন, তাহার চতুঃপার্শ্বে কয়েকটি মহল অধিকার করিয়া রঙ্গমহলের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সমস্ত সৌধাবলিতে প্রায় পঞ্চসহস্র রমণী বাস করিতেন। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বিভিন্ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই রমণীগণের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাঁহাদের সকলের জন্য এক একটা বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে যাঁহারা সুচরিত্রা ও নৈতিক-বলসম্পন্না, তাঁহারা মহলের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার পাইতেন। মহলের ভিতর বাদসাহের হিন্দু পাটরাণী, সাহজাদীগণ ও তাঁহাদের সহচরী কামিনীগণ, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট মহলে অবস্থান করিতেন।

সদরমহলের কার্য্যাবলী নির্ব্বাহিত করিবার জন্য যেরূপ বিশেষ নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, রঙ্গমহলের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যও সেইরূপ কতকগুলি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দৃঢ়কায়া, শ্রমশীলা, সমরথণ্ড ও তাতার দেশের রমণীগণ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রহরীর কাজ করিত। তাহাদের মধ্যে পদবিভাগ ছিল—এক জন উচ্চপদস্থ স্ত্রী-সেনাপতি তাহাদের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাহারা সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি বিনাইয়া চূর্ণকুন্তলে পরিণত করিত; তীব্র-কঠোরকটাক্ষময়, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নে সুরমার রেখা দিত; সুবাসিত, সুগন্ধি তাম্বূলে রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর-রঞ্জিত করিত। তাহারা রমণীহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতায় বঞ্চিত ছিল না; কিন্তু প্রয়োজন হইলে হাতিয়ারের আঘাতে সেই মর্ম্মরপ্রস্তরময় কক্ষতল শোণিতে রঞ্জিত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না। অন্তঃপুরবাসিনী সুন্দরীদের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্ঞী ও বাদসাজাদীদের সখী ও দাসীর কার্য্য করিত। ইহাদের মধ্যে অনেক নর্ত্তকী ছিল। অনেকে মৃদঙ্গ, সেতার, বীণ, এসরার, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রপ্রয়োগে নিপুণা ছিল। কেহ বা বাদসাজাদীদের চিত্রকার্য্য শিখাইত, কেহ বা তাঁহাদের বেশবিন্যাস করিয়া দিত, কেহ বা তাঁহাদিগকে নানাবিধ সুকুমার শিল্প শিক্ষা দিত, কেহ বা নৃত্যাদি শিখাইয়া অন্তঃপুরে জীবনযাপন করিত। আবার কোনও কোনও সম্প্রদায় অভিনয়াদি দ্বারা বাদসাহের মনোরঞ্জন করিত।

প্রথম শ্রেণীর রাজ্ঞীরা মাসে ১০২৮ টাকা হইতে অবস্থা ও শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ১৬১০ পর্য্যন্ত পাইতেন। সখী ও দাসীরা ৫১৲ হইতে ২০৲ অথবা

৪০৲ হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত, অবস্থা ও কার্য্য অনুসারে পাইত। দেওয়ানখাসের পরই অন্তঃপুর—যেখানে "দেওয়ানখাস" শেষ হইয়াছে, তাহার পার্শ্বের দালানেই, এক জন স্ত্রী-হিসাররক্ষক থাকিতেন। হারেম ও তদভ্যন্তরস্থ রঙ্গমহলের মধ্যে যে সমস্ত খরচপত্র হইত, সমস্তই ইঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। এই স্ত্রী-দেওয়ান সমস্ত খরচপত্রের ও ভাণ্ডারের হিসাবাদি রাখিতেন।

দেওয়ান ব্যতীত, হারেমের সীমার মধ্যে কয়েক জন স্ত্রী-তহবিলদার থাকিতেন। অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে যাঁহার যখন কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, তাহা তাঁহার মাসিক মাসহারার অতিরিক্ত না হইলে, তহবিলদার খরচ লিখিয়া সরবরাহ করিতেন। অন্যথায়, সরকারের হুকুম আনাইতে হইত। সমস্ত বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের তালিকা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-হিসাবরক্ষকের দ্বারা প্রস্তুত হইত। এই হিসাব সম্রাটের মন্ত্রীবর্গের সম্মুখে পেশ হইয়া অনুমোদিত হইলে, তাহাতে হারেমের ব্যবহার্য্য নির্দ্দিষ্ট শীল সংযোজিত করা হইত। পরিশেষে ইহা খাজাঞ্চীখানায় উপস্থিত হইলে, খাজাঞ্চী সমস্ত খরচপত্র সরবরাহ করিতেন।

বাদসাহ যে প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেন, তাহার চারি দিকে কালমুক-জাতীয় ভাত্যরীগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারা দিত। ইহাদের পর, খোজা সম্প্রদায়। খোজাদিগের পরেই বাদসাহের নিজনিয়োজিত বিশ্বাসী রাজপুত রক্ষকগণ। তাহার পরে মুসলমান সেনানীগণ। এতদ্ব্যতীত অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ, মনসবদারী পদের গৌরবরক্ষার্থে, অতিরিক্ত প্রহরীর কার্য্য করিতেন। এত দূর সতর্কতা সত্ত্বেও, বাদসাহ নিজে অনেক সময় নিভৃত নিশীথে সামান্য ছদ্মবেশে মহলের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন।

যখন কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা বা আমীর ওমরাহের স্ত্রী অন্তঃপুর-প্রবেশের অভিলাষ করিতেন, তখন সাম্রাজ্ঞী বা বাদসাহজাদীদের হুকুমনামা বা "পাঞ্জাপত্র" জোগাড় করিতে হইত। বিশেষতঃ, সচ্চরিত্রা না হইলে কেহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

সকল বাদসাহই হিন্দুরাজ্ঞীদের জন্য পৃথক মহল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজপুতকন্যাগণ যবন বাদসাহের পরিণীতা পত্নী হইলেও, বাদসাহেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদের জন্য হিন্দু পরিচারিকা ও ব্রাহ্মণকন্যাগণকে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আকবরসাহ যোধপুর-রাজকুমারীর জন্য যে মহল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজও "যোধবাইমহল" বলিয়া, আগরার দুর্গমধ্যে

পরিচিত। এই মহলে, ভিত্তিগাত্রে, কার্ণিসের নীচে, নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। হিন্দুরাজকুমারীরা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে হোমযজ্ঞাদি করিতেন। আকবরসাহ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। অনেক সময় তিনি রাজপুতনীদিগের প্রদত্ত হোমের তিলক, হিন্দুধর্ম্মানুরাগের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ধারণ করিতেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক হইয়া উঠে। এই গ্রীষ্মপ্রাখর্য্যের অপনোদন করিবার জন্য, কেবল যে যমুনার শীকরসংস্পৃক্ত শীতল সমীরণ সহায়তা করিত, এরূপ নহে। অন্তঃপুরের অনেক প্রকোষ্ঠমধ্যে এবং প্রাঙ্গণে, মর্ম্মর ও লোহিত প্রস্তরের চৌবাচ্ছা ও প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জলাধার নানাবিধ সুগন্ধি জলে পরিপূর্ণ থাকিত। কখনও বা গোলাপের ফোয়ারা ধীরভাবে উৎসারিত হইয়া স্বর্গের সৌরভ আনিয়া দিত।

অন্তঃপুরিকাগণের পদমর্য্যাদা অনুসারে, বেশভূষারও পার্থক্য ছিল। উচ্চশ্রেণীর বেগমেরা বা মহারাজ্ঞীরা, সর্ব্বদাই মণিমুক্তাদিতে তাঁহাদের ভ্রমরকৃষ্ণ, আগুল্‌ফলম্বিত, কুঞ্চিত কেশদাম আবৃত করিতেন। কেহ কেহ বাদসাহের অনুমতি লইয়া, মস্তকে সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত মণিময় মুকুট ধারণ করিতেন। গ্রীষ্ম যখন অত্যন্ত প্রখর হইত, তখন বাদসাহপত্নীগণ সুকোমল সূক্ষ্ম রেশমী বাসে ও ওড়নায় দেহাবরণ করিতেন। প্রতিদিন রাত্রে ব্যবহারের পর প্রাতে সেই সূক্ষ্মকারুকার্য্যময় পোষাক পরিত্যক্ত হইত, এবং প্রতিদিনই এক একটি নূতন সুট্ ব্যবহৃত হইত। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহাদের বেশভূষার বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইত। কোনও বৈদেশিক ভ্রমণকারী বলিয়াছেন, "মোগল অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ তাঁহাদের অঙ্গুলিতে এক খানি করিয়া ক্ষুদ্র দর্পণাঙ্গুরীয় ধারণ করিতেন। সময়ে সময়ে, সকল অবস্থায়, তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি, ইচ্ছামত ইহার মধ্যে নিরীক্ষণ করিতেন। চলা, ফেরা, বসা, দাঁড়ান, কথাবার্ত্তার সময়েও তাঁহারা অবসরমত অপাঙ্গদৃষ্টিতে সেই অঙ্গুলীস্থিত ক্ষুদ্র দর্পণে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইতেন।"

বাদসাহের অন্তঃপুরিকাগণ, যে সমস্ত মণিমুক্তা ও রত্নাদির ব্যবহার করিতেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা তাঁহাদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সেই সমস্ত বহুমূল্য মণিমুক্তাদি বাহিরে লইয়া যাইতে পারিতেন না। এগুলি মোগলরাজভাণ্ডারের চিহ্নিত দ্রব্য, তাঁহারা কেবল ব্যবহারকারিণী মাত্র ছিলেন। অনেক বহুমূল্য প্রস্তরকে বাহিরের

বাজারে মূল্যহীন করিবার জন্য, সচ্ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইত। এই ছিদ্র দ্বারা সেই মাণিক্যের সৌন্দর্য্যের অপচয় হইত না, কিন্তু বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে কোনও রত্নবণিকই তাহা ক্রয় করিত না। আকবরসাহ স্বয়ং একবার গুজরাট যুদ্ধের সময় অর্থকষ্ট-নিবন্ধন এইরূপ কয়েকখানি বহুমূল্য রত্ন বাজারে রত্নবণিকদের নিকট বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও রত্নবণিকই তাহা ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

মোগল অন্তঃপুরমধ্যে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রচুর প্রচলন ছিল। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই গন্ধাধারে নানাবিধ সুরভি দ্রব্য জ্বলিত। স্তম্ভে স্তম্ভে, হর্ম্ম্যপ্রাকারগাত্রে, কার্ণিসের মাথায়, নানা স্থানে, নানাবিধ নয়নরঞ্জন সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, নীরবে সুগন্ধ বিতরণ করিত।

পুষ্পের সুগন্ধ হইতে চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, চিত্তের প্রসন্নতা হইতে ঈশ্বরোপাসনার অনেক সাহায্য হয়; আবুলফজল বলেন, আকবরসাহ এই কারণে ফুলের বড় আদর করিতেন। তাঁহার সময়ে সেঁউতী, ভোগেশ্বরী, চাম্বেলি, রায়বেল, মোঙ্গরা, চাম্পা, কেতকী, জুঁই, নেউয়ারী, কেওরা, গুলাল, চালতা, (?) তসিব-ই-গুলাল, শৃঙ্গারহর, কর্ণ, কর্পূরবেল প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের ব্যবহার ছিল। আর কতকগুলি ফুল কেবল শোভার জন্য অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠনিবদ্ধ হইয়া থাকিত। ইহাদের মধ্যে রত্নমঞ্জরী (উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ), রত্নমালা (হরিদ্রাবর্ণ), কর্ণফুল (সোণালী লাল), কদম্বনাগকেশর, শ্রীখণ্ডী (দলের এক পার্শ্ব হরিদ্রাভ শ্বেত, অন্য পার্শ্ব লোহিতাভ), হীনা, চুপারিয়া, ভুইচম্পা, সুদর্শন (হরিদ্রাবর্ণ) প্রভৃতি পুষ্পই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। আকবরের সময়ে গোলাপের নামোল্লেখও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপীয় এবং মার্কিন শ্রমজীবী।

প্রথম প্রস্তাব।

শ্রমজীবী সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিতান্ত নিঃস্ব। আমাদের দেশের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, য়ুরোপ এবং আমেরিকাতেও ইহাদের বংশবৃদ্ধির সহিত ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের প্রাবল্য অনুভব করিয়া অনেক অর্থনীতিবেত্তা ইহাদের মঙ্গলোপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এই হত-

ভাগ্য সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রায় কেহ কিছু চিন্তা করেন না; কিন্তু ভরসা আছে, যদি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই আলোচ্য প্রশ্ন কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা হইলে আমরাও তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকৃত হইব।

কিন্তু শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের কোনও স্থায়ী উপকারের উপায় আবিষ্কার করিতে হইলে, কেবলমাত্র বক্তৃতায় কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমেরিকগণ বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমজীবীব উপার্জ্জন ও জীবিকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে সকল উন্নতিশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মার্কিন যুবক লি মেরিওয়েদাব সাহেব অন্যতম; তিনি য়ুরোপ ও আমেবিকা; এই উভয় দেশেই শ্রমজীবীগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য বথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; এক বৎসরকাল তিনি শ্রমজীবীর জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জিব্রাল্টর হইতে সুদূরবর্ত্তী কৃষ্ণসাগরের প্রান্তসীমা এবং ভূমধ্যসাগর হইতে তুষারমণ্ডিত বাল্টিকের শ্বেত উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় রাজ্যের শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে আমেরিকাব বিভিন্ন দেশেও এই উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার সংগৃহীত তত্ত্ব বিলক্ষণ কৌতূহলজনক।

তিনি বলেন, য়ুরোপ অপেক্ষা আমেরিকায় জীবিকানির্ব্বাহ অধিক ব্যয়-সাধ্য; ইহা ইংলণ্ড অপেক্ষা একচতুর্থাংশগুণ, ফরাসী দেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ, এবং ইটালী অপেক্ষা তিনগুণ অধিক। কিন্তু য়ুরোপের শ্রমজীবীগণ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহাদের সকল অভাব বিদূরিত হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহাদেব জীবনধারণের উপায়কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে হইয়াছে। নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন তাহারা অন্য কিছু ক্রয় করিতে সক্ষম নহে।

ইটালীয় শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের অনেকে প্রত্যহ চতুর্দ্দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চারি আনা মাত্র উপার্জ্জন করে; প্রত্যহ দেড় টাকা উপায় করিতে পারে, এরূপ কারিকর প্রায় দেখা যায় না। এমন কি, প্রত্যহ বারো আনা উপার্জ্জনক্ষম কারিকবের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প; কিন্তু এই সামান্য আয়েই তাহারা যে জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ হয়, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য তাহার অন্যতম কারণ হইলেও, তাহাদের অসম্ভব পরিমিতব্যয়িতাই তাহার মুখ্য কারণ। নানা প্রকার অভাবের মধ্যে বাস করিয়া ইহারা যেরূপ সানন্দ অন্তরে সন্তোষের সহিত কালাতিপাত করে, আমেরিক ভিক্ষুকগণও সেরূপ অবস্থা ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মার্কিণবাসীগণ ইটালীয় শ্রমজীবী সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। অনেক সময়ই আমেরিকার পথপ্রান্তে ইটালীয় ফলবিক্রেতাদিগকে তাহাদের দোকানে বসিয়া ঢুলিতে দেখা যায়, কখন কখন বা ইটালীয় ভিক্ষুকগণ আর্গিন বাজাইয়া এবং বানর নাচাইয়া মার্কিণ-গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যে সকল মার্কিণবাসী এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং যে সকল আমেরিক পর্য্যটক নেপল্‌স নগরের "আল্‌সে-থানা" কিম্বা রোমের পণ্যবীথিকা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইটালীয়গণের আলস্যপরতন্ত্রতার উল্লেখ করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু যে সকল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সমাজের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া নিম্নতল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সকল অবস্থার লোকের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইটালীয় শ্রমজীবীগণ অতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা এত যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে যে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ দেখা যায় না।

ইটালীর পাচকপাচিকাগণের নিকট রন্ধনোপযোগী কোনও দ্রব্যই নষ্ট হইতে পায় না—দরিদ্রের গৃহে দূরের কথা, ধনবানের অট্টালিকাতেও নহে। মার্কিণে যে গৃহস্থের আয় বার্ষিক পনের হাজার টাকা, তাহাদের ভাণ্ডারে রাশীকৃত ময়দা, চিনি, মাখম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া রাখা হয়; এইরূপে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেই সকল দ্রব্য ব্যয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, সুতরাং এই সকল দ্রব্যের যথেষ্টপরিমাণে অপব্যয় হয়; কিন্তু এক জন অবস্থাপন্ন ইটালীবাসীর ভাণ্ডারগৃহ সম্পূর্ণ শূন্য থাকে, প্রয়োজন মত তাঁহারা কয়েক সের ময়দা, কিঞ্চিৎ চিনি এবং কিয়ৎপরিমাণ মাংস আনাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন, তাহার কোনও অংশের অপব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

যাহা হউক, ধনবানের রন্ধনশালায় যে সকল দ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকে, পাচক পাচিকা তাহা সযত্নে রাখিয়া দেয়, এবং সুবিধা অনুসারে খাদ্যদ্রব্যবিক্রেতাদিগের নিকট তাহা অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া আসে। বলা বাহুল্য, এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহাদেরই উপরিলাভ। ইহারা ব্যবহৃত কাফিচূর্ণ শুষ্ক করিয়া বিক্রয় করে, মাছ ভাজিয়া ভাজা তৈল অবশিষ্ট থাকিলে তাহা পর্য্যন্ত বিক্রয় করে; এমন কি, বাতির সর্ব্বশেষ অংশটুকু জমাইয়া তাহাও বিক্রয় করে; এইরূপে তাহাদের অনেক টাকা উপায় হয়। ইটালীয় নগরের যে সকল স্থানে এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, সেই সকল স্থানকে "পিয়েজা" (সমচতুষ্কোণ

মুক্ত প্রাঙ্গণ) বলে। একজন বিক্রেতার নিকটেই উচ্ছিষ্ট শশা কাঁকুড় হইতে আরম্ভ করিয়া মরিচা-ধরা তরবারি পর্য্যন্ত, সকল দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতা তাহার বাজারস্থ ক্ষুদ্র দোকানে সমস্ত পণ্যদ্রব্য থরে থরে সাজাইয়া রাখে। এই সকল দোকানে পুরাতন বস্ত্র, গজাল, ভুক্তাবশিষ্ট খানা, ব্যবহৃত কাফির শুষ্ক গুঁড়া, বাতির পরিত্যক্ত অংশ, নানাবিধ অস্ত্র, ছুরী, কাঁটা, পুরাতন লৌহ-খাট এবং আরও নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইটালীয় শ্রমজীবীগণের গৃহিণীবর্গ, এই সকল দোকান হইতে অল্পমূল্যে আবশ্যকীয় খাদ্য-দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, ইটালীয় শ্রমজীবীদিগের গৃহের অবস্থা কিরূপ। ইহাদের গৃহে গৃহসামগ্রীর মধ্যে কয়েকখানি টুল, একখানি জীর্ণ টেবিল, এবং খুব বেশী হইলে একখানি লোহার খাট পর্য্যন্ত দেখা যায়। পরিবার বৃহৎ হইলে, ইহাদের তিন চারি খানি মাদুর থাকে, দিবাভাগে সেগুলি খাটের উপর জড়াইয়া রাখে, রাত্রে শুইবার সময় তাহা মেজের উপর বিছাইয়া লয়। দিবাভাগে ইহারা স্ব স্ব গৃহ কারখানায় পরিণত করে, তবে গৃহিণী সেই গৃহেরই এক প্রান্তে সাংসারিক কর্ম্ম করিতে থাকে।

ইটালীয় শ্রমজীবীগণ সাধারণতঃ যে প্রকার বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বার্ষিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। যাহারা প্রস্তর-খোদাইএর ব্যবসায় করে, তাহারা প্রায়ই গৃহমধ্যে কাজ করে না, কিঞ্চিৎ বেশী ভাড়া দিয়া কোনও গৃহের ত্রিতল বা চৌতলে কারখানা খোলে। কিন্তু এইরূপ শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি অল্প। প্রায় সকলেই অল্প ভাড়ায় নিম্নতম তলের ঘর ঠিক করিয়া লয়। অবিবাহিত শ্রমজীবীগণের অধিকাংশই হোটেলে থাকে, শয্যার জন্য তাহাদিগকে প্রতি রাত্রে প্রায় দুই আনা ভাড়া দিতে হয়। যে সকল শ্রমজীবী অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারা তিন আনা দিয়া একটু প্রশস্ততর শয্যা ভাড়া করে, এবং অন্য এক জন শয্যাসহচর যুটাইয়া, দুই জনে সেই এক শয্যায় শয়ন করে; ইহাতে তাহাদের উভয়েরই কিঞ্চিৎ ব্যয়লাঘব হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ত্রিশ জন লোক একটি ১৬ বর্গ ফিট পরিমিত কুঠুরী ভাড়া লইয়া, তক্তপোষের উপর তক্তপোষ সাজাইয়া, তাহার ভিন্ন ভিন্ন থাকে শয়ন করে।

রাজমিস্ত্রীরা প্রত্যূষে পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক আনার রুটী ও অর্দ্ধ আনার তরকারী কিনিয়া লয়, এবং কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই

তদ্দ্বারা প্রাতর্ভোজন শেষ করে। সুবিধা হইলে, অনেকে এই সময়ে সুলভ মদিরাও কিঞ্চিৎ পান করিয়া থাকে।

বেলা বারটা বাজিলে, অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরিশ্রমের পর, ইহারা টিফিনের ছুটি পায়, তখন সকলেই নিকটস্থ হোটেলে প্রবেশ করে, এবং তিন চারি আনার মদ্য, মাংস রুটী ক্রয় করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করে। এই সময় ইহারা দ্রাক্ষাফলজাত মদ্য ভিন্ন অন্য মদ্য পান করে না। যে সকল শ্রমজীবী স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করে, তাহারা দুই তিন সের ময়দা আনিয়া তদ্দ্বারা রুটী প্রস্তুত করে। এই উপায়ে তাহাদের খরচ অনেক কম পড়ে। সন্ধ্যার সময় ইহাদের আহার অতি যৎসামান্য। অল্প রুটী, এবং তাহার উপযুক্ত তরকারী ও কিঞ্চিৎ কাফি, ইহাই তাহাদের নৈশভোজনের উপকরণ। হোটেলে এক পাইণ্ট কাফির মূল্য অর্দ্ধ আনা, কিন্তু শর্করাসংযোগে তাহাকে সুমিষ্ট করিতে হইলে এক আনা দেওয়া প্রয়োজন; দেড় আনা ব্যয় করিলে, সেই সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া রুটীও পাওয়া যায়।

ইহাই অতিদরিদ্র শ্রমজীবীদিগের আহারপ্রণালী। দোকানদার ও সর্দ্দার কারিকরদিগের আহারের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক; ইহাদিগের পরিবারবর্গ সাধারণ রন্ধনশালায় আপনাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য রন্ধন করিয়া লয়, ইহাতে খরচপত্রের অনেক সাশ্রয় হয়। এই দেশে কাঠ ও কয়লা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, কিন্তু দুই খানি কঞ্চি এবং মুষ্টিমেয় কয়লার জ্বালে ইটালীর রমণীগণ এত সামগ্রী রন্ধন করিতে পারে যে, মার্কিনবাসীর নিকট তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইটালীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পথপ্রান্তে পতিত কাষ্ঠখণ্ড কিম্বা শুষ্ক দ্রাক্ষালতা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা যাহা কিছু কুড়াইয়া পায়, তাহা দ্বারাই তাহাদের সামান্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে। এতদ্ভিন্ন শীতনিবারণের জন্যও ইহাদের অগ্নির প্রয়োজন হয়; অনেক সময় একটি পাত্রে অল্প অগ্নি রাখিয়া, ছয় সাত জন শ্রমজীবী তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া শরীর উত্তপ্ত করিয়া লয়। কখন কখন দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা মৃৎপাত্রে ছাই তুলিয়া তাহাদের বস্ত্রাদির নিম্নে রাখিয়া দেয়; বোধ হয় তাহারা মনে করে, ইহাতেই তাহাদের বস্ত্রাদি গরম হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডের শ্রমজীবীগণ তাহাদের ইটালীয় ভ্রাতৃবর্গ অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু তাহাদের সাংসারিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এক জেনিভা নগরের অধিকাংশ শ্রমজীবীই ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্রের

কারবার করিয়া থাকে; এই সকল কারিকরেরা সাধারণতঃ দুইটি করিয়া ঘর ভাড়া লয়; তাহার একটি ঘরে বসবাস করে, এবং অন্যটিতে কারখানার কাজ চলে। ঘড়িনির্ম্মাতা ঘড়ির তার, চাকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রনির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করে, তাহা এই ঘরে বসিয়াই প্রস্তুত করে। তাহার পরিবারবর্গও তাহার সহায়তা করিয়া থাকে; স্ত্রী চাকাগুলি পালিশ করে, তার পরিষ্কার করিয়া দেয়; পুত্র কোনও যন্ত্রালয়ের কারবারে চাকরী করে; এবং গৃহে অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে সে সুতা কাটিয়া বস্ত্রবয়ন করে। নিতান্ত শিশুসন্তান ভিন্ন সুইস্ শ্রমজীবীর পরিবারস্থ সকলেই কিছু-না-কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপে পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের সমবেত উপার্জ্জন এবং তাহার পরিমিত ব্যয়, এই পর্ব্বতাকীর্ণ জনবহুল দেশের শ্রমজীবীবর্গকে সুখ ও সন্তোষের সহিত জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা করে। জেনিভা, জুরিচ এবং বার্ণি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে এমন অনেক দোকান আছে, যেখানে দোকানদারেরা মাংস ও নানাপ্রকার তরকারী রন্ধন করিয়া বিক্রয় করে। অনেক শ্রমজীবী এই সকল খাদ্য কিনিয়া স্কুন্নিবৃত্তি করে, সুতরাং খাদ্যপাকের জন্য অনেকের গৃহে উনন জ্বালাইবারই প্রয়োজন হয় না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও পল্লীগ্রামে কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীগণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহাদের পৈতৃক বাসগৃহ না থাকিলে, তাহারা দুই তিনটি মনোরমকক্ষবিশিষ্ট 'চ্যালেট' (কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ) ও তৎসংলগ্ন অনতিবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভাড়া করে; এই গৃহপ্রাঙ্গণে তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে কেহ শাক সব্জীর বীজ বপন করে, কেহ বা কোষ্টা, শন কিম্বা গাঁজার চারা রোপণ করে। ইহারা প্রায় সকলেই মেষপালন করে, এবং শীতকালে এই পর্ব্বতপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র দেশটি তুষারাবৃত হইয়া পড়িলে, বাহিরের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রমণীগণ নিজ নিজ গৃহে বসিয়া কেহ কোষ্টা কাটে, কেহ বা মেষের লোমে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, এবং এই উপায়ে যে অর্থাগম হয়, তাহা আবশ্যক খরচপত্রে ব্যয় করিয়াও কিয়দংশ উদ্বৃত্ত থাকে। রুটির জন্য গম ও যব, দধি, দুগ্ধ, গোল আলু প্রভৃতি প্রধান খাদ্যদ্রব্যও তাহাদের গৃহে উৎপন্ন হয়, এবং তাহারা স্বহস্তে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া পরিধান করে।

সুইস্ শ্রমজীবীগণ য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা এক বিষয়ে সৌভাগ্যবান্, ইহাদিগের প্রত্যেককে বৎসরে তিন সপ্তাহ করিয়া সেনাবিভাগে

কাজ করিতে হয়, তাহাদের সদাকর্ম্মনিরত জীবনে এই পরিবর্ত্তন যথেষ্ট প্রীতিকর। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। য়ুরোপের অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই, তদ্দেশীয় অধিবাসীবর্গকে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর এই কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়। যৌবনকালে যখন সংসারক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করা যায়, এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য প্রাণপণে জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হয়, জীবনের সেই মহার্ঘ সময়ে এইরূপ ক্ষতি অত্যন্ত গভীর। জর্ম্মনীর এবং অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীবর্গ অবনতমস্তকে এই ক্ষতি স্বীকার করে।

জর্ম্মনী ও অষ্ট্রিয়ার শ্রমজীবীগণ উপরি-উক্ত কারণে ২৩।২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান, জর্ম্মণ শ্রমজীবীগণের অবস্থাগত অবনতির অন্যতম কারণ। এই পানদোষের হ্রাস হওয়া দূরের কথা, প্রতি বৎসর ইহার বিস্ময়কর বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক প্রুসিয়া দেশে এক লক্ষ ষাট হাজার দোকানে মদ্য বিক্রয় হইত। ইহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে শৌণ্ডিকালয়ের সংখ্যা দুই লক্ষে পরিণত হইয়াছিল, এই কয় বৎসরে ইহার আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে, এরূপ আশা করা যায়। এই দেশের পুরুষ, স্ত্রী এবং বালকবালিকাগণ প্রত্যহ গড়ে ৪ গ্লাস হিসাবে মদ্যপান করে; অধিক কি, প্রায় সকল শ্রমজীবীই কোনও না কোনও শৌণ্ডিকালয়ের "মেম্বর"। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা স্ব স্ব আড্ডায় উপস্থিত হইয়া, ধূম ও মদ্যপান দ্বারা দৈনিক কঠোর শ্রমের লাঘব করে। এই বিবরণ কাহারও কাহারও নিকট অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু মেরিওয়েদার সাহেব বলেন যে, জর্ম্মণীর শ্রমজীবীগণ সম্বৎসরে যত টাকা বাড়ীভাড়া দেয়, পানাসক্তির জন্য তাহাদিগকে তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীদের অবস্থাও অনেকটা এই প্রকার, এবং পল্লীগ্রামের যেখানে সেখানে মদের দোকান হওয়াতে, ইহারা উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ শৌণ্ডিকালয়ে দিয়া প্রায় রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া যায়; কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে এই শ্রেণীর মধ্যে আজ পর্য্যন্তও মদ্যপান অন্নবস্ত্রের ন্যায় অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু জর্ম্মণ শ্রমজীবীবর্গ মদ্যকে বিলাসোপকরণ বলিয়া মনে করে না, ইহা তাহাদের নিকট অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহারা বিয়ার মদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে, এবং তাহাকে 'তরল খাদ্য' বলিয়া উল্লেখ করে।

জর্ম্মাণীর অন্তর্গত দক্ষিণ উর্টেম্বর্গ নগরে প্রায় সাত শত শ্রমজীবী প্রত্যহ আড়াই হাজার গ্লাস বিয়ার পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ এবং বালক-বালিকাগণ প্রত্যহ গড়ে সাড়ে তিন পাইণ্ট মদ্যপান করে। এক এক পাইণ্ট বিয়ারের মূল্য এক আনারও অধিক, অতএব পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সামান্যঅবস্থাপন্ন শ্রমজীবীগণ মদ্যপানে তাহাদের উপার্জ্জিত সামান্য অর্থের কত অধিক অংশ অপব্যয় করে। যাহা হউক, ইহাদের এক প্রধান সুবিধা এই যে, জর্ম্মণীতে অতি সামান্য খরচেই, এমন কি, ইটালী অপেক্ষাও অল্প খরচে, জীবিকানির্ব্বাহ হয়। যে সকল শ্রমজীবী কলে কাজ করে, তাহাদের আহার ও বাসস্থানের জন্য যে বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে প্রত্যেকের প্রত্যহ আট আনা হিসাবে খরচ পড়ে। ইহাদিগকে প্রাতঃকালে দুই খণ্ড রুটী ও এক পেয়ালা কাফি দেওয়া হয়; মধ্যাহ্নে মাংস, মাংসের ঝোল, কাফি বা আলুর তরকারীর ব্যবস্থা আছে; সান্ধ্যভোজনবিধিও প্রাতঃকালের আহারের অনুরূপ। এখানে ঘরভাড়াও অধিক নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ছোট দো-মহল বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে; প্রত্যেক তলায় চারিটি করিয়া কক্ষ, দুইটি কক্ষের ভাড়া সপ্তাহে এক টাকার কিছু অধিক, কিন্তু সমস্ত বাড়ী ভাড়া লইতে হইলে সপ্তাহে আড়াই টাকা দিলেই চলে। দুইটির অধিক কক্ষ ভাড়া করিতে পারে, এরূপ শ্রমজীবীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তবে বৃহৎপরিবারবিশিষ্ট সুনিপুণ কারিকরেরা কখন কখন চারিটি কক্ষ ভাড়া লইয়া থাকে; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রমজীবীর কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক একটিও নাই।

প্রত্যূষে পাঁচটার সময় জর্ম্মাণ কারখানার কারিকরেরা শয্যাত্যাগ করে। অনন্তর কিঞ্চিৎ রুটী এবং কাফি দ্বারা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া, ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থলে সমাগত হয়, বেলা ১১টা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে জলযোগের জন্য ছুটি পায়; এবং অপরাহ্নে চারিটার পূর্ব্বে এক গ্লাশ বিয়ার খাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য আর একবার দশ মিনিটের জন্য অবসর পাইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত, এই এক ঘণ্টা আহারের জন্য ইহাদিগকে ছুটী দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর সাতটার সময় কারখানাবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছুটী পাইলে ইহারা গৃহে ফিরিয়া আসে। সকলকে প্রত্যহ তের ঘণ্টা কারখানায় থাকিতে হয়, এবং তন্মধ্যে ১১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ইহাদিগের পরিশ্রম করিবার নিয়ম।

কথাপ্রসঙ্গে মেরিওয়েদার সাহেব ওগিডেন নগরের এক পাদুকানির্ম্মাতার কার্য্যবিবরণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি দুইটি কক্ষবিশিষ্ট গৃহে সপরিবারে বাস করে। তাহার পাঁচটি পুত্রকন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, এবং কনিষ্ঠের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সাহেব তাহাদের আতিথ্য-গ্রহণ করিলে, রাত্রে তাহারা সকলে একটি কক্ষে শয়ন করিয়া, অন্যটি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এইটি সেই পরিবারের রন্ধনশালা। পাদুকানির্ম্মাতার স্ত্রীর একখানি ক্ষুদ্র গাড়ী ও একটি বৃহৎ কুকুর আছে, কুকুরটিকে এক দিকে যুড়িয়া সে গাড়ীর অন্য দিক স্বহস্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, এবং তাহাতে দুগ্ধ বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত আর সকলেই স্কুলে পড়ে; জ্যেষ্ঠটি তাহার পিতার কার্য্যে সহায়তা করে। সাহেব অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের বার্ষিক আয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ বিয়ার-ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, ঘরভাড়া তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প। প্রাতঃকালে চর্ম্মকারপুত্র রুটি এবং কাফি দ্বারা অতিথিসৎকার করিল; মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, রুটী, আলু ও কপির তরকারী, বিয়ার, মাংস এবং পায়িস, (ব্যয়বাহুল্যবশতঃ, প্রায় কোনও শ্রমজীবীই নিয়মিতরূপে এই শেষোক্ত ভোজ্যদ্বয়ের আয়োজন করিতে পারে না)। অনন্তর অপরাহ্ণ ৪টার সময় রুটী ও বিয়ারের দ্বারা অল্প জলযোগের যোগাড় হইয়াছিল; রাত্রি ৭টার সময়ে সান্ধ্যভোজন, কিন্তু ঐ সময় রুটী ও কাফি ভিন্ন অন্য কিছু প্রদত্ত হয় নাই। এই পরিবারের আহারাদির বন্দোবস্ত এইরূপ। কার্য্যদক্ষ, অবস্থাপন্ন প্রায় সকল জর্ম্মাণ শ্রমজীবীই এই নিয়মে আহারাদি করিয়া থাকে, কিন্তু যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী লবণ কিম্বা কয়লার খনিতে কাজ করে, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দীর্ঘ দ্বাদশ ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে অন্ধকারময়, জলসিক্ত ভূগর্ভে পরিশ্রম করিতে হয়, দিবসে একটিবারও তাহারা সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না; রাত্রিকালেও তাহাদিগকে নৈশ অন্ধকারে একই প্রকার আর্দ্র এবং আলোকহীন অতিযৎসামান্য কুটীরে কালাতিপাত করিতে হয়। অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত সালবুর্গের নিকটস্থ কোনও খনিতে যে সকল লোক কাজ করে, তাহারা প্রত্যহ প্রায় দেড় টাকা হিসাবে পায়, এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবারবর্গ সুতা কাটিয়া এবং বস্ত্রবয়ন পূর্ব্বক কিছু কিছু উপায় করে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জল-শোষণ।

আতপতাপে ও চঞ্চল বায়ুতে আর্দ্র বস্ত্রাদি শীঘ্র শুষ্ক হইতে দেখিয়া, আর্দ্র বস্তুর নিকটস্থ বায়ুরাশির উষ্ণতা ও তাহার ঘন ঘন সঞ্চালন, শুষ্ক হইবার প্রধান কারণ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; শুষ্ক হইবার পক্ষে বায়ুর যে একান্ত আবশ্যক, তাহাও অনেকে স্থির করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড বা স্পঞ্জ যেমন কৈশিকার্ষণবলে জল শোষণ করিয়া থাকে, এবং তাহা সম্পূর্ণ জলসিক্ত হইলে যেমন অপর একখানি স্পঞ্জ দ্বারা জলশোষণ করিতে হয়, অবিকল সেই প্রকারে আর্দ্র বস্তুর নিকটস্থ বায়ুরাশি জলশোষণ করে, এবং বায়ু সম্পূর্ণ সিক্ত হইলে স্পঞ্জের ন্যায় ইহারও আর জলশোষণ-ক্ষমতা থাকে না—সেই জন্য কোনও আর্দ্র বস্তু আশু শুষ্ক করিতে হইলে, ইহার নিকটস্থ সিক্ত বায়ুরাশি ঘন ঘন স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। শুষ্ককরণকার্য্যে তাপের আবশ্যকতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাঁরা বলেন,—তাপ দ্বারা বায়ু শুষ্ক হয়, এবং এই শুষ্কতাবৃদ্ধির সহিত ইহার জলশোষণক্ষমতারও বৃদ্ধি হয়।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি অতি সহজবোধ্য দেখিয়া এবং স্থূলদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে ইহার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই দেখিয়া, জলশোষণব্যাপারের এই সকল ব্যাখ্যা অভ্রান্ত ও সন্তোষজনক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের যুক্তিগুলির সহিত বাষ্পোৎপাদনক্রিয়ার প্রকৃত কারণ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তটিকে একবারে ভ্রমসংকুল না বলুন, কিন্তু ইহা যে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসাবিষয়ে সন্তোষজনক ও যথেষ্ট কারণ নয়, তাহা সকলেই অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। দুঃখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তকাদিতে জলশোষণক্রিয়ার কারণ বুঝাইতে গিয়া বিজ্ঞ গ্রন্থকারগণ ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিষয়টির আংশিক আলোচনা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, এবং প্রকারান্তরে সেই পুরাতন কথাটারই অবতারণা করিয়া ও স্থূল স্থূল ঘটনা দ্বারা তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া, পাঠকগণকে বিষয়টি তলাইয়া বুঝিবার ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ প্রদান করেন নাই। তাপপরিমাণ সমান রাখিয়া বায়ুশূন্য স্থানে আর্দ্র পদার্থ অতি অল্প কাল মাত্র রক্ষিত হইলে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতে দেখা যায়,—বায়ুনিষ্কা-

শনযন্ত্রের সাহায্যে বা অন্য কোনও উপায়ে, স্থান কিঞ্চিৎ বায়ুশূন্য করিয়া, ইহা বেশ পরীক্ষা করিতে পারা যায়, এবং উচ্চ পর্ব্বতশিখরে অতি শীঘ্র বস্ত্রাদি শুষ্ক হওয়ায়, ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এইগুলি মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে জল ফুটাইতে ২১২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রদান করিতে হয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ৪২০০ হস্ত পরিমিত উচ্চ স্থানে ২০০ ডিগ্রি তাপ দিলেই যথেষ্ট হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কাজেই, এই সকল পরীক্ষার ফল সত্য বলিয়া মানিলে, ঘনবায়ুবিশিষ্ট স্থান অপেক্ষা, তরলবায়ুযুক্ত স্থানে অল্প তাপ দ্বারাই যে জল ফুটাইতে, অর্থাৎ বাষ্পে পরিণত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং, আর্দ্রীকৃত বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর পরিমাণ যতই অল্প হইতে থাকিবে, ইহার জলও ততই শীঘ্র শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষাসিদ্ধ ঘটনাবলী দ্বারা, বায়ুর সহিত জলশোষণক্রিয়ার প্রকৃত সম্বন্ধ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, এবং শুষ্ককরণব্যাপারে বায়ু যে কোনও সহায়তাই করে না, বরং আর্দ্রবস্তুর দ্রুত শুষ্ক হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কোনও পদার্থ শুষ্ক করিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ ইহার জলীয়াংশ কোনও উপায়ে বাষ্পীভূত করিয়া দিই, এবং প্রায়ই ইহাতে তাপসংযোগ করিয়া, পদার্থের মুক্তাংশস্থ জল বাষ্পে পরিবর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিয়া তুলি;—বায়ুচাপ বা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর অবস্থাবৈচিত্র্য দ্বারা এই বাষ্পোৎপাদনকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে কোনও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, ইহা কেবল সঞ্চিত বাষ্পের স্থানান্তরকার্য্যে—অবস্থাবিশেষে—কখনও বাধা দেয়, কখনও বা সহায়তা করে মাত্র।

জলশোষণকার্য্যে, আর্দ্রপদার্থস্থ জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হওয়া এবং উদ্গত বাষ্প স্থানান্তরিত করা,—এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ইহার মধ্যে বাষ্পোৎপাদনকার্য্য একমাত্র উত্তাপ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে; তাপসংযোগে জল কি প্রকারে বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে, বাষ্পসম্বন্ধীয় আধুনিক সিদ্ধান্তটির (Kinetic theory of gases) দুই এক কথা জানা আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তের প্রচারকেরা স্থির করিয়াছেন, জগতের সকল পদার্থই কতকগুলি অণুর সমষ্টিমাত্র, এবং এই সকল অণু পদার্থ-শরীরে নিবদ্ধ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও একস্থানে স্থির থাকে না, প্রত্যেক অণুই সর্ব্বদা অল্প বা

অধিক পরিমাণে গতিশীল থাকিয়া, পদার্থের অভ্যন্তরে স্ব স্ব স্থান সদাই পরিবর্ত্তন করিতেছে। ইহাঁদের মতে, এই আণবিক গতিই তাপের একমাত্র কারণ, এবং পদার্থ সকল অবস্থাতেই এই উপায়ে তাপোৎপাদন করিয়া থাকে। উত্তপ্ত তরল বস্তুর অণুসকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সবেগে নানা অংশে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, এবং এই গতির ন্যূনাধিক্য অনুসারে, ইহার তাপেরও ন্যূনাতিরেক হয়; অর্থাৎ, তাপের বৃদ্ধি হইলে ইহার আণবিক গতিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদার্থের সকল অবস্থাতেই এই নিয়মে আণবিক গতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু অবস্থাভেদে মূল গতির অনেক বৈষম্য হয়,—তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হইবা মাত্র, ইহার প্রত্যেক অণুর গতি, পূর্ব্ব গতির পরিমাণ অপেক্ষা শত শত গুণ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং, জল ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে বাষ্পীভূত হইলে, বাষ্পাণুর গতিপরিমাণ, জলাণুর গতি অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়া মানিলে, এখন বাষ্পোৎপাদনপ্রক্রিয়া বুঝা অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জল উত্তপ্ত করিলে, ইহার আণবিক-গতির উষ্ণতার সহিত বৃদ্ধি পাইয়া, প্রত্যেক অণুই সবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে, এবং কখনও কখনও দুই এক জলকণা জলের আভ্যন্তরীণ সকল বাধাই তাহাদের গতি দ্বারা সহজে অতিক্রম করিয়া, ও জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, অল্পবাধাযুক্ত মুক্তাকাশে পরিভ্রমণ-ইচ্ছায়, জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করে; জলের তাপ অল্প হইলে তাহাদের সকল প্রয়াসই বিফল হইয়া যায়, এবং জলরাশিমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, দ্রুত গতিতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। কিন্তু তাপ অধিক প্রযুক্ত হইলে, আণবিক গতি ক্রমেই বাড়িতে থাকে, এবং কেবলমাত্র ইহারই সাহায্যে অণুসকল আভ্যন্তরীণ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর পৃথক হইয়া, জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। জলকণা সকল এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে সঞ্চিত হইলে, আমরা তাহাদিগকে বাষ্প বলিয়া থাকি। জল এই প্রকারে অবস্থান্তরিত হইবা মাত্র, ইহা এককালে বাষ্পের সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইয়া বাষ্পসংমিশ্রণের (Diffusion of gases) নিয়মানুসারে ইতঃস্তত সঞ্চারিত হইতে থাকে। সুতরাং, ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, উদ্গত বাষ্পের পরিমাণের, পদার্থের আণবিকগতি অর্থাৎ ইহার আভ্যন্তরীণ উষ্ণতার সহিতই বিশেষ সম্বন্ধ, পার্শ্বস্থ বায়ুর গাঢ়তা বা বায়ুতাপের পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার কোনও রূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না—কিন্তু পরোক্ষভাবে বায়ু

সমাজ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি-প্রণয়।

সুখের স্বপ্নের মত তারিণী বাবুর ছুটি কুরাইল, তিনি পুনরায় বর্দ্ধমানে কার্য্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নববধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছুক বলদের মত ফিরিয়া বর্দ্ধমানে যাইয়া আপিসের খানিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী বাবুর কায করা আর পোষায় না। বয়সে শরীর দুর্ব্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়। কাযে সর্ব্বদাই ভুল হইত, সাহেবেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, নাজীর বাবুর পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইয়াছে, পেনশন লউক। অন্যান্য আমলাগণ কাণাকাণি করিত, নাজীর মশায়ের মন নূতন বৌয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কায করিবেন কিরূপে?

চাকুরীর মায়া শীঘ্র ছাড়া যায় না,—অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াও আরও এক বৎসর কায করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্‌শন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, যৌবনের কান্তিতে শরীর ফেটে পড়িতেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভরিয়া গহনা পরিয়া রূপাভিমানিনী গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে! বার্দ্ধক্যে রূপতৃষার্ত্ত তারিণী বাবু মনে করিলেন "চাকুরির মুখে আগুন, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিব।" নববধূ মনে করিলেন, "এবার বুড়ো মিন্‌সেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইব, কর্ত্তাটি আর যাবেন কোথা?"

উমার মা রোগক্লিষ্টা, সংসার দেখিতে পারেন না, দু বেলা দু পেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্ব্বদাই জেঠাইমাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, ওদের জাত গিয়াছে, ওদের আচার ব্যবহার ভাল নয়, উহারা ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়। যে নম্রমুখী দরিদ্র-বালিকা নগ্নাবস্থায় বিন্দুর উঠানে সে দিন খেলা করিতে আসিত, আর একটি সন্দেশের জন্য লালায়িত হইত, সে এখন বড় ঘরের গৃহিণী, সম্পর্কে গুরু। তাহার এই কথা শুনিয়া বিন্দু গোপনে হাসিলেন, জেঠাইমার বাড়ী যাওয়া আসা কতকটা বন্ধ করিলেন।

উমার মার একটি পুরাতন দাসী ছিল, সে শুশ্রূষা করিত। বড় সতীনের প্রতি দাসীর এত মায়া দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন,—অভিমানে সুন্দর চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্ত্তার কাছে লাগাইলেন,—আমার ঘর সংসারের কায চলে না, আমি খাটিয়া খাটিয়া হাড় কালী করিতেছি, আর দিদি গিদ্দে ঠেসান দিয়া শুইয়া থাকেন, তাঁহার দাসী না হইলে চলে না। তা দিদিকে নিয়েই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চলিলাম। বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয়, এমন একজন লোক রহিল না।

পড়সীর লোক সর্ব্বদাই উমার মার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোটমার মেজাজ ও ভাব-গতিক দেখিয়া তাহারাও আসা প্রায় বন্ধ করিল। উমার মার কাপড় চোপড় ও পূজা আচ্ছার খরচের জন্য তারিণী বাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধূর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তারিণী বাবু নববধূর মন পাইলেন না। সুন্দরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই বিমর্ষ, সর্ব্বদাই অভিমানিনী। যুবতী নারীর অভিমান অস্ত্রের প্রভাব, গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুযোগ পাইয়া এখন ধনুকে সেই অস্ত্র জুড়িলেন।

বৃদ্ধ দেখিলেন,—বর্দ্ধমানে সাহেবদের চাকুরি করা অপেক্ষা তরুণী ভার্য্যার পরিচর্য্যা বিষম কায! সে কার্য্যে বৃদ্ধ হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, মান ভাঙ্গে না। নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নানাপ্রকার উপাদেয় বস্তু দিয়া সে রাঙ্গা চরণের সেবা করিতেন, তবু ত সে রাঙ্গা চরণের প্রসাদ পান না। তালুক থেকে তোড়া তোড়া টাকা এনে দেন, তরুণী টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিলে তরুণী কথা কহেন না, অথবা ঘোর অভিমানে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন,—তবু যে জিগ্‌গেস করলে এই আমার ভাগ্য! আমার প্রতি ত তোমার মায়া নেই,—মায়া দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তাচ্ছল্য করবে না ত কি। (ক্রন্দন)

বুড়ো চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতেন,—সে কি, সে কি, তোমাকে মাথায় করে রাখিব,—তুমি কি আমার অযত্নের ধন? কি করিলে তুষ্ট হইবে বল, আমি এখনই করিতেছি।

বিনাইয়া বিনাইয়া নবীনা বলিলেন,—তা আমি মেয়ে মানুষ, কি করিলে ভাল হয়, আমি কি রকমে জানিব? ঐ চাটুর্য্যেদের বাড়ীর কর্ত্তাটি বুড়ো

বয়সে আবার একটা বিয়ে করিয়াই কিছু দিন পর তাঁহার কাল হইল, ছোট মেয়েটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন তাকে উঠ্‌তে বস্‌তে গাল দেয়, দিবারাত্রি মজুরের মত খাটায়, দুবেলা খেতে দেয় না। ছোট বৌটি যেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে,—পথের কাঙ্গালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে। তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কাঙ্গালীর ঘরে জন্ম, আমি পথে ভিক্ষা করিব না ত কে করিবে? (ক্রন্দন)

তারিণী বাবু। সে কি? উমার মার সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মায়া! এখনই দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আস্ত রাখ্‌বে? (ক্রন্দন)

এইরূপ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাঁদাকাটী হইত, দিবারাত্রি অভিমান হইত, তারিণী বাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করিতে চাহে। এতটুকু মেয়ের পেটে এ বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তারিণী বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান্ গোকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্দ্ধমান হইতে আসা যাওয়া করিত, এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্য্যার তীব্র অভিমান ও অশ্রুজল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে পারে, এরূপ বীরপুরুষ সংসারে অল্প! তারিণী বাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আমার ভাল মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে, এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষ কালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে ত সেই পাইবে, মাকে দেওয়াও যা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।

অনেক বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ বর্দ্ধমানে গেলেন। তথায় উকিল মোক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টরি আপিসে হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন। এবং বাড়ীতে পঁহুছিয়াই নববধূর রাঙ্গা চরণে পূজা দিতে আসিলেন। হাস্যগদ্গদ স্বরে তরুণী ভার্য্যাকে সম্ভাষণ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন,—মনে করিলেন, এবার উড়া পাখী পিঞ্জরে পুরিলাম,—এ কুহকমন্ত্র এড়াইবার নহে, দেখিব মন গলে কি না গলে!

অভিমানিনী বধূ স্বামীর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলও না!

তারিণী বাবু। বলি চুপ করে রৈলে যে ?

বধূ। তবে কি করিব ?

তারিণী বাবু। দলীল খানা কি জান ?

বধূ। কেমন করে জানিব ?

তারিণী বাবু। এখানা উইল।

বধূ। শুনিলাম।

তারিণী বাবু। বড় মূল্যবান্ দলীল।

বধূ। তোমার বাক্সে রাখিয়া দাও।

তারিণী বাবু। আমার ভাল মন্দ হইলে আমার বিজয়পুর তালুকখানি তোমারই হইবে।

বধূ। আমার চাই না।

তারিণী বাবু। সে কি ? সে কি ? এত অভিমান কিসের ?

বধূ। অভিমান আবার কি ? যে মানে রেখেছ, ঢের হয়েছে।

তারিণী বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন ! বধূ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন !

তারিণী বাবু দলীল খানি জোর করিয়া বধূহস্তে দিলেন ! বধূ দলীল খান খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রোধে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন !

রাত্রি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণী বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল ! বৃদ্ধ দ্বারদেশে কালীঘাটের কাঙ্গালির মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা মিনতির পর দরজা খুলিল,—

বধূ বলিলেন,—আবার হাড় জ্বালাইতে আসিয়াছ কেন ?

তারিণী বাবু সেই রাঙ্গা চরণ দুইটি আপনার কলপ দেওয়া চুলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—কি অপরাধ করিয়াছি বল ?

বধূ। অপরাধ আবার কি ?

তারিণী বাবু। দলীল খানা ছিঁড়িলে কেন ?

বধূ। কি দলিল ?

তারিণী বাবু। আমার প্রধান তালুক খানি ত তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছিলাম।

বধূ। আর সম্প্রতি যে জমিদারির অংশ কিনিয়াছ, সেটি বুঝি দিদিকে গোপনে দেওয়া হইবে ? তা দিদি তোমার নয়নের তারা, দিদি তোমার মাথার

মণি,—দিদিকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাও! আমি গরিবের মেয়ে, আমি তোমার চক্ষুর শূল হইয়াছি, আমাকে ভিখারীর মত তাড়াইয়া দাও, আমি গরিব মার কাছে চলিয়া যাই। লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া খাইব, তবু তোমার অন্ন আর খাইব না,—এ অপমান, এ লাঞ্ছনা, এ যাতনা আর সহ্য হয় না! (ক্রন্দন)

তারিণী বাবু বিস্মিত হইলেন! তিনি সম্প্রতি একটি জমিদারির অংশ নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা গৃহিণীদের বলেন নাই। সে কথা গোপবালাকে কে বলিল? নববধূ সেটিও চাহেন নাকি? সর্ব্বস্ব নববধূকে উইল করিয়া যাইলে উমার মার দশা কি হইবে? এইরূপ নানা চিন্তা তারিণী বাবুর হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল।

সেয়ানা মেয়ে গোপবালা স্বামীর মনের সন্দেহ বুঝিতে পারিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল,—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পথেব কাঙ্গালী হইব, পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব। আমাতে তোমার বিশ্বাস নাই তখন আমি এ বাড়ীতে থাকিব না, গাছতলায় শুইয়া থাকিব। যাহার উপর বিশ্বাস আছে, সেই দিদির কাছে যাও,—আমাকে ছেড়ে দাও, আর দগ্ধ করিয়া মারিও না। রমণী আছাড় খাইয়া পড়িল,—বুঝি বা হিষ্টিরিয়া হয়,—বড়মানুষী ব্যারামটিও দরকারের সময় গোপবালার আসিত।

সে রাত্রির কথা অধিক বর্ণনায় আমরা অক্ষম। এক দিকে তারিণী বাবুর ভীষণ বিষয়কামনা, অন্য দিকে তরুণী ভার্য্যার ভয়ঙ্কর উপদ্রব,—আজি পথের ভিখারীও তারিণী বাবুর অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ঘন ঘন অশ্রুবাণ, অভিমানবাণ, ক্রন্দনবাণ, হিষ্টিরিয়াবাণ, আবার মিনতিবাণ, ভালবাসার বাণ দ্বারা বৃদ্ধের শরীর জর্জ্জরিত করিলেন। কখন তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন সাধ্যসাধনা, কখন বা মিনতি, কখন বা কত গল্প বলেন। কলিকাতার কত বড় মানুষ সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন, স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী সুন্দররূপে সংসার চালাইতেছেন। নারী কি বিশ্বাসঘাতিনী? নারী কি স্বামীর সংসার, স্বামীর ঘর কখন অবহেলা করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? স্বামীর ঘর ভিন্ন নারীর কি অন্য ঘর এ জগতে আছে?

সমস্ত রাত্রি এইরূপ যুদ্ধ চলিল, প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিল,—তখন বিষয়ী তারিণীবাবু পরাস্ত হইলেন। বলিলেন;—হৃদয়ের ধন! তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব,—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে লিখিয়া দিব, তুমি বড় না আমাব জমিদারি বড়?

সমরবিজয়িনী গোপবালা তখন নয়নের অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া মাটী হইতে উঠাইয়া আপন পার্শ্বে স্থান দিলেন, এবং স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন,—"তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার জীবন! বিষয় কি তুচ্ছ,—তোমার স্নেহ পাইলে সবই পাইলাম।" তরুণীর চক্ষে জল, মনে-মনে হাসি,—তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "মিত্রের ঘরের মেয়ে কেমন এতক্ষণে বুঝিলে? সে কি বুড়ো মিন্‌সের রূপ দেখে বিয়ে করেছিল? যার জন্য বিয়ে করেছিল, সে কায আজ উদ্ধার হইল।"

এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কায সমাধা হইয়া গেল। তারিণী বাবু আজীবন চাকুরী করিয়া ন্যায় ও অন্যায় মতে যে বিষয় করিয়াছিলেন,—পৈতৃক সম্পত্তি নিজে যাহা পাইয়াছিলেন,—বিন্দু ও সুধার বাপের কাছে যাহা ঠকাইয়া লইয়াছিলেন,—গ্রামের লোকের সঙ্গে মকদ্দমা মামলা করিয়া যাহা জিতিয়া লইয়াছিলেন,—বর্দ্ধমানে সময় সময় সরকারি নিলামে যাহা সস্তা পাইয়া কিনিয়াছিলেন, সে সমস্ত অদ্য তরুণী ভার্য্যাকে উইলপত্র দ্বারা লিখিয়া দিলেন! বৃদ্ধা শোকগ্রস্তা, চিরপতিব্রতা উমার মাকে উদ্ধতা যুবতী সতীনের দয়ার উপর ভাসাইলেন,—ঘরের সন্তানের ন্যায় বিন্দুকে চির দারিদ্র্যে রাখিলেন!

উমার মা এ সংবাদ শুনিলেন, বুঝিলেন তিনি সপত্নীর ঘরে আশ্রিতা হইবেন, সপত্নীর অন্নে পালিতা থাকিবেন, সপত্নীর দাসী হইয়া পরিচর্য্যা করিবেন! মুমূর্ষু রোগীর এ মর্ম্মব্যথা অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না,—কয়েক দিনের মধ্যে রোগক্লিষ্টা, শোকবিদগ্ধা নারী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বিন্দু ও সুধা জেঠাইমার শেষ অবস্থায় অনেক সেবা করিলেন, মৃত জেঠাইমার গলা ধরিয়া উমাতারাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন!

তখন নববধূ মল্লিকবাড়ীতে জমকাইয়া বসিলেন। ক্রমে উইল-লিখিত সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই দখল করিতে লাগিলেন। তারিণী বাবুও তাহাতে আপত্তি করিলেন না, নববধূর কোনও কার্য্যে প্রতিবোধ করিতে তাঁহার সাহস হইয়া উঠিত না।

তারিণী বাবু পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, লোকের সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া করেন, গৃহস্থদের গালি দেন, পড়সীদের শাসন করেন,—আর বাড়ীতে আসিয়া ভিজে বেবালের মত আস্তে আস্তে লুকাইয়া থাকেন। সমস্ত বিষয় দিয়াও তরুণীর মন পাইলেন না, তরুণীর অভিমান ও দর্প ভাঙ্গিতে পারিলেন না।

বিষয়কার্য্য এখন গোপবালাই দেখেন,—তাঁহার মন্ত্রী গোকুলচন্দ্র! তারিণী

বাবু দুই বেলা দুই পেট খাইতে পান, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া থাকেন, অথবা উমার মা যে ঘরে মরিয়াছে, সেই ঘরে এক একবার যাইয়া ভাবেন। কেহ কেহ বলিত, উমার মার জন্য এত দিন পর শোক হইয়াছে। কেহ বলিত, দুঃখিনী বিন্দুকে কিছু না দিয়া সমস্ত বিষয় গৃহিণীকে উইল করিয়া দিয়া বৃদ্ধের মনস্তাপ হইয়াছে। কেহ বলিত, তা নয়, তা নয়, বুড়োর ভীমরতি ধরিয়াছে!

তারিণী বাবুর ভীমরতি ধরে নাই,—তিনি এখন সর্ব্বদাই পুরাতন কথা চিন্তা করিতেন,—এবং সেই চিন্তা করিতে করিতে মনে একটা মতলব স্থির করিতেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তালপুখুরের ইতিহাস।

আমরা এতক্ষণ তারিণীবাবুর ইতিহাস লিখিতেছিলাম, কেন না, তারিণী বাবু তালপুখুরের মধ্যে বড়লোক, বড়লোকের কথা কি শীঘ্র শেষ হয়? তথাপি তালপুখুরে সামান্য অবস্থার লোকও বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও দুই একটি কথা লেখা আবশ্যক।

বিন্দু চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু এই দরিদ্র অবস্থাতেই সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত ও ছেলে দুটিকে মানুষ করিত। মেয়ে সুশীলার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর হয়েছে, দেখ্‌তে একটু কাহিল ও শ্যামবর্ণ, কিন্তু মেয়েটি সুশ্রী ও শান্ত, এবং মার মত চক্ষু দুটি কাল, প্রশান্ত ও বড় সুন্দর। ছেলে সুবোধটির বয়স নয় বৎসর হইয়াছে, নিকটস্থ সনাতনবাটী গ্রামের ইংরাজিবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যায়, এবং পিতার ন্যায় শান্ত। বিন্দুর আর সন্তান হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রায় গ্রামেই বাস করেন, জমীর চাস বাস দেখেন, আর বাড়ী বসিয়া দুই একখানা বৈ পড়েন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে লেখাপড়া শিখি, তাহাতে আমাদের নিজের শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা পাই না। হেমচন্দ্রের সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইত।

এ বয়সে তিনি টোলে গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রশিক্ষার একটি সুযোগ ঘটিল। সনাতনবাটীতে সম্প্রতি রমাপ্রসাদ সরস্বতী নামে একজন বহুশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে শাস্ত্র পাঠ করিতে যাইত, হেমচন্দ্রও পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়সে তাঁহার নিকট সংস্কৃতভাষায় কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিলেন, এবং সর্ব্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্রের সহিত রমাপ্রসাদের বড়ই সৌহৃদ্য জন্মিল। রমাপ্রসাদের বয়স ৪৫ বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু বহুবৎসরাবধি কাশীধামে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, এবং পশ্চিমদেশের অনেক তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শরীর এখনও তেজঃপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তিনি মস্তকে জটাধারণ করিতেন, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়াছিলেন, হরিদ্র বসন পরিধান করিতেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে শিক্ষাদান করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার দেবীপ্রসাদ নামে পঞ্চদশ বৎসরের একটি সন্তান ছিল, সে পিতার সহিত পশ্চিমে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে, পিতার ন্যায় তেজঃপূর্ণ ও উদারচেতা। সে এখন সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করে, এবং পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। দেবীপ্রসাদ সুবোধকে বড় ভালবাসিত, সর্ব্বদা আপন গৃহে লইয়া যাইত, এবং তালপুখুরেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুবোধ ও সুশীলার সহিত খেলা করিত।

সুধা বিবাহের পর কয়েক বৎসর শরতের সঙ্গে কলিকাতায়ই বাস করিতেন, কখন কখন গ্রামে আসিতেন। শরচ্চন্দ্র একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন, পরে একটি উপযুক্ত চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, বিলাতে যাইয়া বড় পরীক্ষা দিয়া ভাল চাকরী লইয়া আইসেন, কিন্তু শরতের সেরূপ আয় নাই যে, বিলাতে যাইয়া কয়েক বৎসর থাকেন। শুনিলেন, দেশেও ভাল পরীক্ষা দিতে পারিলে "ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সর্ভিস" প্রবেশ করিয়া উচ্চ কর্ম্ম পাওয়া যায়, সুতরাং সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, উৎসাহী, কৃতবিদ্য লোক পরীক্ষায় ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন না। যে বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই তালপুখুর গ্রামে সুধার একটি পুত্রসন্তান হইল। সুধা এটি সুলক্ষণ মনে করিয়া বড় স্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। খোকার মাসী বড় যত্নে খোকার শুশ্রূষা করিতেন এবং খোকার বাপ সহর্ষে পুত্রমুখ দেখিয়া চাকুরিস্থান পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি দুই বৎসর শরচ্চন্দ্র বিদেশে বিদেশেই রহিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ী আসিতে পারেন নাই। স্বামীকে এত দিন ছাড়িয়া থাকা সুধার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, গোপনে গোপনে কাঁদিতেন; দিদির কাছে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন, আবার পুত্রটিকে চুম্বন করিয়া অশ্রু মুছিতেন। এবার শরৎবাবু কার্য্যস্থানে সুধাকে লইয়া যাইবেন, এক্ষণে দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছেন, আজ তাঁহার তালপুখুরে আসিবার কথা; সেই জন্য সুধা এত প্রফুল্লহৃদয়া হইয়াছেন,—সেই জন্য স্বামীসোহাগিনী সযত্নে বেশভূষা করিতেছেন।

বাদপ্রতিবাদ।

পৃচ্ছার আলোচনা।

বিগত চৈত্রমাসের সাহিত্যে "পৃচ্ছা" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে "অনুসন্ধিৎসু" স্বাক্ষরকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ, বি-এ, এম্-বি, মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আর্য্যকন্যার বিবাহ কোন্ সময়ে অধিক প্রশস্ত, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, না তৎপরে?" আর্য্যশাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি পাওয়া যায়, তৎসমূহ একত্র সংগৃহীত হইলে, বিচার করিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে বিবেচনায়, প্রশ্নকর্ত্তা গতবারে যথাসাধ্য শাস্ত্রমত সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরাও সেই উদ্দেশ্যে তৎসম্পর্কীয় আরও কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অনৃতুকা কন্যার বিবাহের স্বপক্ষে, অনুসন্ধিৎসু গতবারে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তা ছাড়া আরও কয়েকটি প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আবশ্যকবোধে এ স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

ঋগ্বেদান্তর্গত আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্টে গর্ভাধানসংস্কারসম্পাদনার্থ প্রাজাপত্য হোমের বিধানকথনপ্রসঙ্গে,—

"অথর্ত্তুমত্যাঃ প্রাজাপত্যং, ঋতৌ প্রথমে অনুকূলেঽহনি স্নাতায়াস্বারব্ধঃ প্রাজাপত্যস্য স্থালীপাকস্য হুত্বা"—ইত্যাদি।

অনুবাদ,—"ঋতুমতী স্ত্রীর প্রাজাপত্যহোমের বিধান এই,—প্রথম ঋতুকালে, অনুকূল দিবসে স্নাতা পত্নীর সহিত ভর্ত্তা প্রাজাপত্য চরুহোম করিয়া"—ইত্যাদি।

গর্ভাধানং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ঋতৌ প্রথম এবহি।—লঘু আশ্বলায়ন।

ঋতৌ তু প্রথমে কুর্য্যাৎ গর্ভাধানং দ্বিজোত্তম।—চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতি।

এখানে স্ত্রীর প্রথম ঋতুকালে পতিসহ প্রাজাপত্যহোমের ও গর্ভাধানের বিধান ব্যবস্থিত হওয়ায়, অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইতেছে। গোভিলগৃহ্যসূত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—

"যদর্ত্তুমতী ভবত্যুপবতশোণিতা তদা সম্ভবকালঃ।"

চন্দ্রমোহন বাবু এই বচনকে যৌবনবিবাহের সমর্থক মনে করেন। বস্তুতঃ উহা বাল্যবিবাহের স্বপক্ষেই সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কারণ, গোভিল ইহার দুই তিন সূত্র পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, শিষ্য গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক—

"—দারান্ কুর্ব্বীত।" ৩।৪।৩ "অসগোত্রান্।" ৩।৪।৪

"মাতৃরসপিণ্ডান্।" ৩।৪।৫ "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা।" ৩।৪।৬

এখানে স্পষ্টতঃই অনৃতুমতী কন্যার বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু চন্দ্রমোহন বাবু এখানে "অনগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পাঠ বিশুদ্ধ নহে। ডাঃ ভাণ্ডারকর প্রভৃতি যাবতীয় কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ "নগ্নিকা" (১) পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকাতেও "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণও "নগ্নিকা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—

(১) বাবন্ন লজ্জাশালিনী কন্যা পুরুষসন্নিধৌ।

"যস্তা কন্যায়া ঋতুর্নাভবৎ অনৃতুকা, অথবা যাবৎ কুচহীনা নগ্না উলঙ্গাপি বিচরিতুং শক্নুয়াৎ সা নগ্নিকা "তু" এব "শ্রেষ্ঠা" প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ইতিশেষঃ। প্রাপ্তায়াং অপ্রাপ্তযৌবনায়াং প্রাপ্তযৌবনা ন উদ্বাহেৎ ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ, "যে উলঙ্গভাবে বিচরণ করিতেও লজ্জা বোধ করে না, এরূপ অপয়োধরা ও অপ্রাপ্তযৌবনা অথবা অনৃতুকা কন্যা 'নগ্নিকা' পদবাচ্যা। এরূপ কন্যা বিবাহ করাই প্রশস্ত। এরূপ কন্যা পাওয়া গেলে প্রাপ্তযৌবনাকে বিবাহ করিবে না।" আমরা উক্ত বচনগুলি মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা নানা পত্রিকায় ও পুস্তকে বাল্যবিবাহের স্বপক্ষ ও বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত দেখিয়াছি; সর্ব্বত্র "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এই পাঠই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। চন্দ্র বাবু "অনগ্নিকা" পাঠ কোথায় পাইলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন কি? যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশি সূত্রে—

"অনুজ্ঞাতো ভার্য্যামুপযচ্ছেৎ সজাতানগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণীং।"

এখানে "সজাতাং নগ্নিকাং" এই ব্যাসবাক্য হইবে, অথবা "সজাতাং অনগ্নিকাং" এইরূপ হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। বৃত্তিকার মাতৃদত্ত "অনগ্নিকাং" পদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু "অনগ্নিকা" অর্থে "আসন্নর্ত্তুরা" করিয়াছেন।

যোন্তাদিনাবগুহেত তাবৎ ভবতি নগ্নিকা॥—বিষ্ণিওথিকা ইণ্ডিকা।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, (পূর্ব্বে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও) সূত্র ও সূত্রপরিশিষ্টের বচনাকালে অনৃতুকাবিবাহ আর্য্যসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইতেছিল। গৌতম বলেন,—

"প্রদানং প্রাক্পিতোরপ্রযচ্ছন্ দোষী (পিতা)। প্রাঙ্নাসঃ প্রতিপত্তরিত্যেকে।

"দদ্যাৎ গুণবতে কন্যাং নগ্নিকামেব শক্তিতঃ।"—যমঃ।

"অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং না শৌচং কদাচিদপি শাম্যতি।"—শঙ্খঃ।

এখানে যে অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, নির্ণয়সিন্ধুকারের মতে সেটি অর্থবাদমাত্র।

"গৌরীং দদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।
কন্যাং দদৎ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাং।"—মরীচিঃ।

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।"

ইত্যাদি বচনে "অপি" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, অনৃতুকার বিবাহই মনুর মতে সমধিক প্রশস্ত বোধ হইতেছে। কিন্তু আবার,—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যর্ত্তুমতী সতী।"

ইত্যাদি বচনও মনুতেই দৃষ্ট হয়। বসিষ্ঠ বলেন,—

"সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। কুমারী ঋতুমতী ত্রীণি বর্ষাণ্যুপাসীত। উর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত তুল্যম্।

প্রযচ্ছন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥"

এই বিরোধের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, "অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ", এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় উক্তি কি সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য? আধুনিক সমাজ ইহার উত্তরে কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন,—

এতদুক্তলক্ষণবরসম্ভবে বেদিতব্যম্। সতি গুণবদ্বরে তদ্দাতব্যম্।"

অর্থাৎ, গুণবান্ বরপ্রাপ্তি সত্ত্বেও যদি পিতা (অধিক ঔচ্চ লোভে) কন্যা দান না করেন, তবে তিনি দোষী হইবেন। কিন্তু যদি পিতা চেষ্টা করিয়াও ঋতুকালের পূর্ব্বে উপযুক্ত বর যোগাড় করিয়া উঠিতে না পারেন, তবে তিনি ভ্রূণহত্যার ভাগী হইবেন না, এবং কন্যাও তিন বৎসর কাল পিতার অপেক্ষা করিয়া, পরে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে। এ কথাটা আমাদের দেশে সকলে বুঝেন না। কন্যা ঋতুমতী হইলেই পিতা দোষভাগী হইবেন বিবেচনায়, অনেকেই তাড়াতাড়ি করিয়া অপাত্রে কন্যা প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার সামাজিক অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মানবহিতচিকীর্ষু ঋষিগণের এরূপ অভিপ্রায় নহে। তাঁহারা বলেন,—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুতুমতীং যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
স তুল্যং ভ্রূণহত্যায়ৈ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্॥
ন যাচতে চেদ্দেবং স্যাৎ যাচতে চেৎ পৃথক্ পৃথক্।
একৈকস্মিন্নৃতৌ দোষং পাতকং মনুরব্রবীৎ॥
ত্রীণিবর্ষাণ্যুতুমতী কাংক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥
অবিদ্যমানে সদৃশে গুণহীনমপি শ্রয়েৎ (২)॥"—বৌধায়নঃ।

"যাবচ্চ কন্যাং ঋতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥"—বশিষ্ঠঃ।

সুতরাং, পিতার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত বর না পাওয়া যায়, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও, তিন বৎসর পর্য্যন্ত অথবা তিন বৎসরের মধ্যে যতদিন বর না পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত, পিতা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে যখনই উপযুক্ত পাত্র পাইবেন, তখনই যদি কন্যা সম্প্রদান না করেন, তবে সেইদিন হইতে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন, সন্দেহ নাই। এতাবতা, শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে একবাক্যতা করিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, শাস্ত্রে যেখানে যেখানে "মাসি মাসি বলস্তস্য পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং" ইত্যাদি অর্থবোধক বচনাবলী দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই এই অর্থে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, কন্যার সকামত্ব ও উপযুক্ত বরের সদ্ভাব সত্ত্বেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ দিতে বিলম্ব করেন, তবে তিনি দোষভাগী হইবেন। অত্রিকাশ্যপোক্ত "পিতুর্গেহেচ যা কন্যা" ইত্যাদি (সাহিত্য, চৈত্র, ৯৪০ ও ৯৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন) বচন ও পরাশরের "মাতা চৈব পিতা চৈব" ইত্যাদি বচনও এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। অন্ততঃ, মেধাতিথি, কল্লুক, মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি মীমাংসকগণ এইরূপ মনে করেন।

এইরূপ একবাক্যতা দ্বারা শাস্ত্রসমূহের পরস্পর বিরোধ ও ব্যাঘাত দোষ নিরাকৃত হয়। ফল কথা, শাস্ত্রের এই সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম নগ্নিকাবিবাহের প্রশস্ততাপ্রমাণে যথেষ্ট কি না, সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

এখন কন্যার বিবাহকরণাধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রমত অনুসন্ধেয়। কেন না, বশিষ্ঠ, মনু ও বৌধায়ন, কন্যাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া, পরে স্বয়ং বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম বলেন,—

"ত্রীনৃতূন্ কুমার্য্যতীত্য স্বয়ং যুঞ্জ্যেত।"

(২) এইরূপ স্বয়ংবিবাহিতা কন্যার যিনি পাণিগ্রহণ করেন, মনুর মতে তাঁহারও কোনও পাপ হয় না, কন্যারও কোনও পাপ হয় না (মনু ৯।৯১)।

"ঋতুত্রয়মুপাস্তৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরং।"—বিষ্ণুসংহিতা।

এই বিরোধমীমাংসার জন্য, পূর্ব্বোক্ত বসিষ্ঠ, বৌধায়ন ও বিজ্ঞানেশ্বরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কন্যা বর কর্ত্তৃক যাচ্যমানা হইয়াও যদি যথাকালে সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তিন ঋতু অপেক্ষা করিয়া সে স্বয়ংবরা হইতে পারিবে। কিন্তু যাচ্যমান বরের অসদ্ভাবে, পিতার উপযুক্ত বরানুসন্ধানের প্রতীক্ষায় তিন বৎসর থাকিবে—পরে (চতুর্থ বর্ষে) যেচ্ছামত (সদৃশই হউক, অথবা হীনই হউক) বরে আত্মসমর্পণ করিবে। এই হইল শাস্ত্রানুসারে বিবাহকালের শেষ সীমা। এই সময়ের মধ্যে বিবাহ করিলে কোনও দোষ নাই। (১ চিহ্নিত পাদ টীকা দেখুন) কিন্তু যে কন্যা এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া ঋতুপ্রাপ্তির পর চতুর্থ বর্ষেও স্বয়ংবরা না হইবে, সে "বৃষলী" নামে অভিহিতা হইবে; এবং—

"যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসদ্ভাব্যোহপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥"

যে বিপ্র তাহার পাণিগ্রহণ করিবে, সে পতিত হইবে। ফলকথা, এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমার পূর্ব্বে বৃষলীত্বসিদ্ধি হয় না। এতৎপূর্ব্বে বৃষলীত্ব স্বীকার করিলে মনুর সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

এই নিমিত্ত মীমাংসকগণ সমস্ত স্মৃতির অর্থ মনুর অনুকূল করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত কালের পূর্ব্বে বৃষলীত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঋতুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার স্বয়ংবরা হইবার অধিকার ত নাইই। ঋতুপ্রাপ্তির পরেও পিতার উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধানের প্রতীক্ষায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় থাকা অধিকাংশ স্মৃতিকারের অভিপ্রেত। শাস্ত্রকারগণ বরানুসন্ধানের জন্য পিতাকে ঋতুর পরও তিন বৎসর সময় দিয়াছেন, এবং ঋতুর চতুর্থ বর্ষে কন্যাকে বিবাহবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ ব্যবস্থায় কাহারও পক্ষেই মনুর মতে দোষাবহ বা প্রাতিত্যজনক নহে। বৌধায়নাদি কেহই ইহার দোষোল্লেখ করেন নাই।

সুতরাং ঋতুর পর বৎসরত্রয়ের মধ্যে বৃষলীত্ব সম্ভবে না। কাজেই বৃষলীসম্বন্ধীয় বচনগুলি অবস্থাবিশেষে ঋতুপ্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরের পর প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেখানে যাচ্যমান বরের অসদ্ভাবাদি কারণে শাস্ত্রানুসারে কন্যা ঋতুপ্রাপ্তির পর তিন বৎসর অবিবাহিতা থাকা দূষণীয় নহে, সেখানে ঋতুর চতুর্থ বৎসরে বা তাহার পর "বৃষলী" রূপে পরিগণিতা হইবে। আর যেখানে গুণবান্ বরের সদ্ভাবসত্ত্বেও যথাকালে কন্যা প্রদত্তা না হয়, সেখানে শাস্ত্রানুসারে তিন মাস অপেক্ষা করিয়া কন্যা যদি স্বয়ংবরা না হয়, তবে চতুর্থ মাস হইতে "বৃষলী" রূপে গণ্যা হইবে (৩)। এই সিদ্ধান্ত যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, সেইরূপ সকল স্মৃতির সহিত অবিরোধী।

আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বিবাহকালের শেষ সীমা কি, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন উহার প্রারম্ভ কোথায়, তাহা দেখিব। মহর্ষি সম্বর্ত্ত বলেন,—

"বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।"

অর্থাৎ, আট বৎসরের কন্যারও বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু কন্যার অর্থাৎ দশমবর্ষাবধি রজো-

(৩) নতুবা পিতার দোষে অথবা যাচ্যমান বরের অসদ্ভাবে ঋতুকালের পূর্ব্বে বিবাহ না হইলে, পরাধীনা কন্যা (কেন না, শাস্ত্রানুসারে তখনও তাহার বিবাহ করিবার স্বাধীনতা নাই-) "বৃষলী" রূপে পরিত্যক্তা হইবে কেন? তবে শাস্ত্রানুসারে কন্যা যখন বিবাহবিষয়ে স্বাধীনা, তখন যদি সে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিবাহ না করে, তবে অবশ্যই সে দোষভাগিনী, অর্থাৎ বৃষলী হইতে পারে।

দর্শনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত। (অষ্টমবর্ষীয়াঃ বিবাহঃ (শক্যঃ) তু কন্যায়াঃ (বিবাহঃ) প্রশস্যতে। এইরূপ অন্বয় হইবে)।

মহর্ষি সম্বর্ত্ত ইহার এক শ্লোক পূর্ব্বে—

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।"

(দশমবর্ষে কন্যকাবস্থাপ্রাপ্তি ও কন্যকাবস্থার পর রজস্বলা। অর্থাৎ, দশম বর্ষের পর ও রজোদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাপন্না বালিকা কন্যা নামে অভিহিতা)।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা কন্যা শব্দের পারিভাষিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন ও মরীচি, আশ্বলায়ন প্রভৃতি তাহার সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, আমরা সম্বর্ত্ত-বচনের উক্তবিধ অন্বয় করিয়াছি। দশ বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্যকন্যার বিবাহ প্রশস্ত নহে, এবং কালধর্ম্মবক্তা পরাশরের মতে, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনুঢ়া কন্যার বিবাহ অপ্রশস্ত নহে।

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।"

ইত্যাদি বচনটি কোন্ স্মৃতি হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু, নির্ণয়সিন্ধুতেও এই বচনটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, এবং সেখানে গ্রন্থকার ইহাকে স্পষ্টতঃ মহাভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্মৃতিগ্রন্থের অনেক শ্লোক মহাভারতে ও মহাভারতের কোনও কোনও শ্লোক স্মৃতিগ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, উক্ত বচনটি নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে কি না, (বিশেষতঃ সম্বর্ত্তসংহিতার সহিত যখন উহার ঐক্য আছে; তখন) তাহাও সুধীগণের বিচার্য্য।

মহাভারত হইতে রঘুনন্দন যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, ও তৎসম্বন্ধে চন্দ্রমোহন বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, মহারাষ্ট্র দেশেও উক্ত বচনের—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। সুতরাং, "নগ্নিকা" পাঠের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? "অনগ্নিকা" পাঠ গ্রহণ করিলে,—

"মহদ্দোষঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈষ বিধিঃ স্মৃতাং।"

মহাভারতের এই উক্তিটি প্রায় সমস্ত স্মৃতি এবং আশ্বলায়ন ও গোভিল প্রভৃতি সূত্রকারগণের অভিপ্রায়ের বিরোধী হইয়া পড়ে।

লেখক ৯৪৪ পৃষ্ঠায় গোভিলীয় গৃহ্যপরিশিষ্টের "তাং প্রযচ্ছেদনগ্নিকাং" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিয়াছেন,—'সেই অনগ্নিকাই প্রদান করিবে।' লেখক "অনগ্নিকাকেই" কোথায় পাইলেন? টীকাকার (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়) বলেন,—

"তাং কন্যামনগ্নিকামৃতুমতীমপি দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ, সেই ঋতুমতী অনগ্নিকাকেও প্রদান করিবে। অনুসন্ধিৎসু যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে অনগ্নিকা বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ মূলে সেরূপ কোনও ভাব নাই। কিন্তু এখানে আরও একটু বক্তব্য আছে। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকায় প্রকাশিত গোভিলসূত্রের ভাষ্যে, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার "তাং প্রযচ্ছেত্তু নগ্নিকাং" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদনুসারে নগ্নিকার বিবাহই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। এই পাঠ স্বীকার করিলে গোভিলের সহিত গোভিলপুত্রের আর কোনও বিরোধই থাকে না।

তার পর লেখক—

অভুক্তাং চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকাং প্রশস্যতে।

এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ পাঠ আমরা কোথাও দেখি নাই। গোভিল বলেন,—

"নক্ষিকা তু শ্রেষ্ঠা"। সুতরাং চন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত "কন্যকায় প্রশস্যতে" এই পাঠ গোভিলের বিরোধী হইতেছে। প্রচলিত পাঠ এই,—"কন্যকাং তু প্রশস্যতে।" বিরিণ্ডিধিকা ইণ্ডিকাতেও এই পাঠ আছে। এই পাঠ গোভিলোক্তির সহিত অবিরোধী। সুতরাং বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি দেখি না। চন্দ্রমোহন বাবু এই সব স্বমতপরিপোষক নূতন পাঠ কোথায় পাইলেন, আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

গ্রহণ।

গত মাসের সাহিত্যে "গ্রহণ" সম্বন্ধে যে বাদপ্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অপূর্ব্ব বাবুর 'উত্তর' সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।

১। তিনি প্রথমেই কয়েকটি যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভবপর হয় না," কিন্তু দুঃখের কথা, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহা প্রমাণিত হয় না। এই কয়টি কারণে গ্রহণসীমা সঙ্কীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, শুধু ইহার দ্বারা কিরূপে প্রমাণ হইল, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব নয়, তাহা বুঝিলাম না। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে, গ্রহণসীমার সঙ্কীর্ণতা গণনা করিলে, সূর্য্যচন্দ্র পৃথিবীর আমরা যে কোনও combination লই না কেন, তাহাতেই দুইটির অতিরিক্ত চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবার কালে গ্রহণসীমা অতিক্রান্ত হয়। মনে করুন, আমি যে অবস্থাটি লইয়াছিলাম, সূর্য্য প্রথম কক্ষপাতে আসিবার দুই দিবস পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল, ইহাতে তাঁহার দেখান উচিত ছিল যে, প্রথম কক্ষপাত সূর্য্য পুনর্ব্বার অতিক্রম করিবার সময় যে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, সেটি ঘটা সম্ভব নয়। ইহা দেখান হইয়াছে যে, সূর্য্যের প্রথম কক্ষপাত দ্বিতীয়বার অতিক্রমণের ৬ দিবস পরে এই চন্দ্রগ্রহণটি হইবে। এখন দেখা যাউক, এই ৬ দিন পরে সূর্য্য এবং চন্দ্রের কক্ষপাত হইতে দূরতা কত। সূর্য্যের কক্ষপাত হইতে অপসরণ প্রতি দিনে ১°২′১৯″, অতএব ছয় দিনে কক্ষপাত হইতে তাহার দূরত্ব ৬°১৩′৫৪″। চন্দ্র ও সূর্য্য oppositionএ আছে, অতএব ক্রান্তিবৃত্ত দিয়া মাপিলে চন্দ্রেরও তন্নিকটস্থ কক্ষপাত হইতে দূরত্ব ৬°১৩′৫৪″, এবং ধ্রুবাক্ষের সহিত চন্দ্রকক্ষের বক্রতা ৫°৯′ মনে রাখিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, চন্দ্রের নিকটস্থ পাত হইতে প্রকৃত দূরতা প্রায় ৬°১৬′। এখন অপূর্ব্ব বাবুর নিজের মতে, যে সীমার মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, ইহা সেই সীমার মধ্যে পড়িয়াছে, সুতরাং এই অবস্থায় চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চিত। অপর দুইবারে (প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষপাতে সূর্য্য আসিলে) যে দুইটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, অপূর্ব্ব বাবু স্বয়ং তাহা দেখাইয়াছেন। অতএব যদি চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর এরূপ combination কখনও হয়, তাহা হইলে সেবার এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনের মধ্যেই তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে। এখন কথা এই যে, তিনটিকে একই অব্দের মধ্যে পুরিতে হইলে প্রথমটির জানুয়ারির প্রথমেই হওয়া চাই, এবং তাহা হইলে শেষেরটি ডিসেম্বরের শেষভাগে হইবে। এইখানেই গোলযোগ, এরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না, কিন্তু মোটেই যে হইতে পারে না, এমন কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। সত্য, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে আমার 'প্রতিজ্ঞা'র বড় ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, এরূপ ঘটাটা একেবারে অসম্ভব নয়, অন্ততঃ সূর্য্যচন্দ্রের গতি এবং ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিলে বলা যায় না, এরূপ ঘটা একেবারে অসম্ভব। যদি ইহার প্রতিপোষক একটি দৃষ্টান্তও না থাকিত, তাহা হইলেও ইহা সত্য হইত যে, বৎসরে ৩টি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভব, কিন্তু অপূর্ব্ব বাবু স্বয়ং

একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটে না, ইহা একটা general rule হইতে পারে, কিন্তু gravityর মত ইহা একটা natural law নহে। পরিশেষে একটা কথা বলা উচিত, Godfrey এবং P. T. Mainএর Astronomy দুখানিতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভব," এবং অবশিষ্ট যে গ্রন্থগুলি আমি দেখিয়াছি, তাহাতে এমন কথা পাই নাই যে, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা অসম্ভব।

২। অপূর্ব্ব বাবু বলেন, "যে ঘটনা সচরাচর ঘটে, তাহার বর্ণনাতে কবির অনুভব করা আমাদের ন্যায় একান্ত গদ্যপরায়ণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।" এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে চাহি না, ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, চন্দ্র প্রায় প্রত্যহই উঠে, পূর্ণিমাও সচরাচর ঘটে, নীল আকাশ চিরকালই মাথার উপর বিরাজ করিতেছে, গিরিতলে সন্ধ্যানিলবিধূত, ক্ষুদ্র নদীটির মর্ম্মরধ্বনিরও বড় একটা অসদ্ভাব নাই, অথচ এ সকলই চিরকাল সমানভাবে কবি-বাক্যে রাজত্ব করিয়াছে, এবং বহুকাল হইতে মনুর সন্তানদিগকে (অস্বীকৃত হইলেও) বিশুদ্ধ আনন্দ দিয়াছে। আষাঢের ঘনবর্ষা এবং মেঘের মন্দ্রস্নিগ্ধ গুলিত যহ শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভাব-প্রবাহ তুলিয়াছিল, আজিও প্রত্যেক নরনারী এবং বালকবালিকার হৃদয়ে তাহা অপেক্ষা কম অব্যক্ত আনন্দপূর্ণ ভাবরাশির উদ্রেক করে না।

৩। সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসাবস্থা আমি বলিয়াছিলাম, ৪ কালস্থায়ী হয়। অপূর্ব্ব বাবু একটি উদাহরণ দিয়াছেন, পূর্ণগ্রাসাবস্থা ৪৷৷০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ছিল। হইতে পারে, আমি ততটা নির্ভুল হইতে পারি নাই। কিন্তু ইহা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, এ সব গণনায় একে-বারে নির্ভুল হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, সূর্য্যের লম্বন (parallax) প্রভৃতির পরিমাণসম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া অসম্ভব।

৪। ইহার পরে অপূর্ব্ব বাবু একটা গোলযোগ করিয়াছেন। "চন্দ্রগ্রহণ প্রায় ১০ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছে," এখানে তিনি পূর্ণগ্রাস অথবা আংশিক গ্রাস, ইহাদের কোন্‌টির কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাহার পরেই বলিতেছেন, "এক গ্রীষ্মকালীয় রজনীতে একপ একটি গ্রহণ ঘটিলে সমস্ত রজনী অন্ধকারে কাটাইতে হইবে," ইহা হইতে মনে হয়, তিনি পূর্ণগ্রাসের কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা নয়, কারণ আংশিক গ্রাস ১০ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইলেও পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল প্রায় ২ ঘণ্টা মাত্র। পৃথিবীর ছায়াসূচির সহিত চন্দ্র-কক্ষের যেখানে সম্পাত হইয়াছে, সেখানে এই বৃত্তসূচির একটা section লইলে তাহার ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় তিনগুণ হইবে, এবং চন্দ্র তাহার ব্যাসপরিমিত স্থান প্রায় এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে, সুতরাং চন্দ্রের এই ছায়া অতিক্রম করিতে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগিবে *। এইরূপ মোটামুটি গণনা হইতেও জানা যায়, চন্দ্রের পূর্ণগ্রাসাবস্থা প্রায় ২ ঘণ্টা মাত্র। অতএব অপূর্ব্ব বাবুর অনুমানটি ঠিক নয়।

৫। "মুরলী বাবুর টীকাটি একান্ত ভ্রমাত্মক হইয়াছে।" আমি ইহা স্বীকার করি, এবং অপূর্ব্ব বাবুর নিকট সে জন্য কৃতজ্ঞ রহিয়াছি, কারণ তিনি না দেখাইয়া দিলে হয় ত ভুলটি সহজে ধরা পড়িত না। যদিও অপ্রাসঙ্গিক, তবুও কেন এ ভুলটি হইয়াছিল—বলিব, পাঠক ক্ষমা করিবেন। এই footnoteটি আমি Lardner কৃত Handbook of Astronomy নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলাম, তাহাতেই ঐ ভুলটি ছিল (বোধ হয় misprint), এবং নিজে পুনর্ব্বার গণনা না করিয়াই তুলিয়া দিয়াছিলাম, কাজেই ভুলটিও অজ্ঞাতে আমাতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, ভুলটি আমার প্রসঙ্গের মোটেই অন্তরায় হয় নাই। আমি বলিয়া-

* Vide Encyclopœdia Britannica, Vol. IV art. astronomy, pp. 7 and 10.

ছিলাম, "সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস অতি অল্পপরিমিত স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে," ইহাই আমার বিষয় ছিল। এখন এই স্থানটির ব্যাস (অপূর্ব্ব বাবুর গণনানুসারে) যদি ১৬৭ মাইলই ধরা যায়, তাহা হইলেও ইহার ক্ষেত্রপরিমাণ অতি ক্ষুদ্র হইবে, বাঙ্গালার * তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ বেশী হইবে মাত্র। ইহা হইতেই দেখা যাইবে, সমগ্র পৃথিবীর সহিত তুলনায় অথবা পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের সহিত তুলনায় (কারণ অর্দ্ধাংশ হইতেই সূর্য্য একেবারে দেখা যায়), যে স্থান হইতে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখা যায়, সে স্থানটি বড়ই ক্ষুদ্র। আরও বলা উচিত যে, এটা উর্দ্ধ সীমা।

৬। তাহার পরে তিনি যে উপছায়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কারণ আমার বিষয় ছিল, পূর্ণগ্রাসের কথা, সূর্য্যের আংশিক অথবা অঙ্গুরীয়াকার (annular) গ্রাসের আমি উল্লেখই করি নাই, এবং করিবার আবশ্যকও দেখি নাই।

৭। ইহার পরে অপূর্ব্ব বাবু এক ভুলে পড়িয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "এই সকল গণনাতে মধ্যাহ্নকালকে গ্রহণসময় বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নয়। এই সব গণনায় ধরা হইয়াছিল যে, গ্রহণকালে চন্দ্র পাতে অবস্থান করিতেছে, এবং সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী এক রেখায় আছে। ১৬৭ মাইল ব্যাসের বৃত্তটির সর্ব্বত্রই যে মধ্যাহ্ন কাল, অর্থাৎ সমুদায় বৃত্তটির ক্ষেত্র যে এক Meridianএ অবস্থিত, ইহা বোধ হয় অপূর্ব্ব বাবু স্বীকার করিবেন না।

৮। তৎপরে ধরাপৃষ্ঠ কর্ত্তৃক ছায়া-মণ্ডলের তির্য্যকছেদনের কথা। আমি যখন লিখিয়াছিলাম, কথাটা তখন আমার মনে ছিল, তবে ইহাতে ক্ষেত্রপরিসরের বৃদ্ধি হইলেও এত বৃদ্ধি হইবে না যে, আমার প্রসঙ্গের কিছু বাধা হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াই কথাটার উল্লেখ করি নাই।

৯। "সমসূত্রস্থের" কথা। অপূর্ব্ব বাবু যাহাই বুঝুন, আমরা কিন্তু তিনটি গোলক অথবা ball এক রেখায় অবস্থিত বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝি যে, তাহাদের কেন্দ্র তিনটি এক রেখায় আছে। কথাটার ইহাই সাধারণ অর্থ, এবং বোধ হয়, সেই জন্যই আমিও প্রথমে উহাই বুঝিয়াছিলাম। তবে এক্ষণে অপূর্ব্ব বাবু যখন ভিন্নরূপ বুঝাইতেছেন, তখন ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই।

উপসংহারে অপূর্ব্ব বাবুর নিকট নিবেদন, তিনি আমার প্রতি যেরূপ সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়, এবং সে জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। আমার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আমি মনে করি যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সাধারণের জন্য লিখিত হইলেও নির্ভুল হওয়া উচিত, এবং সচরাচর popular articleএর যে একটা দুর্নাম আছে, তাহার সংশোধন হওয়া উচিত। অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোক যে সাধারণের শিক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, এবং ভরসা করি, তিনি তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধাবলী দ্বারা উত্তরোত্তর আমাদের জ্ঞানোন্নতি এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী।

---

* The total area for Bengal Proper (including the Presidency, Burdwan Rajshahi, Dacca and Chittagong divisions only) is given by Hunter in the Imperial Gazetter as 70430 sq. miles; and the area in question is about 25000 sq. miles.

প্রত্যুত্তর।

মুরলী বাবুর প্রতিবাদের বিশেষ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইতেছে না; কেবল ইহা বলা যায় যে, General rule কখনও Natural law না হইতে পারে, কিন্তু তাহা Natural lawএর first approximation মাত্র। Godfrey এবং Mainকে আদর্শ করিয়া আমি কোনও কথা বলিতে সাহস পাই না, এবং সাধারণের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হইলে যে সকল General rule প্রাকৃতিক বিধানের first approximation মাত্র, তাহাই আমি অগ্রে বুঝাইবার চেষ্টা করি। সেই জন্যই আমি ৩৬৫·২৪২২১৬ দিবসে বৎসর না বলিয়া প্রথমে ৩৬৫ ও তৎপর ৩৬৫¼ দিবসে বৎসর গণনা করিয়া থাকি; এবং সেই একই কারণে গ্রহদিগের কক্ষকে ক্ষেত্রজ্যামিতির একটি সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ক্ষেত্র না বলিয়া, "বৃত্তাভাসাকার" (Elliptical) বলিয়া থাকি। এই সকল উক্তি মাধ্যাকর্ষণের বিধানবহির্ভূত এবং ভ্রমাত্মক হইলেও, প্রাকৃতিক বিধানের "সংক্ষেপ"। সাধারণ নিয়মে বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ দেখা সম্ভবপর নহে, ইহার প্রমাণ মুরলী বাবুর পক্ষে সহজবোধ্য হইলেও, সাধারণের পক্ষে তাহা হইবে না বোধে, আমি এ স্থলে তাহা দর্শাইতে অক্ষম। মুরলী বাবু ইচ্ছা করিলে ইহার বিচার জন্য Watson's Theoretical Astronomy পাঠ করিতে পারেন।

আরও একটি কথা,—সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্বকাল অক্ষাংশানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, লণ্ডনের অক্ষাংশে (Latitude) ৪ মিনিট, কলিকাতার অক্ষাংশে ৭ মিনিট, এবং নিরক্ষ বৃত্তোপরি ৮।০ মিনিট পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে; এই উক্তি সম্পূর্ণ "নির্ভুল" না হইলেও মুরলী বাবুর উক্তি হইতে অধিকতর নির্ভুল বলা যায়। অপর সকল কথার উত্তর এক্ষণে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পাঁচ ফুলের সাজি।

দৃগ্‌ভ্রম।—মেঘহীন সন্ধ্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে, তারকাখচিত নীল আকাশমণ্ডল আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। বোধ হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, আকাশমণ্ডলের প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মে, আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভূত আকাশভাগ গোলার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, আকাশগোলকের অস্তিত্বই যে আমাদের কল্পনাসম্ভূত, সে সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি এই একই গোলকের তলদেশে (surface) অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, তাহাদের পৃথিবী হইতে দূরত্ব অতিশয় বিভিন্ন। কোনওটা অপরটা হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থান করিতেছে। তার পর, দৃষ্টিমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী আকাশভাগ যে বেশী দূরে বলিয়া মনে হয়, সেও আমাদের একটা দৃগ্‌ভ্রম মাত্র। খুব সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই;—Horizonএর নিকটবর্ত্তী গ্রহতারাদি দেখিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের অনেকটা বেশী অংশ ভেদ করিয়া দেখিতে হয়, তাহাতে বায়ু Horizon স্থিত পিণ্ডসমূহের

কিরণমালা শীর্ষস্থ গ্রহতারাদির অপেক্ষা অধিকপরিমাণে আত্মসাৎ (absorb) করে, এবং সেই জন্য তাহারা কতকটা অস্পষ্ট ভাব পায়, আমাদের পরিচিত এবং সহজগম্য জিনিসের মধ্যে—আমরা জানি—দূরতাই অস্পষ্টতার কারণ, সেই জন্য আকাশের প্রান্তভাগকে আমরা সুদূরতর বলিয়া মনে করি।

***

আরও একটি বিস্ময়কর দৃগ্‌ভ্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিশাকালে খণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, দুইটি নিকটস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব, যতই তাহারা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই কমিয়া যায় বলিয়া ভ্রম হয়। আবার সদ্য-উদিত পূর্ণচন্দ্রকে কত বড় দেখি, এবং তাহাই আবার ঊর্দ্ধে উঠিলে কত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি। এ দুইটি একই ভ্রমের দুইটি উদাহরণ মাত্র। আমরা মনে করি, চন্দ্র যেন আমাদের বেষ্টনকারী খগোলে আবদ্ধ আছে, কখনও তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। এই জন্যই চন্দ্র যখন দৃঙ্‌মণ্ডলের নিকটে থাকে, তখন খগোলকের—আমাদের অনুমানে—দূরতর অংশেই থাকে, এবং ক্রমশঃ যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়। চন্দ্রের ব্যাসের দুই প্রান্তবিন্দু এবং আমাদের চক্ষু দিয়া যদি দুইটি সরল রেখা টানা যায়, তাহাদের মধ্যগত কোণকে চন্দ্রের "দৃশ্যমান ব্যাস" (apparent diameter) বলা যাইতে পারে। এখন যদি আমরা মনে রাখি যে, চন্দ্রের প্রকৃত আয়তনের কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই, তাহা হইলে আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি যে, চন্দ্র যতই নিকটে আসিবে, ততই এই কোণটিও বড় হইবে। কিন্তু আশা করিলে কি হয়, এই কোণ প্রায়ই অপরিবর্ত্তিতই থাকে, সুতরাং পূর্ণচন্দ্র যখন আকাশের প্রান্তে থাকে, তখন তাহার আয়তন ঊর্দ্ধে স্থিতিকালের অপেক্ষা অনেক বড় থাকে—এ অনুমানের হাত হইতে আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। একটা বড় জিনিস দূরে থাকিয়া আমাদের চক্ষুতে যে কোণ করে, একটা ছোট জিনিস নিকটে থাকিলেও সেই একই কোণ করিতে পারে। * তারকাদ্বয়ের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিও এই একই কারণে ঘটে।

***

আরও দুই একটি ভ্রমের কথা বলিব। বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শানের কতকগুলি সুন্দর ফল দেখা যায়। একটি এই—উদয়াস্তকালে চন্দ্রসূর্য্যকে অনেক সময়ে ডিম্বাকার (oval) দেখায়, যেন উপরে নীচে একটু চাপিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

যখন নক্ষত্রাদির কিরণসমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়ে, তাহারা রিফ্র্যাক্‌শানের নিয়মানুসারে ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে বাঁকিয়া আসে, এবং এই জন্য নক্ষত্রাদি প্রকৃত উচ্চতা অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে স্থিত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের উচ্চতা (altitude) বাড়িয়া যায়, ইহাই রিফ্র্যাক্‌শনের মুখ্যফল। নক্ষত্রাদি দৃঙ্‌মণ্ডলের কাছে থাকিলেই উচ্চতার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। কারণ, তখন রশ্মিসমূহ অতি বক্রভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্রকৃত এবং দৃষ্ট উচ্চতার প্রভেদকে astronomical refraction বলে। যাহা হউক, একটি রিফ্র্যাক্‌শানের তালিকা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ৩০ ইঞ্চ বায়ুচাপে এবং ৫০° ফাঃ উত্তাপে—

+ Godfray'র Astronomy দ্রষ্টব্য। উদয়াস্তকালে চন্দ্র সূর্য্য কেন বড় দেখায়, এই সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের "সাধনায়" অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

৪৫°	উচ্চতায়	রিফ্র্যাক্শান্	০´৫৮´´২
১০°	,,	,,	৫´১৯´´২
৫°	,,	,,	৯´৫২´´
২°	,,	,,	১৮´২৬´´
০°	,,	,,	৩৬´২৯´´

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, নক্ষত্রাদি দৃঢ়মণ্ডলের যতই নিকটে আসে, ততই উচ্চতার অল্প পরিবর্ত্তনেই রিফ্র্যাক্শানের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রভেদ হয়, এবং এই জন্যই চন্দ্রসূর্য্যের উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত ব্যাসটি সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও উদয়ের কিঞ্চিৎ পরেই এবং অস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাহারা ডিম্বাকার ধারণ করে; নিম্নার্দ্ধ অপরার্দ্ধ অপেক্ষা একটু বেশী চাপা বলিয়া মনে হয়। একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে কর, সূর্য্যের নিম্নতম বিন্দুর প্রকৃত উচ্চতা ৫°, এবং সূর্য্যের দৃশ্যমান ব্যাস ৩২´, এখন

	নিম্নতম বিন্দুর	উচ্চতম বিন্দুর
প্রকৃত উচ্চতা	৫°০´০´´	৫°৩২´০´´
রিফ্র্যাক্শান	৯´৫২´´	৮´৫২´´
দৃষ্ট উচ্চতা	৫°৯´৫২´´	৫°৪০´৫২´´

ইহাদের প্রভেদ ৩১´, অর্থাৎ সূর্য্যের ঊর্দ্ধাধঃস্থিত দৃষ্ট ব্যাস ৩১´; তাহা হইলেই এই (vertical) ব্যাসটি ১´ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। যখন দৃঢ়মণ্ডলের আরও নিকটে থাকে, তখন সঙ্কোচন কখনও কখনও ৫।৬ মিনিট পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

রিফ্র্যাক্শানের আর একটি ফল এই, ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের উদয় একটু অগ্রে হয়, এবং অস্ত একটু বিলম্বে হয়। সূর্য্য প্রকৃতই আমাদের horizonএ আসিবার পূর্ব্বে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, এবং horizon ছাড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, রিফ্র্যাক্শনে সূর্য্যের উচ্চতার বৃদ্ধি হয়।

বায়ুর রিফ্র্যাক্শনে আমাদের দৃষ্টিসীমা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার কারণ, রিফ্র্যাক্শনে আলোক বাঁকিয়া আসে বলিয়া, প্রকৃত দৃঢ়মণ্ডলের নিম্নস্থ কতক অংশ এই বক্র আলোকরশ্মির সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে ভূতলের দৃষ্টাংশ প্রায় ৬ অংশ বাড়িয়া যায়।

শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী।

চন্দ্রভাগাতীরে। (গল্প)

শৈশবের চাঞ্চল্য এ বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে ত্যাগ করে নাই, এখনো দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার; হাতে কাজকর্ম্ম থাকিলে কথাই নাই, কিন্তু কাজকর্ম্ম না থাকিলে অকারণে ঘুরিয়া বেড়ান আমার স্বভাব, এ স্বভাব পরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। ছোটভাইএরা এখন আমার অভিভাবক, সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহারা তাঁহাদের এই নাবালক জ্যেষ্ঠ-

টিকে সুপথে আনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অথবা নীতি-পুস্তক, এই দুইয়ের কিসের অভাবে আমার স্বভাব সংশোধিত হইল না, তাহা আমি এবং তাঁহারা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

হাতে কোনও কাজ নাই, এরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই মনের মধ্যে নানা গভীর চিন্তার উদয় হইয়া মনটিকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলে। সে ভাবনা কেবল ইহকালের প্রাচীরসীমায় আবদ্ধ নহে, পরকাল পর্য্যন্ত তাহার গতি বিস্তৃত, সময়ে সময়ে তাহাকে দার্শনিক চিন্তার নামান্তর বলা যাইতে পারিত, কিন্তু আমার মত গরীবের দার্শনিক চিন্তার দরকার কি? তাই আমি ছুটিয়া বাহির হই; লোকে অবসর পাইলেই বিশ্রাম করে, কিম্বা বন্ধুবান্ধবদিগের সহবাসসুখে বা নির্জ্জনে পুস্তকপাঠে সময়াতিপাত করে, কিন্তু আমি বিশ্রাম পাইলেই ঘুরিতে আরম্ভ করি। এরূপ অবস্থায় দুই দিনের ছুটী যে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কোথায় যাই, কিরূপে ছুটীর দিন কাটাই, এই ভাবনাতেই অস্থির। জীবনের দিনগুলি কোনও রকমে অতিবাহিত হইলেই আমার নিকট পরম শান্তি।

এই প্রকার যখন অবস্থা, সেই সময় সোমবারে এক দিন ছুটী পাওয়া গেল, রবি সোম দুই দিন বিশ্রাম—অতএব এই দুই দিন কাটাইবার জন্য কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইল।

সৌভাগ্যক্রমে আমার একটি সঙ্গী যুটিয়াছিলেন। ইনিও আমার মত স্কুলের মাষ্টার; আমরা দুজনে এক বাসাতেই থাকি, এবং ইনি আমার এক ঘরের সঙ্গী। জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও বঙ্গদেশ বা বঙ্গভাষার সঙ্গে ইহাঁর অধিক সম্বন্ধ নাই; ইহাঁর পিতামহের সঙ্গে সে সম্বন্ধ ছিল বটে। তিন পুরুষ হইতেই ইহাঁরা "পশ্চিমে"। ইনি বেনারস কালেজের ছাত্র, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর; বেশ বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে ইহাঁর পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী সকলেই বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহাঁর মন নির্ব্বেদভাবাপন্ন, সংসারের প্রতি আসক্তিবর্জ্জিত; বাহিরের লক্ষণেও তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইত, এবং মস্তকে দীর্ঘ চুল, মৎস্যমাংসত্যাগী, মিতাচারী এই ভদ্রলোকটিকে দেখিলে, যোগী ঋষির একটি নাগরিক সংস্করণ বলিয়া অনুমান হইত। তাহার ধর্ম্মমতও কিম্ভূতকিমাকার; ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়, এই সমাজভুক্ত লোকেরা বেদের অপৌরুষত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা কিম্বা কোনও ক্রিয়াকাণ্ড

মানেন না, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত) এবং হিন্দুসমাজের অদ্ভুত মিশ্রণের উপর তত্ত্ববিদ্যার (থিওসফি) আধিপত্য থাকিলে যেরূপ ধর্ম্মমত হয়, আমার এই বন্ধুটির ধর্ম্মও তদ্রূপ। এই বন্ধু আমার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন; ইনি বেশ ধর্ম্মনিষ্ঠ, এবং ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তাতে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়াই ইহাঁকে সঙ্গী করিলাম। কিন্তু গৃহজীবী এমন একটি অল্পবয়স্ক যুবককে সঙ্গে লইয়া বনজঙ্গলে বেড়ান আমি তত নিরাপদ মনে করি না, বিশেষ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার যেরূপ ঝোঁক, তাহাতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি বার ঘুরিলেই হয় ত তিনি গৃহের বন্ধন ছিঁড়িতে পারেন। যাহা হউক, আমি অবসর পাইলেই একা ঘুরি, হ—বাবু (এই বন্ধুটির নাম) এ জন্য দুঃখিত, এবং আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত; তাঁহার অনুযোগ, আমি কেন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরি না,—আমি যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রেমাস্পদ ভ্রাতা ভগিনী এবং কিশোরী প্রণয়িনীর কথা ভাবিয়াই তাঁহার বহুদিনের উমেদারীর প্রতি শিথিলপ্রযত্ন, সে কথা তিনি বুঝিতে পারেন না।

এবার এই রবি ও সোম দুই দিনের ছুটীতে একাকী কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না; সঙ্গীহীনের প্রাণের মধ্যে একটি সঙ্গীর কামনা জাগিয়া উঠিল। এই অরণ্য ও পর্ব্বতে ভ্রমণোপযোগী সঙ্গী কোথায়? প্রকৃতির সুন্দর শোভন দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেকে সঙ্গী হইতে চাহেন, কেহ বা পুরাতত্ত্ব কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের আশায় দুর্গম গিরিপথে, কি শঙ্কটময় বহু প্রাচীন পার্ব্বত্য অট্টালিকায় গমন করিতে পারেন, কিন্তু কেবল উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইবার আশায় বোধ করি কেহই আমার সাহচর্য্য অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। অন্য কেহ সম্মত না হইলেও, এ বিষয়ে হ—বাবুর কিছুমাত্র আপত্তি দেখিলাম না, সুতরাং আমার সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিলাম; তিনি তখনই প্রস্তুত, আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরিবেন, এ উৎসাহ আর তাঁহার রাখিবার স্থান হইল না। তিনি একা কি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইতেছেন দেখিয়া আমার বড়ই হাসি আসিল; আমাকে হাসিতে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। আমি বলিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে, না জানিয়াই যানের বন্দোবস্ত?"—তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে গাড়ী ঘোড়া যাইতে পারে, উত্তম হাট বাজার আছে, এবং সঙ্গে দুই একজন চাকর বাকরও চলিবে, কিন্তু আমি বুঝাইয়া দিলাম, আমার সঙ্গে চলিতে হইলে যানবাহনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, আমি পদব্রজে,

যাইব, লোকজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বন্ধুটি রাস্তার দূরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন; প্রথমে তিনি প্রবল তর্কের দ্বারা স্থির করিলেন, আমার এই প্রকার কঠোরতাস্বীকার নিরর্থক, আমি যখন সাধু সন্ন্যাসী নই, তখন যতটুকু বিলাস ভোগ করা দূষণীয় নয়, ততটুকুর প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত। আমি যে বিলাস ও প্রয়োজনীয়, এ উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেছি, ইহা বন্ধুবর অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, বিলাস-সুলভ ও প্রয়োজনীয়, এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে যে অন্তরাল আছে, তা অতি সামান্য, সেই জন্য অল্প কারণেই গোলযোগ ঘটে, আজ যে জিনিষ বিলাসোপকরণ বলিয়া মনে হয়, দুই দিন পরেই তাহা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তখন তাহা না হইলে আর চলে না। তর্কে সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি প্রশ্ন ধরিলেন, আমি কতদূর যাইব? ততদূর হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব কি না, আজ রাত্রে ফিরিয়া আসা কি সহজ হইবে, সেখানে থাকিবার যায়গা আছে কি না, এবং সেখানে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা? এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া ফেলিলেন; আমিও তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের নিরাশাব্যঞ্জক এক একটি উত্তর দিতে লাগিলাম; বলিলাম, রাস্তা কত দূরে তাহা জানি না, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ চলিতে হইবে, হাটবাজার নাই, থাকিবার স্থান আছে কি না জানি না, না থাকারই অধিক সম্ভাবনা, সেখানে কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্যও পাওয়া যায় না, পথ হইতে দুই এক পয়সার রুটভাজা সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে। ভায়া অবিলম্বে বুঝিলেন, এ এক নূতন রকমের পর্য্যটন; অতএব এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহার বিশ্বাস যেখানেই যাই, তাঁহার ন্যায় বন্ধু বান্ধবকে কখনই অনাহারে বাঘভালুকের মুখে সমর্পণ করিব না। আমাদের ভ্রমণেরও লক্ষ্য কি, জানিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার কৌতূহলনিবারণের জন্য বলিলাম, "চন্দ্রভাগা-তীরে।"

নাম শুনিয়াই তিনি হাসিয়া আকুল; বলিলেন, "এতখানি বাক্যকৌশলের কিছু আবশ্যক ছিল না, সরলভাবে পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া যাইবে বলিলেই সকল কথা বুঝা যাইত। অবশেষে তিনি প্রমাণ করিতে বসিলেন, এই দুই দিনের ছুটীতে কিছুতেই পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া যায় না; পদব্রজে ত দূরের কথা; তবে খুব কষ্ট স্বীকার করিলে অম্বালা কি অমৃতসর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া নিয়মিত সময়ে চাকরীতে হাজির হওয়া যায়। আমি এক কথায় সমস্ত সারিয়া দিলাম, বলি-

লাম, "তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি যোগবলে তোমায় লইয়া যাইব।"—ভায়া Theosophist মানুষ, আমার যোগবলের কথা বিশ্বাস করিলেন কি না জানি না, কিন্তু নিরস্ত হইলেন।

শনিবারের দিন আমাদের আয়োজন শেষ হইল। আয়োজনের মধ্যে মোটা একখানি গাত্রবস্ত্র, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, এবং নগদ চারি আনার পয়সা। ভায়ার চক্ষুস্থির! এ কি রকম আয়োজন, এতেই চন্দ্রভাগা-দর্শন ঘটিবে? কোনও প্রকারে শনিবারের রাত্রি কাটিয়া গেল।

রবিবার অতি প্রত্যুষে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। দেরাদুন হইতে সাহারণপুর আসিতে হইলে একটি পথ পাওয়া যায়, এই পথটি দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া ঠিক দক্ষিণ মুখে আসিয়াছে, এবং শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া সাহারণপুরে বিস্তৃত হইয়াছে; এই পথ যেখানে শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়াছে, সেখানে একটি নাতিক্ষুদ্র গিরিসঙ্কট আছে, এই গিরিসঙ্কটের নাম "মোহনপাশ"। আমরা যে সময় "মোহনপাশ" অতিক্রম করিলাম, তখন অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, এবং তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহ এক একবার আমাদের শরীরে লাগিয়া বুকের রক্ত জমাইয়া দিতেছিল, কিন্তু তথাপি এই পার্ব্বত্য 'পাশ' অতিক্রম করিতে কত আনন্দ! সেই জনহীন, পর্ব্বতাকীর্ণ, সৌন্দর্য্যবহুল, উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশ দিয়া আমরা দুইটি প্রাণী নিঃশব্দে অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল, বিহঙ্গের সুমিষ্ট প্রভাতকাকলী স্তব্ধ বনস্থলী আচ্ছন্ন করিয়া নবীন সূর্য্যের আহ্বানগীতিরূপে যেন ঊর্দ্ধ গগনমণ্ডলে প্রেরিত হইল। চতুর্দ্দিকে অযত্নসম্ভূত তৃণলতায় সুগন্ধি পুষ্প মুক্তাফলের ন্যায় শিশিরভারে আনত। নবোদিত সূর্য্যের লোহিত কান্তি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া ধূসর পর্ব্বত-অঙ্গে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, কেহ লোহিতচূর্ণে পর্ব্বত অঙ্গ রঞ্জিত করিয়াছে; আমরা কোনও লতামণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, কোনও উচ্চ বৃক্ষতল দিয়া আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম; এ যেন আমাদের শৈশবের জীবনপথে অগ্রসর হওয়া, তেমনি উদ্বেগহীন, আনন্দপূর্ণ, যতদূর দৃষ্টি পড়ে, সমস্ত প্রদেশের উপর এক অটল বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় অনুরাগ প্রকাশিত; সমস্ত পথই অজ্ঞাত, কিন্তু আশঙ্কাশূন্য, যেন আপনার মাতার ন্যায় প্রকৃতিজননী অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবেন।

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ পথ দিয়া প্রীতি-উচ্ছ্বসিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে দেরাদুন

হইতে দুই তিন মাইল দূরস্থ পর্ব্বত-অধিত্যকায় একটি নদী দেখিতে পাইলাম; এই নদীর নাম "বিন্ধ্যাল"। সমস্ত গিরিনদী যে প্রকৃতির, "বিন্ধ্যাল"ও সেই প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন। এ সকল নদীতে জল থাকে না, কিন্তু পর্ব্বতে যখন প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখন এই সকল নদী দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রবল বেগে জলপ্রবাহ প্রবাহিত হয়; কাহার সাধ্য, সেই প্রবল স্রোত রোধ করে, কিম্বা সেই সময় নদী পার হইয়া যায়? কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আর কিছু নাই, সম্পূর্ণ শুষ্ক, জলবিন্দুশূন্য। এই কারণে এ সকল নদীর উপর সেতুনির্ম্মাণের কোনও প্রয়োজন হয় না।

আমরা যখন নদী পার হইলাম, তখন তাহা শুষ্ক, সুতরাং পারের জন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। এই তিন মাইল চলিয়াই আমার বন্ধুটি কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারজি, এমনি পদব্রজে কি সাহারণপুরে যেতে হবে?"—আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া সোৎসাহে এবং সবেগে চলিতে লাগিলাম, নিরুপায় ভাবে তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এক একবার তিনি কাতরতা প্রকাশ করিয়া কোনও কথা বলিবার উপক্রম করিলেই, একটি সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, আর তিনি সমস্ত ভুলিয়া যান, মহাআহ্লাদে এবং আশ্চর্য্যভাবে, মুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়া তাহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, ও উপসংহারে বলেন, "এমন সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে জীবনের পূর্ণ উপভোগ হইতে পারে, এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জ্ঞানানুভূতি অপেক্ষা কত মহত্তর; এই সৌন্দর্য্যানুভূতি তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা সেই পরম-সুন্দর পুরুষকে বা মহিমান্বিতা শান্ত প্রকৃতির অখণ্ড মাধুরীকে ধারণা করিতে পারে, আমরা বৃথা জ্ঞানের উদ্বোধনে রত রহিয়াছি, ইহাতে না আছে তৃপ্তি, না আছে শান্তি, ইহাতে কেবল অহঙ্কারবৃদ্ধি করে, এবং সন্দেহের ভিতর হইতে আমরা গভীরতর সন্দেহে ডুবিয়া যাই।"—আমি বলিলাম, "জগতের অভি-ব্যক্তিই সৌন্দর্য্যমূলক; এমন কি, জ্ঞানের মধ্যেও যদি সৌন্দর্য্যের বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের এত আদর থাকিত না। জ্ঞান অপেক্ষা বিধাতার সৌন্দর্য্যেই অধিক প্রীতি, এবং এই কথা যুনানীর মহাকবি মিল্টন অতি সুন্দর বুঝিয়াছিলেন, তাই আদমকে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিরসৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন ত্রিদিবের প্রমোদকানন পরিত্যাগ করিতে হইল।"—এইরূপ গল্পে ভুলাইয়া ভুলাইয়া তাঁহাকে লইয়া চলিলাম, অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময়

ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, "আর ত চলিতে পারি না; সকলই সুন্দর, কিন্তু এই গম্য অংশ পথ চলাটুকু যদি না থাকিত!"

একটু বিশ্রামের পর, আর অধিক চলিতে হইবে না এই আশা দিয়া, আবার চলিতে লাগিলাম। অল্পদূরে—রাস্তার ধারে একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রাম দেখিয়া বন্ধুটির দেহে প্রাণ আসিল; তাড়াতাড়ি আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, বেলা বোধ হয় তখন আট্‌টা বাজিয়াছে। গ্রামের নামটি আমার মনে নাই, পশ্চিমে গ্রামগুলির নাম—তাহাদের পার্ব্বত্যপ্রকৃতির অনুরূপ, অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর; শত শত গ্রাম ঘুরিয়াছি, সকলগুলির নাম শ্রুতিধর ভিন্ন অন্য কাহারও মনে রাখা সম্ভব নহে। গ্রামে দুই তিনখানি ছোট দোকান, তাহাতে প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দেখিলাম, অদূরে লাল রঙ্গ-করা পাথরের অতি সুন্দর একটি অট্টালিকা, কিন্তু এই অট্টালিকা ও তাহার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ, অট্টালিকাটি কেমন সুন্দর, ছবির মত সুশোভন, তাহার ভিতর যদি কেহ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি থরে থরে সজ্জিত রাখিত, তাহা হইলেই তাহার সদ্ব্যবহার হইত; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপরিষ্কারের জীবন্তমূর্ত্তি কয়েকটি মানবক গা দুলাইয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া সমস্বরে উর্দ্দু পড়িতেছে। তাহাদের সেই সমবেত সুর আমাদের কানে নিতান্ত মন্দ লাগে নাই; দেখিলাম, এই গোষ্ঠের নেতা প্রকাণ্ড এক সাদাপাগ্‌ড়ীধারী, বেত্রহস্ত, বিশ বাইশ বৎসর বয়স্ক এক শ্মশ্রুবিরল গুরুমহাশয়। আমাদিগকে দেখিয়াই গুরুমহাশয় ত্বরিতপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, গুরুমহাশয়টি আমারই এক প্রকার ছাত্র। তাঁহার অনুরোধে আমরা বিদ্যালয়গৃহে প্রবেশ করিলাম। ছাত্রেরা মাটীতে কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া আছে, হঠাৎ প্রভাতকালে অপরিচিত দুইটি অতিথিকে দেখিয়া সেই বালকবৃন্দের হৃদয়ে যে অপর্য্যাপ্ত ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, তাহাদের চঞ্চল চক্ষুর কোমল স্পন্দনেই আমি তাহা অতি সহজে অনুমান করিতে পারিলাম। বিশেষ যখন তাহাদের গুরুমহাশয় অতি ব্যগ্রভাবে আমাদের বসিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং চেয়ারখানিতে স্থান সংকুলান হইবে না দেখিয়া, অদূরস্থিত একটি কেরোসিনের বাক্স বহিয়া আমাদের নিকটে রাখিলেন, তখন ছাত্রেরা একবারে অবাক্ হইয়া গেল, যেন তাহাদের যমের যম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

গুরুমহাশয় সবিনয়ে তাঁহার ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ছাত্রেরা যে যে ভাষা শিক্ষা করিতেছে, সে সকল ভাষায় আমার অসীম দখল, বাস্তবিক উর্দ্দু ও পারসীতে আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে এই দুই ভাষায় অন্যের বিদ্যা পরীক্ষা চলে না। কিন্তু আজকাল ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করে না, প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমরা, বিশেষতঃ এই গুরুমহাশয়শ্রেণী, বিশেষ ঋণী; কারণ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্তই তাহার প্রসাদাৎ; কিন্তু সত্য বলিতে কি, যদি ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করিত; তবে প্রবেশিকাপরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের প্রশ্নপত্রের ভাষার চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতাম, এবং স্থূলোদর সিভিলিয়ানপুঙ্গবেরা বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষাদানকালে The remarkable lady'র বঙ্গানুবাদে "ঐ মন্তব্যা স্ত্রীলোক" লিখিয়া অপূর্ব্ব ভাষাভিজ্ঞতা এবং অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন না।

যাহা হউক, দুই চারিটি কথায় পরীক্ষা শেষ করিয়া, গুরুমহাশয়কে চন্দ্রভাগার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিতে পারিলাম, এই গ্রাম অতিক্রম করিয়া দক্ষিণের দিকে একটি জঙ্গল আছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। অধিক বিলম্ব না করিয়া, একটি দোকান হইতে কলাইভাজা ও গুড় কিনিয়া দুই জনে অগ্রসর হইলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা শিভালিকের একেবারে কোলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি; রাস্তার ধারে একজন কৃষক জমী চষিতেছিল, তাহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দক্ষিণের একটি রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা তাহার নির্দ্দেশমত চলিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কোনও পথই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল অরণ্যের মধ্যে রেখাবৎ একটি চিহ্ন; তাহাই অবলম্বন করিয়া লতাপাতা দুই হাতে সরাইতে সরাইতে চলিতে লাগিলাম। কোথাও পথ বেশ পরিষ্কার, আবার কোথাও গভীর জঙ্গল। স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্ধকার—সূর্য্যকিরণের চিহ্নমাত্র দেখা অসম্ভব। খানিক দূরেই আবার সমস্ত পরিষ্কার—বেশ রৌদ্র এবং চারিদিক খোলা। প্রকৃতির এই প্রকার বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়া প্রায় দুই মাইল ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রভাগাতীরে উপস্থিত হইলাম।

এই চন্দ্রভাগা একটি সংকীর্ণকায়া ক্ষুদ্র গিরিনদী। সিন্ধুর অন্যতম শাখার নামও চন্দ্রভাগা, কিন্তু তাহার সহিত এই ক্ষুদ্র নগনদীর কোনও সম্বন্ধ নাই।

সে চন্দ্রভাগা মহাপ্রতাপশালী, দুর্দ্দমনীয় সিন্ধুর একটি প্রধান শাখা ; সে নিজেই বিখ্যাত, এবং তাহার চঞ্চল পতি বীরভূমি পঞ্চনদের বিস্তৃতবক্ষ সুশোভিত করিতেছে ; আর আমাদের পুরোবর্ত্তিনী এই চন্দ্রভাগা অরণ্যসঙ্কুল শিভালিকের কোনও এক অজ্ঞাত অংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে জন্মলাভ করিয়া, নির্ঝর এবং জলপ্রপাতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা সামান্য জল সংগ্রহ পূর্ব্বক মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতেছে ; আমাদের দেশের ছোট খালেও ইহা অপেক্ষা অধিক জল থাকে।

নির্জ্জন নদীতীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির, মন্দিরে মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান, মন্দিরের প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এবং এই মধ্যাহ্নকালেও তাহার মধ্যভাগ হইতে অন্ধকার বিদূরিত হয় নাই। কত কাল হইতে এই মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত, হয় ত চতুর্দ্দিকে কত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই ন্যায় মহাসমাধিনিমগ্ন, যেন বিশ্বের প্রলয়ের সহিত বিশ্বেশ্বরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

এই মন্দিরের সম্মুখে অতিজীর্ণ আর একটি সামান্য মন্দির দেখা গেল। প্রবাদ, ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে বহু দিন যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। এ কথা কতদূর প্রামাণিক, তাহা স্থির করা কঠিন ; তাহার পর কতকাল অতীত হইয়াছে, বোধ হয়, কোনও লিখিত বিবরণও নাই। সুতরাং, এই মন্দির বুদ্ধদেবের তপশ্চর্য্যাসম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য না দিলে, ইহার সত্যাসত্যের নির্ণয় হয় না। কিন্তু এমন সুন্দর স্থানে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছেন বলিলে অসম্ভব বোধ হয় না ; এই সকল স্থানে আসিলে বুঝিতে পারি, যোগী ঋষিগণ ভগবানের চিন্তায় দেহপাত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ স্থান কে[illegible]নীত করেন ; আরণ্যপ্রকৃতির স্নিগ্ধগম্ভীর শোভা, প্রত্যেক [illegible]ও তুষারধৌত প্রস্তরখণ্ডের সুপবিত্র শান্তভাব, এবং উপলব্যথিতগতি ক্ষীণকায় এই গিরিনদীর নির্ম্মল প্রবাহ, এ সমস্ত দেখিলে মনে আর কোনও কথার উদয় হয় না,—শুধু অনাদি অনন্ত মহাপুরুষের মধুর সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এখানে সকলই সহজ—সকলই সুন্দর, পার্ব্বত্য বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষীগণের কি স্বাধীন আনন্দধ্বনি, নদীজলে মৎস্যকুলের কি নির্ভয় সন্তরণ! বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করুন আর না করুন, তাঁহার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহা উক্তি এই পার্ব্বত্য প্রকৃতির প্রাণে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই নীতিকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মনুষ্যের অনুশাসন এখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

চন্দ্রভাগার গতি অতি ধীর; পার্ব্বত্য নদীর লম্ফঝম্ফগতি, সিংহনাদ, ফেনিল তরঙ্গের ঘূর্ণিত বেগ, এখানে সে সকল কিছুই নাই। সামান্য শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রভাগা অগ্রসর হইয়াছে, কত বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য যে সেই অল্প জলে খেলা করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। জল সর্ব্বত্রই এক হাঁটু, দুই এক স্থানে একটু বেশী হইতে পারে। জীর্ণ মন্দিরটির এক দিকের 'দেওয়াল' ফাটিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই ভিতর হইতে একটি নির্ঝর বাহির হইয়া চন্দ্রভাগায় মিশিয়াছে। এই নির্ঝরের জল কেমন নির্ম্মল, যেন বীরের শরাঘাতে বিদীর্ণবক্ষ বসুন্ধরার মর্ম্মস্থান হইতে প্রসন্নসলিলা ভোগবতী সমুদ্ভূত হইয়া তৃষাতুরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। ভগ্নমন্দিরের সোপানে বসিয়া, এই ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর অনাবিল পুণ্যপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম; এই শুভ্র দিবালোকে বায়ুহিল্লোলিত উন্নত বৃক্ষরাজির ঘনপল্লবের সঘন মর্ম্মরশব্দ, নদীর অস্ফুট কলধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া যুগান্তপ্রবাহিত রহস্যভাষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল, বুঝি ইহা বিশ্বপিতার অনাদ্যন্ত যশোগীতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা হয়; নিকটস্থ গ্রামসমূহের স্ত্রীপুরুষ এবং বালকবালিকা সকলে সে দিন একত্র হইয়া চন্দ্রভাগায় স্নান করে, এবং মন্দিরে শিবের মস্তকে দুগ্ধ ও বিল্বপত্র "চড়ায়,"—এদেশে শিবের মাথায় জলঢালার নাম 'জল-চড়ান'। আমি এই সময় একবারও চন্দ্রভাগায় আসিতে পারি নাই; কারণ, ঠিক এই দিনে হরিহরছত্রের মেলা আরম্ভ হয়, হরিহরছত্রের মেলা দেখিবার লোভ কোনও বারই সম্বরণ করিতে পারি নাই, এখানকার মেলাও এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবার সুযোগ হইত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুযোগ ত্যাগ করিতাম; বর্ষাকালে আমার বন্ধুগণ দল বাঁধিয়া মৎস্যানুসন্ধানে এই নদীতীরে আসিতেন, কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র স্থানে,—যেখানে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচারক কিছুকাল যোগসাধনায় কালাতিপাত করিয়াছেন, সেখানে জীবহিংসার জন্য দল বাঁধিয়া যাওয়া, আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইত না।

মহাদেবের মন্দিরমধ্যে বস্ত্রাদি রাখিয়া, এই প্রবল রৌদ্রের মধ্যে শীতে কম্পমান দেহে দুই জনে স্নান করিতে নামিলাম। বাসায় গরম জলে স্নান করাই আমাদের নিয়ম, আমার সঙ্গী বন্ধু অনেক দিন পরে অবগাহনের সুবিধা পাইয়া হাঁটু জলেই সন্তরণ আরম্ভ করিলেন; এত শীত, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

মন্দিরে পূজা করিতে আসেন, কৃষকেরা প্রভাতে ফুল ফল পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখে, এবং এক এক দিন রাত্রে তাহাদের দূরস্থ গ্রাম হইতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি পর্য্যন্ত শুনিতে পায়। একবার একজন সন্ন্যাসী কাহারও কথা না মানিয়া রাত্রি-যাপনের জন্য এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আর সশরীরে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই; প্রাতঃকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাহার মৃতদেহ পতিত ছিল, কে যেন তাহার শরীরের সমস্ত হাড় চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। যে কৃষকটি আমাদের কাছে গল্প বলিতেছিল, তাহার বিশ্বাস, এই মন্দিরপ্রহরী সর্প তাহাকে জড়াইয়া পিষিয়া মারিয়াছে; কৃষক আরও বলিল, এই মন্দিরটি শিবমন্দির হইলেও ইহা একটি সমাধিমন্দির। অনেক দিন পূর্ব্বে এখানে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতে আরম্ভ করেন; সকলের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী কোনও দেবতা, সন্ন্যাসী এখানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গের কাহাকেও এখানে রাত্রি-বাস করিতে দিতেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া লইত। সন্ন্যাসীর গাঁজা, আফিং বা ভাং খাওয়া অভ্যাস ছিল না, তিনি ফলমূলাহারী ছিলেন, নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত; সেই সকল গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে সভয়ে দেখিত, সন্ন্যাসীর আশ্রম অনেকদূর লইয়া আলোকাকীর্ণ হইয়াছে, সামান্য অগ্নিতে সেরূপ আলোক উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে, অথচ সন্ন্যাসীর কুটীরে কখনও এত কাষ্ঠ থাকিত না, যাহা দ্বারা এরূপ প্রচুর আলোক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। শুনা গেল, এখনও মধ্যে মধ্যে আলোক দেখা যায়। একবার সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, পাঁচ ছয় মাস পরে একজন নবীন শিষ্য লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন; সেদিন অন্যান্য শিষ্যগণ রাত্রে তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি পাইল, রাত্রে তিনি ঘোষণা করিলেন, সেইদিনই তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শিষ্য-মণ্ডলী এই সংবাদে আকুল হইয়া উঠিল; তিনি আদেশ করিলেন, নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিয়া তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন, এবং সেই মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা হইবে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবেশন করিলেন, চারিদিকে শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িল, প্রত্যূষে উঠিয়া দেখে, সন্ন্যাসীর প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে এখানে এই মন্দির ও এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং তিনি চলিয়া যাইবার সময় আদেশ করিয়া গিয়াছেন, রাত্রিকালে এখানে কেহ বাস না করে।

এইজন্য এ স্থান রাত্রিকালে জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আমার সঙ্গী বন্ধুর ঘাড়ে "থিওজফির" ভূত চাপিয়া আছে, তিনি আগাগোড়া সমস্ত গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, আবার ঠিক এই সময়ে সেই ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড সর্প বাহির হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, আমাদের সংবাদ-দাতা কৃষক বলিল, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, তাই সাপ বাহির হইয়াছে, শীঘ্রই বনের মধ্য হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

এই কথা শুনিয়া আমার সঙ্গী আর বিলম্ব না করিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে গাত্রবস্ত্রাদি লইয়া বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন, আমার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেখানে থাকিবারও যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে; কারণ, দেখিয়া শুনিয়া এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হয়, এখানে থাকিলে মারাত্মক কিছু না হউক, আমাদের কোনও বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং এখান হইতে উঠিলাম। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কৃষকটি বলিল, দেরাদুন এখান হইতে অনেক পথ, বেলাও আর অধিক নাই, পথে বিপদে পড়িতে পারি, অতএব যদি রাত্রে তাহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করি, তাহা হইলে সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে দেরায় ফিরিতে পারি। আমার সঙ্গী সহজেই সম্মত হইলেন, আমার অসম্মতিরও অবশ্য কোনও কারণ ছিল না, বিশেষ এদেশীয় কৃষকেরা অত্যন্ত আতিথ্যপরায়ণ।

আমরা দুজনে কৃষকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি অল্পপরিসর ভূখণ্ডক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকের বাসগৃহে উপস্থিত হইলাম, বাড়ীতে দুইখানি ঘর—একখানিতে রান্না হয়, এবং তিনটি গাই বাঁধা থাকে—অর্থাৎ একখানি পাকশালা এবং গোশালা একাধারে উভয়ই, অন্যখানি শয়ন-গৃহ। কৃষকের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং দুই কন্যা; আমরা গৃহস্বামীর শয়ন-গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া বসিলাম—সে তাহার স্ত্রীকে আমাদের কথা বলিল; আমাদের বাঙ্গলাদেশের গৃহলক্ষ্মীগণের গৃহে আজকাল অতিথিসমাগমে তাঁহাদের প্রসন্নমুখে সহসা যে পরিমাণ বিরক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাতে স্বামী মহাশয়েরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে এই পার্ব্বত্য কৃষকপরিবারে সেরূপ কোনও ভাবের পরিচয় না পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, এই সঙ্গে বাঙ্গলার মহিলাকুলের সহিত পর্ব্বতবাসিনী রমণীগণের একটু তুলনাও করিয়া লইলাম, কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা আমাদের সহৃদয়া পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না, অতএব সে কথা এখানে না বলাই ভাল।

কৃষকরমণী সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল; দুইটি সুসভ্য বিদেশী অতিথিকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিবে, এই চিন্তাতেই তাহারা স্বামী স্ত্রী প্রথমে বিব্রত হইয়া পড়িল; কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষকপত্নী ঘরের বাহিরে আসিয়া "রি, রি, রি, রি, রো"—এইরূপ এক শব্দ করিল, উত্তরে দূর হইতে "কু" শব্দ শুনিতে পাইলাম, কে যেন ভাঙ্গাগলায় মিষ্টকণ্ঠে এই শব্দ উচ্চারণ করিল। গৃহস্বামিনী আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জাবোধ করিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার মানুষের অধিকক্ষণ অভাব ছিল না; অবিলম্বে কৃষকের হৃষ্টপুষ্ট, উন্নতদেহা, গৌরাঙ্গী দুইটি কন্যা তিনটি গাই লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। আমাদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল, তাহাদের পিতা সকল কথা ব্যক্ত করিল। বড় মেয়েটি মার সাহায্যের জন্য রান্নাঘরে গেল, ছোটটি গোবৎস ধরিল, তাহার পিতা গোদোহন করিল। গোদোহন শেষ হইলে আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম; সে সকল কি গল্প? তাহাতে আমাদের শিক্ষা সভ্যতার কোনও কথা ছিল না, জীবনসংগ্রামের গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা যে প্রতিদিন অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি—আমাদের হৃদয়ের সেই ব্যাকুল ক্রন্দন এই সুখী ও শান্তিপূর্ণ কৃষকপরিবারে ব্যাপ্ত করি নাই; সংসারের অনেক কথা তাহারা বোঝে না, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুশীলনে ইহাদের মস্তিষ্ক ব্যথিত না হইলেও, ইহাদের দিন বেশ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতেছে। ইহাদের সহিত কথা কহিয়া আমি বুঝিলাম না, কোনগুণে আমরা শ্রেষ্ঠ; ইহাদের নিষ্ঠা কেমন একাগ্র, ভক্তি কত গভীর; হৃদয় কত উদার ও মহৎভাবপূর্ণ, এবং বিশ্বাস কেমন অবিচল; আমাদের সংশয়, আমাদের সংকোচ, আমাদের মানঅভিমানজ্ঞান ইহাদের নাই, কিন্তু ভগবান যদি আমাদের হৃদয়ে এই মূর্খ, পার্ব্বত্য পরিবারের ন্যায় সন্তোষ ও শান্তি দান করিতেন, তাহা হইলে এ শিক্ষা ও সভ্যতার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতাম।

তাহাদের গল্পে তাহাদেরই পুরাতন কাহিনী ধ্বনিত হইতেছিল, তাহাদের সেই সকল গল্পের সহিত তাহাদের গভীর বিশ্বাস বিজড়িত। সে সকল গল্প যুক্তিতর্কের অতীত, কিন্তু তথাপি তাহা কেমন সুন্দর! কৃষকের ছোট কন্যাটি তাহার পিতার নিকট বসিয়া তাহার পিতাকে গল্পে সাহায্য করিতেছিল, হাত মুখ নাড়িয়া সে যখন সালঙ্কারে তাহার পিতার গল্পের অনুবৃত্তি আরম্ভ করিল, তখন আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—তাহার বর্ণনভঙ্গী সুন্দর,—কি বর্ণনকৌশল সুন্দর? বাস্তবিক মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী। তাহার নিটোল

দেহে প্রথম যৌবনের উজ্জ্বলকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই চাঞ্চল্যের উপর সুন্দর সরলতা তাহার মধুর রূপকে অতি সুশোভিত করিয়াছিল। তাহার সরলতা, তাহার রূপ মাধুরী এবং গ্রাম্যভাব দেখিয়া, প্রসিদ্ধ স্কচ্ কবির একটি কবিতা মনে পড়িয়া গেল :—

"She was a bonnie sweet Sonsie lassie."

কৃষকের ভাষায় সুন্দর পরিচয়; কৃষক কবিই এ সৌন্দর্য্যবর্ণনার উপযুক্ত পাত্র।

গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি হইল। ইতি মধ্যে মা ও বড় মেয়ে গরম লুচি, শাকের চাটনী, কাঁচা ভুট্টার একটা ঝাল তরকারী এবং গরম দুধ লইয়া, অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত করিল; আমরা আহারে বসিলাম, ছোট মেয়েটি "এটা খাও, ওটা খাও" বলিয়া জিদ করিতে লাগিল, তাহার কাছে আমরা অত্যন্ত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আহারান্তে আমার সঙ্গী কম্বলের উপর নিজের কাপড়খানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন, দশ পনের মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল; দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নিদ্রা এরূপ আজ্ঞাকারী নহে, (বন্ধুগণ কিন্তু একথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না), আমি বসিয়া গৃহস্বামীর সহিত গল্প করিতে লাগিলাম।

বারান্দার এক পাশে জাঁতা ছিল, কাজকর্ম্ম শেষ হইলে মেয়ে দুটি সেই জাঁতা পিষিতে লাগিল, প্রথমে তাহারা অস্পষ্ট স্বরে কি বলাবলি করিতেছিল। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, আমাদের কথাই আলোচনা করিতেছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে শয়ন করিলাম—কিন্তু তাহাদের বিশ্রাম নাই, আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহারা গান ধরিয়া দিল। জাঁতা পিষিতে পিষিতে গান করা এ দেশের নিয়ম। প্রথমে দুই ভগিনী অতি ধীরে, অতি সসঙ্কোচে গাহিতে লাগিল, যেন নৈশ বায়ুর স্পর্শমাত্রে সেই মৃদু-স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু ক্রমেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গ্রামের পর গ্রামে উঠিয়া, এই নীরব নিশীথে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সে স্বর কেমন সুমিষ্ট এবং প্রতি চরণের শেষে যে একটি কম্পন, তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন কর্ণে মধুবর্ষণ করে। এতকাল পরে এখনও মধ্যে মধ্যে সেই গীত-ধ্বনি কর্ণে বাজিয়া উঠে, সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য কুটীরে সেই নৈশগানের ধুয়া-এখনো ভুলি নাই; এখনও মনে পড়ে—

"ওরে ধন দৌলত—"

এবং নিজের অদ্ভুত কবিত্ববলে কত কথাই এই ধুয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া নিজের ভাবুকতা প্রকাশ করি!

কখন ঘুমাইয়াছিলাম, মনে নাই। প্রত্যূষে সঙ্গীর ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইল, গৃহস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, দেরাদুনের দিকে অগ্রসর হইলাম; আমাদের বিদায় লইবার সময় কৃষকের ছোট মেয়েটি বলিয়াছিল, যদি আবার কখন এ পথে আসি, তবে যেন তাহাদের গৃহে অতিথি হই। পর্ব্বতপ্রান্তের এই অতিথিবৎসল কৃষকপরিবারের কথা আমার অনেক কাল মনে থাকিবে।

শ্রীজলধর সেন।

মাধুরী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যত বেলা যাইতেছিল, ততই তারাসুন্দরী অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রভাত না হইতেই পুত্র অপর সকলকে লইয়া মুন্সীগঞ্জে গিয়াছিলেন—আজ মোকদ্দমা উঠিবার কথা—কি জানি কি হইল? ছেলে মানুষ—বোধ সোধও তেমন নাই—হয় ত বা সাক্ষীরাই বাঁকিয়া বসিল? হয় ত বা কোনও বিপরীত ঘটনাই ঘটিল? কিন্তু তাহা তো হইবার কথা নয়। তিনি তো আট ঘাট বাঁধিয়া সকল কাজ করিয়াছিলেন। অমূল্যের সঙ্গে ভূষণ আছে। সে যেটা বুঝিতে না পারে, ভূষণ তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। বাঙ্গাল রামমাণিক্যও খুব চতুর; তাহাকে কার্য্যসিদ্ধির পর আরও অধিক পুরস্কারের লোভও তিনি দেখাইয়াছেন—ভয়ের কারণ তো কিছু নাই। তবে এক ভয় ভজহরিকে। সে লোকটা নিরীহপ্রকৃতি, উদ্দেমাদা, ভয়তরাসে। কিন্তু তাকেই বা আর কটা কথা বলিতে হইবে? এত করিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন, তবু কি গোলমাল করিয়া ফেলিবে? আর ইন্‌স্পেক্টর? তাহাকেও তো টাকা দিতে তিনি কম করেন নাই।

অপরে জানে না বটে; কিন্তু তিনি তো বুঝিতেছেন এই কাজে ইহার মধ্যে তাঁহার কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। হাতে যাহা ছিল, তাহার আর এক কপর্দ্দকও নাই। গোপনে—অমূল্যকে লুকাইয়া—রামমাণিক্যের হাত দিয়া গহনা বিক্রয় করিয়া তবে অনেক সময় খরচ চালাইতে হইয়াছে। রামমাণিক্য যে দুই শত টাকার জিনিষ খানায় এক শত টাকা আনিয়া দিয়াছে, তাহা

যে তারাসুন্দরী বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে; তবে কি করিবেন, উপায়ান্তর নাই। যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, খরচ অভাবে তখন আর ফিরিতে পারেন না। তবে রামমাণিক্য পাছে তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতা বুঝিতে পারিয়া বশীভূত না থাকে, এ জন্য সে সকল অলঙ্কার যে তাঁহার মৃতা সপত্নীর, ইহা তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারাসুন্দরী অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়া ছিলেন। অমূল্য অপেক্ষাও বুঝি গহনা অধিক ভাল বাসিতেন। বড় সাধ করিয়া পছন্দসই ভারি ভারি বিস্তর গহনা গড়াইয়াছিলেন। অত বড় বাক্সে তাহা ধরিত না। আজ তাহার অর্দ্ধেক প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। এক একখানি গহনা বেচিতে দিয়াছেন, আর বুকের এক এক খানি পাঁজরা যেন খসিয়া গিয়াছে। তবু জেদে পড়িয়া তাহার মায়া রাখেন নাই। সেই জেদ কি বজায় হইবে না? এত করিয়াও কি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না? উকীল অনেকটা টাকা লইয়াছে। লউক, এখন অমূল্য জয়ী হইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই হইল।

জয় তো নিঃসন্দেহ—তারাসুন্দরী আবার ভাবিতে লাগিলেন—জয় এত ক্ষণ নিশ্চয়ই হইয়াছে। এত করিয়া সাজাইয়াও যদি মোকদ্দমা না টিকে, তাহা হইলে সে হাকিমের ন্যায় নির্ব্বোধ আর নাই। তিনি শুনিয়াছেন, হার জিত নাকি সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। যে প্রমাণ যোগাড় হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? বেলা গিয়াছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই অমূল্য হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিতেছে। আর ভুবন?—সে এতক্ষণে জেলে গিয়াছে—নেংটী পরাইয়াছে, মাথা মুড়াইয়াছে, হাতকড়ি লাগাইয়াছে, কম্বলে শুইতে দিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য চোখের উপর ভুবনের সেই অবস্থা দেখিতে পাইলেন। বিকট আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই কল্পিত দৃশ্য যেন তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া দিল। "বাঃ বাঃ এই তো রাজার জামাইয়ের উপযুক্ত বেশ! এই তো সুখের বাসরশয্যা! তার পর রাজদণ্ড? কাল প্রাতে যখন পাথর ভাঙ্গিবার জন্য প্রকাণ্ড লৌহ হাতুড়ি হাতে দিবে, তখনই তাহার ঠিক শোভা হইবে। মরি মরি কি সুন্দর বেশ!"—

তারাসুন্দরী একেলা সে গৃহে ছিলেন, একেলাই উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"আমি তারাসুন্দরী, আমায় অপমান! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা! কেন, আর কি মেয়ে ছিল না? আমার পুত্র রাজার জামাই না হইয়া, রাজকন্যা বিবাহ করিবে সপত্নীপুত্র? আর আমি তাই চুপ করিয়া দেখিব?

তাহা দেখিবার পূর্ব্বে বায়সে কেন আমার চক্ষু উৎপাটন করিল না? যে সতীনকাঁটা—আমার চক্ষুঃশূল—সে হইবে রাজরাজেশ্বর, আর আমার সোণার নিধি ভাসিয়া যাইবে। কর—এখন প্রাণ ভরিয়া রাজত্ব ভোগ কর।" ঘূর্ণিত-লোচনে বিকৃতস্বরে অট্ট হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী দন্তে দন্ত নিপীড়িত করিলেন। নির্জ্জন গৃহে ভীষণ কড় কড় শব্দের প্রতিধ্বনি হইল।

বেলা গিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন পর্য্যন্ত এক জনও প্রাণী ফিরিল না। তারাসুন্দরী উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া কি চিন্তা করিলেন। আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিষ্ঠিতে পারিলেন না—ব্যস্ত হইয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন। তাই ত, এখনও কেন অমূল্য আসিল না? সেই আনন্দপ্লাবিত হৃদয়ে সহসা একটা আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সহসা দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথার উপর গৃহগাত্র হইতে একটা টিক্‌টিকি রব করিল, বারাণ্ডায় ঝিল্‌মিলির উপর বসিয়া একটা কৃষ্ণকায় কাক বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া একটা পোকা চোখের ভিতর পড়িল, অকারণ নয়ন দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। অশুভ আতঙ্কে তারাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, নীচে দাসীরা কি একটা কথা লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া গোল করিতেছে; সন্ধ্যা হইয়াছে, তবু কেহ গৃহে প্রদীপ দিয়া যাইতেছে না। ভগ্নপ্রায় হৃদয়ে জোর করিয়া বল বাঁধিয়া তারাসুন্দরী এক জন দাসীকে ডাকিলেন। ভীতপদে দাসী ধীরে ধীরে নিকটে আসিল। তারাসুন্দরী কি জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর বড়ই ধড় ফড় করিতেছিল। দাসীও কিছু বলিতে না পারিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এই সময়ে বামনদিদি হন্তদন্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সেইখানে আসিলেন। তিনি আপনা-আপনি বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন—"আ মর্ মর্, যত বড় মুখ তত বড় কথা! ঝাঁটা খেয়ে দূর হয়ে গেলেন, তবু আস্পর্দ্ধার সীমে নাই। কেন র‍্যা? তোর এত লাফানি কেন?"

বামনদিদি সেই অনুদ্দিষ্ট সম্বোধিতের প্রতি আরও কত অপরের অবোধ্য কথা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরী জানিতেন, তাহার স্বভাবই এইরূপ, সেই জন্য অন্য সময়ে তাহাকে এইরূপ গজর গজর করিতে দেখিলে, হয় সেইখান হইতে চলিয়া যাইতেন, নয় ধমক দিয়া উঠিতেন। আজ কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না।

তাহার দিকে চাহিয়া নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন, সে অর্থ-শূন্য মাথামুণ্ড বকুনির তিল মাত্র বিরাম নাই, তখন একবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি হইয়াছে? কে কি বলিয়াছে?"

বামনদিদি দেখিলেন, আজ স্বয়ং গৃহিণী মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছেন ও কার কথা হইতেছে আগ্রহ সহকারে তাহা প্রশ্ন করিতেছেন, আর তাঁহাকে কে পায়? একটা বামনদিদি একেবারে দশটা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ওগো সেই কালামুখী। ছোট লোক জাত স্বতন্তর। সেই যে একটা রূপকথার শেষে আছে, 'আঙার না যায় ধুলে, আর স্বভাব না যায় মলে'—তা মা, এও জান্‌বে তাই। ছি ছি, এক দিনও তো নূন খেয়েছিস্, পাড়ায় পাড়ায় তোর কি এই মিথ্যা কথাটা বলে বেড়ান উচিত? তা সেই যে—"

তারাসুন্দরীর আর বর্দ্দাস্ত হইল না। তিনি যথার্থই বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আসল কথাটা কি বলিতে হয় বল না হয় এখান হইতে চলিয়া যাও।"

বামনদিদি জড়সড় হইয়া বলিল, "তা মা, আমায় বকিলে কি করিব? আমরা তোমাদের খেয়ে পরে মানুষ, মিছামিছি তোমাদের একটা নিন্দা কি সহিতে পারি? তাই কি একটা যে সে কথা—ওমা বেদে নেই কোরাণে নেই এমন সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌লে কি আর জ্ঞান থাকে?"

তারাসুন্দরী আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বামন ঠাব্‌রুণ তোমার পায়ে পড়ি, কথাটা কি তা ভেঙ্গে বল।"

বামনদিদি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মা? সে কথা অতি বড় শত্রুতেও মুখে আনিতে পারে না, আমি কেমন করিয়া বলি? শুনে পর্য্যন্ত গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে।" বামনদিদি দেখিলেন, হারাণী ঝি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "তা হ্যাঁ হারাণ, তুইও তো শুনেছিস্, বল্ না।"

তারাসুন্দরীর প্রাণের ভিতর তখন বড়ই আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল। কে জানে কেন চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। বক্ষঃবেপন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "বল বল, আমার অমূল্যের কিছু হইয়াছে কি?"

যারপরনাই ব্যথিত হইয়া বামনদিদি বলিলেন, "কেন মা তুমি অমন কর। নিশ্চয়ই ক্ষেমা সর্ব্বনাশীর মিছা কথা। দাদা বাবু কি করিয়াছেন যে, তাঁহার জেল হইবে?"

"জেল! অমূল্য আমার জেলে গিয়াছে!" হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারিত করিয়া শরাহতের ন্যায় তারাসুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। দিনের কোলাহল নিবিয়া গিয়া চারি দিক শান্ত হইয়া আসিতেছিল। অন্ধকারে ছায়াপথ বাহিয়া, নীরবতা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিতেছিল। রজনীর সেই অন্ধকারময় প্রথম যামে নীরব গৃহতলে নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া পরিচারিকাগণ দেখিল, তারাসুন্দরী আহতা মৃগীর ন্যায় বিষম যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

প্রহর অতীত হইয়া গেল। তারাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ। নয়ন জলশূন্য, হৃদয় স্পন্দনরহিত, কেশপাশ আলুথালু, বদনমণ্ডল ঝটিকারম্ভকালীন ঘনগুরু আকাশের ন্যায় বিষাদগম্ভীর ও ভীতিবর্দ্ধন। দেখিলে ত্রাস জন্মে। ইতিপূর্ব্বে গৃহে আলো দিয়া গিয়াছিল। উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সেই আলোক বাহিরে আসিতেছিল, সেই আলোকে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া পরিচারিকাগণ শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদিনীর ন্যায় একবার উদাস নয়নে তীব্রদৃষ্টি করিয়া, তারাসুন্দরী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ত্রস্তপদে পরিচারিকাগণ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

বাহিরের রাস্তার দিকের জানালার কপাট ধরিয়া, অনেকক্ষণ তারাসুন্দরী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—এত স্থির যে ঠিক্ যেন প্রস্তরমূর্ত্তি। নাসায় নিশ্বাস বহিতেছিল কি না, তাহাও সন্দেহ জন্মে। তখন অন্ধকার অনেক তরল হইয়া আসিয়াছিল, সেই অন্ধকারে যতদূর লক্ষ্য হয়, ততদূর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নির্ব্বাকে স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন। প্রকাণ্ড দর্পণ আলোকের চূর্ণরশ্মিসম্পাতে ঝক্ ঝক্ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই দর্পণমধ্যে আপনার বিকৃতমূর্ত্তি দেখিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বটে, তাই বাছা আমার এখনও মা বলিয়া ঘরে আসিল না। তাই আমি এত ধড়ফড় করিয়া মরিতেছিলাম। এত করিয়াও আমি কিছু করিতে পারিলাম না। শেষ আপনার ফাঁদেই আপনি জড়াইয়া পড়িলাম। বাছা আমার—যাদু আমার—কেন আমি মা হইয়া তাহার এই সর্ব্বনাশ করিলাম? কেন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া শত্রুর হাতে তুলিয়া দিলাম? কেন আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিলাম? ডাকিনীর মূর্ত্তি ধরিয়াছিলাম কি আগেই আপনার

বাছাকে খাইবার জন্য ? হায় হায় আর কি সে চাঁদমুখ দেখিতে পাইব না ? সেই কোমল প্রাণ এত কষ্টে কি বাঁচিবে ? অমূল্য রে—বাপ আমার—"

ব্রণমুখ কাটিয়া গেলে যেমন রুধিরস্রোত নির্গত হয়, তেমনি দর দর ধারায় অশ্রুস্রোত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই নয়নজলে কপোল, চিবুক ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিলেন।

সহসা কি মনে উদয় হইল, তারাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন, "না না—এ শোকের সময় নয়। বাছা আমার কারাগারে কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতেছে, আর শত্রু গৃহে গিয়া হাসিমুখে আনন্দ করিতেছে—এ সময় শোকের নয়, কাঁদিবার অনেক সময় আছে, আগে শত্রুর চক্ষু দিয়া জল বাহির করি, আগে তার প্রাণে এমনি আঘাত করি, তার পর প্রাণ ভরিয়া যত পারি কাঁদিব। এখন কাঁদিব না। তাহা হইলে শত্রু আরও হাসিবে। এবার আর কাহারও উপর নির্ভর করিব না। আপন হাতে কাজ সারিব। সাক্ষী, হাকিম, বিচার—কিছুরই অপেক্ষা রাখিব না। শেষ অস্ত্র যখন আবশ্যক হইবে প্রয়োগ করিব বলিয়া যত্নে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহা আজ প্রয়োগ করিব।" গ্রীবা উন্নত করিয়া, আলুলায়িত কেশ দুলাইয়া কঠোর দৃষ্টি করিয়া তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—"দেখি দেখি, কার সাধ্য তাহা ব্যর্থ করে ? নরক সহায় হও ; ডাকিনী যোগিনী ভৈরবী পিশাচী সকলের সর্ব্বনাশিনী শক্তি আসিয়া আশ্রয় দাও। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—আগে প্রতিহিংসা, তার পর অন্য কথা।"

কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পলকহীন দৃষ্টি অনলকণা উদ্গীরণ করিতেছে, দন্তে দন্তে নিপীড়িত হইয়া কীটি কীটি ধ্বনি উঠিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাসে বুকের সমস্ত পাঁজরা গুলা ফুলিয়া উঠিতেছে, কেশপাশ স্কন্ধবিক্ষিপ্ত হইয়া পৃষ্ঠভাগে দুলিয়া দুলিয়া লুটাপুটি খাইতেছে, অঙ্গের বস্ত্রও শিথিলতা প্রযুক্ত দেহ হইতে স্খলিত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। শাবকহারা কুপিতা সিংহিনী যেমন আততায়ীর উদ্দেশে গর্জ্জন করিতে করিতে ভীষণা হইয়া দণ্ডায়মান হয়, সে মূর্ত্তি তেমনি ভীষণা হইয়াছে।

ধীরে ধীরে বাক্স মধ্য হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া যতনে তাহা বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একবার গৃহগাত্র সংলগ্ন ঘটিকার প্রতি চাহিলেন। তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল। "আর না—আর না—সময় বহিয়া যায়।"

ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া পিড়কির দ্বার খুলিয়া তারাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন। কাঠের পুতুলের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পরিচারিকাগণ দাঁড়াইয়া রহিল। একটিও কথা কাহারও মুখে আসিল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে অলক্ষিতে এক জন লোক ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

ক্রমশঃ।

সাংখ্যস্বরলিপি।

পরিচয়।

শঙ্করা—তাল পটতাল।

দেখে দেখে লোক বুঝেছি আলোক হই সাবধান ভাবী ভাবীভ্রম;
কি হেতু বিলাপ কি হেতু প্রলাপ বুঝেছি কিরূপ সরম বিভ্রম;
(এবে)—ছাড়ি অপলাপ করিছি আলাপ বুঝেছি কিরূপ এ মান সম্ভ্রম।

তালি। ১ঃ (স্থা, স্ত আরম্ভ)। ০।
মাত্রা। ৪ । ৪।

২
বা সূবে সা। নি ধা

২
(স্থা) । নসা সা "নি ধা । পা মা"— ২পা ।
(স্থা) । দে খে দে খে । লো — ক্ ।

২
। পা নি ধা ধ্সা । ৪নি । পা পা গা২ । গপা৪ ।
। বু ঝে ছি আ । লোক্ । হ ই সাব্ । ধান্ ।
। গা — মা রে গা — । রেঃ — সাঃ ২সা । সা সা
। ভা — বি ভা । বী — ভ্রম্ । হ ই

২
সগাঃ — নিঃ । ২রে ২সা । গা মা পা প্সা ।
২
সা — । —ব্ ধান্ । ভা — বি ভা ।

২
নি — ধা — ধ্সা নি । পাঃ — ধাঃ — পাঃ — ∧মাঃ — পাঃ —
বী — — — । — — — — —
গা — রে । — গা — রে ২সা । (স্ত—প্র) । পা পা
— — । — — ভ্রম্ । (স্ত—প্র) । ফি হে

২ ২
নি নি । ৪সা । সা সা সূরে নি । ৪সা
তু মি । লাপ্ । কি হে তু প্র । লাপ্

সূবের রে সা । সা৪ । । সূবের সা — নি । — ধা
বু ঝে — । ছি । । বু — — । —
— পা — ∧মা — পা । — গা২ — গমা সা । সা৪ । মা২
— — — । — — ঝে । ছি । কি

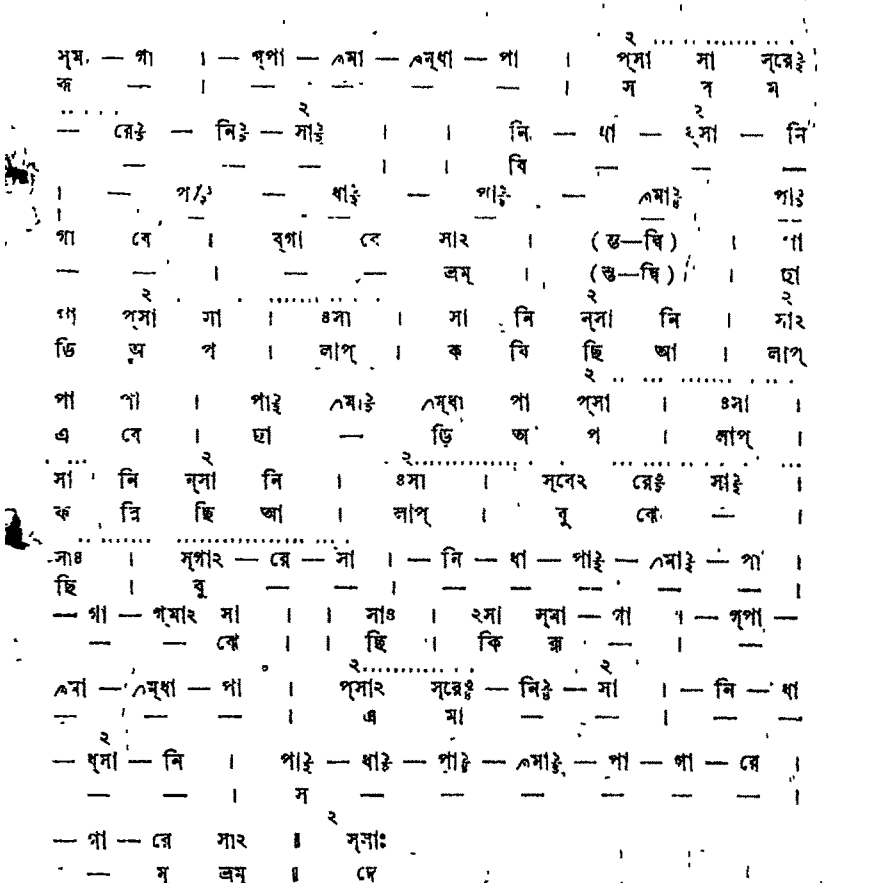

এইবার হইতে আমরা স্বরযোগের মুখ্যচিহ্নকে শুদ্ধ স্বরযোগের প্রকৃত—বিশেষ চিহ্নরূপে এবং তাহার গৌণচিহ্নত্ব কমা বা ছেদ এবং ব্যবধানকে বিয়োগচিহ্নরূপে দেখিব। ইহাদিগকে এইবার হইতে স্বরবিয়োগচিহ্নরূপে ধরা যাইবে। কিন্তু এই স্বরবিয়োগচিহ্ন সাধারণ স্বরযোগাদ্ভাবের অধীনে থাকিবে। কারণ, যেমন সত্ত ও অসত্তের মধ্যে সত্ত প্রধান, সেইরূপ যোগ ও বিযোগের মধ্যে যোগ প্রধান। যোগের আপেক্ষিক ভাবে বিয়োগ কার্য্য করে। মূলে যোগের প্রাধান্যতেই দেখা যায় যে, কোথাও বিযোগ খাঁটি বিয়োগভাবাপন্ন নয়, কিন্তু যোগাত্মক বিযোগভাবাপন্ন।

স্বরবিয়োগের চিহ্ন = — =, = ব্যবধান।

এখন হইতে স্বরবিয়োগ এবং থামাকে একপ্রাণ বলিয়া ধরিতে হইবে; তাহাদের মধ্যে স্থূলতঃ কোনও ভেদ নাই। অপর এক সময়ে ইহা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্মযোগী ভূদেব ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক এত দিন অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, আজি তাহা অস্তমিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য!

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশ মনীষিশূন্য হইয়াছে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী বঙ্গে পাদক্ষেপ করিয়াই ভূদেব ও বিহারীলালকে হরণ করিল। যাহা গেল, তাহা বহুমূল্যবান; ক্ষতিপূরণের আশা অল্প।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপ, মিলনবিন্দুস্বরূপ, ভূদেব এ দেশে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদর্শী ধীর সংস্কারক, পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্ত্তব্যশরণ কর্ম্মযোগী, স্বয়ং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য, ভূদেব, স্বীয় জীবিতকাল কর্ম্মযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভূদেবের জীবিতকালে তাঁহাকে বিষয়ী সংসারী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার দেহাত্যয়ের পর দেখা গেল, ভূদেবের শাস্ত্রচর্চ্চা নিষ্ফল নহে; গীতার উপদেশে তিনি নিজ জীবনযাত্রা, সংসারপ্রণালী নিয়মিত করিয়াছিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষক ও শিষ্য, নিষ্কাম ভাবে চিরজীবনসঞ্চিত প্রচুর অর্থ দান করিয়া বঙ্গে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র, তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে, তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এক দিকে বিলাতী শিক্ষার ঝলসকারী উজ্জ্বল চাকচিক্য, অন্য দিকে স্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ব্বাণোন্মুখ বিকৃত রহিরালোক, ভূদেব উভয়ের একটিকেও নিজের লক্ষ্য করেন নাই। বিচারকুশল প্রাচীনকালের প্রবীণ আর্য্যের ন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তির সাহায্যে, উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন— চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় এক দিকে প্রধাবিত বাঙ্গালী সমাজে এ দৃশ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না,—নিজের চিন্তা ও বিচারশক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি,—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে আন্তরিকতা বড় অল্প। কিন্তু ভূদেবে এই আন্তরিকতা বড় প্রবল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যবিলাসের উদাহরণমাত্র নহে, তাঁহার আন্তরিকতার ফল। তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজকেও সেই কর্ত্তব্যপথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কারকের আড়ম্বর ছিল না। পারিবারিক প্রবন্ধে যে হিন্দু পরিবারের চিত্র দেখিতে পাও, ভূদেব নিজের পরিবারটি তদনুরূপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের আদর্শেই তিনি সমাজের সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আচার প্রবন্ধে তিনি যাহা সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে সেই আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবন ও জীবনের কার্য্যে এমন ঐক্য, বাঙ্গালীজীবনে দুর্লভ।

ভূদেব বাবুর সকল মত সকলের অনুমোদিত বা স্বীকার্য্য হইবে, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়া বিরত হন নাই, নিজে আজীবন স্বকীয় অভিমতকে ভিত্তি করিয়া, আত্মপরিবার গঠন করিয়াছেন, সমাজের সহিত ব্যবহারে আসিয়াছেন, সদাচারপূত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে, ধর্ম্মচিন্তায় এবং স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলানুধ্যানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং সেই জীবন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তাহার পরিণাম, বাঙ্গালীর উত্তম আদর্শ;—তাঁহার চরিত্র, পরার্থপর অথচ আত্মস্থ,—সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্কাম বীরের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

ভূদেব নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলাতী শিক্ষায় ও ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও, স্বদেশীয় শাস্ত্রে আস্থাবান ছিলেন। তিনি আজীবন অধ্যাপকশ্রেণীর ভক্ত ছিলেন,—মৃত্যুকালে সেই হৃদয়ের ভক্তি কার্য্যে পরিণত ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভূদেব যে অর্থরাশির উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" "অর্থসঞ্চয়" ও মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিজের

জীবনে তাহার অনুশীলন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রায় সমুদায়—দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা, সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষার, হিন্দু শাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মনে করিয়া দেখ, গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান,—চিরজীবনের কঠোরপরিশ্রমলব্ধ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত করিলেন। ভূদেব যদি আর কিছুও না করিতেন,—কেবল এই এক সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানে তাঁহার নাম বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবন-তত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।

রত্নাবলী

নিস্তব্ধ নিশীথ অতি, লতা-বাস ল'য়ে করে,
বহিছে জ্যোছনা-স্নাত বিজন বাগান পরে।
নতজানু হ'য়ে বালা বসি বকুলের তলে,
মুখেতে চাঁদের আলো, তরুছায়া পড়ে কোলে।
লতাটির মত ক্ষীণ সুললিত তনু তার,
এলায়ে প'ড়েছে পিঠে দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার।
শুভ্র ফুল দলে যেন মধুর মুখানি গড়া,
স্বর্গ পানে উন্মীলিত স্বপন-আবেশ-ভরা।
দুখানি কপাল আঁখি, মেঘের স্নিগ্ধতা মাখা,
নিবিড় তিমির তারা পল্লবে আধেক ঢাকা!
পরিপূর্ণ অশ্রুবাষ্প টলমল, ভাবি পরে
থর থর চন্দ্রালোকে কাঁপিতেছে সকাতরে।
রক্তপুষ্পপুটতুল্য কম্প ওষ্ঠাধর দুটি
সৌরভ মধুর ভরে করে যেন ফুটি ফুটি।
নবনীনিন্দিত বুক আধ অনাবৃত করি
অঞ্চল পড়িছে খসি, হাত খানি তদুপরি
রাখিয়া, করুণকান্তি সুকুমারী কচি মেয়ে
বিষাদকোমল ভাবে আকাশের পানে চেয়ে
কহিছে কাতর কণ্ঠে,—"হে কন্দর্প, দয়াময়!
কেন প্রেমপুষ্পশরে বিঁধিয়াছ এ হৃদয়?
অসাগরা ধরণীর তিনি রাজরাজেশ্বর;
ধনে মানে রূপগুণে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজন পর;
লক্ষ্মীর প্রতিমা সম রূপবতী রাণী তাঁর,
নহি আমি পদপ্রান্তে দাসীযোগ্যা হইবার।
আমি ভালবাসি তাঁরে! শুনিলে হাসিবে পরী,
তবে এ দুষ্ট সাধ কেন গো হৃদয়ভরা?
কত উর্দ্ধে ঐ চাঁদ সোনার তারার দলে,
রজত রজনীগন্ধা ফুটে হেথা ধরাতলে!
ইহার সৌরভ কেন উচ্ছ্বসিছে ওর পানে?
নাগাল না পাবে কভু এ কি তাহা নাহি জানে?
প্রভাতে এ বাসে ঝরে' ধূলায় সকল ব্যথা,
কেহ না জানিতে পাবে গোপন প্রাণের কথা।
তেমনি নিশীথে এই অনাথা দুখিনী বালা,
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে নিবাবে প্রেমের জ্বালা।
এই ভাঙ্গা শপ্পগুলি চরণপরশে তাঁর
হ'য়েছে পবিত্র অতি, শেষ শয্যা এ আমার!
প্রভাতভ্রমণে কাল এসে হেথা নরপতি,
চমকিয়া হেরিবেন হইয়া বিস্মিত অতি,
তরুমূলে বৃন্তচ্যুত বিশুষ্ক যুথিকা সম,
পড়ে' আছে প্রাণহীন এ তরুণ তনু মম!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

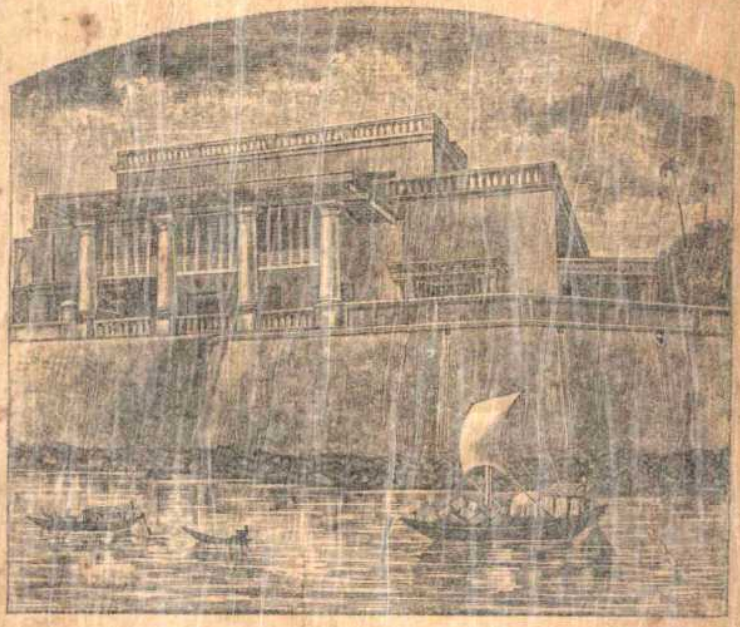

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যে, বাস্তববাদ (Realism) ও আদর্শবাদ (Idealism) এতদুভয়ের কলহ নূতন না হইলেও, আজকাল বড় বেশী মাত্রায় চলিয়াছে। বাস্তববাদের এমনই মোহ যে, লোকে পরিণাম গণনা না করিয়া দলে দলে উহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। আর লোকের মতি-গতি বুঝিয়া বাস্তববাদী লেখকেরাও পদ্ধতিটাকে দিন দিন নিতান্ত হীন ও জঘন্য করিয়া তুলিতেছেন। যাঁহারা পবিত্র শিল্পসৌন্দর্য্য এবং আদর্শের উপাসক ও মনুষ্যসমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের বাস্তবিকই একটা বিষম ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।

Realismএর প্রভাব।

এপ্রিল্ মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে, কাউণ্টেস্ কাউপার উপরি-উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। Realism কিম্বা Idealism প্রকৃতপ্রস্তাবে দুষ্য না হইলেও, ইহাদের উপর কলঙ্কের দাগ লাগিয়াছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কাউণ্টপত্নী শব্দ দুইটির অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বাস্তববাদীগণ Realiam কথাটার প্রকৃত অর্থ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ডাক্তার জন্‌সন্ বলেন, "যাহা সত্য, প্রত্যক্ষ, অকৃত্রিম, তাহাই Real; আর যাহা মানসিক, বুদ্ধিগত, কল্পিত, তাহাই Ideal."

Real ও Ideal ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি?

আপাততঃ দুইটি পদার্থকে নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এতদুভয়ের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ট; এমন কি, কলাবিদ্যায় একটিকে অপরটি হইতে বিযুক্ত করিলে উভয়েরই প্রভূত ক্ষতি। কাব্য-সাহিত্যে উভয়েরই অল্প বিস্তর প্রয়োজন আছে; Real এবং Idealএর সম্মিলন দেখাইতে না পারিলে কোনও কাব্যগ্রন্থই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

এই সম্মিলনের উপায় কি? কাউণ্টেস্ তাহা বলিয়া দিয়াছেন,—"যাহা সত্য ও প্রকৃত, তাহারই উপর গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তৎপরে বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার সাহায্যে উহার বিশিষ্ট বিকাশ সম্পাদন কর। কিম্বা যদি কল্পনার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে যাহাতে সেই কল্পনা পরিণামে সত্য ও প্রত্যক্ষ কোনও একটা পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হও।"

সম্মিলনের উপায়।

সচরাচর সত্য ও মিথ্যা ভেদে দুই প্রকারের Realism ও Idealism দৃষ্টিগোচর হয়। যথার্থ বাস্তববাদী জগৎকে যেরূপ দেখেন, ঠিক সেইরূপই বর্ণনা করেন; দোষ-গুণ, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য, কিছুই ঢাকিয়া রাখেন না। কিন্তু যিনি ইহার অপব্যবহার করেন, তিনি সৌন্দর্য্যাংশগুলি চাপা দিয়া, কেবল কুৎসিতের বর্ণনা করেন, অথবা, যাহা ছায়া এবং আলোক উভয়েই গঠিত, তাহাকে কেবল নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া ফেলেন। প্রকৃত আদর্শবাদ, সত্য ও বাস্তবের উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে কমনীয় রূপ ও গুণরাশি দ্বারা এরূপে বিভূষিত করেন যে, আমরা উহার অপূর্ব্ব, অপার্থিব সৌন্দর্য্যে একেবারে বিমোহিত হইয়া যাই। কুটা আদর্শবাদীগণ, দাঁড়াইবার স্থলটাকে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবিয়া, একবারে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হন; আর এই ধূলি-মৃত্তিকাময় সংসারের সহিত কোনও প্রকার সম্পর্ক লজ্জাকর মনে করিয়া, কোন্ নিরুদ্দেশ সাগরে

Realism ও Idealism সত্য ও মিথ্যা ভেদে বিবিধ।

আপনাদের কল্পনা-তরণী ভাসাইয়া দেন। এই প্রকার কপট Realist ও কপট Idealist, উভয়েই নিন্দার্হ।

বাস্তববাদীগণ আত্মপক্ষসমর্থনার্থ দুইটি যুক্তি প্রদান করেন। প্রথম,—কুৎসিতের ভিতরেও সৌন্দর্য্য আছে; তাহা কেবল Realist দেখিতে পান। দ্বিতীয়,—সকল অবস্থাপন্ন লোক ও সকল জিনিষেরই চিত্র অঙ্কিত করা কবির কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্র অশ্লীল ও হেয় হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ, উহা স্বভাবের অবিমিশ্র, নিখুঁত ফটো। Realist কেবল আবরণখানি উন্মোচন করিয়া দেন। প্রথম কথাটি মন্দ নহে। দ্বিতীয় কথাটির কোনও মূল্য নাই। কারণ, যাহা অশ্লীল ও হেয়, তাহা কোনও মতে কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আসল কথা, বাস্তববাদীগণ আপনাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারাই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তিবশতঃ ইহাঁরা Idealismএর ছায়া দেখিলেও আতঙ্কে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইঁহারা Real ও অশ্লীল এতদুভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন;—যেন Real হইলেই অশ্লীল। ইঁহাদের বিশ্বাস যাহা আদর্শ, তাহা সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু সত্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। এইরূপে বাস্তব ও আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান ইহাঁদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং Realisticএর নাম শুনিলেই আজ কাল আমাদের মনে অতি ভীষণ একটা বীভৎস ভাবের উদয় হয়। ইহা সমাজের পক্ষে বড় শুভকর নহে।

বাস্তববাদীর যুক্তি।

বাস্তববাদীর ভ্রম।

—ফরাসী-রাজ্যে চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য এখন Realismএর পূর্ণাধিপত্য। জার্ম্মাণি, বেল্‌জিয়ম প্রভৃতিও সেই পথের পথিক। পারিসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে কয়েক বৎসর হইল, ৩০০ হাজার করিয়া যে চিত্র প্রদর্শিত হইত, তাহার অধিকাংশই অশ্লীল উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি; অথবা অস্ত্রচিকিৎসালয় হইতে গৃহীত মুমূর্ষু বা মৃতের ভীষণ প্রতিকৃতি।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য।

সাহিত্য,—উপন্যাসের অবস্থাও তদ্রূপ। কয়েক জন ফরাসী ঔপন্যাসিক মানব-প্রকৃতির নিকৃষ্টতম অংশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে এমন লোক আছে, যাহারা সম্পূর্ণতার পূর্ণাবতার,—কোনও প্রকার সৌন্দর্য্য বা সাধুতার লেশমাত্র তাহাদের ভিতর দেখিতে পাইবে না। এই সকল মানব-পশুর আপাদমস্তক ছবি তুলিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, পূর্ণপাপিতা বিশ্বপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আলো ও ছায়ার ন্যায় এ জগৎ সর্ব্বত্রই ভাল মন্দে মিশ্রিত। অধিকন্তু, কোনও চরিত্রে মন্দের অত্যন্ত আধিক্য থাকিলেও, তাহাকে সেইভাবে চিত্রিত করিয়া কোনও উপকার নাই; বরং অপকার আছে। একদেশদর্শী চিত্রের শিক্ষা সর্ব্বথা নিষ্ফল; লাভের মধ্যে নূতন নূতন পাপাচার সম্বন্ধে লোকের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যায়।

সাহিত্য,—উপন্যাস।

মুঁসো জোলার নবেলগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষকে অতি কদর্য্য অবস্থায় স্থাপিত করিয়া, তিনি তাহাদের কদর্য্য পাশব-লালসার এরূপ জীবন্ত ও রঙ্গভঙ্গীময় বর্ণনা প্রদান করেন যে, তাহাতে পাঠকের অবৈধ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন, আর কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। জোলা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, তাহা মুঁসো বুর্জেট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

জোলা ও বুর্জেট।

রঙ্গালয় ও নাটকের অবস্থা আরও শোচনীয়। এমন কদর্য্য, অশ্লীল দৃশ্য নাই, যাহা আজ কালকার নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত না হইতেছে। ইহা নাটককারের দোষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিনেতা মহাশয়েরাও নিতান্ত সাধু নহেন।

রঙ্গভূমি,—নাটক।

বাস্তববাদীগণ যদি বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী হন, তবে ইন্দ্রিয়জাত সুখ দুঃখ এবং বিকৃত বা পীড়িত মস্তিষ্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাদের সহজবুদ্ধিটা একটু সূক্ষ্ম করিয়া লউন; আর জাগতিক পদার্থসমুদায়ের বাস্তবিক যে অবস্থা, তৎপ্রতি মনোযোগী হউন। আদর্শের কথা একবারে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যে হেতু ঐ উপেক্ষাই তাঁহাদের দুর্গতির একমাত্র কারণ।

বাস্তববাদীর কর্ত্তব্য।

মনুষ্যপ্রকৃতি যে বাস্তববাদে সন্তুষ্ট নহে, তাহার একটা প্রমাণ ফটোগ্রাফি। ক্রমওয়েলের মত আজ কাল আর বড় কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না—"Paint me as I am, or I wont pay you a shilling." ফটোগ্রাফারদিগকেই জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বাবু ও বিবিগণের অন্যায় আবদারে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি নিতান্ত কালো, তিনি চান মুখখানি শ্বেতপদ্মের ন্যায় সুন্দর হইবে, আর তদুপরি ঈষৎ গোলাপীর একটু আভা খেলিবে। যাঁহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, ক্ষুদ্রাকৃতি, তিনি বলেন, চক্ষু দুইটি ভাসা-ভাসা বিশালায়ত না হইলে ছবি লইবেন না। ইত্যাদি আরও অনেক আবদার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়। খোদার উপর এই খোদ্‌কারী ভাল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ফটোগ্রাফি যে Realism-এর একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ঠিক।

ফটোগ্রাফি ও বাস্তববাদ।

কাউন্টেসের শেষ কথাগুলি বড়ই সত্য এবং প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের জন্য আমরা আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়া দিলাম।—"বিশাল আকাশের মত একটা উচ্চ আদর্শ মাথার উপর না রাখিয়া, কেবল Realismএর মৃত্তিকা খাঁটিয়া বেড়াইলে কর্দ্দম ও ময়লার ছিটাই আমাদের পুরস্কার। অন্য পুরস্কারের আশা করাও অন্যায়। পক্ষান্তরে, চতুর্দ্দিকব্যাপী সত্য ও প্রত্যক্ষের সংস্পর্শ একবারে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল স্বপ্ন ও কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া থাকিলেও চলিবে না। স্পর্শক্ষম সহজবোধ্য সত্য প্রত্যক্ষের প্রতি মনুষ্যের যে একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, উহাতে তাহার অবমাননা করা হয়। আমরা পূর্ণতার ভিখারী। এ জগতে অসম্ভব হইলেও অপর কোনও জগতে তাহা মিলিবে না, এমন কে বলিতে পারে? অতএব যদি পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে বাস্তব ও প্রত্যক্ষের উপর কাব্যের ভিত্তি সংস্থাপিত কর; তার পর, সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কল্পনা করিয়া, উহার সহিত সংযোজিত করিয়া দাও।"—অর্থাৎ, কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার Skylark সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, কাউন্টেস্ কাব্যকারদিগের সমক্ষে সেই আদর্শই ধরিতে চান—

কাউন্টপত্নীর শেষ কথা।

"Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home."

আদর্শ-উন্নতির পথে মনুষ্য-সমাজের সাহায্য করাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমাদের অভাব কি, বুঝিতে হইলে, কি আছে, তাহারও কতকটা জ্ঞান থাকা চাই। এইখানেই Realএর আবশ্যকতা। তবে মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনার্থ যতটুকুর প্রয়োজন, কাব্যগত Realism যেন তাহাকে অতিক্রম করিয়া না উঠে। অশ্লীলতায়, কুৎসিত কদর্য্য দৃশ্যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আর, কাউন্টেস্ সহোদয়া বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের যে সম্মিলনের কথা বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যপ্রকৃতির পূর্ণচিত্রাঙ্কনে প্রয়োজনীয় হইলেও, বিশুদ্ধ Realismএর একটা উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। জগৎ-পদ্ধতি ভালমন্দে মিশ্রিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ভাল ও মন্দের পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে বিশেষ ইষ্ট-

মীমাংসা।

লাভের সম্ভাবনা। প্রতিভার অধিকারীগণ এ পর্য্যন্ত তাহা করিয়াও আসিতেছেন। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ,—বাল্মীকি, কালিদাস, টেনিসন, হুগো প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত,—সাম্‌বর্টিস্, হুইকট, ইত্যাদি। ব্যঙ্গ-কাব্য, শ্লেষ-প্রহসন প্রভৃতির যে একটা উপযোগিতা আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলে না, অথচ এই সকল গ্রন্থে মনুষ্যপ্রকৃতির কেবল নিকৃষ্ট অংশেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

সমাজ-তত্ত্ব।

উপস্থিত সংখ্যা নাইটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে সার্ জন্ সিমন "আদি কালের সামাজিক শাসন" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

অনৈতিহাসিক কাল হইতে কোনও প্রকার সত্য আবিষ্কার করা বড় সহজ নহে। মানুষের আদিম অবস্থার ছবি আঁকিতে গিয়া আমরা অনেক সময় আপনাদিগকেই চিত্রিত করিয়া ফেলি। সত্য-মিথ্যা, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে সভ্য নর-নারীর যে জ্ঞান, আমরা ভাবি, অসভ্যাবস্থায়ও ঠিক ততদূর না হউক, কতকটা এই রকমই ছিল। সুতরাং, এ সকল কথার কোনও সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অতীব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীস্থ সকল প্রাচীন জাতির ইতিহাসের প্রথমাংশ বংশপরম্পরাগত কিম্বদন্তীতে পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিষয়ে এই সকল জটিল জনপ্রবাদই আমাদের প্রধান অবলম্বন। প্রাণীবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ হইতেও কতকটা আলোক পাওয়া যায়। পরন্তু, এখনও অনেক জাতি সভ্যতার অতি নিম্নতম সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের অবস্থার সহিত আমাদের পূর্ব্বোপায়লব্ধ তত্ত্বগুলির সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইলে তাহা বোধ করি অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। জীবজগতে আত্মরক্ষা ও আত্মসুখসাধনই প্রকৃতির প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। এই নিয়মের বশে মানুষ নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একমাত্র বিবেক বা হিতাহিতবুদ্ধি ব্যতীত মানবমনে এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির অপর কোনও অন্তরায় নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বংশরক্ষা ও অপত্যপালনেরও একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

জীবন-সংগ্রামে পরস্পরের সহায়তা প্রকৃতির আর একটি নিয়ম। এই প্রবৃত্তি যে জাতির মধ্যে যত প্রবল, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিবার তাহাদের ততই সম্ভাবনা। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, এই দুই বৃত্তির যথাপরিমিত ও সুসঙ্গত পরিচালনই মানব-জাতির উন্নতির উপায়। নীতিবিজ্ঞান আর কিছুই নহে; কেবল এই দুই বৃত্তির মধ্যে কোনও প্রকার বিরোধ উপস্থিত না হইয়া যাহাতে সাধারণের হিতসাধন হয়, তাহারই ব্যবস্থামাত্র।

ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে যে সকল মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ বংশ বা পরিবার হইতে সমুদ্ভূত। এই সবল পরিবার বা বংশ কালক্রমে বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইয়া পরিশেষে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ খুব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে, পরস্পরের মধ্যে যে কখনও শোণিতের সম্পর্ক ছিল, তাহা আর কাহারও মনেই আইসে না। কিন্তু, যেমন এক দিকের বন্ধন এইরূপে ঘুচিয়া যায়, স্বশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি প্রাণের আকর্ষণটা তেমনই বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

আসিরিয়া, মিশর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাসে যে সমুদয় যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে তদানীন্তন লোকের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ

হয়। আর এই সকল সংগ্রাম ও কলহ যে অনৈতিহাসিক পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেও সংশয় থাকে না। চারিদিকে কেবল হত্যা ও শোণিতপাত। প্রাচীনতম কিম্বদন্তীসমূহও ইহার সাক্ষী। রাক্ষস, দৈত্য, অসুর ইহারা মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ, বিজয়লাভার্থ কেবল রক্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইত। দেবতারাও মানবের সাহায্যার্থে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেন। পুরাণ-কল্পিত স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত সংগ্রামস্রোতে বিপর্য্যস্ত। এ স্বর্গলোক আর কিছুই নহে;—তখনকার ভূলোকেরই অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে যে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে, কত জাতি যে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্য স্থির করিয়া বলা সম্ভাবিত নহে। আধুনিক সুসভ্য সমরের বিগ্রহাদির পরিণাম ভাবিয়া দেখিলেই তাহা অনেকাংশে উপলব্ধ হইবে। কিন্তু তথাপি ইহাতে এমত বুঝায় না যে, তদানীন্তন লোকদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কোনও ভাবেরই অস্তিত্বমাত্র ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থপরতা যেরূপ স্বাভাবিক, পরার্থপরতাও তদ্রূপ। বর্ত্তমান স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। একদিকে যেমন স্বার্থরক্ষার্থ শত্রুনাশের আগ্রহ, অপরদিকে তেমনই জাতীয়ত্বের বন্ধন ও প্রতিবেশী সম্প্রদায়বর্গের সাহায্য।

উপরি-লিখিত জাতীয়ত্ব কথাটার উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, ঐ জাতি-স্নেহ বশতঃই ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতি-গত স্বার্থের ভিতর ডুবিয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জাতির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। কোনও দৈব দুর্ঘটনা না ঘটিলে জাতিভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কখনও কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইত না। জাতিবিশেষের অভ্যন্তরে পূর্ণ সহানুভূতি ও সহায়তার ভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত। ১৮৯১ সালের এপ্রিল সংখ্যা সেঞ্চুরীতে প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ এ কথা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের উপর জাতিগত জীবনের এতদূর প্রাধান্য ছিল যে, প্রতি বৎসরেই রাশি রাশি লোক স্বজাতির কল্যাণার্থ দেবতার সমক্ষে আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত সানন্দে বলি দিত।

জাতি-প্রাধান্যের জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ আর একটা কথা লিখিত হইতেছে। খাদ্যাভাবের ভয় প্রাচীনদিগের মধ্যে এরূপ প্রবল ছিল যে, যাহাতে কোনও লোক খাদ্য-আহরণে কোনও প্রকার সাহায্য না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া উদর পূর্ণ করিতে না পায়, তদ্বিষয়ে নানা উপায় অবলম্বিত হইত। যাহারা অকর্ম্মণ্য, বৃদ্ধ, পীড়িত,—কেবল সমাজের ভারস্বরূপ,—তাহাদিগকে আত্মহত্যা দ্বারা কিম্বা অপরের সাহায্যে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। জাতি-রক্ষার্থ যতদূর প্রয়োজন, নবজাত শিশুদিগের সংখ্যা তাহার অতিরিক্ত হইলে, তাহারাও বিনষ্ট বা পরিত্যক্ত হইত। এই নিয়মটা প্রধানতঃ কন্যা বা রুগ্ন সন্তানদিগের উপরেই খাটিত। যাহাতে বেশী সন্তান জন্মাইতে না পায়; সে জন্যও কতকগুলা কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত ছিল।

সিমন্ সাহেব বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রথা হইতেই মানব-মনে ক্রমশঃ নীতিজ্ঞানের উদয় হইল। তাঁহার কথাগুলি এইস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম;—"যে জাতি জীবন মরণের উপর এরূপ প্রভুত্ব চালাইত, তাহারা কখনই নীতির সাধারণ স্বাভাবিক সূত্রগুলি উপেক্ষা করিতে পারিত না। বিপদআপদের পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থ এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়ের প্রয়োগার্থ ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই তাহাদের ক্রমশঃ একটা শিক্ষালাভ হইয়াছিল। এইরূপে, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে মারিতে হইবে, কোন্ উপায় ছাড়িয়া কোন্‌টিকে বাছিয়া লইতে হইবে, ইত্যাকার বিষয়ের বিচার করিতে করিতে মানবের চিন্তা সত্বরেই নীতির গভীর তত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইল।" তা'র পর ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত সাধুচিত্তের লোকেরা স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া

পরার্থের কথা ভাবিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা ব্যক্তিগত স্নেহবশতঃ বৃদ্ধ ও বালকদিগের হত্যাবিষয়ে জাতীয় সভায় আপত্তি উত্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে কোনও কোনও আপত্তি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, দুর্ব্বলের রক্তপাত করিয়া বলসঞ্চয়, এবং প্রকৃতির বিরোধী নিষ্ঠুর ও অশ্লীল উপায়াবলম্বনে আত্মোন্নতি-লাভ, উভয়ই নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

উপসংহারে সারজন সিমন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন—"যেদিন জাতি-বিজাতির সম্বন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি তর্কের সাহায্যে নিরূপিত হইবে, সকলে একমাত্র বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে, পরস্পরের উপর আর নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না, সেদিন—সেই শুভদিন, যত বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আসিতেছে।" সিমন্ মহোদয়ের মানব-হিতাকাঙ্ক্ষার জন্য ধন্যবাদ দিয়া, এবং তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনভার পাঠক মহাশয়দিগের উপর অর্পণ করিয়া, আমরা বিদায় লইলাম।

+ + +

"এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার" মে মাসে প্রকাশিত সংখ্যায়, "পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান" ইতিশীর্ষক একটি ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বাইস্ উক্ত বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ রচিত করেন, বর্ত্তমান সন্দর্ভ তাহারই সারসংকলন। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস কোন্ কোন্ অংশে খাঁটি মহম্মদীয় ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন, এবং তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার কতটা হিন্দুভাবমিশ্রিত—তাহাই প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য কোন্ কোন্ কারণে সংভূত, তাহাও বিবেচিত হইয়াছে। শেষ কথাটার আলোচনাই বোধ হয় সাহিত্যের পাঠকবর্গের অধিকতর কৌতূহলপ্রদ হইবে, সেই জন্য আমরা উহারই অবধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ, মুসলমান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত না থাকিলে, অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা তত প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৮৭২ সালের লোকগণনায় স্থির হয় যে, নিজ বাঙ্গালায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অতি বহুল—ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে সেরূপ নহে। ইহার হেতু কি?

উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে যে অনেক মুসলমান পরিবার এদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে, এ কথার প্রমাণাভাব। বরং ইহাই ইতিহাসসিদ্ধ যে, বাদসাহ আকবরের সময় বঙ্গদেশের জলবায়ু এত অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, নবাবসুবাদিগকে এদেশে পাঠাইলে তাঁহারা আপনাদিগকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত মনে করিতেন। কিন্তু একটা ব্যাপারের কিছু মীমাংসা করা যায় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ উপকূলে এক আরব্য মুসলমান সম্প্রদায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বারবোসা (খৃষ্টীয় ভ্রমণকারী) ঐ প্রদেশ মুসলমানশাসিত দেখিয়া যান। ১৫৭০ সালে সে ব্লাক সোনারগাঁয়ে মুসলমানাধিষ্ঠান দেখিয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ। ১৩৩৮ সালে দেখা যায়, সুবর্ণগ্রামে মুসলমান নবাবের রাজধানী ছিল। তার পর সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান মোল্লাগণের সুবর্ণগ্রামই কেন্দ্রভূমি ছিল। কথিত আছে, জালালুদ্দিনের গুরু ঐ স্থান হইতেই আনীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ কঠোর ধর্ম্মতত্ত্বে দীক্ষিত করেন। পরে জালালুদ্দিন তাঁহার রাজত্বকালে (১৪১৪—১৪৩০) হিন্দু জাতির উপর যারপরনাই অত্যাচার আরম্ভ করেন। হয় যবন—নয় কোরাণ, ইহাই তাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠে। সার্দ্ধ পাঁচ শতাব্দী যুড়িয়া বঙ্গভূমি মুসলমানকরগত ছিল, কিন্তু এরূপ ব্যাপক অত্যাচার আর কখনও হয় নাই। ডাক্তার বাইজ সাহেবের বিশ্বাস যে, মুসলমান জেতার খরধার তরবারির ভয়ে অনেক ভীরু বাঙ্গালী

মহম্মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয় করে। তেজস্বী মুসলমান সেনা সুদূর শ্রীহট্টেও চন্দ্রকলাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন করে।

কিন্তু কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারাই বঙ্গে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। ইহার অন্যান্য পন্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মুসলমান সাম্রাজ্যের একটা অঙ্গ—দাসপ্রথা। বাঙ্গালায় এ প্রথার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। শুনা যায়, দিল্লীর রঙমহলের অনেক খোজা বাঙ্গালা হইতে আনীত হইত। বাইস্ সাহেবের মত এই যে, অত্যাচার অবিচার দুর্ভিক্ষ ও উৎপাতে পীড়িত বাঙ্গালী নৈবাধের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করিত। মুসলমান প্রভুর পরিবারভুক্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ মহম্মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয় করে।

বাইস সাহেব আরও বলেন যে, অনেক বাঙ্গালী হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঐরূপ করিলে অপরাধীর কসুর মাপ হইত।

ঐ প্রথার অনুকরণে কোনও কোনও দুর্দ্দান্ত নবাব এই নিয়ম করেন যে, জমিদার বাকী খাজনার দায়ে পড়িলে, সপরিবারে মুসলমান হইয়া রক্ষা পাইতে পারেন, নহিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।

রাইস সাহেব বলেন যে, উক্ত হেতুনির্দ্দেশে যে এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা হইল, এরূপ কেহ মনে না করেন। কারণ, অধুনা ইংরাজ রাজত্বে ঐ সকল কারণের অভাব সত্ত্বেও মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যথার্থ কারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্মের একটা আকর্ষণ আছে। আর্য্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অনার্য্যপ্রসূত চণ্ডালাদিকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। হিন্দু সমাজে চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য। বোধ হয়, এ কথা বাঙ্গালা সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, আর কোথাও সেরূপ নহে: কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্মে বলে, রাজা প্রজা, দাস প্রভু জমীদার রায়ত সকলই একজাতীয়, এক শ্রেণীভুক্ত, সমাজে সমান সমান। অতএব, চণ্ডাল প্রভৃতির এই সাম্যবাদী মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ কিছু বিচিত্র কথা নহে। হিন্দু চণ্ডাল দাসের দাস,—ব্রাহ্মণাদি মুসলমান দাসের দাস। মুসলমান চণ্ডাল—রাজধর্ম্মাবলম্বী—কাজীর যজাতি—ভূতপূর্ব্ব প্রভুর প্রভু। রাইস সাহেবের মতে, এই শেষোক্ত কারণই বঙ্গভূমিতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভূয়ঃপ্রচারের প্রধান হেতু। এ সকল গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। অতএব আমরা ইহাতে ক্ষান্ত রহিলাম।

শিল্প ও শিক্ষা।

মিষ্টার উইলিয়ম মরিস ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবক ও চিত্রশিল্পী। শিল্প ও শিক্ষা লইয়া আজকাল অনেক তর্কবিতর্ক, বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। "সেরি-গো-রাউণ্ড" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে মিষ্টার মরিসের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বেশ সাংসারিক লোকের মত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন; কবিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার মতের সারাংশ আমরা এখানে দিলাম। সাহেব বলেন, কবিতা বা কল্পনামূলক রচনার জন্য অর্থ প্রত্যাশা করা উচিত নহে। রচনার জন্য কালি, কলম এবং কাগজের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু এই তিন জিনিসের মূল্য বড় অধিক নহে। দুর্ম্মূল্যের অত্যাচার ও অভাবের অভিযোগ নাই। এই সকল রচনার জন্য পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, একবার লিখিতে আরম্ভ করিলেই কলম চলিল। ইতিহাস বা বিজ্ঞা-

কবির রচনার মূল্য।

নের কথা স্বতন্ত্র। সে সকলের জন্য বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক; অনেক অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করিবার পর সে সকল পুস্তক রচিত হয়—তাহার জন্য অর্থপ্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক নহে, বরং উচিত। তিনি বলেন যে, সাহিত্য গোটের উপর অধিক অর্থ আনয়ন করিতে অসমর্থ। সত্য বটে, শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড ছয় বৎসরে প্রভূত ধনলাভ করিয়াছেন; কিন্তু সাহেব বলেন, তাঁহার সময় দিনকাল ভাল ছিল—সুবিধা পাইয়াছিলেন। তখন সাধারণের মনে যে বিষয় বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি সেই বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার সহিত সকলের তুলনা করা সম্ভব নহে।

নৈতিক।

সাহেব বলেন, আজ কাল লোকে নীতিপ্রবণ উপন্যাস লইয়া পাগল। এই যে নিত্যনূতন নীতির নেশা, সাহেব ইহার বড় পক্ষপাতী নহেন, এই যে নব নব নীতির নিয়ম,—সাহেব বলেন,—এ সব কেন? এই সব "novels with a purpose" কেন? তিনি এ সব ভালবাসেন না; তিনি কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য উপন্যাস পাঠ করেন। তিনি বলেন, যদি দর্শন প্রভৃতির কথা বলিবে, স্পষ্ট করিয়া তাহাই বল; সেগুলিকে নভেলের সঙ্গে মিশাইয়া চিনিমাখা ঔষধের বড়ীর মত জোর করিয়া লোকের গলাধঃকরণ করাইবার আবশ্যক নাই। বিশুদ্ধ আমোদের জন্য সকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক অবকাশ, সর্ব্বদা কিছু-না-কিছুর চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাকা ভাল নহে। সাহেব বলেন, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া একটা মস্ত ভুল। যে সকল শিক্ষার কোনও ফল নাই, সেই সকল শিক্ষায় অনেক সময় বৃথা ব্যয়িত হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স হইলেই ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। এবং কাহার কোন বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক আছে, তাহা বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে একই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠে ব্যাপৃত রাখা হয়। যে বিষয়ে যাহার ঝোঁক আছে, সেই বিষয়ের শিক্ষাই তাহার পক্ষে উপকারী। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে তাহা হয় না। যে সকল শিক্ষা শিশুদিগের উপযোগী নহে, তাহাদিগকে সেই সকল শিক্ষায় বৃথা বিরক্ত, বিড়ম্বিত করিয়া লাভ কি? বিদ্যালয়ে জোর করিয়া যে গণিত এবং গ্রীকভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়—বিদ্যালয়পরিত্যাগের পর কয় জন সে সকল মনে রাখিতে পারে? শৈশবে শিশুদিগকে এইরূপ শিক্ষা না দিয়া আপনার হস্ত ব্যবহার করিতে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদির বিষয় জানিতে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। তিনি বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি মহৎ দোষ এই যে, ইহাতে শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না।

Drudgery.

সাহেব বলেন, বর্ত্তমান জটিল সমাজের অধীনে আমাদিগকে বৃথা অনেক কষ্ট পাইতে হয়। লোকের যাহা প্রয়োজন, লোকে তাহাই পায়; এইরূপ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। কারণ, সেটি নিতান্তই সহজসাধ্য, সরল, সঙ্কটহীন। ইংরাজগণ জাতীয় ভাবে যতই ধনবান হউন না কেন—ইংলণ্ডের সাধারণ লোকেরা দরিদ্র এবং জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়। সকলের পক্ষেই সে drudgery মন্দ। তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। লোকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা তাহার পক্ষে আনন্দজনক হওয়া চাই—নীরস না হয়। যে কার্য্য যাহার ভাল লাগে না, তাহার পক্ষে সে কার্য্য করা যে কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহা নহে। তাহাতে বিশেষ গৌরব নাই। এখন সমাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না—তাহা হইলে এই drudgery থাকিত না, যে যে কাজ ভালবাসে, সে সেই কাজ করিত, এবং যে যে শিল্প ভালবাসে, সে তাহাতেই মনোনিবেশ করিত। তাহা হইলে লোকে নিজ নিজ অবলম্বিত ব্যবসায়ে আনন্দ অনুভব করিত। সাহেব বলেন, এই মত অনুসারে কার্য্য করিলে আর কোনও গোল থাকিবে না।

এইবার সাহেব আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। সাহেব সোসিয়ালিস্‌মের কবি; তিনি সোসিয়ালিস্‌মের মন্ত্রে মুগ্ধ, সোসিয়ালিস্‌ম-সাগরে সংজ্ঞাহীন,—সন্তরণরত। তিনি বলেন,

স্ত্রীলোকদিগের শ্রম।

স্ত্রীলোকেরা যে কলকারখানা প্রভৃতিতে কার্য্য করে, তাহা সত্য সত্যই বড় দুঃখের বিষয়। সত্য বটে, এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের মত সুচারুরূপে কিম্বা তাহাদিগের অপেক্ষাও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করিবে, এমন নহে; তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাদিগের শরীর পুরুষদিগের ন্যায় দৃঢ়গঠিত নহে, কাজেই তাহারা কম বেতন পায়। কাজেই রমণীদিগের পরিশ্রমফলে পুরুষদিগের পর্য্যন্ত বেতন কম হইয়া আসে, ইহাতে সোটের উপর বড় ক্ষতি হইতেছে। এখন সমাজে সোসিয়ালিস্‌ম প্রবল নহে, এবং কুমারী ও বিধবাগণ অনেক সময় উপায়ান্তরবিহীন হইয়া এই সকল কার্য্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্টিক প্রণালী মতে কার্য্য করিলে, যে কার্য্য যাহার উপযোগী, সে সেই কার্য্য করিবে। সমাজের প্রচলিত প্রথায় স্ত্রীলোকদিগের বড়ই কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। অনেক স্থানে সংসারে পতি, পত্নী, সন্তান সকলেই অর্থোপার্জ্জনরত, তাহাতে অনেক অনিষ্ট অবশ্যই ঘটিতেছে; বিশেষতঃ কর্ম্মদাতৃগণ দেখে যে, ইহারা মোটের উপর অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখিতে গেলে, প্রত্যেকের উপার্জ্জন, বিশেষতঃ রমণী ও শিশুদিগের উপার্জ্জন, বড়ই সামান্য। যদি পতি একাকী উপার্জ্জন করিত, তবে সে অধিক বেতন পাইত; তাহা ভিন্ন তাহার গৃহে শৃঙ্খলা থাকিত, এবং তাহার সন্তানগণেরও যত্ন হইত। যে গৃহে জননী প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কারখানার কাজ করে, সে গৃহের অবস্থা কি ভীষণ! যদি সে পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় হয়, তবে সে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়; তাহা বড়ই অন্যায়। নতুবা গৃহ শ্রীহীন হইয়া পড়ে, সন্তানগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়ায়; যদি এই সকলের জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তবে জননীর উপার্জ্জন প্রায় তাহার বেতনে ব্যয়িত হয়। যে সকল স্থানে রমণীগণকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না, সে সকল স্থানে শ্রমজীবীদিগের সামাজিক জীবন অনেক গুণে ভাল। সেখানে পুরুষগণ অধিক বেতন পায়, এবং তাহারা প্রায় ভাল লোক হয়। সে সকল স্থানে রমণীগণও ভাল, এবং সন্তানগণ সুস্থকায় ও বলশালী। জীবনির্ব্বাহের জন্য বালিকাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করান, মিঃ মরিসের অভিপ্রেত নহে; যদি তাহারা ইচ্ছা করে, কুমারী থাকুক, এবং ইচ্ছামত পরিশ্রম করুক, তাহাতে হানি নাই। তবে অনেক বালিকা পুরুষ আত্মীয়দিগের দ্বারা প্রতিপালিত হয়; তাহারা নিজ ব্যয়ের (Pocketmoney) জন্য সামান্য অর্থের অনাটন উপলব্ধি করে। তাহাদিগের অভাব অল্প, কাজেই তাহারা অল্প বেতনে কার্য্য করে; ইহাতে শ্রমজীবীদিগের বড় অপকার হয়। ইহার নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক। এখন (এই সকল অভাবনিবারণের জন্য) অনেক অনাবশ্যক ব্যবসাদির আবশ্যক হইতেছে। রমণী কিম্বা কোনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য এইরূপ অভাব-উদ্ভাবন, সাহেব ভাল বলেন না। এই সকল অনাবশ্যক অভাব, অনেক অনিষ্ট অবশ্যই করিতেছে, এবং ইহাতে বাজার খারাপ হইয়া যাইতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

সাধনা।—বৈশাখ। এবারকার সাধনায় সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্কিমচন্দ্র"। বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্র

বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু, বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্ত্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্র বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব। "নববর্ষে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা—কিন্তু ইহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই। "ভারতবর্ষে—বারাণসী" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত অনুবাদ। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য,—একজন সহৃদয় চিন্তাশীল বৈদেশিক কি ভাবে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নের উপযুক্ত। আমাদের নিজের জিনিস, এই কয়াসী পর্য্যটকের মন্তব্য ও চিন্তারূপ চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে,—একটু নূতন হইলেও—নিতান্ত মন্দ দেখাইবে না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই। "বৃত্তিনির্ব্বাচনের" লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। "প্রলয়" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি সুলিখিত, সুচিন্তিত, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রলয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের উক্তি কি, লেখক তাহা প্রাঞ্জল ভাষায়, সরল প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন এবার "বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস" লিখিয়াছেন। "কাব্যে প্রকৃতি" শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্র বাবুর ভাবুকতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের ভাষাও বেশ তেজস্বিনী এবং বর্ণনাভঙ্গী অতি সুন্দর। বলেন্দ্র বাবুর সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রশংসা করিয়া আমরা "সাধনার" কথা শেষ করিলাম।

ভারতী।—বৈশাখ। এবারকার "ভারতীর" প্রথমেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বন্দী" নামক একটি ক্ষুদ্র গল্প। নগেন্দ্র বাবুর ভাষা চমৎকার, কিন্তু বন্দী গল্পে, সেও যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে। গল্পটি কৃত্রিমতাপূর্ণ,—নগেন্দ্রবাবুর লেখনীর অযোগ্য। লেখক এক স্থলে বলিতেছেন,—"নীতি যাহাই বলুক, আত্মসুখই ইংরাজের জীবনের প্রচলিত আদর্শ।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা। নগেন্দ্র বাবুর মত একজন পাকা লেখক সহসা অসঙ্কোচে কথাটা লিখিয়া ফেলিলেন, ইহা বস্তুতই বড় আশ্চর্য্য। একটা জাতি সম্বন্ধে এক কথায় একটা গুরুতর বিষয়ে কয়তা দেওয়া ভ্রান্ত অন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে এরূপ সঙ্কীর্ণতা শোভা পায় না। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" বেশ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। "অশ্বপৃষ্ঠে" দার্জ্জিলিঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত। জোর করিয়া ইহাতে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেকখানি হাস্যরস ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবন্ধটি বেশ চিত্তাকর্ষক ও কৌতুকজনক বলিয়া বোধ হয়। "মুসলমানের গোবলি" শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের মৌলিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি খুব উৎকৃষ্ট। লেখক মসলেমদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, "গোবলি না হইলে যে মুসলমানের 'কুরবাণী' মাটী হয়, ইহা নিতান্ত অমূলক।" অপর পক্ষ কি বলেন, দেখা যাক। কিছু দিন পূর্ব্বে, এসিয়াটিক্ কোয়ার্টার্লী পত্রে ডাক্তার লিট্‌নার এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সিদ্ধমোহন বাবুর প্রবন্ধে তদপেক্ষা অনেক অধিক বস্তু আছে। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগকে ধীরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি। ভারতের ভাবী বিপদ এই গোবলি উপলক্ষ করিয়াই দেখা দিবে,—বোধ হইতেছে। যদি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক একটা মীমাংসা হইয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হইতে পারে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ" একটি চিন্তাপূর্ণ আলোচনার যোগ্য প্রবন্ধ। "বিদ্যাপতি" শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটি চলনসই

কবিতা। "রবির প্রেম" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা।—সাধারণ কবিতার অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু লেখিকার উপযুক্ত হয় নাই। এবারকার "ভারতীতে" পারসীর জাঁক কিছু বেশী। স্বরলিপির গানটিও 'পারস্য গজল।' তা ছাড়া শ্রীমতী সরলা দেবী একখানি পারসী নাটকের অনুবাদ করিতেছেন। নাটকের নাম—"লান্‌করানের উজীর।" উজীরের এক পত্নী জীবাখানুম চটিয়া স্বামীকে বলিতেছে,—"আমি কেন বেরোতে যাব? তোমার সোহাগিনী তার উপপতিকে নিয়ে বেরোক—' এ গুলি কি সুরুচিসঙ্গত? সাহিত্যের—বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এরূপ অনেক বিষয় আসিয়া পড়ে,—যাহার উল্লেখ করিতে পুরুষদেরও হাত বাধ-বাধ করে। সেরূপ স্থলে মহিলাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য? ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। আমাদের দেশের মহিলারাও যখন সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী যখন সাধনায় "পিয়ের লোটী ও ইস্তাম্বুলের" অনুবাদ করেন, তখন তাহার অনেকটা বাদ দিয়াছিলেন। সাহিত্যের হিসাবে তাহা ক্ষতি,—কিন্তু স্ত্রীজাতির শালীনতার হিসাবে তাহা বহুমূল্য। আমাদের প্রশ্ন,—সাহিত্যের অঙ্গ হানি, না শালীনতার বিসর্জ্জন, কোনটা বড়? শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "নক্ষত্রদিগের জাতিবিচার" সারপূর্ণ, সুন্দর প্রবন্ধ। "প্রবাসে" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কবিতা। কবিতাটি ভাল হয় নাই।

নব্যভারত। বৈশাখ। এ সংখ্যায় প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর লিখিত "ত্রয়োদশ শতাব্দী" নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধের ফুটনোট এই;—"সম্পাদকের প্রবন্ধ কোনও সংখ্যায় সর্ব্ব প্রথমে ছাপা হইলে, আমাদের দেশের পরনিন্দাব্যবসায়ী 'সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ' (?) মাসিকের অসাধারণ ভাষাবিৎ সম্পাদক অত্যন্ত বিরক্ত হন। আমরা এই হাম-বড়া, 'গায়-মানে-না-আপনি-মোড়ল' সম্পাদকের অমূল্য (gratis) উপদেশানুসারে চলিতে না পারিয়া খুব দুঃখিত হইতেছি। তিনি পৃথিবীর কোন তত্ত্ব রাখুন বা না রাখুন, দুঃখ নাই। নব্যভারতের প্রতি বৎসরের নিয়ম জানিয়া কথা বলিলে বাধিত হইতাম। তাঁহার নিকট এখন নিবেদন এই, তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করুন। আর কেহ না হইলেও, দেশ কাল ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া, ভারতী ও নব্যভারত সম্পাদক শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে।" গত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে", মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল,—"সাধারণতঃ এই রূপ নিয়ম আছে যে, মাসিকপত্রের সম্পাদক পত্রিকার সর্ব্বপ্রথমে স্বরচিত কোনও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিবেন না। নব্যভারত সম্পাদক এই বৎসর প্রথমেই 'সান্ত ও অনন্ত' নামক স্বলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত 'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধ শীর্ষস্থানীয় করিলে সুরুচিসঙ্গত হইত।" নব্য-ভারতের সম্পাদক, ঠিক এক বৎসর পরে, পূর্ব্বোল্লিখিত মন্তব্যপ্রকাশরূপ অপরাধের জন্য, উদ্ধৃত ফুটনোটে আমাদিগকে গালি দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন। শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলাম, এক মাহুত একবার হাতীর মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিল, নিরুপায় হাতী তখন চুপ করিয়া সহিয়া রহিল;—তাহার পর, আর এক দিন বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শুঁড় দিয়া একটা নারিকেল তুলিয়া লইয়া মাহুতের মাথায় ভাঙ্গিয়াছিল"—কিন্তু দেবীবাবুর প্রতিহিংসা তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক,—শিশুশিক্ষায় লিখিয়া রাখিবার যোগ্য,—তিনি এক বৎসর পরে আমাদের কথার জবাব, এবং সুদের হিসাবে গুরুতর গালা-গালি দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিলে, তিনি আবার আমাদের অকৃতজ্ঞ বলিবেন। তিনি আমাদের অবৈতনিক স্কুল খুলিয়া তাঁহাকে ও ভারতীর সম্পাদককে

শিক্ষা দিতেও আহ্বান করিয়াছেন। তিনি যেরূপ অভদ্র ভাবে ও অভদ্র ভাষায় আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন, আমাদের তাহার প্রতিদান করিবার প্রবৃত্তি নাই। কারণ, যাঁহাদের বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ আছে, তাঁহারা কখনও নব্যভারত-সম্পাদকের শিষ্ট ভাষায় 'উত্তোর গাহিতে' পারেন না। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা যাইতে পারে, "নব্যভারত"-সম্পাদককে লোভ করিয়া "ভারতীর" শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া "দাঁড় কাক ও ময়ূরপুচ্ছের" গল্প মনে পড়ে। বলা বাহুল্য যে; তিনি ভারতীর দলে ঢুকিতে চাহিলেও, এবং তাঁহার নব্যভারত খানিকে "ভারতীর" সমশ্রেণীস্থ মনে করিলেও; আমরা তাহাতে সায় দিতে পারিব না। তিনি "ভারতীর" নিকট এখনও দশ বৎসর নীতিজ্ঞানের প্রথম পাঠ শিক্ষা করিতে পারেন। আর সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি যে, নব্যভারতসম্পাদকের শিক্ষক হইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। বরং প্রার্থনা করি, আমাদের সহিত ব্যবহারে, তিনি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের যে উজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া, দেবীবাবুর কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সম্পাদকগণের কর্ত্তব্যনীতির আদর্শ হইয়া থাকুক। সে যাহা হউক, গালি খাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, "ত্রয়োদশ-শতাব্দী" নামক "নব্যভারতের" গীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া নিরাশ হইতে হয়। লেখক পুঙ্খ পুঙ্খ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি পূর্ণ ও সুদীর্ঘ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে নূতন, শিক্ষাযোগ্য বা জ্ঞাতব্য কথা একটাও নাই। বিষয় বিস্তৃত,—কিন্তু লেখকের শক্তি সঙ্কীর্ণ; কাজেই প্রবন্ধটি "অকাল কুষ্মাণ্ডে" পরিণত হইয়াছে। আর একটি বিচিত্র সংবাদ পাঠকেরা শুনিয়া রাখুন,—নব্যভারত-সম্পাদক "ত্রয়োদশ শতাব্দী" প্রবন্ধে দাশুরায় পর্য্যন্ত অনেকের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের গৌরব, গীতি-কবিদের শিরোমণি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করেন নাই। ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি? নবযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিভা বাদ দেন,—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"তাঁহার জন্য দাশু রায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা,"—বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার এক বিন্দুও নাই। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের একটি ক্ষুদ্র রচনা। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি, রমেশ বাবুর নিকট আমরা এ বিষয়ে স্বভাবতই অনেক অধিক আশা করিয়াছিলাম। "বঙ্কিমচন্দ্র" শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি পদ্য।—এমন বাজে পদ্য সচরাচর দেখা যায় না;—বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাশালী লেখকের বিয়োগ উপলক্ষ করিয়া এরূপ ধৃষ্টতাপ্রকাশ অসহ্য। লেখক বলিতেছেন,

"'রোহিণীর' সম তুল বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন?
কি শোভা পুকুর পাবে, গোবিন্দ তুলিলা তাবে,
ইন্দিরা লভিল বন নিজ নারায়ণ!"

ইহার উপর আর কলম চলে না। ব্যভিচারিণী রোহিণী বকুলফুল!—গোবিন্দ বাবু—দেখিতেছি—নৌরভে মাতোয়ারা হইয়াছেন। নহিলে, হিন্দুর জননীরূপিণী দেবতা ইন্দিরার সঙ্গে একটা কামুকীর উপমা দিতেন না। "প্রতিভার পূজা" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর একটি কবিতা; ইহাও বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত। এই কবিতায় কবিত্বের কিছু দেখিলাম না। শোকগাথার উপদ্রবে বড়লোকের মরিয়াও নিস্তার নাই, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুতে অনেক রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এটিও দলছাড়া নহে। "প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র" সম্পাদকের রচনা। প্রবন্ধটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না,—সম্পাদক ক্ষমা করিবেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "পবিবসেবা— ভিক্ষাদান" আলোচনার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বৌদ্ধবল" চিন্তাপূর্ণ, সুলিখিত ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ক্ষীরোদ বাবুর কল্যাণে এতদিনের পর বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণভাবে অনেকটা পরিচিত হইল। আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, আশা করি, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইব। "বৌদ্ধসঙ্ঘের" মত প্রবন্ধ সাময়িক সাহিত্যের গৌরব। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের "নগ্ন প্রকৃতি" আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" নামক সুন্দর প্রবন্ধটি এখনও চলিতেছে। এবার অষ্টম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে।

জন্মভূমি।—বৈশাখ। এবারকার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "৺ কাশীরাম দাস [illegible] তে বাজে কথা বেশী, কাজের কথা কম।' কেবল অতিশয়োক্তির সাহায্য [illegible] ক জমকাল করা যায়, কিন্তু তাহা হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে না। এ প্রবন্ধটি [illegible] করি ভাল হইতেছে না। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "নূতন [illegible] ইতে আনীত একটি বৃক্ষের বিবরণ। কাজের কথা, কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত। "[illegible] মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বিদ্যানিধি মহাশয় যে 'বঙ্গভাষার [illegible] ব্রত' ত্যাগ করিয়া ইতিহাসে অনুরক্ত হইয়াছেন,—এজন্য আমরা পরম শান্তিলাভ করিলাম। "টু জেন্টলমেন্ অফ্ ভেরোনা"—সেক্সপীয়রের একখানি নাটকের গল্প,—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। গল্পটি অনেকের ভাল লাগিবে। "বিহার" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ভ্রমণবৃত্তান্ত, "১০ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত স্থান চর্ব্বিতের ন্যায় দেখিয়া এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াও কতিপয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া" এত বড় প্রবন্ধ লেখা বাহাদুরী বটে, কিন্তু অকর্ত্তব্য মনে করি। কেন না, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে। এই সংখ্যায় "আমার জীবনচরিত" শেষ হইল। এই আষাঢ়ে গল্পটি বেশ সুখপাঠ্য ও চিত্তবিনোদন। 'জন্মভূমিতে অবশিষ্ট জীবনী আর প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত নহে" কেন? পুস্তকাকারে অবশিষ্টটা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে কি?

কল্প।—বৈশাখ। অনেক আর্য্যের "শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের বক্তৃতা" ও শ্রীযুক্ত শরৎনাথ পণ্ডিতের "ধর্ম্ম," এই দুইটি প্রবন্ধ এখনও চলিতেছে।

বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ।—বৈশাখ। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আন্দোলনের অনুরাগী ও শাস্ত্রীয় মতের অধুনাতন সমালোচনাপ্রণালীর অনুমত আলোচনার অভিলাষী, তাঁহারা শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির "জীব বা অন্তঃকরণাদির গতি, ক্রিয়া ও স্থানাদি নিরূপণ" পড়িবেন। এইবার হইতে "বেদব্যাসের" সহিত "ব্রাহ্মণের" সংযোগ হইয়াছে।

জ্যোতিঃ।—বৈশাখ। ইহা একখানি নূতন প্রকাশিত সাহিত্যপত্র। 'মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী" না লিখিয়া সম্পাদক মহাশয় "মাসিক পত্র ও সমালোচন" লিখিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যে কয়খানি নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "জ্যোতিঃ" উল্লেখযোগ্য ও আশাপ্রদ। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "সমর্থ রামদাস স্বামী" এক মহারাষ্ট্র মহাপুরুষের বিবরণ। রচনাটি বেশ হইয়াছে। আমরা আশা করি, জ্যোতিঃ ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হইবে।

চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ।—১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। সমীরণ চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া অনেক উন্নত হইয়াছে। এখন খ্যাতনামা লেখকগণের কেহ কেহ "সমীরণে" লিখিতেছেন। এই সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত "জনা" নাটকের সমালোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সমালোচনাটির প্রশংসা করি। কিন্তু সাহিত্যহিসাবে "জনার" উপযোগিতা এত অল্প যে, সাহিত্য-পত্রে তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি

হইত না। "জনার" সমালোচক যখন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন থিয়েটারের বহির্ভূমির আবর্জ্জনা সমালোচনা না করিয়া বিরত না হন; এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সমীরণে ভগবদ্গীতা-বিষয়ক যে প্রবন্ধটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইল কেন? প্রবন্ধটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।—আমরা সমীরণের ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

দাসী।—মে। পত্রিকার কভারের "করজোড়ে নিবেদন" প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়িয়া দেখা উচিত। "পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়াতেও অনেক গ্রাহক দাসীর মূল্য দিতেছেন না। প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার গ্রাহকের নিকট দাসীর মূল্য বাকী পড়িয়াছে।" দাসী ব্যবসার উদ্দেশে প্রকাশিত হয় না, লোক-সেবা, আতুরের রক্ষা,—দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য। ইহার মূল্য সেই অন্ধ খঞ্জ আতুর অসমর্থ বৃদ্ধদের উপকারার্থ কৃত দান [illegible] আনে—একটি টাকার মামলায়—এই কাণ্ড। ধন্য বাঙ্গালী পাঠক! এই সংখ্যায় "[illegible]শ হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী।—বৈশাখ। "সত্যযুগে মানবায়ু" [illegible]গণেশ দেউস্করের রচনা। লেখক নানাবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দক্ষতার[illegible] করিয়াছেন যে, "সত্যযুগীয় নরগণের শতবর্ষ পরমায়ু শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ।" [illegible]থ চট্টোপাধ্যায়ের "গিরিগুহা" একটি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ। তত্ত্ববোধিনীতে ইহা [illegible]গিতা কি, তাহা সম্পাদকই বলিতে পারেন। "মংস্যরহস্য" শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর প্রণী[illegible] "তত্ত্ববোধিনীর" পাঠকেরা নিতান্ত শিশু কি না, বলিতে পারি না। আজ কাল অনেক স্কুলে 'মৎস্যানের রীডার' পড়ান হয়,—যে সকল বালক ঐ রীডার পড়িয়াছে, তাহারাও প্রাণীবৃত্তান্তের এতটুকু "রহস্য" অবগত আছে, এমন আশা করা অন্যায় নহে। "তত্ত্ববোধিনী" পূর্ব্বগৌরব হারাইয়া দিন দিন অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িতেছে। এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ইহার প্রতিবিধান কি শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের সাধ্যাতীত?

পূর্ণিমা।—জ্যৈষ্ঠ। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এইটিই এবারকার পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ও পাঠ্য প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র কাগজে তিনটি কবিতা ও একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একটিও উল্লেখযোগ্য নয়। "কুরুক্ষেত্র" এখনও চলিতেছে। "সুধাময়ী" নামক একটি উপন্যাসও পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইতেছে।

পুরোহিত।—বৈশাখ। সম্পাদক-লিখিত "সামাজিক ইতিহাস" মন্দ প্রবন্ধ নহে। আর একটু সাধারণ ভাবে লিখিলে বোধ করি ভাল হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইনের "বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বলেখকগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে লেখক যে সকল মতামত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিছু মূল্য নাই। পুরোহিত-সম্পাদক বলিতেছেন,—"লেখকের আগ্রহাতিশয়ে ইহা পুরোহিতেই প্রকাশিত হইল।" প্রথমে আমরা এই টিপ্পনীর অর্থ বুঝিতে পারি নাই। শেষে দেখা গেল, "বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ" প্রবন্ধে, পুরোহিতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির সম্বন্ধেও একটি সুদীর্ঘ প্যারা প্রশংসা ও স্তুতিবাদে পূর্ণ হইয়াছে। তাই বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লিখিত টীকা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নিজের প্রশংসাকীর্ত্তনে তাঁহার তত আগ্রহ ছিল না, কেবল লেখকের আগ্রহেই প্রবন্ধটি পুরোহিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যাহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছি যে, তিনি নিজের ঢাক নিজে অনায়াসে বাজাইতে পারেন, সে জন্য কুণ্ঠিত হইয়া কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক কি?

দন্ত-শোধন চূর্ণ।

আমি, কতিপয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ ও দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এই দন্তশোধন চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি। যে সকল দ্রব্যে, দাঁত পরিষ্কার হয় ও দন্তের বিশেষ উপকার দর্শে, তাহার অনেক গুলিই, ইহাতে মিশ্রিত আছে। যাহাতে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন, সেজন্য মূল্য অতিশয় অল্প করিলাম। একবার ইহা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, দাঁত উজ্জ্বল হইবে, মুখের দুর্গন্ধ ও বিরসতা বিনাশ করিবে। দন্তগত, জিহ্বাগত বা মুখগত, সর্ব্বপ্রকার অপরিষ্কার দূর করিবে। দাঁতের গোড়া শক্ত হইবে, রক্তপড়া নিবারণ হইবে।

চারি প্রকার টিনের [আবশ্যক হইলে কাচের] কৌটায় বিক্রয় হয়। প্রতি কৌটার মূল্য—/০, /১০, ৵০ ও ।০ আনা মাত্র। কেবল চূর্ণের মূল্য:— প্রতি ছটাক /১০ দেড় আনা। পত্র লিখিলে পাইকারি দর জ্ঞাত করা যায়।

ডাক্তার প্রাণধন বসু, এম, বি, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমি, আপনার দন্ত-শোধন চূর্ণ ব্যবহার করিয়া, অতিশয় আনন্দের সহিত, ইহার গুণগত দ্রব্যের উৎকৃষ্টতার, প্রশংসা করিতেছি। ইহা যথার্থ যোগ্যতার সহিত সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তম দন্ত-শোধন চূর্ণে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার সকল গুলিই ইহাতে মিশ্রিত আছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অনতিবিলম্বে সাধারণে ইহার আদর করিবেন। ২৯ মার্চ্চ, ১৮৯৩।

এল, রায়।

৩১, ৩৩, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

FOR SALE:—RARE *BOOKS ON* INDIA AND THE EAST.

1. Pennethorne and Robinson: The Geometry and optics of ancient Architecture Illustrated by examples from Thebes, Athens and Rome 54 large plates, some splendidly executed in colours and gold and 256 pages of Text, large Volume, Atlas folio, half morocco, Price Rs 50. (very rare).
2. Asiatic Journal: Neatly bound 40 vols Rs 60.
3. Sir John Shore's Indian Affairs 2 vols (out of Print) Rs 20.
4. Heber's Indian journals 3 vols, Rs 10.
5. Transactions of the Royal Asiatic Society London vols, I, II, III, each Rs 5.
6. Sir William Jone's works 6 vols, Complete Rs 45.
7. Stewart's History of Bengal Original Edition. Rs 12.
8. A rare collection of 39 views of old Calcutta Rs 12.
9. Calcutta Review old Numbers. Ten annas each.
10. Orders for Books of India are promptly attended to. A trial solicited.

List of Books are sent on application.

R. P. MITRA,

14/1 Hularam Bannerjey's Lane, Bowbazar,

Calcutta.

কুন্তলীনের

স্বাস্থ্যলিক পুরস্কার !

নগদ একশত টাকা।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ৪০৲
দ্বিতীয়-স্থানীয় গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ২০৲
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ২৫৲
দ্বিতীয়-স্থানীয় কবিতার জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ১৫৲

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত বোধ করিলে, আমরা পাঁচ টাকা বা ততোধিক মূল্যের আরও কতিপয় পুরস্কার দিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলি—

কি গল্প, কি কবিতা, উভয়েতেই কুন্তলীনের উল্লেখ থাকা চাই। গল্পটি সুপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হইবে—প্রত্যক্ষভাবে কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনবিশেষ হইলে চলিবে না। অথচ তাহাতে কুন্তলীনের কথা থাকিবে। কবিতা সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম।

রচনা আগামী শ্রাবণ মাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংবাদপত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাকারীদের নাম প্রকাশিত হইবে।

একজনের যত ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এক ব্যক্তি একটির অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব। রচনাকারী সে বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পরীক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে, এবং তাঁহারা যাহা স্থির করিবেন, তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

এইরূপ পুরস্কার, পূজার পূর্ব্বে একবার ও বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। সবিশেষ বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য।

কুন্তলীন পঞ্জিকা।

বিনামূল্যে বিতরিত।

রঞ্জিত কাগজে রঙ্গীন কালীতে সুন্দররূপে মুদ্রিত। কাছে থাকিলে তারিখ তিথি দেখিতে আর বটতলার পাঁজী খুলিতে হইবে না। যাঁহারা এই সুদৃশ্য ও সুন্দর পঞ্জিকা খানি গৃহে রাখিতে চান, তাঁহারা কুন্তলীন আফিস হইতে বিনা মূল্যে লইয়া যাইতে পারেন। মফস্বলবাসীরা অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক,

এইচ, বসু।—ম্যামুফ্যাক্চারিং কেমিষ্ট।

৫ম ভাগ। ১৩০১; ১৬ই আষাঢ়। ৩য় সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বি-এ, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস, শ্রীপ্রমদাচরণ সেন, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম-এ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম-এ, শ্রীহরিদাধন মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মাধুরী (উপন্যাস)	১৭১	৮। আবেদন	
২। য়ুরোপীয় ও আমেরিকান শ্রমজীবী	১৮৫	৯। বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ	
৩। পরমাণু	১৯৩	১০। সহচরী সাহিত্য	
৪। সমাজ (উপন্যাস)	১৯৭	১১। রাজনীতি	
৫। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ	২০৩	১২। সাহিত্য	
৬। অপরাধনিদান	২১০	১৩। সমাজনীতি	
৭। আদি ব্রাহ্ম	২১৫	১৪। মাসিক সাহিত্য সমালোচন।	

কলিকাতা;
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীনৃত্যগোপাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম বর্ষসাধের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। যে সকল গ্রাহক এখনও মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা শীঘ্র পঞ্চম বৎসরের বাকী মূল্য পাঠাইবেন।

২৩।১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন। } শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি।
হোগলকুড়িয়া; কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

হারমোনিয়ম-শিক্ষক।

এক জন ভদ্র যুবক, পরিমিত পারিশ্রমিক লইয়া হারমোনিয়ম শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। শিক্ষার্থীর যে সময়ে শিখিবার সুবিধা, তিনি সেই সময়ে শিখাইতে পারেন। বৈজ্ঞানিক ও সহজ প্রণালীতে শিখাইয়া থাকেন। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, "হারমোনিয়ম-শিক্ষক, ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, কলিকাতা।" এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ সংবাদ জানিতে পারিবেন।

উপনিষদঃ।

অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য, এই ছয়খানি উপনিষৎ। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা শ্রীসীতানাথ দত্ত-কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী সরল ও সংক্ষিপ্ত টীকা ও 'প্রবোধক' নামক অবিকল বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমি-কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য এক টাকা। ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উত্তরের গলিতে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

সোনার তরী।

(নূতন কবিতাপুস্তক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

ছোট গল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

এই পুস্তকে ষোলটি ক্ষুদ্র উপন্যাস আছে। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকগুলি ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

NOTICE.

The undersigned begs to inform the public that he is willing to undertake any survey work in Calcutta or in the Suburbs at very moderate charges.

Nagendra Nath Shome.
61, Simla Street, Calcutta.

মাধুরী।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পূর্ব্বে সেই রাজপুরী দেখিয়াছিলে, আর আজ একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ। রাজ্যময় সে নৃত্যগীত, সে রাগভাণ্ড, সে আনন্দ-কোলাহল নিভিয়া গিয়াছে; তাহার পরিবর্ত্তে আজ ঘরে ঘরে হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস ও শোকধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সে আনন্দভবন আজ নিরানন্দে পরিপূর্ণ। ভূত বোধনের দিনেই যে এমন বিজয়ার কালরাত্রি আসিবে, ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখনও সেই পথে পথে দীপাধার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, এখনও মঞ্চে মঞ্চে পতাকাশ্রেণী মৃদু বায়ুহিল্লোলে উড্ডীন হইতেছে, দ্বারে দ্বারে তেমনি কদলীতরু রোপিত রহিয়াছে—উৎসবের সকল চিহ্নই বিদ্যমান, কিন্তু সে উৎসব আর নাই—সকলই শোভাহীন, ভ্রষ্টশ্রী, বিষাদাধিষ্ঠিত। নাট্যশালা আছে, কিন্তু সে নাট্যরঙ্গ ফুরাইয়াছে; নন্দনকানন আছে, কিন্তু সে শচী শচীনাথ নাই; কাঠাম আছে প্রতিমা নাই, দীপ [illegible] কিছু নাই, দেহ আছে প্রাণ নাই। রাজপথে লোক চলিতেছে, কিন্তু [illegible] সকলের, উৎসবমত্ততা আর লক্ষিত হয় না। সকলেই ম্রিয়মাণ, [illegible] ছিন্ন, দারুণ বাষ্পগ্রস্ত। সেই মন্দিরে মন্দিরে দেবারাধনা হইতেছে, কিন্তু সেখানেও সে [illegible] ঘণ্টা আর তেমন করিয়া বাজে না। তোরণদ্বারে হস্তী সকল তেমনি সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু সেও আর তেমন করিয়া শুণ্ড সঞ্চালন করিতেছে না। নহুষতের কাড়া বাদকের অনাদরে একপার্শ্বে কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই অতিথিশালা ও কৃষ্ণাশ্রম সেখানে বন্দোবস্ত তেমনই আছে, কিন্তু লোক আর তেমন নিত্য নূতন আসিতেছে না। যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কত অভিথি আহার করিতে বসিয়া একটি মূর্ত্তির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া এমনই অধীর হইয়া পড়ে যে আর তাহার আহার করা হয় না—সেই গ্রাস মুখে না দিতেই নিঃশব্দে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। কত কোটী পথে [illegible] একজন পরিচিতের জন্য চারি দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখে, চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নীরবে উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া রোদন করিতে থাকে—পরিচারক তাহা দেখিয়া সেইখানে পথ্য-পাত্র

রাখিয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া যায়। রাজ্যময় সকলের মুখে একই কথা—"হা নারায়ণ কি করিলে? কেন এমন হইল? কিসে আবার যেমন ছিল তেমনি হইবে?" ব্রাহ্মণ শালগ্রামকে তুলসী দিতেছেন, বৃদ্ধেরা ঠাকুর দেবতার নিকট মানত করিতেছেন, যুবক ও প্রৌঢ়গণ দুই বেলা দূর পথ হাঁটিয়া রাজবাটী আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। রাজকার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজা আর রাজসভায় আসেন না। বৃদ্ধ দেওয়ানকেও আর কেহ দেখিতে পায় না। আজ দুই দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি রুগ্নার সেবায় নিরত রহিয়াছেন। মাধুরীর অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন।

বিবাহ রাত্রে অকস্মাৎ ঘন ঘন মূর্চ্ছার পর সেই যে বালিকা প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত রাত্রি অশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজবৈদ্যগণ কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। প্রভাতে গায়ের উত্তাপ একটু কমিয়া আসিল। রাজা তখন সেখানে ছিলেন না। রাণী হৈমবতী সারারাত্রি জাগিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলেন, একজন পরিচারিকাকে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। সে পরিচারিকার ফিরিতে বিস্তর বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে একা আসিয়া চুপ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাণী দেখিলেন, তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। ভৃত্যগণ তখন পরস্পরে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া রাণী পরিচারিকাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বাহিরে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তাহা বিবৃত করিল। সেই সর্ব্বনেশে কথা—সেই ভুবনের চুরী অপবাদ, তাহার পর পিতাপুত্রের পুলিসে গমন—রাজার গভীর মর্ম্মবেদনা—শুনিয়া রাণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। একবার কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কুক্ষণে তখন তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্ঞানোদয় হইতেছিল—সেই কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। শূন্যনয়নে কন্যা ও মাতার মুখের প্রতি চাহিলেন। বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মাতার ক্রোড় হইতে মাথাটা ভূমে লুটাইয়া পড়িল। এক সঙ্গে আহতা হইলেও পক্ষিণী যেমন আপনার ব্যথা তুচ্ছ করিয়া সন্ত্রস্তভাবে শাবকটিকে পাখায় ঢাকিয়া বুকের ভিতর রক্ষা করে, রাণী হৈমবতীও তদ্রূপ মুহূর্ত্তের জন্য আপনার বেদনা বিস্মৃত হইয়া মাধুরীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মাতার নয়নজলে কন্যার অচৈতন্য দেহ ভিজিতে লাগিল।

যন্ত্রণাসূচক সেই চীৎকারশব্দ শুনিয়া চিকিৎসকগণ ছুটিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রুগ্নার প্রতি চাহিয়া সহসা তাহার আকারের বিকৃতভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। সাবধানে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মহাভীত হইয়া একজন চিকিৎসক বাহিরে উঠিয়া গেলেন। তিনি রাজাকে খুজিতেছিলেন। রাজা এবং মুকুন্দরামও ঠিক্ সেই সময়ে সেইখানে আসিতেছিলেন। চিকিৎসককে দেখিবামাত্র রাজা আগ্রহে অন্তরি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয়চকিত দৃষ্টি দেখিয়া রাজা আকুল হইয়া বলিলেন, "বল, মা আমার কেমন আছেন?"

বৃদ্ধ মুকুন্দরাম কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "আর কি তবে ভরসা নাই?"

নতমুখে আর্দ্রস্বরে চিকিৎসক বলিলেন, "ভরসা ভগবান। তবে হঠাৎ অতটা মন্দ আশঙ্কা নাই। এই অবস্থায় যদি আরও চারি ঘণ্টা কাটে, তাহা হইলে একটু আশা হইলে হইতে পারে।"

রাজার সর্ব্বশরীর তখন কম্পিত হইতেছিল—সেই উন্নতকায় প্রশান্তবদন গম্ভীরপ্রকৃতি রাজা বালকের ন্যায় অধীর হইয়া রোদন করিতেছিলেন—অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া মুকুন্দরাম তাঁহাকে ধরিয়া রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রতীক্ষার দীর্ঘ ঘণ্টা অতি কষ্টে কাটিতে লাগিল। ক্রমে চারি ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইল। আর কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিল না। এ কয় ঘণ্টা গায়ে হাত দিয়া দিয়া মুকুন্দরামের উত্তাপ-অনুভবশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া আসিয়াছিল। সাগ্রহে চিকিৎসককে ভয়ের কারণ গিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু চিকিৎসক বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"যখন সমভাবেই কাটিয়াছে তখন ভরসা আছে বটে। তবে রাত্রি দুই প্রহর অতীত না হইলে ঠিক্ পারিতেছি না। সে সময়ে নাড়ীর পুনরায় গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা যদি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না।"

আবার সেই আশঙ্কা। সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এক একটি ঘণ্টা যেন এক একটি বৎসর কাটিতে লাগিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রমে প্রহর উত্তীর্ণ হইল। রাত্রি দশটা—এগারটা বাজিল। চিকিৎসকগণ ঘনঘন নাড়ী পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশই নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ক্রমশই চিকিৎসকদিগের মুখ বিষণ্ণ হইতে বিষণ্ণতর হইয়া আসিতে আরম্ভ

করিল। দেখিতে দেখিতে কণ্ঠার বিষম যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘনঘন শ্বাস পড়িতে আরম্ভ করিল। অচেতন অবস্থাতেই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। চিকিৎসকগণও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ ঘণ্টা এইভাবে কাটিল। তারপর নির্জ্জীব হইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। ভিষক্‌গণ হাত দেখিয়া বলিলেন, প্রাণের আশঙ্কা আর নাই। বিকারের লক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রোগের বিকার কাটিয়াছে বটে, এই নিদ্রাভঙ্গের পর চিত্তের বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক যাহা বলিল, তাহাই ঘটিল। শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর মাধুরী ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার সে বিকৃত দৃষ্টি, বিকৃত হাসি ও অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ কথা দেখিয়া সকলের চক্ষু জলে ভাসিয়া আসিল।

কাঁদিয়া মুকুন্দরাম চিকিৎসকদিগকে বলিলেন, "এ রোগের উপায় কি? মার আমার এ অবস্থা দেখিয়া যে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

চিকিৎসক বলিলেন—"অধীর হইবেন না। এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য নয়, তবে যাপ্য। ঔষধপ্রয়োগে ইহার প্রতিকার করিতে দিন লাগিবে। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে এ রোগ যে ত্রাসজনিত তাহার আর সন্দেহ নাই। যে ভয়ে এ রোগ জন্মিয়াছে, যদি তাহার অপেক্ষা সেই বিষয়ে ইহার মনে আরও অধিক ভয় উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রবৎ এখনই আবার ইহা সারিয়া যাইতে পারে।"

ব্যাকুল হইয়া মুকুন্দরাম বলিলেন, "সে কি উপায়, তাহাই কেন করিয়া দেখুন না।"

চিকিৎসক বলিলেন, "সে উপায় করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ভয়টি যে কারণে যাহার জন্য হইয়াছে, সে সময়ে ইহার মানসিক অবস্থা যেরূপ ছিল, ঘটনাগুলি ঠিক একত্র মিল হওয়া দরকার। তাহা ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুতেই হইবার নহে। আপাততঃ যে কোন প্রকারে হউক, ইহার চিত্তের গতি কতকটা পরিবর্ত্তন করা অবিশ্যক। বোধ হয়, আমাদের সকলের এ স্থান ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছায়াতাকে এখানে রাখিলে অনেকটা ফল দর্শিতে পারে।"

জামাতা রাঙ্গা মুখ ফিরাইয়া কপাল টিপিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

দিন রাত্রির মধ্যে মুকুন্দরাম এক দণ্ডের জন্যও সে চিন্তা করিতে পারেন নাই। পরদিন মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্য কয়েকজন বিখ্যাত লোক মুন্সীগঞ্জে

পাঠাইয়া দিলেন। আগ্রহে বিস্তর প্রজা সেই মোকদ্দমা দেখিবার জন্য ত
দের পাছু পাছু ছুটিয়া গেল।

* * * *

মোকদ্দমার সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণাম দর্শনে আনন্দে কোলাহল করি
করিতে যখন সেই সমস্ত লোকসমগুলী আদালতগৃহ হইতে নামিয়া আ
তখন অমূল্যের জন্য ব্যথিতান্তঃকরণে ভুবন বিষণ্ণ মুখে এক পার্শ্বে দাঁড়া
চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার কাতরতা দেখিয়া আরও অধিক অস্থির হ
পড়িলেন, কিন্তু কি করিবেন, জন্য উপায় তখন ছিল না। পিতা পুত্রে ই
কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দরামের লোক গিয়া তাঁহাদি
নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তাঁহারা উভয়েই বিশেষ চিনিতেন। সে ব
আদালতে আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করি
প্রবৃত্ত হইল। সে এক উপায় ঠাহরিল। আর তো কোন প্রতিকার নাই,
যাহাতে খাটুনিটা একটু কমে, তাহার যোগাড় করিতে উদ্যত হইল। দে
দারোগা মুকুন্দরামকে ভাল রকম জানিত, বড় ভয় ও ভক্তি করিত। তা
লোকের মুখে কথা পাইয়া সে অমূল্যের পরিশ্রমলাঘবের জন্য স্বীকার পা
মুকুন্দরামের লোকজন তখন হরিহর ও ভুবনকে লইয়া গৃহে ফিরিল। সেখ
ফিরিতে ভুবন কতবারই ইতস্ততঃ করিল। কি করিয়া যাইবে, কেমন ক
আবার সরলের নিকট মুখ দেখাইবে, আর কাহারও নিকট না হউক,
সরলা বালার নিকট সে কি বলিয়া আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিবে—
যদি তাহার মনে ক্ষণকালের জন্যও একটুও সন্দেহ জন্মে?—ভুবন তা
সন্দেহভাজন হইবার পূর্ব্বে সহস্রবার আপনার মৃত্যুকামনা করিল। যা
মন সরে না, পা উঠে না; কিন্তু আবার যতক্ষণ যাইতে না পারিতে
যতক্ষণ সেই মুখ—যাহা হিমানীপীড়িতপঙ্কজবৎ মূর্চ্ছাম্লান দেখিয়া আ
ছিলেন—দর্শনীয়ের সার তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব সেই মুখ দেখিতে না পারি
ছেন, হৃদয়ও কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না। আশঙ্কা, উদ্বেগ ও অশুভচি
রহিয়া রহিয়া বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিতেছে। লজ্জায় কাহাকে
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও কথা আসে না। সে কি আজিও সুস্থ হয় ন
আজিও কি পীড়ার যাতনায় কষ্ট পাইতেছে?—না জানি সে স্বর্ণলতা কে
শুখাইয়া গিয়াছে? সেই সুধাংশুনাথের সদাপ্রফুল্ল চল চল মুখখানি
গুরুজনসমক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া কি আর তেমনি রাগরক্তিম হইয়া উঠিবে

সেই স্নিগ্ধবিদ্যুদ্বর্ষী প্রীতিভরা অচপল নয়ন দুটি তাহাকে দেখিয়া কি আর তেমনি করিয়া হাসিতে উছলিয়া উঠিবে না? ভুবন যতই সে কথা মনে করে, ততই প্রাণের ভিতর যে প্রাণ তাহা কেমন করিতে থাকে; পথ যেন দূর-প্রসারিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, গাড়ী না করিয়া যদি পদব্রজে যাইতেন, তাহা হইলে বুঝি অনেক শীঘ্র গিয়া পৌঁছিতেন। অনন্যমনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুবন যাইতে লাগিলেন।

হৃদয়ের বেগের নিকট শকটের বেগ হারি মানিল। চালক বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রাত্রি ৮ টার কমে রাজবাড়ীতে পৌঁছিতে পারিল না। অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল। মুকুন্দরাম ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। মোকদ্দমার অবস্থা সংক্ষেপে অবগত হইয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অন্য সময় হইলে তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন চলিত, কিন্তু সে আন্দোলনের সময় এখন ছিল না। হরিহর সোৎকণ্ঠে রাজকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে মুখ নত করিলেন। ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মুকুন্দরাম সরোদনে সব কথা বলিলেন। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভুবন জোরে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। বুক বুঝি তখন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। সেই ছল ছল কাতর মুখখানিতে নিমেষের মধ্যে কত নীরব ভাষা ফুটিয়া উঠিল। পুত্রের দিকে চাহিয়া হরিহর আরও কাতর হইয়া পড়িলেন। সেই দণ্ডেই সকলে সেই পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাধুরী একবার তাঁহাদিগের দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া আপন মনে কি বকিতে বকিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিস্ফারিত নেত্রে ভূমিপ্রতি চাহিয়া জড়বৎ ভুবন দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপগতবন্ধ প্রস্রবণের ন্যায় দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"মাধুরী!"—চিকিৎসকের সঙ্কেতে সকলে উঠিয়া চলিয়া গেলে, বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে ভুবন ডাকিলেন—"মাধুরী!"

মাধুরী কোন কথা না কহিয়া, এক তীব্র কটাক্ষ করিয়া ভুবনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া ভুবন মর্ম্মপীড়িত হইলেন। অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, "চিনিতে পারিতেছ না, আমি যে ভুবন।"

"ভুবন!" মাধুরী চমকিতা হইল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভুবন! ঐ নামে একজন ছিল—সে আমার—তাকে কি আর দেখিতে পাইব না?" সেই অর্থশূন্য দৃষ্টিময় চক্ষে জলধারা উছলিয়া উঠিল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

সরোদনে ভুবন বলিলেন, "এই যে আমিই তোমার সেই ভুবন।"

"অ্যাঁ—তুমি—তুমি—" ভুবনের মুখের প্রতি সেই অধিরূঢ় বড় বড় চক্ষু দুটি স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টে বালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"হা ভগবন, শেষে অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলে?" মর্ম্মাহত হইয়া ভুবন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অন্তরাল হইতে চিকিৎসক সমস্ত লক্ষ্য করিলেন। ভুবনের দর্শনে পূর্ব্ব-স্মৃতি যে ঈষন্মাত্রায়ও জাগিয়াছে, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। এত শীঘ্র যে এরূপ উপকার দর্শিবে, ইহা আশা করেন নাই। সেই রাত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে ভুবনকে পীড়িতার পার্শ্বে একা রাখিয়া অন্য সকলে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যখন দশটা, তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকিয়া কত কি চিন্তা করিতে করিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। চিকিৎসক সেই সংবাদে আরও অধিক আশান্বিত হইলেন। তখন নির্ভাবনায় সকলকে বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিলেন। আর আর সকলে নিকটবর্ত্তী গৃহে গিয়া শয়ন করিল। রাণী কিন্তু কিছুতেই সহচরীর দল ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। শেষ চিকিৎসক ভয় দেখাইলে অগত্যা পাশের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। তবু কতবার উঠিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলেন; পরিচারিকাদিগকে কি প্রয়োজন অপ্রয়োজন জিজ্ঞাসার ছলে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অনাহার অনিদ্রা ও উদ্বেগ বশতঃ শরীর যারপরনাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কন্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে রাণী তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সহচরীর দলও দুই একবার উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কোন সাড়া শব্দ পাইল না। শেষ নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল। একাকী বিনিদ্র হইয়া ভুবন পত্নীর ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া গুরুভার অন্তঃকরণে বসিয়া রহিলেন।

সহসা কিসের শব্দ হইল। ত্রস্তে ভুবন চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই লক্ষিত

হইল না। বায়ু-সঞ্চালন জন্য গবাক্ষ-সকল উন্মুক্ত ছিল, একবার দণ্ডায়মান হইয়া ভুবন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রজনী সার্দ্ধদ্বিযাম অতিক্রম করিয়াছে। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যভীষণ। সুপ্তিতে দিগন্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার ছুটাছুটি করিতেছে। সেই অন্ধকারের বক্ষে চন্দ্রের ম্লান জ্যোতি নিপতিত হইয়া ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে। কোথাও একটিও শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। কোথাও একটিও প্রাণীর সজীবতা অনুভূত হয় না। নীরবে নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশের গায় মীটি মীটি জ্বলিতেছে। নীরবে উচ্ছ্রিতশীর্ষ পাদপশ্রেণী অন্ধকার ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিযাছে। নীরবে মুক্ত গবাক্ষপথ বাহিয়া নিদ্রিত নরনারীর নিশ্বাস আসিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। সেই শব্দশূন্য স্তব্ধীভূত রজনীর গম্ভীরতা, সেই মূর্চ্ছিতবৎ অচেতন পৃথিবীর গম্ভীরতা, সেই সচন্দ্রজলদ দিগন্তবিস্তারী অনন্তধূমময় আকাশের গম্ভীরতা—সর্ব্বত্রই গম্ভীরতাপূর্ণ। তৎপ্রতি চাহিযা দেখিলে সহসা ত্রাসে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। ত্রাসে ভুবন চক্ষু ফিরাইলেন।

চক্ষু ফিরাইতে দ্বারপথে মনুষ্যছায়া লক্ষিত হইল। বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভুবন সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহাকে হস্তসঙ্কেত করিয়া নিকটে ডাকিল। ভীতিমন্থর পদে ভুবন অগ্রসর হইলেন। বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার চক্ষুর উপর অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষেমা। যদি সেই দণ্ডে তাঁহার সম্মুখে বজ্রপতন হইত, যদি ক্ষেমা না হইয়া সত্যসত্যই সে কোন ভীমদর্শনা পিশাচিনী হইত, তাহা হইলেও ভুবন তত আশ্চর্য্য হইতেন না। তাঁহার লোপ হইল। হতবুদ্ধি হইয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ক্ষেমা—ক্ষেমাই বটে—মুখের উপর অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া ভুবনকে একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল। একটু একটু করিয়া পাশের একটি গলির পথে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভুবনও ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তন করিলেন। একি? ভুবন দেখিলেন, পিতা। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সফলই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল। এ কি স্বপ্ন না কুহক? মূকের ন্যায় ভুবন চাহিয়া রহিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, হরিহর কি বলিতে গেলেন। এই সময়ে গৃহের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া কি শব্দ হইল। ঠোঁটের কথা ঠোঁটে রহিয়া গেল। দৌড়িয়া হরিহর সেই গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন।

দ্বার উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, পার্শ্বে যেখানে রুগ্নার সেবন জন্য দুগ্ধ ও পথ্যাদি রহিযাছে, সেইখানে কে একজন

স্ত্রীলোক উপুড় হইয়া পড়িয়া কি করিতেছে। হরিহর চিনিলেন, সে তারাসুন্দরী। ক্ষেমার মুখে তিনি তাহার এখানে আসিবার কথা শুনিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, তারাসুন্দরী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে যে একজন ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, সে আর কেহ নহে ক্ষেমা—তাহার কথা কিন্তু কিছুতেই হরিহর বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাও কি সম্ভব? কুলনারী হইয়া কি কখন এতদূর করিতে পারে?—তিনি বিস্তর তোলাপাড়া করিয়াও কথাটা ঠিক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি স্থির হইতে না পারিয়া পুত্রকে সতর্ক করিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এখন বুঝিলেন, স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছুই নাই। ঘৃণায় চক্ষে জল আসিল।

আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে পশ্চাৎ হইতে গিয়া হরিহর তারাসুন্দরীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাতের ভিতর হাতখানি একবার নিমেষের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া তারাসুন্দরী পিছন দিকে চাহিল। বলিল, "তুমি! তুমি আসিয়াছ!" স্বর পরিষ্কার, অকম্পিত, মর্ম্মভেদী।

সে স্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হরিহর চমকিয়া উঠিলেন। কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "তুই এখানে কেন?"

পূর্ব্ববৎ স্থিরস্বরে তারাসুন্দরী বলিল, "আমি এখানে কেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? কি করিব, তুমি তো বধূ ঘরে লইয়া গেলে না, তাই রাত্রে লুকাইয়া দেখিতে আসিয়াছি।"

হরিহর সে ব্যঙ্গোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড স্বরে বলিলেন, "ও দুধের সঙ্গে কি মিশাইলি?"

তারাসুন্দরী তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "তাহাও দেখিয়াছ! তা আমার কি সাধ আহ্লাদ নাই? বধূ বরণ করিব বলিয়া দুধে আল্‌তা গুলিতেছিলাম।"

আর সহ্য হইল না। হরিহর সেই করধৃত হাতখানি নাড়া দিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "পিশাচি, এখনও ছলনা!"

"পিশাচী!" তারাসুন্দরী গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমি পিশাচী? আর তুমি কে? তুমি পিশাচের অবতার, তাই তো আমি পিশাচিনী। পিশাচিনী আমার কুলকুলের কলঙ্ক, নির্লজ্জ কপটী, আবার মুখ নাড়িয়া তাই আমায় ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছ? কেন আগে আমার কথা শুনিলি না? কেন আমার অমূল্যকে ছাঁটিয়া ভুবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলি? কেন?

আমরা মাতাপুত্রে কি অনিষ্ট করিয়াছিলাম? যদি আমার এই জোর না বাঁচিবে, তবে কেন জরাগ্রস্ত শরীর লইয়া রূপলালসায় মজিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলি? শেষ যদি মনে ইহাই ছিল, তবে কেন আগে কৈতববাক্যে জ্ঞানহীনা অবলা রমণীর মনে আশার বাতি জ্বালাইয়াছিলি? কোন্ মাতা তাহার পুত্রের শুভ ও উন্নতি কামনা না করে? আমি তাই করিয়াছিলাম, এই আমার দোষ? তুই বুড়ো মিন্সে কেন তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলি? তাহা না হইলে তো সব যেমন ছিল, তেমনই বজায় থাকিত। আমি পিশাচিনী?—"

হতবাক্ হইয়া জড়ের ন্যায় নিশ্চলভাবে হরিহর দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রতি কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কুশ বিদ্ধ করিতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ধিক্, ধিক্। পশুর অধম তুমি, তুমি আমাকে ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছ? আমি কি করিতেছি সেই খবর লইবার জন্য ব্যস্ত, আর তুই কি করিয়াছিস? তুই না পিতা, তুই না রক্ষাকর্ত্তা, তুই কি-না ষড়যন্ত্র করিয়া পুত্রকে জেলে দিয়া আসিলি? সে না হয় আমার মন্দ—আমি না হয় বুঝিতে না পারিয়া রাগের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলাম,—কিন্তু তুই না পুরুষ? তুই বুড়ো মিন্সে কোন্ প্রাণে সেই দুধের বাছাকে—যাকে এক দণ্ড না দেখিলে চারি দিক অন্ধকার দেখিতাম—সেই সর্ব্বস্বধনকে সচ্ছন্দে চোর-ডাকাত খুনেদের মধ্যে রাখিয়া আসিলি? সেই ননীর পুতুল—সে আমার পাথর ভাঙ্গিবে, আর তুমি বৌ বেটা লইয়া সুখে সংসার করিবে? তারাসুন্দরীর শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা মনেও স্থান দিও না। তবে শোন্ পাষণ্ড, কি করিতেছিলাম বলি শোন্—"

সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া ভ্রূকুটী কুটিলমুখে তারাসুন্দরী একবার চাহিয়া দেখিলেন কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় তখনও হরিহর আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া। দ্বারদেশে আরও দুই জনের মূর্ত্তি লক্ষিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল, যেন আরও কত অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে সব মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর—কি বিকট! কেহ পাকল নেত্রে ভ্রূকুটী করিতেছে, কেহ লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক অট্টহাস্য করিতেছে, কেহ ছুটিয়া গলা চাপিয়া ধরিতে আসিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। "অমল রে বাপ আমার, তোমার প্রতিশোধ লওয়া হইল না। অভাগিনীকে মার্জ্জনা করিও।"—অতি কষ্টে এই কয়টি কথা উচ্চারিত করিয়া পলকমধ্যে মুঠার ভিতর হইতে সেই গরলের শিশি বাহির করিয়া মুখের উপর স্থাপন

করিল। "কি কর—কি কর" বলিয়া, হরিহর ব্যস্ত হইয়া তাহা কাড়িয়া লইতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিষ পান করিয়া, নৈরাশ্যের ভীষণ হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী সেই শিশি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অবাক্-মুখে যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; সে সেইখানে চিত্রার্পিতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

অচিরাৎ মস্তিষ্কের উপর সে তীক্ষ্ণ হলাহলের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। ফেনপূর্ণ-মুখে অজ্ঞান হইয়া তারাসুন্দরী পড়িয়া গেলেন। ছুটিয়া আসিয়া ভুবন তাঁহাকে তুলিতে গেলেন। দেহ হিম, অবশ,-প্রস্তরবৎ কঠিন। বালকের ন্যায় ভুবন কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * *

সেই রোদনশব্দ শুনিয়া অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, দৌড়িয়া আসিল। একটা গোল উঠিল। সেই গোলে মাধুরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, চকিতনেত্রে চাহিয়া বাসিকা দেখিল, গৃহ লোকে পুরিয়া গিয়াছে, সকলে হায় হায় করিতেছে, আর এক জন—সে কে জানে কে? —তাহাকে দেখিলে আপনা হইতেই প্রাণ কেমন অবশ হইয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা যায়—সে কাহার মৃতদেহ কোলে করিয়া অজস্রধারে রোদন করিতেছে। বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। উদাস অথচ ছল ছল নেত্রে একবার চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে সেই মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। এ যে সেই—সেই—সেই সন্তানহারা কাঙ্গালিনী! এ কি! কে ইহার এ দশা করিল? সহজ অবস্থায় যাহাকে চিনিতে পারেন নাই, মনের এই বিকৃত অবস্থায় বোধ হইল—যেন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতির ন্যায় মনে হইল—ইহাকে যেন আরও পূর্ব্বে অন্য কোথাও দেখিয়াছেন। ঠিক ঐ সেই মুখ—মুখে সেই ভ্রূকুটী। সেই চোখ—এখন ঊর্দ্ধতার, কিন্তু গরল-উগারিণী দৃষ্টির আধার সেই চোখই তো বটে। চিনিতে পারিয়া, ভয়ে সে উন্মাদগ্রস্তা কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বিকট চীৎকার ছাড়িয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ সকলে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকাকে তুলিয়া ধরিল। দেখিল, দাঁতি লাগিয়াছে, মূর্চ্ছায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসকগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মুখে চোখে অবিরাম জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন;

দাসীরা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। চৈতন্যসম্পাদনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইল, কিন্তু কিছুতেই সে মূর্চ্ছার অপনোদন হইল না। হাত ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ। নাসায় হস্ত প্রদান করিলেন, নিশ্বাস অতি কষ্টে অল্প মাত্রায় বহিতেছে। সে অচেতন অবস্থায় তখনও সে রুগ্না থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ চিকিৎসকগণ ভীত হইলেন। কিন্তু, আধ ঘণ্টার পর আবার যখন নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তখন তাঁহাদের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। বলিলেন—"ভগবানের কৃপায় বোধ হয় এ দুরন্ত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হইল।"

দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেতনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কতক্ষণ পরে সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালিকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। তার পর, কেমন একটা আচ্ছন্নতায় শরীর স্পন্দহীন হইয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর বালিকা আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। একেবারে যেন এ মাধুরী আর সে মাধুরী নয়। অবগুণ্ঠনবতী, ব্রীড়ামৌনী, মৃত্তিকাসম্বদ্ধদৃষ্টি। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। ভগবানের অপার কারুণ্যের কথা স্মরণ করিয়া যুগপৎ সকলের চক্ষু উচ্ছ্বসিত, ভক্তিবারিস্রোতে পরিপ্লাবিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবির নহবতের কাড়া বাজিয়া উঠিল। আবার ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। মন্দিরে মন্দিরে আবার অগুরু গুগ্‌গুল স্তূপে স্তূপে জ্বলিয়া চতুর্দ্দিকে আমোদিত করিয়া তুলিল। নিশার অন্ধকার ঘুচিয়া উষার স্বর্ণকিরণ স্পর্শে পৃথিবী যেমন হাসিয়া উঠে; তেমনি সেই রাজ্যভাগ রাজকুমারীর আরোগ্য-সংবাদে আবার হাসিয়া উঠিল। যে দিন প্রথম এই সংবাদ প্রচারিত হইল, সে দিন অতিথিশালায় রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন ফেলা গেল—আহ্লাদেই সকলের উদর পুরিয়া গিয়াছিল, তা ভোজন করিবে কি? অনেক রোগী মনের আনন্দে অর্দ্ধেক রোগমুক্ত হইল, যে অতি কষ্টে বিছানায় পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, সেও মুহূর্ত্তের জন্য রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া একবার উঠিয়া বসিল। বৃদ্ধ মুকুন্দরাম রাজকুমারীর কল্যাণে অকাতরে দীন দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। রাজারাণী আনন্দে এতই অধীর হইলেন যে, সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি কেবল কন্যার কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই যখন আনন্দে মগ্ন, তখন হরিহরেরও আনন্দ না হইবার কোন কারণ ছিল না। তবে থাকিয়া থাকিয়া সেই রোরুদ্যমান অমূল্যের কাতর দৃষ্টি,

সেই অপরিণতবুদ্ধি হতভাগ্য বালকের কুক্রিয়ানুরতির বিষম প্রতিফল; আর মন্দভাগিনী তারাসুন্দরীর অচিন্তিতপূর্ব্ব ভয়াবহ পরিণাম মনে হইয়া তাঁহাকে বড়ই আকুল করিয়া তুলিল। যেদিন ত্রিরাত্রি গতে সেই অচিরমৃতার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ভুবন শ্রাদ্ধ করিয়া উঠিলেন, সেদিন হরিহর কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। একাকী নিরালায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। পত্নীর শেষ কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই কথা যখনই মনে হইত, তখনই প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত। মনে মনে আপনার মৃত্যুকামনা করিতেন। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই অন্তর্দাহে হরিহর শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পিতার জন্য ভুবন যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে একদিন শয্যা হইতে উঠিয়া আর হরিহরকে কেহ দেখিতে পাইলেন না। বিস্তর অন্বেষণেও কেহ কোন সংবাদ বলিতে পারিল না।

রাজা দেবীবর ক্রমঃশই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকল কাজই দেখিবার ভার ভুবনের উপর পড়িল। ভুবন কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, সৎস্বভাবশীল—অতি সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কলেজে পড়া আর হইল না। তাহাতে ভুবনের বড় মনঃকষ্ট দেখিয়া রাজা কলিকাতা হইতে সুশিক্ষিত মাষ্টার পণ্ডিত আনাইয়া গৃহে রাখিয়া দিলেন। ভুবন প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। রাজা যখন ভুবনের স্বভাব চরিত্র অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাণীর মুখে কন্যা ও জামাতার মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসার কথা শুনিয়া আরও অধিক পুলকিত হইলেন, তখন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ মনে সংসারপাশ কাটাইয়া পতিপত্নী তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। অকস্মাৎ সে কথা যে শুনিল, সেই কাতর হইয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণলোচনে মাধুরী কতই নিষেধ করিলেন, হৃদয়ের কাতরতা জানাইলেন। রাজা সস্নেহে সে নয়নজল মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পতিসহায় হইয়া দেবদর্শনে যাইবেন, ইহা অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর ব্রত আর কি আছে, কিন্তু তবু কন্যাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সেই চাঁদমুখ আর দেখিতে পাইবেন না—রাণীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পাছে দুহিতা তাঁহার মনের অবস্থা জানিতে পারিয়া আরও অধিক কাতর হইয়া পড়ে, এ জন্য তাহার নিকট সে ব্যাকুলতা গোপন করিয়া, নিভৃতে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া, যে কয়দিন যাত্রার বিলম্ব ছিল, সে কয়দিন নিত্য সন্ধ্যার সময় কন্যাকে কাছে বসাইয়া নানা নীতি উপদেশ দিতেন। কি করিয়া সংসার

ধর্ম্ম পালন করিতে হয়—দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে সম্মান, দীন দরিদ্রে দয়া, অতিথি অতুরের সেবা, হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বলোকহিতসাধন, একটি সামান্য প্রজার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহপ্রদর্শন, আর নারীধর্ম্মের সারধর্ম্ম পাতিব্রত্য-রক্ষা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা করিলে ফল কি, না-করিলেই বা-কি প্রত্যবায়, একে একে কত কথাই বুঝাইতেন। সে কথায় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মাতা আপনার ব্যাকুলতা ভুলিয়া যাইতেন, কন্যা আপনার কাতরতা বিস্মৃত হইতেন। ক্রমে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। রাজ্যশুদ্ধ লোক রাজা রাণীর আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য ভাঙ্গিয়া আসিল। নানাবিধ ধনরত্ন বিলাইয়া, প্রশান্তমুখে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, প্রণত কন্যা ও জামাতার শিরশ্চুম্বন করিয়া অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সামলাইয়া, শুভমুহূর্ত্তে রাজারাণী শকটারোহণ করিলেন। ঘর্ঘরচক্রে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

সেদিন বৃদ্ধ মুকুন্দরাম বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। পাগলের ন্যায় একাকী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ কিছুতেই স্বীকার পান নাই। মাধুরীকে ছাড়িয়া তিনি বৈকুণ্ঠেও যাইতে চাহেন না, তীর্থ তো সামান্য কথা। তাঁহার অসামান্য স্নেহ দেখিয়া রাজারাণী বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহাদের মাথার উপর আছেন, ইহা ভাবিলেও অনেকটা উদ্বেগের লাঘব হইবে, এই মনে করিয়া বৃদ্ধাকে আর বেশি পীড়াপীড়ি করিলেন না। রাজাকে ছাড়িয়া থাকা যে বড়ই কষ্টকর হইবে, তাহা যে মুকুন্দরাম অগ্রে বুঝেন নাই তাহা নহে, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক হওয়া অকর্ত্তব্য, ইহা ভাবিয়া কোন কথা কহেন নাই, বরং নিজেই উদ্যোগী হইয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন; আজ কিন্তু আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার সে কাতরতা দেখিয়া মাধুরী আপনার কষ্ট চাপিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যারপর তবে বৃদ্ধ কতক শান্ত হইয়া স্নান করিয়া আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সেই স্নেহময় হাস্যপ্রদীপ্ত করুণাপ্রফুল্ল মুখযুগল পৌরজনবর্গ কিছুতেই কিন্তু ভুলিতে পারিল না। সে মুখ যে আর কেহ কখন ভুলিতে পারিবে, তাহাও এক দণ্ডের জন্য কাহারও মনে স্থান পাইল না। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল,—সেই কৌশলে এক বৎসর পরে আর একখানি নূতন মুখ আসিয়া সকলকে সে কথা ভুলাইয়া দিল। সেই জ্যোৎস্নানিন্দিত মুখখানিতে যখন জ্যোৎস্নানিন্দিত হাসি ফুটিয়া উঠিত, মাধুরী

চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। কে বলিবে, প্রাণের ভিতর কি সুখ
জগৎসংসারের অন্য কোন কথাই আর হৃদয়ে স্থান পাইত
কেবল তাহারই পানে চাহিয়া থাকিতেন। আপনি দেখিয়া
ত না, স্বামীকে আনিয়া তাহা দেখাইতেন। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত
তপ্রাণে অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে ডুবিয়া যাই-
ছুটিয়া আসিয়া মুকুন্দরাম সেই নিসর্গসুন্দর মুখখানিতে সহস্র
তন, আর বৃদ্ধের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া প্রেমধারা গড়াইয়া

গিয়া বাস করা আর ভুবনের ঘটিল না। বৃদ্ধ মুকুন্দরাম আর
না। তিনি যদি সে কাজ করিবেন, তবে তাঁহার ছোট্টটো
ল ধরিয়া বেড়াইবে কে? কাজেই সকল কাজ ভুবনের না
তিনি মনোহরপুরের সমস্ত সম্পত্তি অমূল্যের নামে লিখিয়া
ারামুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন খুড়ার উপর তাহার
ন্ত হইল। দিন কতক দুর্য্যোধন লোকের হাতে মাথা
রিল। দেখিতে দেখিতে দুর্যোধন ও ক্ষেমার নাম একত্র
পাইয়া সকল লোকে দল বাঁধিয়া তাঁহাকে একঘরে করিল।
ার সকলের কার কি হইল, তাহা আর বলিতে পারি
খবর রাখি নাই।

সম্পূর্ণ।

য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবী।

শেষ প্রস্তাব।

শ্রমজীবীগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে
প্রবল; শনিবারের সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রবিবারের
মত্তপান ও বিবিধ কুক্রিয়ায় সময় ক্ষেপণ করে; এমন কি,
ত্ত হইয়া পড়ে যে, সোমবারেও কার্য্যে যোগ দিতে পারে না,
নেক আর্থিক ক্ষতিও ঘটে। বাস্তবিক বেলজিয়াম শ্রমজীবী-
ল এবং পরিশ্রমী, তাহাতে ইহাদের সংখ্যা প্রয়োজনাতি-

রিক্ত না হইলে ইহাদের অবস্থাগত উন্নতির পরিচয় পাওয়া
কোনও সুবৃহৎ কাচের কারখানায় এক এক জন কারিকর প্র
পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে; এই সকল লোক মাসিক পঁচিশ
অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দ বাসোপযোগী বাড়ীভাড়া করে। বেলজি
শ্রমজীবীগণ প্রত্যহ গড়ে এক টাকার অধিক উপার্জ্জন ক
ইহারা বাসের জন্য ছোট ছোট কুটীর ভাড়া করে, প্রত্যেক কু
মাসিক ভাড়া পাঁচ ছয় টাকা। মেরিওয়েদার সাহেব এক
পরিচয় দিয়াছেন, এই ব্যক্তির বাড়ী এ্যাণ্টওয়ার্পের নিকট, ত
সংখ্যা পাঁচটি—যে নিজে, স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা; পুত্রদ্ব
চতুর্দ্দশ বৎসর, অন্যটি একাদশবর্ষীয়, কন্যাটি আট বৎসর
সপ্রস্নীক কাগজের কলে কাজ করিত, সে নিজে বার আনা
ছয় আনা হিসাবে প্রত্যহ উপার্জ্জন করিত, বালকবালিক
দোকানে নিযুক্ত ছিল—বালকটির প্রত্যহ চারি পাঁচ আন
দুই তিন আনা উপার্জ্জন হইত; সকলে যাহা উপার্জ্জন ক
তাহারা একটি জনবহুল অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে এক দুর্গন্ধময় খ
কুঠরী ভাড়া করিয়া বাস করিত। রুটি, কাফি, ভাত
এবং বিয়ার মদ্য ইহাদের দৈনিক খাদ্য, এতদ্ব্যতীত কখন
ইয়াও খাইত।

বেলজিয়ামের সেরাইং নামক নগরে লৌহসম্বন্ধীয়
এখানে নানাপ্রকার কল (Engins) প্রস্তুত হয়, এবং ঢা
কাজ হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন এখানে কয়লা ও লৌহের
জিয়ামের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে শ্রমজীবীদিগের অ
পাওয়া যায়। লৌহের বিভিন্ন কারখানায় প্রায় দশ বার
প্রত্যহ পরিশ্রম করে; তাহাদের জন্য এখানে একটি ই
তাহাতে বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ হয়; কেবল
জীবীদিগের সুবিধার জন্য সেভিংস ব্যাঙ্ক, পীড়িতের ব্যাঙ্ক,
বিদ্যালয়, সাধারণ রন্ধনশালা এবং ভোজনাগার স্থাপন করা
জিয়ামে যে সকল কয়লার খনি আছে, তাহাতে স্ত্রীলোক,
বালিকাগণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া থাকে, তাহারা পৃষ্ঠে করিয়া
এবং এ জন্য দৈনিক আট আনা হিসাবে উপায় করে।

ফরাসী শ্রমজীবীগণ প্রত্যহ একবার করিয়া পূরামাত্রায় খাইতে পায়, কিন্তু তাহারা যাহা আহার করে, সকলের মতে তাহা পূর্ণমাত্রা নহে। প্রত্যহ প্রভাতে বহির্গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ইহারা কোনও হোটেলে প্রবেশ করে, এবং দুই আনা দিয়া খানিক রুটী ও মদ কিনিয়া লয়। প্যারী নগরীর শ্রমজীবীগণই কেবল বাজারে মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত করে। পণ্য-বিক্রেতা পরিচ্ছদবিভূষিত হইয়া একখানি হাতা হস্তে তাহার স্তূপাকার পণ্য-দ্রব্যের নিকট দাঁড়াইয়া থাকে; কোনও গৃহিণী এই বাজারে রেশমী বস্ত্র, খাদ্য-দ্রব্য বা খেলেনা কিনিতে আসিলে, অগ্রে আবশ্যক দ্রব্য মনোনীত করিয়া পরে বিক্রেতার হাতায় মূল্য রাখিয়া দেয়, দোকানী সেই অর্থ তাহার একটি বাক্সে ঢালিয়া রাখে। এই সকল সাধারণ ফরাসী দোকানে এক পণ্যবিক্রেতাই সকল কাজ করে, তাহার অন্য সহকারী নিযুক্ত দেখা যায় না। খাদ্যক্রেতৃগণ সজ্জিত ডিসের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য করে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে—এক টুক্‌রা রুটী অর্দ্ধ আনা, ঝোল দেড় আনা, তরকারী এক আনা, ইত্যাদি। মেরিওয়েদার বাজারে আহার করিতেন, সেখানে প্রতিদিন প্রায় তিন সহস্র শ্রম-জীবী গ্রহণ করিত, এবং এজন্য প্রত্যেককে পাঁচ আনা হিসাবে দিতে হইত। কোনও কোনও শ্রমজীবী সেখানে বসিয়া খাইত না, রুটি, মাখম, মাংস পকেটে পুরিয়া আপনাদিগের ইপ্সিত স্থানে লইয়া যাইত।

ইংরেজ শ্রমজীবীগণ য়ুরোপীয় সকল দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে, কিন্তু ইহাদের আহারাদির ব্যয়ও অনেক অধিক। তথাপি ইটালীর বা ফরাসী শ্রমজীবী অপেক্ষা সন্তুষ্ট ও সুখী কি না সন্দেহ। ইটালী বা ফরাসী জাতি অপেক্ষা ইহাদের অভাব অনেক অধিক, সুতরাং আয় অধিক হইলেও ইহারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মদ্য মাংস খাইতে না পাইলে ইহারা মনে করে, বুঝি অনাহারে মৃত্যু ঘটিল; যাহা হউক, ইহাদের ক্রমে ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্য নিতান্ত দুর্ম্মূল্য নহে। অধিকাংশ ইংরেজ-ই প্রত্যহ প্রায় তিন টাকা উপায় করিতে পারে, দক্ষ শ্রমজীবীগণ পাঁচ টাকাও উপায় করে। ইয়র্কসায়রের শ্রমজীবীগণের বিভিন্ন বাসগৃহ এই সকল গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে দুইটি কুঠুরী, প্রত্যেকটির পরিসর চতুর্দ্দশ ফিট মাত্র, দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। এই সকল গৃহের ভাড়া সপ্তাহে আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা, এতদ্ভিন্ন গ্যাস ও কয়লার

দামও নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য নহে, দশ পয়সা দিলেই এক সের ভাল ময়দা পাওয়া যায়, এক সের ভাল চিনির মূল্য প্রায় আনা; কিন্তু টাট্‌কা মাংস এক সের এক টাকার কমে পাওয়া যায় না। লণ্ডনের বাহিরে শ্রমজীবীগণ নিজ নিজ গৃহেই রন্ধন করিয়া থাকে। উপরে আমরা যে ঘরের কথা বলিয়াছি, তাহার নিম্নতলের একটি প্রকোষ্ঠে রন্ধনকার্য্য ও আহার সম্পন্ন হয়, অন্যটি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। যে সকল নগরে কল কারখানা অধিক, সেখানে শ্রমজীবীদিগকে ভাড়া দিবার জন্য এরূপ অনেক গৃহ প্রস্তুত থাকে; এমন কি, বৈঠকখানাটি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া, দেয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া এবং মেজেতে কার্পেট মুড়িয়া ভাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়; কারণ, ইহাতে শ্রমজীবীগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়।

বিলাতী তাঁতিরা সপ্তাহে দশ বার টাকা উপার্জ্জন করে। এই অবশ্য তাহাদের বিলাসলালসা পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সব্জি সংগ্রহ করিয়া সচ্ছন্দে দিন চালাইতে পারে। সকালে কাজে যাইবার ইহারা চা, কফি, রুটি, মাখম, এবং কখন কখন ডিম্ দিয়া উদর মধ্যাহ্নে আহারের সময় কোনও এক প্রকারের মাংস অথবা মটন, আখম, আলু ব্যবহৃত হয়; এতদ্ভিন্ন সপ্তাহে দুই তিন দিন "পুডিং" প্রস্তুত করিয়া লয়; বলা বাহুল্য, ইহার উপর অধিকাংশ পরিবারই মদ্য করে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমজীবীদিগের অনেক "ক্লব" হইয়াছে, এই ক্লবে যোগ দেওয়াতে অনেকের মধ্যে পানদোষের পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস দেখা এই সকল ক্লবের অধিকাংশই রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। দিনের পরিশ্রমের পর শ্রমজীবীগণ এখানে আসিয়া নানাপ্রকার গল্পে বা পত্রপাঠে সায়াতিপাত করে, এবং যে সময় হয় ত ইহারা মদ খাইয়া থাকিত, সেই সময় নির্দ্দোষ আমোদে অতিবাহিত করে। যে সকল ক্লবের সভ্য, তাহাদিগকে বার্ষিক দুই টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে সামান্য চাঁদা দিয়া ইহারা নানাপ্রকার সংবাদপত্র পাঠ করিতে ও খেলিতে পায়; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের পরিতুষ্টির জন্য কখন কখন ক্লবে দেওয়া বা ক্রীড়া কৌতুক দেখান হয়।

মার্কিন শ্রমজীবীদিগের উল্লেখ করিয়া মেরিওয়েদার সাহেব লিখিতেছেন, "আমি যে অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঘুরিতেছি, তাহার সাধনপথে আমেরিকায় যত বাধা, ইংলণ্ড বা য়ুরোপীয় অন্য কোনও

দেশে তত বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপের এই সম্প্রদায়স্থ লোক তাহাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কতকটা ইচ্ছুক, কিঞ্চিৎ ব্যগ্রও বটে, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের কঠোর পরিশ্রম ও অল্প পারিশ্রমিকের কথা বলিত, এবং তাহাদের মার্কিন সহযোগীগণের অবস্থার কথা মনোনিবেশসহকারে শ্রবণ করিত; কিন্তু আমেরিকায় শ্রমজীবীগণের বিশ্বাসভাজন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। অল্পদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় শ্রমজীবীগণের মধ্যে "শ্রম ও পারিশ্রমিক" লইয়া যে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই তাহারা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা হইয়া উঠিয়াছে। যদি অনেক চেষ্টায় তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের নিকট হইতে কোনও কোনও কথা জানিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাদের উপকার করিবার উদ্দেশে তাহাদেরই মনস্তুষ্টি করিতে কয় জনের প্রবৃত্তি হয়? মেরিওয়েদার একবার নিউইংলণ্ডের এক "তুলার কলে" উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শ্রমজীবীর নাম ও ঠিকানা টুকিয়া লন, অভিপ্রায়—তাহাদের গৃহে গিয়া তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করিবেন। তিনি কল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"মশায়, আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়েছেন, তা ফেরত দেন।" সাহেব প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইলেন, তাহার পর "নোটবুক" খুলিয়া গম্ভীরভাবে বৃদ্ধার নাম ও ঠিকানা পাঠ করিলেন; স্ত্রীলোকটি তখন শান্তভাবে নিজের কাজে ফিরিয়া গেল।

অতঃপর সাহেব যখন এই বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন সে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইল, কারণ সাহেব তাহার নাম ও ঠিকানা ফেরত লওয়া সত্ত্বেও কিরূপে তাহার বাড়ী ঠিক করিয়া আসিলেন। এই বৃদ্ধার পরিবার সংখ্যা সর্ব্বসমেত নয়টি, সমবেত সাপ্তাহিক উপার্জ্জন ত্রিশ টাকা, ইহাদের বাড়ী একতলা, বাড়ীতে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ, দুইটি কক্ষ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, অন্য তিনটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহার ভিতরের স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে, একটি পরিমিত আয়তনের শয্যাও তাহার মধ্যে বিস্তৃত রাখা যায় কি না সন্দেহ। এই বাড়ী পূর্ব্বোক্ত তুলার কলের স্বত্বাধিকারীর; তিনি কম ভাড়ায় ইহা বৃদ্ধাকে বাস করিতে দিয়াছেন, বৃদ্ধাকে মাসিক বিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। বাস্তবিক মাসিক বিশ টাকার কমে আমেরিকায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া দুর্ঘট। মেরিওয়েদার সাহেবের মতে এই বৃদ্ধা যে বাড়ীতে আছে, এরূপ বাড়ী আমেরিকার কোথাও মাসিক ত্রিশ টাকার কম ভাড়ায় পাওয়া যায় না।

এই পরিবারকে বৃহৎ শ্রমজীবী পরিবারের আদর্শরূপে ধরা যাইতে পারে; ইহারা যে নিয়মে দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তাহাতেই মার্কিন শ্রমজীবীগণের আহারাদি সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা হয়।

ইহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে সাড়ে পাঁচটার সময় উঠে। ছয়টার সময় কাফি, রুটি, মাখম ও আলু দিয়া জলযোগ করে; সাড়ে ছয়টার সময় কলে কাজ আরম্ভ করিবার নিয়ম, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়; কেবল মধ্যাহ্নে সকলে আহারার্থ এক ঘণ্টা ছুটী পায়। এই বৃহৎ পরিবারের আয় যেরূপ সামান্য, তাহাতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উঠাই তাহাদের পক্ষে কঠিন; কিন্তু পরিমাণে যতই অল্প হউক, অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভিন্ন অপকৃষ্ট দ্রব্য ইহারা কখনও ক্রয় করে না। মার্কিন-শ্রমজীবীগণের ইহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। আমাদের দেশের "মোটা ভাত মোটা কাপড়" কথাটি ইহাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে খাটে না; কারণ, ইহারা মোটা, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিবে, অন্ধকারময় কুটীরে কাল কাটাইবে, যাহা আহার করিবে, তাহাও হয় ত ক্ষুধার পক্ষে সামান্য,—কিন্তু "মোটা ভাত" ইহাদের অসহ্য, কেবলমাত্র অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যই ইহাদের গ্রহণোপযোগী।

যে শ্রমজীবী সপ্তাহে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করে, সে এই বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে যে, "কেহই বলিতে পারে না, আমি আমার পরিবারবর্গকে অতি উত্তম ময়দা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিনি ও খুব টাট্‌কা মাংস খাইতে দিই না।" বাস্তবিক, বার্ষিক তিন হাজার টাকা উপার্জ্জনক্ষম উকীল কিম্বা পুস্তকব্যবসায়ী যে রকম ময়দা, চিনি ও মাংসের ব্যবহার করেন, শ্রমজীবীগণ তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়াই মনে করে না। মার্কিন শ্রমজীবীগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার ধারণাই নাই, সর্ব্বস্বান্ত হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু "বাজারের সেরা" জিনিষ খাইতে হইবে, ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। মেরিওয়েদার সাহেব বলেন, বাজারে যখন খুব ভাল [illegible] আনা হিসাবে পাউণ্ড বিক্রয় হইত, তখন শ্রমজীবীগণ চৌদ্দ আনা পাউণ্ড মাখম কিনিয়া লইত। মাংসের খরচও অল্প নহে। উপরে যে বৃদ্ধার কথা বলা গিয়াছে, সে রাত্রি সাতটার সময় কল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিতে আরম্ভ করিত; প্রকৃতপক্ষে নৈশভোজনই ইহাদের প্রধান আহার, মধ্যাহ্নে কারখানার ঝঞ্ঝাটে আহার তত ভাল হয় না।

নিউইংলণ্ডের অনেক কলের সঙ্গেই শ্রমজীবীগণের ভোজনাগার সংযুক্ত আছে। বেলা বারটার সময় দলে দলে লোক এই ভোজনশালায় খাইতে বসে,

পনের মিনিটের মধ্যেই প্রায় সকলের খাওয়া শেষ হয়, তাহার পর তাহারা খোলা বারগায় বসিয়া গল্প বা আমোদপ্রমোদ করে। ১টা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ঘণ্টা দেওয়া হয়; ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই সকলে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া যায়, এবং ঠিক একটার সময় নির্দ্দিষ্ট কাজ আরম্ভ করে।

মেরিওয়েদার সাহেব রোড্ দ্বীপে এগারটি বালিকাকে কাজ করিতে দেখিয়াছিলেন; ইহাদের একজন সপ্তাহে বার টাকা, দুইজন প্রত্যেকে নয় টাকা, দুইজন তের টাকা হিসাবে এবং ছয়জন প্রত্যেকে সাত টাকা উপার্জ্জন করিত। একজন ভিন্ন ইহাদের সকলেই নিজ নিজ গৃহে বাস করিত; কেহ বাড়ীতে চারি পাঁচ টাকা খরচ দিত, অনেকে তাহাদের উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থই পিতামাতাকে সমর্পণ করিত। যে বালিকা গৃহে থাকিত না, সে আয়র্লণ্ড হইতে আসিয়াছিল। সে সপ্তাহে নয় টাকা উপার্জ্জন করিত; তন্মধ্যে নিজে সাত টাকা খরচ করিত, অবশিষ্ট যাহা বাঁচিত, মাসে মাসে পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। এই কয়েকটি বালিকা যে কলে কাজ করিত, সেখানে শ্রমজীবি সংখ্যা উনিশ-শত; ইহার মধ্যে এক হাজার বিশ জন স্ত্রীলোক; এই হতভাগিনীগণের অধিকাংশের নিকটই দিবারাত্রি সমান। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা কলে আসিয়া কাজ আরম্ভ করে, সমস্ত দিন সেখানেই কাটিয়া যায়; এই সমস্ত কারখানা অন্ধকারময় এবং অবরুদ্ধ, সুতরাং কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহৃত হয়। এই বায়ুপ্রবাহশূন্য, উত্তপ্ত, রুদ্ধ গৃহে প্রত্যহ দিবসের অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকায়, এই সকল শ্রমজীবীদিগের অবস্থা, কারারুদ্ধ অপরাধীদিগের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, কয়েদীগণও পরিষ্কার খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম, নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যালোক ভোগ করিতে পায়, এবং রাত্রে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে নিদ্রা যাইতে পারে। কয়েদীদিগের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু কলে যাহারা কাজ করে, তাহারাও নিতান্ত পরাধীন; পীড়া বা অন্য কোনও অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কাহারও কল ছাড়িয়া যাইবার অধিকার নাই।

নিউইয়র্ক, ফিলাডেল্‌ফিয়া, সেণ্টলুই প্রভৃতি আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরে অন্যান্য ক্ষুদ্র নগর অপেক্ষা পারিশ্রমিকের হার কিঞ্চিৎ অধিক; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যয় অপেক্ষাকৃত এত অধিক যে, এই বর্দ্ধিত হারে শ্রমজীবীদের কিছু মাত্র আনুকূল্য বোধ হয় না। নিউইয়র্কে শ্রমজীবিগণ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের দিনাতিপাত হয়; ঘরভাড়া অত্যন্ত অধিক,

জিনিষপত্র ভয়ানক মহার্ঘ, খাদ্যসামগ্রীও দুর্ম্মূল্য, সুতরাং কোনও দিকেই কাহারও সুবিধা হয় না। মাসিক ত্রিশ টাকার কম কেহ বাড়ী ভাড়া পায় না, এবং ত্রিশ টাকায় যে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা বাসের এক প্রকার অনুপযোগী।

নিউইয়র্কের নিকট ব্রুকলিনে বাড়ী ভাড়া বেশ সস্তা। মেরিওয়েদার ব্রুকলিনে এক তন্তুবায়পরিবারের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন; ইহারা নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত ফিতে প্রস্তুত করে। ইহাদের বাড়ীটি ধূসর বর্ণের, দেখিতে বেশ সুন্দর, এবং দেখিলে মনে হয়, কোনও ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী। এই পরিবারে পুরুষ মানুষ কেহ নাই; গৃহকর্ত্রী এই বাড়ী মাসিক ৭৫৲ টাকায় ভাড়া করিয়াছে; সে আবার সর্ব্ব নিম্নতল ত্রিশ টাকায় এবং তৃতীয় তল কুড়ি টাকায় ভাড়া দিয়াছে। দ্বিতীয় তলে তন্তুবায়রমণী তাহার এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী এবং পিতামহীর সহিত বাস করে, নিজে পঁচিশ টাকা মাত্র বাড়ী ভাড়া দেয়। ইহাদের সম্মুখের ঘরটি উচ্চ রেল পথের ঠিক উপরেই, সুন্দররূপে সজ্জিত এবং ছবি, গালিচা, পিয়ানো প্রভৃতি দ্রব্যে ভূষিত। গৃহকর্ত্রীর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী আহার ও বাসাভাড়ার জন্য সপ্তাহে ছয় টাকা দেয়, এবং সে নিজে ফিতে বুনিয়া সপ্তাহে পনের টাকা উপার্জ্জন করে; এই পনের টাকা ও ভগিনীদত্ত ছয় টাকা, ইহাতেই তাহাদের সুখে সচ্ছন্দে কালযাপন হয়। অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে যাহাই হউক, ব্রুকলিনে একটি ছোট খাট সুন্দর দোতালা বাড়ী মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়াতেই পাওয়া যায়। এইরূপ একটি বাড়ীতে মেরিওয়েদার সাহেব এক সূত্রধরপরিবারের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। এই বাড়ীতে বাসোপযুক্ত ঘর ব্যতীত বৈঠকখানা, স্নানের ঘর, ভাণ্ডারগৃহ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না; বাড়ীটি বেশ সজ্জিত, এবং সূত্রধরের পরিবারবর্গ বুদ্ধিমান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। গৃহস্বামী একজন সর্দ্দার মিস্ত্রী, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় তের শত টাকা; তাহার দুই কন্যা টুপীর (Straw Hat) দোকানে কাজ করিত, একজন বার্ষিক ছয় শত ও অন্যটি পাঁচ শত টাকা উপায় করিত। এতদ্ভিন্ন মিস্ত্রীর বাইশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র এক সওদাগরী আফিসে কাজ করিয়া সপ্তাহে ত্রিশ টাকা পাইত। সকলের উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ হইতে ইহাদের বার্ষিক প্রায় নয় শত টাকা উদ্বৃত্ত হইত।

এই সূত্রধরপরিবারের সহিত আলাপ করার অতি অল্পদিন পরে, সাহেব

সমুদ্রতীরবর্ত্তী জার্সি নগরে ভ্রমণোপলক্ষে গমন করেন। সেখানে এক হোটেলে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুঃস্থির।—দেখিলেন, উল্লিখিত সূত্রধরের টুপীওয়ালী কন্যা এক তুষারধবল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সোফায় উপবিষ্ট,—তাহার ওষ্ঠ বিম্ববিনিন্দিত শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং পাউডার-রঞ্জিত কপোলদেশ কি মধুর আরক্তিম!

সাহেবকে দেখিয়াই বেচারী কিছু অপ্রতিভ হইল, এবং একটু নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি এখানে দিন কত ছুটী ভোগ করিতে আসিয়াছি; আপনার কাছে আমার কিঞ্চিৎ অনুরোধ আছে।"—তাহার পর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে আপনার কিরূপে পরিচয় হইয়াছে, তাহা কাহাকেও না বলিলে বড়ই বাধিত হইব; আমি টুপীর দোকানে কাজ করি, এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। এখানে সকলের বিশ্বাস, আমি কোনও কালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী; আমি টুপীর দোকানে কাজ করি, এ কথা প্রকাশ হইলে এখানে আমার যে প্রতিপত্তি আছে, তাহা মাটী হইয়া যাইবে।"

এই যুবতী এরূপ ভাবে কথা বলিতে লজ্জিত হইল না দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; তিনি সবিস্ময়ে এই যুবতীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই হোটেলে তাহার অনেকগুলি "ইয়ার" জুটিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একজন কালোয়াৎ, কোনও জজের একটি কুলতিলক পুত্র ও এক ডাক্তারী স্কুলের জনৈক ছাত্র, এই তিনজন প্রধান। যুবতী গান করিতে লাগিল, এবং গীতবাদ্যে হোটেল জমকাইয়া উঠিল।

য়ুরোপের কোনও শ্রমজীবীর কন্যাই এই টুপীওয়ালী যুবতীর মত আমোদ প্রমোদে ছুটী কাটাইতে সক্ষম নহে, এবং আমেরিকাতেও শ্রমজীবীশ্রেণীর মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে সাহেব এক তামাকওয়ালার বাড়ী যান। ছয় জন লোক দুইটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে বাস করিত। গৃহকর্ত্তা ও তাহার স্ত্রী তামাকের কারখানায় সপ্তাহে পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিত, ইহার মধ্যে পাঁচ টাকা সপ্তাহে বাড়ী ভাড়া যাইত, অবশিষ্ট বিশ টাকায় ছয় জন লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। আহারের জন্য তাহারা রুটি, কফি ও আলু ভিন্ন অন্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারিত না।

মেরিওয়েদার সাহেব বলেন, শ্রমজীবিরমণীগণের জন্য একটি কার্য্যবিভাগ

উন্মুক্ত আছে; সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে অনেকে বেশ সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, কিন্তু এই সকল রমণী সাপ্তাহিক বিশ টাকা বেতনে প্রত্যহ এগার ঘণ্টা ধরিয়া কলে খাটিবে, তথাপি ইহা অপেক্ষা অধিক বেতনে কাহারও গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে না। সাহেব বলেন, ইহার কারণ এই যে, শ্রমজীবিবর্গের স্ত্রীকন্যাগণ প্রায় কেহই রাঁধিতে জানে না, এবং রাঁধিতে জানিলেও তাহারা কলে কাজ করা সুবিধাজনক মনে করে; তাহাদের বিশ্বাস,—পরিশ্রম অধিক ও উপার্জ্জন অল্প হইলেও, ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতাও সম্মান আছে।

ভারতীয় শ্রমজীবী।—য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবী সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ করা গেল, উপসংহারে ভারতীয় শ্রমজীবী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবীগণের আয়ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুর্ভাগ্য দেশের শ্রমজীবীগণের আয়ব্যয়ের কি তুলনা হয়? কি য়ুরোপ, কি মার্কিন, এমন কোনও দেশ নাই, যেখানে শ্রমজীবীগণ সপ্তাহে ন্যূনকল্পে দশটি টাকা উপার্জ্জন না করে, এবং তাহাদের আহারের মধ্যেও অনেকটা সুখসাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। সেখানে তাহাদের জীবিকা সম্মানজনক; তাহাদের সেই গৌরব, স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তি কি আমাদের দেশের শ্রমজীবীর মধ্যে সম্ভব? আমাদের দেশে খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ বটে, কিন্তু শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে পুষ্টিকর আহার জুটিয়া উঠে না। পঁচিশ টাকা মাসিক আয় হইলেই আমাদের দেশের শ্রমজীবীদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল, বঙ্গের সাধারণ শ্রমজীবী কুলি মজুরগণের মাসিক আয় চারি টাকার অধিক নয়, অথচ এক এক জনের অনেকগুলি পোষ্য। এই সামান্য আয়ে কিরূপে তাহাদের দিনপাত হয়, তাহা য়ুরোপ এবং আমেরিকার লোক কল্পনাও করিতে পারেন না। আমাদের দেশ এমন শস্য-শ্যামলা না হইলে, অরণ্যে অযত্নসম্ভূত শাক শবজী উৎপন্ন না হইলে, এবং নদী ও বিল খালে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য না পাইলে, অনাহারে অধিকাংশ লোককেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। আজ কাল সভ্য দেশে জীবনসংগ্রামের গভীর কলরব উত্থিত হইয়াছে, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহার প্রাবল্য অনুভূত হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবার হইতে প্রতি-নিয়ত যে নীরব দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হইতেছে, কয় জনের সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর আছে? দেশ দিন দিন ধনধান্যশূন্য হইতেছে, দরিদ্রের প্রতি

চারি দিক হইতে ক্রুদ্ধ হস্ত উত্থিত হইতেছে, এবং দুর্ব্বলের প্রতি প্রতিদিন অত্যাচারের বিরাম নাই, ইহার প্রতিকার কোথায়? বৎসর বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি ও সংক্রামক পীড়ার প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে দরিদ্র শ্রমজীবিগণ যে অধিক দিন দুই সন্ধ্যা নিয়মিত আহার পাইবে, এরূপ বোধ হয় না। সর্ব্বসাধারণের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এবং যদি জাতীয় উন্নতিই না হইল, তবে বৃথা আমাদের এ শিক্ষা, সভ্যতা এবং প্রাধান্যের ভান। কেহ কেহ বলেন, আমরা শ্রমশীলতা হইতে আধ্যাত্মিকতায় 'প্রমোশন' পাইয়াছি, য়ুরোপীয় এবং আমেরিক জাতি শারীরবলে জগতে কীর্ত্তি এবং প্রাধান্য স্থাপন করুক, আমাদের সে অবস্থা গিয়াছে, এখন আধ্যাত্মিকতাই আমাদের অবলম্বনীয়। কিন্তু আমরা এ কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাই কি?—এখনও আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন; অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য না হইলে আমাদের প্রাণ এবং মান কিছুই রক্ষা পায় না, আমাদের কি আধ্যাত্মিকতার অভিমান চলে? জগৎ মায়াময় বল ক্ষতি নাই, সংসারে আসক্তি না থাকিলেও অচল হয় না; কিন্তু সংসার যাহাতে রক্ষা হয়, সে দিকে দৃষ্টি গেলেই, অগত্যা কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগকেও অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে; যাহা আমাদিগের প্রধান অভাব, তাহা দূর করিবার জন্য সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিকে একাগ্র হইতে হইবে; জানি, এই প্রস্তাব অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন;—তথাপি যদি এ বিষয়ে চেষ্টা করা যায়, অন্যান্য কথার সঙ্গে এই প্রধান কথাটিও আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠে, তবে কালে একটা পথ বাহির হইলেও হইতে পারে, এবং সেই আশাতেই আমাদের এই আলোচনা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পরমাণু।

"If, as would seem to be supposed in this doctrine, all the material ingredients of the earth existed in this diffuse nebulosity, either in the state of vapour, or in some state of still greater expansion; whence were they and their properties?"—Whewell.

(হরিহর এবং পূর্ণচন্দ্রের কথোপকথন)

পূর্ণ। কেন মহাশয়! লাপ্লাসের মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া জড় পরমাণু এবং জড়শক্তির সংযোগে হইয়াছে। তিনি বলেন—আদিতে সমুদায় সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া বিশাল পরমাণুসমষ্টি ঘূর্ণ্যমান ছিল, এবং তাহাদেরই আবর্ত্তনে গ্রহাদি-

সমেত কেন্দ্রস্থ সূর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টি সেই পরমাণু সকলের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের ফলমাত্র, মূলে সেই জড়পদার্থ এবং জড়শক্তি। —A fortuitous concourse of blind atoms—

হরি। থাম বাপু। থাম, অত ব্যস্ত হ'ও না। একটু ধীরে ধীরে চল। আদিতে পরমাণু-সমষ্টি ছিল—আচ্ছা বাপু। আমাকে বুঝাইয়া দাও পরমাণু কাহাকে বলে।

পূর্ণ। আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন, কোনও একটা পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করিয়া গেলে অবশেষে এমন একটা সূক্ষ্ম অংশে উপনীত হইব, যাহাকে আর ভাগ করা অসম্ভব। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্ম পদার্থাংশকে পরমাণু বলে।

হরি। বেশ বাপু। বেশ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ দেখি। যদি পদার্থের বিভাজ্যতার একটা সীমা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও কল্পনীয় শক্তির দ্বারা পদার্থের শেষ অংশগুলিকে (ultimate particles) ভাগ করা যায় না, কিন্তু এরূপ স্বীকার করা অসম্ভব। এ কল্পনা শুধু কথায় বলা যায় মাত্র, কিন্তু চিন্তাতে আনা যায় না। মনে কর, পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে কতকগুলি ভাগাবশিষ্ট অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশ রহিয়া গেল, এখন ইহাদের প্রত্যেকেরই (যদি ইহাদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়) অবশ্য বড় অংশগুলির ন্যায় একটা উপরিদেশ এবং নিম্নদেশ আছে, একটা দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্ব আছে। এই পার্শ্বগুলি এত সন্নিহিত মনে করিতে পার কি যে, তাহাদের মধ্য দিয়া একটা plane of section যাইতে পারে না? অথবা তাহাদের সংযোগশক্তি যতই প্রবল হউক, তাহার জবোপযোগী একটা বিরোধী-শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পার না কি? পদার্থের বিভাজ্যতার সীমাকল্পনা মনুষ্যচিন্তার অতীত, এবং এইরূপে ইহাও দেখান যাইতে পারে যে, পদার্থের বিভাজ্যতার অনন্তত্ব-কল্পনাও মানুষের চিন্তার বিষয়ীভূত নয়। এখন পদার্থের বিভাজ্যতার সীমা আছে, অথবা সীমা নাই, এ দুইটির একটি অগত্যা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে; কারণ দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞার একটি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝিয়াছ, এ দুইটার কোনটাই মনুষ্যের পক্ষে conceivable নয়।* এই ত তোমার পরমাণু! হা! হা!

পূর্ণ। বলেন কি? আপনি যে বিষম metaphysicsএর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। পরমাণুর অস্তিত্ব মানিব কি না, তাহা ত বুঝি না। পদার্থকে ভাগ করিলে তাহার শেষ আছে কি না, তাহা ত জানা যায় না। তবে কি পরমাণু একটা কল্পনা মাত্র?

হরি। কল্পনা বটে, এবং এ কল্পনা করিবার গুরুতর কারণও রহিয়াছে, কোনও একটা পদার্থ যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অংশের সমষ্টিমাত্র, ইহা রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য। Laws of definite and multiple proportions প্রভৃতি নিয়মগুলি এই Atomic theory ব্যতীত অসম্ভব মনে হয়। যাহা হউক, স্বীকার করিলাম, পরমাণু আছে। তার পর?

পূর্ণ। এই পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ জনিত আবর্ত্তনে সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টি। পরমাণু সকল কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ, সেই নিয়মগুলি তাহারা চিরকাল পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের আবির্ভাবের সময় (সে সময় কখন, তাহা অবশ্য আমরা জানি না, হয় ত তাহারা অনাদি), তাহাদের আবির্ভাবের সময় অবধি একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সুসঙ্গতানুযায়ী হইয়া থাকে, এবং তাহা অঙ্কশাস্ত্রানুসারে নির্ণীত। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সৃষ্টি—

হরি। থাম, থাম, নিয়মপালন? তাহারা কি নিয়মগুলি জানে, না সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে যে, সেগুলি পালন করিবে?

* H. Spencer's First Principles. Part I. Chap. III.

একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করিবে। বাঃ! একটা নিয়ম থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কোনও উপস্থিত ঘটনায় তাহারা কি সে নিয়মটি খাটাইতে জানে? তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধানুরূপ হইয়া থাকে! বেশ! কিন্তু সে সম্বন্ধ তাহারা জানিবে কিরূপে? মনে কর, এই তোমার পরমাণু ক, আর ওই তোমার পরমাণু খ। কখএর মধ্যে দীর্ঘ একটা ব্যবধান রহিয়াছে, এবং তাহাদের সংযোগের একটা রজ্জু পর্য্যন্তও নাই। এখন ক কেমন করিয়া জানিবে—খ কোথায়, এবং কেনই বা জানিবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ কি? আহা! blind atomগুলি বড়ই দুঃখী, সন্দেহ নাই।

পূর্ণ। আপনার প্রশ্নের আমি আর উত্তর দিতে পারি না। আপনি শেষে এমনি একটা সমস্যায় আনিয়া ফেলেন যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই। আপনি নিজেই বলুন।

হরি। না হে বাপু! না, আমি এমন কি জানি যে বলিব। কিন্তু ওইখানেই ত পরমাণু লইয়া যত গোল। তাহাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধটা বড় সহজ নয়। যত বিজ্ঞান এবং "Ology" ও "Ometry"র সৃষ্টি হইয়াছে, সবগুলিই এই সম্বন্ধ লইয়া। তাহাদের গতি এবং স্থান-পরিবর্ত্তন, ঘৃণা এবং ভালবাসা, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, সকলই ঘটনাস্থলে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। ইহাতে গোলমাল নাই, পরীক্ষা নাই, এবং ভুল নাই। Dynamycsএর এক একটা অঙ্ক, যাহা লাগ্রাঞ্জের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে, তাহাও তাহারা ঘটনাস্থলে মুহূর্ত্তমধ্যে কষিয়া ফেলে। একটা differential equation, যাহা কাগজে লিখিলে সমুদায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারে, তাহা তাহারা চক্ষুর নিমেষে integrate করিয়া লয়; এবং সমুদায় গণনা এমন সুন্দর-ভাবে করে যে, লাপ্লাস্ অথবা নিউটনের সাধ্য নাই, তাহাদের সহিত লাগে। বস্তুতঃ এই পরমাণুগুলা বড়ই অদ্ভুত!

পূর্ণ। ইহা অপেক্ষা আর বেশী বিস্ময়কর কি আছে, জানি না। তাহাদের স্মৃতিশক্তি যেমন অদ্ভুত; তাহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও তেমনি অত্যাশ্চর্য্য। একটা ঘটনা পড়িলে মুহূর্ত্তমধ্যে এমন নির্ভুলরূপে (অথচ চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া) কার্য্য করা বড়ই আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই।

হরি। ঠিক বলেছ হে ঠিক বলেছ। ওই-খানেই সমুদায় রহস্যের অবসান। হাঁ তাহা-দের মধ্যে একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। এইখানেই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি।

পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমায় একটু ভাবিবার অবসর দিন্। আমি কই কখনও এমনধারা ভাবি নাই। তাই ত ব্যাপারখানা বড় সহজ নয়। *

* Herschel's Popular Loctures: "On atoms—a dialogue."

সমাজ।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরমার পরামর্শ।

বিন্দু। বলি অ সুধা, সুধা, তোর কি আজ খোঁপা বাঁধা হবে না বোন? সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনও কি তোর চুলবাঁধা শেষ হল না? এমন চুলবাঁধা ত বাপের জন্মেও দেখি নি।

সুধা। দেখ না, দিদি, এই ঠাকুরঝিকে বল্‌লাম এক রকম করে চুল বেঁধে দিতে, তা ঠাকুরঝি যে কি করছেন তার ঠিক নেই।

কালীতারা। হেঁ লো হেঁ, ঠাকুরঝিরই বড় সাধ, তোর মনে কিছু সাধ নেই, কেমন? লোকের ভাল করলে মন্দ হয়, না? তা এই নে বোন, এই খোঁপা বাঁধা শেষ হ'ল, এখন রূপার ফুল দুটি দে দিখি, বসিয়ে দি।

সুধা। না ঠাকুরঝি, রূপার ফুলে কায নাই, ছেড়ে দাও, তোমার দুটি পায়ে ধরি।

কালী। আর নেকামি কায কি লো? এই নে ফুল দিয়ে দিয়েছি, এখন একবার তোয়ালেখানা দাও ত বিন্দুদিদি, সুধার মুখখানা বেশ ভাল করে মুছিয়ে দি।

কালীতারা ছাড়বার মেয়ে নয়। মুখখানি বেশ করে মুছিয়া দিয়া, গলায় হার পরাইয়া দিয়া, হাতে দুখানি গয়না পরাইয়া দিয়া, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরাইয়া, পরে আরসীখানি সুধার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"এখন শরৎ বাড়ীতে এসে বলুক মনের মত বৌ হয়েছে কি না?"

লজ্জায় সুধা আরক্তমুখী হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন, বিন্দু ও কালীতারা হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সুধার আয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। শুইবার ঘরে গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলেন, কি ভাবিতে ভাবিতে, হাসি হাসি মুখে বিছানা করিলেন, বিছানার ভিতর দুই একটি ফুলের মালা লুকাইয়া রাখিলেন, ডিবে ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিলেন। কালীতারা ঘরে থাকাতে রন্ধনকার্য্য আর কাহাকেও দেখিতে হইত না, তবে সুধা গিছরিপানা, ফল মূল, মুগের ডাল ভিজান, প্রভৃতির আয়োজন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

রেকাবি করিয়া সমস্ত সাজাইতেছেন, এমন সময় সেই ঘরে "ঠাকুরমা"কে লইয়া বিন্দুদিদি প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরমা সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, "বলি বড় আয়োজন যে লো!" সুধা লজ্জায় হেঁটমুখী হইলেন।

ঠাকুরমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিন্দু ও সুধার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানি না, গ্রামের কোন্ ঘরের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক, তাহাও জানি না,—তবে বৃদ্ধা বিধবাকে গ্রামের বৃদ্ধগণ আদর করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যবয়স্ক ও যুবকযুবতীদিগের "ঠাকুরমা" হইতেন। বাল্যকাল হইতেই বিধবা, সুতরাং স্বামী-ঘর কখনও করেন

নাই। মনটি সাদা, হৃদয় মমতাপূর্ণ, আর ছেলে দেখিলেই ঠাকুরমা কোলে লইতেন। সকল বাড়ীতেই তাঁহার যাতায়াত ছিল, সকল ঘরের ছেলেরা তাঁহাকে ভাল বাসিত, সকল গৃহের গৃহিণীরা ঠাকুরমাকে বসাইয়া দুইটি গল্প করিতেন। তবে ঠাকুরমা একটু রসিকা ছিলেন, এবং কথাগুল একটু অম্লমধু, নিতান্ত মিছরি-মাখান নয়!

আজ অনেক দিন পরে শরৎবাবু বাড়ী আসিবেন, শরৎবাবুকে ঠাকুরমা ছেলেবেলা থেকে বড় ভাল বাসিতেন, তাই আজ একবার দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎবাবুকে গ্রামের লোক একঘরে করেছে, কিন্তু ঠাকুরমা মায়া ও মমতা কাটাইতে পারেন নাই।

হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমা বলিলেন,—"বলি আজ বড় আয়োজন যে লো! বিদেশে কি আর কারও স্বামী চাকরি করে না, না বিদেশ থেকে কেউ ফিরে আসে না! এত আয়োজন কিসের লো? বুড়ি ঠাকুরমা এসেছে তা কি এক বার চেয়ে দেখতে নেই গা?"

সুধা। না ঠাকুরমা, তুমি এসেছ জান্‌তাম না। আয়োজন আর কি ঠাকুরমা, একটু জলখাবার তৈয়ার করে রাখ্‌ছি। তা ঠাকুরমা তুমি রেকাবিখানা সাজিয়ে দাও না।

ঠাকুরমা। দেখি, দেখি, কি রেখেছিস! ইস্ এ যে পানফল, আক, মুগের ডাল, আর এ পাথরের গেলাসে বুঝি মিছরিপানা?

বিন্দু। হেঁ গো ঠাকুরমা, শরৎবাবু মিছরিপানা বড় ভাল বাসেন।

ঠাকুরমা। আর এ বাটীতে কি? ও মা এ যে চিনির রসে রসবড়া রে! এ বুঝি তুই আপনার হাতে করেছিস? এ যে ভারি যত্ন রে। দেখিস্ বাছা, এত যত টত্ন করে যেন শরতের মাথাটি খাস্ নি।

বিন্দু। কেন ঠাকুরমা, শরতের মাথা খেতে যাবে কেন? অনেক দিন পরে শরৎ বাড়ী আস্‌ছে, তা সুধা একটু যত্ন কর্‌বে না ত কে কর্‌বে?

ঠাকুরমা। তা কর্‌বে বৈকি বাছা, সুধা ভাল মেয়ে, শরতের যত্ন টত্ন কর্‌বে বৈ কি। তবে কি জানিস, আজ কাল যে রকম সময় পড়েছে, যেয়ারা যত্ন টত্ন করলেই পুরুষ মানুষ আবার মাথায় চড়ে। তা বুঝি জানিস নি?

বিন্দু। না ঠাকুরমা, সে আবার কেমন, বল না, ঠাকুরমা।

ঠাকুরমা। ওলো দেখবি দেখবি, যখন আমার মত বয়স হবে দেখে শিখবি। আমি বাড়ী বাড়ী যাই, ঢের দেখিছি লো, তাই শিখিছি।

বিন্দু। তা আমাদের শিখাও না ঠাকুরমা, আমরা শুনি।

ঠাকুরমা। ওলো শুন্‌বি ত শোন্‌। ঐ যে তোরা বিয়ে বিয়ে করে পাগল হস, ছেলের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও বলে পাগল হস, আমি ত বলি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় না ত, ছেলে মেয়ের লড়াই লাগে। এই যেমন রাজায় রাজায় লড়াই হয় না? সেই রকম লড়াই লাগে। নে, তোরা যে হেসে গড়িয়ে গেলি। বুড়ীর কথা শুনে যদি অমন করে হাসিস ত আমি এই চল্লাম।

বিন্দু। না ঠাকুরমা হাস্‌ব না, সত্য হাস্‌ব না, বল, বল, তোমার পায়ে ধরি।

ঠাকুরমা। বলছিলাম কি, বিয়ে নয় ত ছেলে মেয়ের লড়াই লেগে যায়। যে যত আদায় করতে পারে, বুঝলি কি না, মেরে ধরে, বকে ঝকে যে যত আদায় করতে পারে। ঐ আমাদের পাড়ার ঐ ঘোষালের পো আছে না? তার দুইটা ছেলে হয়েছে তা জানিস বাছা। তা ঘোষালের বৌটি রোগা শরীর নিয়ে দুই ছেলে কাঁকে করে সমস্ত দিন খাটছে গো, সমস্ত দিন খাটছে, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, রাঁধা বাড়া, সমস্ত সংসারের কায করছে, তার উপর দুবেলা গাল খেতে খেতে প্রাণটা যায়। বাবুর যদি গরম দুদটুকু পেতে একটু দেরি হইল, তা অমনি গালাগালি, সে ত এমন গালি নয়, আমাদের কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! বৌটি নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে রক্ত উঠিয়ে বাবুর যত্ন করে, তবু ত উঠতে নাবতে গাল খায়। ভাল মানুষ হলে অমনি হয় লো, পুরুষের হাতে প্রাণটা যায়। তাই বলি, বেশী ভাল মানুষ হওয়া কিছু নয়, একটু আদায় করতে শেখ।

বিন্দু। তা সব পুরুষ কি ঐ রকম ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। না তা বলছিনি, তা বলছিনি, আবার মেয়েও তেমনি আছে। ঐ যে বড়ালদের বৌটি কেমন পাকা মেয়ে! স্বামীকে ঠিক যেন ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। কর্ত্তাটি বৌয়ের কথায় উঠে, বৌয়ের কথায় বসে, মুখে কথাটি কইবার যো নাই! তবু ত বড়ালের বৌয়ের বকুনি থামে না, সকাল থেকে পিট্‌ পিট্‌ করে বক্‌ছে, আর রাত দুই প্রহরের সময় সে বকুনি শেষ হয়! বাবুটি কলুর বলদের মত চখ্‌ কাণ ঢাকিয়া মুখ বুজিয়া বৌয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সারাদিন ঘুরছেন। সাবাস মেয়ে যা হউক! কেমন স্বামীকে বশ করেছে! কেমন কায আদায় করে নিচ্ছে!

বিন্দু। তা ও রকম কি আদায় করা ভাল? উহাতে কি সংসারে সুখ হয়। এই দেখ না, জেঠামহাশয়ের সংসার কি হইয়া গেল?

ঠাকুরমা। ঠিক বলেছিস বাছা, আহা ঠিক ধরেছিস্। তারিণী বাবুর সোণার সংসার ছিল, উমার মাকে কখন একটা রেগে কথা কহিতে শুনিনি গো। তা তাকে ভালমানুষ পেয়ে তোমার জেঠামশাই তাকে পায়ে ঠেল্‌লেন দেখলি ত। আহা তাকে দগ্ধে মারলেন গো, দগ্ধে মারলেন। এ লড়াই লো লড়াই,—যে ভালমানুষ তারই মরণ, যে হারামজাদী তারই জিত। আবার এখন কেমন লড়াই বেধেছে। সেই ত তারিণী বাবু,—পাড়ায় পাড়ায় ষাঁড়ের মত ফেরেন, সকলকে শাসন করেন, বাড়ীতে প্রভুত্ব করুন দেখি! কৈ এবারও ত ছেলে হ'ল না, আর একটি বৌ করুন দেখি! তার যো নেই,—ছোট গৃহিণী তারে বাড়া শক্ত, লড়াইয়ে তারিণী বাবুকে হারাইয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। বেশ করেছে! খুব করেছে! মেয়ের মত মেয়ে বটে! বেশ করেছে, আরও কর্‌বে। এ রকম মেয়ে না হইলে কি পুরুষ জব্দ হয়?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা গোপী জেঠাই যা কর্‌লে, সে কি ভাল কায ঠাকুরমা? ও-রকম কাযে কি সংসারে সুখ হয়?"

ঠাকুরমা। ভাল আর কি? এই সংসারের রীতি, চিরকাল এই হ'য়ে আস্‌ছে। সুখ আবার কি? লড়াইতে সুখ হয় না বিয়েতে সুখ হয়? যে যত কেড়ে নিতে পারে, মেরে ধরে বকে ঝকে যে যত আদায় কর্‌তে পারে। আমি ত সংসারে এই দেখি, তোরা বাছা লেখা পড়া শিখেছিস্, কি ভাবিস জানি না। ওলো শরৎ ছেলেটি ভাল, তোকে বড় ভালবাসে। একটু একটু মুখঝামটা দিস্ লো, মেয়ে হয়ে জন্মিয়াছিস, একটু আদায় কর্‌তে শেখ।

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরমা, দিদি ত হেমবাবুকে সেবা টেবা করে, আর হেমবাবুও দিদির যত্ন করে। কৈ দিদি ত আদায় কর্‌তে শিখে নাই।"

ঠাকুরমা। ওলো ওদের কথা বলিস্ কেন? হেম বাবুটি ত সন্ন্যাসী, আর বিন্দু ত চিরকালই কটু বোকা সোকা মেয়ে, ওদের কথা ছেড়ে দে। তা ও রকম বোকা সোকা ভালমানুষ লোক সংসারে কটা আছে? আমি ত দেখি, সংসারে প্রায় লড়াই, যে ভাল মানুষ হয়, তারই সর্ব্বনাশ। তা পুরুষের কি বল?—তারা রোজকার করে, তাদের বিষয়সম্পত্তি আছে, তাদের আয় আছে,—তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আর বৌগুলাকে দাসীর মত খাটাতে চায়। তা বৌগুলা যদি একটু ধারাল না হয়, একটু ঝাঁঝাল না হয়, তোর জেঠাইয়ের মত শক্ত না হয়, তা হলে কেবল খেটে খেটে তাদের প্রাণটা

যাক্? পুরুষের লাথি ঝেঁটা খেয়ে থাকুক? কেমন? তাই বলি বাছা, একটু ধারাল হবি, একটু ঝাঁজাল হবি, একটু শক্ত হবি। তা হলে মানে মানে থাক্‌বি, আদায় কর্‌তে শিখবি, কাপড়খানা গয়নাখানা, প্রভুত্বটুকু আদায় করবি। পুরুষকে ভয়ে ভয়ে রাখবি, পুরুষের গতর খাটিয়ে আদায় করে নিবি, তবে ত বলি মেয়ের মত মেয়ে। আদায় কর্‌তে শিখ্‌বি নি ত মেয়ে জন্ম নিয়ে এসেছিলি কেন?

বিন্দু। ঠাকুরমা, আদায় কর্‌তে গিয়ে যদি সব লোক্‌সান হয়?

ঠাকুরমা। যে রাঁধতে জানে, তার হাতে কি বেয়ন খারাপ হয়?

বিন্দু। ঠাকুরমা, এই বয়সেই আমি কত লোক্‌সান দেখলাম! কত পরিবার ঝগড়া-ঝাঁটী করিয়া যেন শ্মশানের মত হয়ে গিয়েছে! স্বামী কিম্বা স্ত্রী একটু বরদাস্ত করিলে সোণার সংসার থাকিত, কিন্তু সেইটুকু বরদাস্ত না করাতে সংসার-সুখ গোল্লায় গিয়াছে। অধিক আদায় করিতে গিয়া সব লোকসান হইয়াছে, ঠাকুরমা, শেষে যে আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই মাথায় হাত চাপড়াইয়াছে।

ঠাকুরমা। ওলো সে রাঁদুনীর দোষ। বলি ঐ যে এক একটা রাঁদুনী বেয়নে যেয়দা নুন দিয়ে ফেলে,—তাই বলে কি নুন না দিলে রান্না হয়? তুই ত একজন ভাল রাঁদুনী, কৈ নুন না দিয়ে কেবল মিছরি দিয়ে সব বেয়নগুলো রাঁধ দেখি?

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়সমাগম।

রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় শরচ্চন্দ্র বাটী আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দুই বৎসর পর দেখিবার জন্য আজ বাড়ী লোকে পূর্ণ। হেমচন্দ্র এত দিন পর ভ্রাতৃসম শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া যথার্থই আনন্দলাভ করিলেন। অন্যান্য বয়স্য বন্ধুগণও শরৎকে সানন্দে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের বৃদ্ধগণ (যাঁহারা শরচ্চন্দ্রকে একঘরে করিতে অগ্রগামী ছিলেন), তাঁহারা উচ্চপদাভিষিক্ত বহুক্ষমতাশালী যুবককে "বাবাজী" "বাবাজী" বলিয়া বড়ই প্রীতি, স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন। শরৎ সকলকে হৃদয়ের সহিত সম্মানিত করিয়া মার-ঘরে গেলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিলেন। শুক্লকেশী শুভ্রবসনা বৃদ্ধা সজলনয়নে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া মাতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শরতের মাতা সংসার হইতে প্রায় অবসর লইয়াছেন; সংসারের কাযকর্ম কিছু দেখেন না। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা আহ্নিক করেন, তৎপরে কিছু জলগ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক করিয়া নিরামিষ ভোজনানন্তর শয়নগৃহে প্রবেশ করেন।

শরৎকে সকলে যখন একঘরে করে, তখন শরতের মাতা হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, "মা, কিছু ভাবিবেন না, ব্রাহ্মণ পূজারি আপনার বাড়ীতে আসে না আসে, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আপনি যে নিয়মে পূজা আহ্নিক করেন, সেই নিয়মেই করিতে থাকুন, পূজারি ব্রাহ্মণের সাহায্য অনাবশ্যক। মনের সহিত ভগবানকে ডাকিবেন, ভগবানের আরাধনায় মোক্তারনামা আবশ্যক হয় না।"

শরতের মাতা সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে শরৎ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য পাইয়াছেন, আজ বিদেশ হইতে আসিয়া ভক্তিভাবে মাতাকে প্রণিপাত করিলেন।

বিন্দু ও কালীতারা কাছে বসিয়া কত যত্ন করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্ভাষণ করিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনবতী সুধার ক্রোড় হইতে প্রিয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিলেন,—আনন্দে সুধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজপুরুষদিগের আহ্বানার্থ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বড় ধুমধাম হয়। পুণ্যচরিত্র পুণ্যহৃদয় শরচ্চন্দ্রকে আহ্বান করিবার জন্য আজ সেই ক্ষুদ্র কুটীর যেরূপ স্নেহের লহরীতে ভাসিল, তদপেক্ষা প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে দৃষ্ট হয় না।

অনেকক্ষণ পর মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী সুধা সযত্নে জলখাবার আনিয়া দিলেন। জল খাইয়া পুনরায় হেমচন্দ্রের সহিত বাহিরের ঘরে যাইয়া সমবেত বন্ধুদিগের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করিতে লাগিলেন। গ্রামের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; দরিদ্র ও বিপদ্‌গ্রস্তদিগকে আশু সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন; সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী ও পথ ঘাট সংস্কারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, পীড়িতদিগের ঔষধাদিদানের ব্যবস্থা করিলেন, দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের মাহিয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধদিগের কাহারও ছেলেদের পড়িবার পুস্তক চাই; কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধে কিছু সাহায্য চাই; কাহারও ঘরটি ছাইবার জন্য কিছু খড় চাই। শরৎ দুই বৎসর

পর দেশে আসিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করিলেন না; সকলকেই সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে। হেম ও শরৎ আহারে বসিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কাছে বসিলেন, কালীতারা রন্ধনে অতুল্যা; তিনি ভাইকে মনের মত খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

পরে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হেম ও বিন্দু বিদায় হইলেন। বিন্দু বিদায় হইবার পূর্ব্বে শরতের হাত ধরিয়া তাঁহার শয়ন-ঘর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বলিলেন, "এখন তোমার ধন তুমি বুঝে লও; আমরা চলিলাম।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎ দেখিলেন, শয্যায় শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে, পার্শ্বে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং শিশুর নিকটে পূর্ণযৌবনা, পতিপ্রাণা, লজ্জা-বিদগ্ধা সুধা রঞ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

এক মুহূর্ত্তকাল সেই পুণ্য ছবিটি দেখিলেন,—প্রদীপের স্তিমিত আলোকে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব রত্নকে নিরীক্ষণ করিলেন,—ধীরে ধীরে সুধার পার্শ্বে আসিয়া সেই কোমল প্রেমবিহ্বল দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় গাঢ় চুম্বন করিলেন।

সুধা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কোমল বাহুলতা দ্বারা পতির গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন,—বহুদিনের হৃদয়ের ব্যথা ভুলিলেন। পতিপ্রাণা সুধার পূর্ণ হৃদয় বারবার স্ফীত হইতে লাগিল, নয়ন দুটি আনন্দবারিতে আপ্লুত হইল।

সাদরে সে জল মুছাইয়া দিয়া, সে সুন্দর নয়নদ্বয় বারবার চুম্বন করিয়া শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "সুধা, আমি জগতের মধ্যে ভাগ্যবান্ যে তোমার মত রমণীরত্ন আমার হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবনাকাশে চিরকাল দীপ্ত রহিয়াছে। স্বদেশে, বিদেশে, সুখে, সন্তাপে তুমিই আমার নয়নমণি, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী।"

সুধা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার সজল নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া নয়নজল ত্যাগ করিল।

পতিপ্রাণা সুধার মনের কথা যদি বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বলিত,—পথের কাঙ্গালিনী হতভাগিনীকে কুড়াইয়া হৃদয়ে স্থান

দিয়াছ,—দুঃখিনীর জন্য কত নিন্দা ও কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—হৃদয়েশ্বর! আমি কি তোমার রত্ন হইলাম? চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জন্মে জন্মে ঐ পুণ্যপদ সেবা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

(১) নির্ধূম বারুদ।

যুদ্ধকালে, বারুদজাত ধূম দ্বারা, রণক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সৈন্যচালনাদি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে; ইহার জন্য প্রায়ই শত্রুমিত্র উভয়েরই অল্প বা অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইতে দেখা যায়। অগ্নিযুক্ত হইলে, আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্যবশতঃ, সকল ধূমই ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত ও যুদ্ধক্ষেত্র ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব করিয়া তোলে, এবং দূরস্থিত শত্রুগণও গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবার বেশ অবসর পাইয়া যায়, এবং এই সময়ে ধূমাবৃত মিত্র সৈন্যকে শত্রুভ্রমে নিহত করাও বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়। বারুদোৎপন্ন ধূম দ্বারা এই প্রকারে উভয় পক্ষই নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ও বহু অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, ধূমের এই মহানিষ্টকারিতার হাস হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য য়ুরোপীয় সভ্যজাতিগণ অনেকদিন অবধি নানা চেষ্টা করিতেছেন। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি প্রদেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া নানা গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং নির্ধূম বারুদ প্রস্তুত করিয়া, প্রচলিত সধূম বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উদ্দেশে সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কিছু দিন পরীক্ষাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক, দুই একটি নির্ধূম দাহ্য পদার্থ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বন্দুক কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে ব্যবহার করিবার সম্যক্ উপযোগী হয় নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই। অল্প দিন হইল, আলফ্রেড নোবেল নামক জনৈক সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক, এক প্রকার ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং নানা পরীক্ষায় ইহা বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নূতন বারুদের প্রস্তুতক্রিয়া বুঝিতে হইলে, সাধারণ বারুদ কি প্রকারে দগ্ধ হয়, এবং ধূমই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহার স্থূল বিবরণ জানা আবশ্যক। বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে ইহার উপাদান সকলের এক প্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়া কয়েক জাতীয় বাষ্প ও কয়েকটি নূতন কঠিন যৌগিক পদার্থ সহসা উৎপন্ন হয়।* এই প্রকারে বাষ্প উৎপন্ন হওয়ায় বারুদের পূর্ব্বায়তন হঠাৎ অনেক বর্দ্ধিত হইয়া, বাষ্প সকল মহা-

* সোডা, কয়লাচূর্ণ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে, বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, পোটাসিয়ম্ সলফেট, পোটাসিয়ম্ কার্ব্বোনেট, এবং কার্ব্বনিক্ অক্সাইড ও নাইট্রোজেন্ উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কঠিন যৌগিক পদার্থ এবং শেষ দুইটি স্বচ্ছ বাষ্পীয় পদার্থ।

দেশে মুক্তস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; এবং এই সময়ে কঠিন যৌগিক পদার্থগুলি বাষ্পে পরিণত হইয়া ও অবিকৃতভাবে কঠিনাবস্থায় থাকিবাই, শুভ্রধূমরূপে পরিণত হয়। প্রচলিত বারুদের উপাদান পরিবর্ত্তন করিয়া, দাহসময়ে ইহা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত না হইয়া, যাহাতে সকলই স্বচ্ছ বাষ্পে পরিণত হয় ও ধূমোৎপাদন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ঈপ্সিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রচলিত বারুদের উন্নতিসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ, অপর পর দাহ্য পদার্থ লইয়া অনেক দিন পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে সম্প্রতি নোবেলই এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এই নূতন বারুদটি পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ধূম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডাইনামাইট (Nitroglycerines) এবং গন্‌কটন (Nitrocelluloses) নামক দুইটি প্রসিদ্ধ দাহ্যপদার্থ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মাত্র, এই বারুদের সমস্ত উপাদানই রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, এককালে স্বচ্ছ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়, এবং কোনও অংশই ধূমে পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে গন্‌কটনের দাহ্য গুণটির, ধূমহীন বারুদ প্রস্তুতে উপযোগিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন হইতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং ভিলি নামক অনেক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গন্‌কটন, ঈথর ও অলকোহোলে গলাইয়া, অল্প দিন হইল, এক প্রকার বারুদও প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বারুদজাত বাষ্প দ্বারা ধাতব আগ্নেয় অস্ত্রাদি অতি শীঘ্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে দেখিয়া, এবং ইহার বাষ্পের বল অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বন্দুকাদি যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া নানা অনর্থ ঘটিবার সম্ভব বিবেচিত হওয়ায়, এই বারুদ যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত নির্ধূম বারুদে, পূর্ব্বোক্ত কোনও দোষই দৃষ্ট হয় না। ১৫০ ভাগ গন্‌কটনের সহিত, ১০০ ভাগ ডাইনামাইট ও শতকরা দশভাগ কর্পূর মিশাইয়া, সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক এই অদ্ভুত বারুদ প্রথম প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্প্রতি নানা দেশে এই বারুদ লইয়া বহুল পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে, এবং সকল পরীক্ষাতেই ইহা অতি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে নির্ধূম বারুদের নানা গুণ দেখিয়া, এবং ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ আদর হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, আবিষ্কারক নোবেল সাহেব, টিউরিণ সহরে, ইহার একটি সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং বহুলপরিমাণে বারুদও প্রস্তুত করিতেছেন।

নির্ধূম বারুদ আবিষ্কারের পর হইতেই যুদ্ধকার্য্যে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য সকল দেশেই মহা আয়োজন হইতেছে, এবং ইহার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইলে, যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মাদির কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না,—এই প্রশ্ন লইয়া নানাদেশীয় সৈনিক বিভাগে মহা আন্দোলন চলিতেছে। অনেকেই বলিতেছেন, নূতন বারুদ প্রবর্ত্তিত হইলে, সামরিক ব্যাপারমাত্রেই এক অদ্ভুত বিপ্লব উপস্থিত হইবে; সাধারণ বারুদের ব্যবহারকালে, ধূমাবরণে আবৃত থাকিয়া যোদ্ধৃগণ অলক্ষিতভাবে শত্রুর উদ্দেশে অনায়াসেই গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া জয় লাভ করিয়া থাকেন, এবং শত্রু সৈন্যগণও অবিচলিতচিত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে অলক্ষিত গোলা দ্বারা আহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু নির্ধূম বারুদ ব্যবহৃত হইলে, সৈনিকগণ পূর্ব্বোক্ত সুবিধা হারাইয়া, ও বিপক্ষ কামানের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া, অকম্পিত দেহে ও স্থিরপদে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় কি প্রকারে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনেক সমরনিপুণ পণ্ডিত, এখন তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। কয়েকটি বাজ্যে, যুদ্ধপোষাকের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে। রণক্ষেত্রে ধূমহীন থাকিলে শুভ্র ও লোহিতাদি উজ্জ্বলবর্ণযুক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা, সৈন্যগণ শত্রুদের সহজলক্ষ্য হইবে; সুতরাং ধূসরাদি অন্য

জ্বল বর্ণের পৌষাক ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জর্ম্মান সাম্রাজ্যের রণবিভাগের কর্ত্তারা, কেবল পোষাক পরিবর্ত্তন করাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, সৈনিকদিগের উজ্জ্বল খাতব শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীগণের বহুমূল্য উজ্জ্বল বর্ণসজ্জাও, পূর্ব্বোক্ত কারণে, আমূল পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

(২) পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

চল্লিশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত কাচ দ্বারা "বস্তুখণ্ড" (Object-glass) * নির্ম্মাণ করিয়া, একটি দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণার্থে অনেক দিন হইতে কয়েকটি মার্কিন বৈজ্ঞানিক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার "বস্তু-খণ্ডের" একাংশ পারিস হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। এক খণ্ড কাচ দ্বারা যদি "বস্তু-খণ্ডের" কাজ চলিত, তাহা হইলে এ প্রকার একটি দূরবীক্ষণনির্ম্মাণ সহজসাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত, কিন্তু "বস্তু-খণ্ডের" জন্য আরও একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্যক, এবং এই কাচ প্রস্তুত করা এত কঠিন ব্যাপার যে, তিন বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যতৎপর ও সুনিপুণ শিল্পীগণ দ্বারা কায করাইলেও, একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাচ প্রস্তুত হইবে কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে গঠিত হইবে যে, ইহার বিভিন্নাংশের স্থূলতা, পূর্ব্বপ্রস্তুত কাচের তত্তৎ অংশের স্থূলতার সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রাখিবে, এবং আলোকরশ্মি সকল প্রথম কাচখানির মধ্যে "বিক্ষারিত" (refracted) ও বিশ্লেষণজনিত রঙ্গিণ হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে, যাহাতে রশ্মি সকলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়া, দূরস্থ বস্তুর ছায়া একবর্ণীয় বর্ণচ্ছটাশূন্য হয়, এবং যাহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র বিক্ষারণের কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহা বস্তুখণ্ডের দ্বিতীয়াংশের প্রস্তুতসময়ে সাবধানের সহিত দেখা আবশ্যক। †—সুতরাং একখণ্ড এইপ্রকার কাচ ঘসিয়া মাজিয়া প্রস্তুত করিতে যে তিন বৎসরেরও অধিক সময়ের আবশ্যক হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এই প্রকারে চল্লিশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত বস্তু-খণ্ড নির্ম্মিত হইলে, ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটি অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে, এবং এই নিখুঁত কাচ দুইখানির মূল্য, কহিনুরের ন্যায় মহারত্নের মূল্যের সমকক্ষ হইবে।

প্রস্তাবিত দূরবীক্ষণনির্ম্মাণ শেষ না হইতেই, ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইবে, এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ অপেক্ষা, ইহার আকৃতি-বৃদ্ধিকরী ক্ষমতা কত অধিক হইবে, এখনই সেই সকল বিষয়ের গণনা করা হইতেছে।

লিক্ মানমন্দিরের দুই-হাত-ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ ও আয়র্লণ্ডের লর্ড রসের চারি-হাত-ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই, আজ কাল, পৃথিবীর দুইটি সর্ব্ববৃহৎ যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে লর্ড রসের যন্ত্রটির ব্যাস-পরিমাণ অপরটি অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলেও, এইটি "প্রতিফলক দূরবীক্ষণ" (Reflecting telescope) বলিয়া, লিকের যন্ত্রটি অপেক্ষা ইহার পরিসর-বৃদ্ধিকরী শক্তি অনেক কম। এখন লিক্ মান-মন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ক্ষমতায় সর্ব্বপ্রধান বলিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ কল্পিত দূরবীক্ষণের ক্ষমতা এই যন্ত্রটির সঙ্গে তুলিত করিতেছেন, এবং গণনা করিয়া দেখিয়া-

---

* সাহিত্যের সুযোগ্য লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে, ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের যে সকল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইল।

† বস্তু-খণ্ড প্রস্তুতের বিস্তৃত বিবরণ Deschanel's Natural Philosophy গ্রন্থের ১০৮১ পৃষ্ঠার, Conditions of Achromatism শীর্ষক প্রস্তাবপাঠে, পাঠক জানিতে পারিবেন।

ছেন, নূতন যন্ত্রের "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" (Light-gathering power) লিক্ যন্ত্র অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অধিক হইবে ‡; সুতরাং এই যন্ত্রটি দ্বারা অপরিজ্ঞাত তারকা ও নীহারিকা মণ্ডলের প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, এবং ওরায়ন্ (Orion) প্রভৃতি জ্যোতিষ্করাশির বহস্য কতকটা উদ্ভেব করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোকরশ্মিপ্রেরণে বায়ুস্তরের বাধা ও আকাশের অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ধরিয়া হিসাব করিয়া, এই নূতন যন্ত্রটির আকৃতিবৃদ্ধিকরী ক্ষমতা শেষে কি দাঁড়াইবে, এই প্রশ্ন লইয়া, সম্প্রতি অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা দ্বারা নগ্ন-চক্ষু-দৃষ্ট পদার্থ, কে একলক্ষ গুণ বৃহদায়তন দেখাইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা শুক্র ও মঙ্গলাদি গ্রহের উপরিস্থ নানা বিষয়ের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা, এবং ইহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিগণের বিবিধ অনুমানের কোনটি সত্য, তাহাও নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ইহা গ্রহবাসী জীবগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী হইবে না। কয়েক জন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এই দূরবীক্ষণযন্ত্রটি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে, ইহা ১২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদার্থের ন্যায় বৃহৎ দেখাইবে, এবং চন্দ্রলোকে পৃথিবীস্থ বৃহৎ অট্টালিকার ন্যায় দুই একটি বাড়ী থাকিলে ও ভূলোকের ন্যায় সুদৃশ্য বাষ্পীয়যানাদির গতায়াত চন্দ্রলোকে বিদ্যমান থাকিলে, এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে সে সকলও প্রত্যক্ষ হইবে। শ

(৩) আইওডিন ও জললিপি।

মঁসিয়ে ব্রলাণ্টস্ নামক জনৈক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক, অল্প দিন হইল, আইওডিনের একটি অত্যাশ্চর্য্য শক্তির আবিষ্কার করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত শক্তির সদ্ব্যবহার হইলে, জগতের অশেষ উপকার হইবে। ব্রলাণ্টস্ সাহেব বহুকাল ব্যাপিয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া দেখিয়াছেন,—সাধারণ কাগজ সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় আইওডিন-বাষ্পে নিমজ্জিত করিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার স্বাভাবিক বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক প্রকার হরিদ্রাভ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়, এবং কাগজের কোনও অংশ যদি প্রথমে জলসিক্ত ও পরে শুষ্ক করিয়া, সমগ্র কাগজখানি আইওডিন বাষ্পের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে সিক্তাংশের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া নীলাভ বেগুনে রঙ্গে পরিণত হয়, কিন্তু ইহার অবশিষ্টাংশের বর্ণ, পূর্ব্ববৎ হরিদ্রাবর্ণই থাকিয়া যায়। সাহেবটি অধিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—কাগজের কোনও অংশ জলসিক্ত করিয়া শুকাইয়া, পরে যদি সমস্ত কাগজখানি এককালীন পুনরায় জল-নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা শুষ্ক করিয়া নানাকৌশলে অবিকৃতাবস্থায় আনিলেও, কোন্ অংশ প্রথমে সিক্ত হইয়াছিল, তাহা আইওডিনের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অনায়াসেই চিনিতে পারা যায়।

---

‡ আলোক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" ইহার "বস্তু-খণ্ডের" ব্যাসের বর্গের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে, কম ও অধিক হইয়া থাকে; কিন্তু এই স্থলে ৩৬ শের বর্গ ১২৯৬ এবং ৪০ শের বর্গ ১৬০০, সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদিও একটির ব্যাস অপরটি অপেক্ষা কেবল এক নবমাংশ গুণ বড়, কিন্তু "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" একচতুর্থাংশ অধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শ For a Detailed Description of the telescope Vide, The New-york Sun of 1892.

কোনও নিদর্শন পত্রাদির অক্ষর অসদুদ্দেশে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আমরা সাধারণতঃ ইহা আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি, এবং সন্দেহযুক্ত অংশের কাগজ অপরাংশ অপেক্ষা পাতলা, স্বচ্ছ বা মলিন বোধ হইলে, সন্দেহ অযথা নয় বলিয়া, উপসংহার করি। কিন্তু অভ্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা সতর্কতার সহিত অক্ষর উদ্ধৃত হইলে, এই উপায়ে সন্দেহযুক্ত অংশ বাহির করা প্রায়ই অসাধ্য হইয়া পড়ে। ব্রলাণ্টস্ সাহেব এখন, আইওডিন্ বাষ্পের সাহায্যে, অতি সহজেই উদ্ধৃতাক্ষরের স্থান বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন;—প্রতারণাকুশল সুনিপুণ শিল্পী দ্বারা অতি কৌশলে অক্ষর উদ্ধৃত হইলেও, উদ্ধৃতাংশে বাষ্প-সংলগ্ন হইলেই, তৎক্ষণাৎ ইহার বর্ণ, সকল অবস্থাতেই লোহিতাভ বেগুনিয়া রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইবে। আবিষ্কারক অনুমান করেন, এই ব্যাপারটি আইওডিনের একটি সাধারণ রাসায়নিক গুণ দ্বারা সম্পন্ন হয়; অক্ষর কাটিবার সময়, কাগজাভ্যন্তরীণ শ্বেতসার (Starch) কোনও প্রকারে উপরে আসিয়া পড়ে, কাযেই ইহাতে আইওডিন সংযুক্ত হইলেই এই বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়,—সুতরাং এটি আইওডিনের নূতন গুণ নয়, তবে ইহার ব্যবহারে সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে বটে। এতদ্ব্যতীত, কোনও সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ দিয়া ধীরে ধীরে কাগজে অক্ষরাদি লিখিলে, এবং ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন না পড়িলেই; ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায়, অক্ষরগুলি বেশ পাঠ করিতে পারা যায়, সাহেবটি তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

পেন্‌সিল-লিখিত কাগজের কোনও অংশ সম্বন্ধে যদি পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ঠিক উল্লিখিত উপায়ে জাললিপির স্থান অনায়াসেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এবং একটু সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলে, উক্ত স্থানে কি কি কথা লিপিবদ্ধ ছিল, তাহাও বাহির করিতে পারা যায়। ব্রলাণ্টস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—প্রথমোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইলে, পূর্ব্বকথিত উপায় অবলম্বন করিলেই, জাললিপিস্থানের বর্ণবৈচিত্র্য হইবে, এবং ইহা দ্বারা সহজেই সন্দেহযুক্ত স্থান বাহির হইবে;—কিন্তু কি কি অক্ষর পূর্ব্বে লিখিত ছিল, তাহা জানিতে হইলে, কাগজের অঙ্কিতাংশে বাষ্প সংযোগ করিলে কোনও ফলই হইবে না, অতিসাবধানে ইহার পশ্চাদ্ভাগে বাষ্প সংলিপ্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে পূর্ব্বলিপি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই লিপি সকল সময়েই বিপরীতাকারে প্রকাশিত হয় বলিয়া, পড়িবার বড়ই অসুবিধা হয়; এই অসুবিধার নিবারণার্থ, প্রায়ই প্রকাশিত লিপি-সম্মুখে একখণ্ড দর্পণ রাখিয়া, এই দর্পণের প্রতিবিম্বে পাঠ করা হইয়া থাকে।

আবিষ্কারক বলেন, সকল কাগজের উপর আইওডিনের প্রভাব সমান নয়। কাগজের প্রকৃতি অনুসারে, ইহার বর্ণেরও প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং কাগজ যতই উৎকৃষ্ট হইবে, অক্ষরের স্পষ্টতাও তত সুন্দর হইবে। যাহা হউক, আজ কাল যে সকল উপায়ে জাললিপি বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা বড়ই অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত, সুতরাং ব্রলাণ্টসের আবিষ্কৃত উপায়ে প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া জাল বাহির করা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে, আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই এই নূতন আবিষ্কারের উপর য়ুরোপীয় কয়েকটি রাজ্যের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং এখন হইতে সেই সকল দেশে নবাবিষ্কৃত উপায়েই জাললিপি পরীক্ষিত হইতেছে।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

* Vide the *Revue Scientifique* of January, 1893.

অপরাধনিদান।

অজ্ঞানতা বিস্ময়ের জননী। যাহা জানি না, তাহা যে যাহা জানি তাহার মত হইতে পারে, যে সাধারণ নিয়ম সকলকে শাসন করে, তাহা যে তাহাকেও শাসন করে, এরূপ বুঝিলে জগৎ অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ভ্রমণের শ্রম, অনুসন্ধানের কষ্ট তখন সফল হয়, যখন অসাধারণ কোনও কিছু দর্শন বা আবিষ্কার করিতে পারি। যে জন্তু কখন দেখি নাই, সে জন্তু অন্য জন্তুর মত ক্ষুৎপিপাসাসম্পন্ন, রোগজরাজীর্ণ, কামক্রোধপীড়িত; এক সাধারণ প্রকৃতি যে জগতের যাবতীয় পদার্থ যাবতীয় জীবকে একত্বে পরিণত করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে জীবন উদ্যমশূন্য হইয়া পড়ে। অজ্ঞাতকুলশীল পরিচিত জনের মত নহে, নূতন পথে অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কার সম্ভাবনা, অন্ধকারে একটা চিরনূতনত্ব, বিস্ময় ও আশঙ্কার আকর। যখন বাষ্পযান ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া লৌহবর্ত্মে প্রথম ধাবমান হইয়াছিল, কে বুঝিয়াছিল, জলাগুনে ইহার প্রাণ, একটা টিপে ইহার প্রবলতা প্রশমিত হইতে পারে, পালিত বলদের ন্যায় ইহাও সারথির ইঙ্গিতে পরিচালিত। বাষ্পযানে প্রথমে পদার্পণ করিতে কাহার সাহস হইয়াছিল? শেষে আশঙ্কার কিছু হ্রাস হইলেও, পুরুষেরা পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতে, আরোহণ করিতে সাহস করে নাই। হাফ্‌কিনের বিসূচিকাবীজে টীকা দিতে যাহারা সাহস করে, তাহারা বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া টীকা দেয়; পরিবারে দুই জনকে টীকা দিয়া চারি জনকে নিবৃত্ত করে। গোবীজে বসন্তটীকার মত বিসূচিকাবীজে কয় জনের সাহস হইয়াছে?

যথেচ্ছাচার প্রভুত্বের নিদর্শন। রাজা আইনে বাঁধা, প্রজার মত শাসনদণ্ডে নিয়ত, অসভ্য দেশে ইহার কল্পনাই হইতে পারে না। প্রভুত্বের প্রাণ যথেচ্ছাচার। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মারিব, যাহা ইচ্ছা হুকুম দিব, যত ইচ্ছা খাজনা লইব। যে নিয়মে বদ্ধ, সকলে সে নিয়মে বদ্ধ হইলে রাজার রাজত্ব যায়। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এ দেশে আসিলে, লোকে তাঁহার লাঙ্গুল বা শৃঙ্গ কল্পনা করিয়া না থাকুক, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিলে তাঁহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইতে হয়, এ দেশের লোক ইহা প্রাণান্তে বিশ্বাস করিতে পারে না। একটি গল্প আছে:—একজন সিপাহী উর্দ্দী পরিয়া আসিতেছিল,—সঙ্গে একটি মোট। মাঠে এক কৃষককে কাজ করিতে দেখিয়া সে মোট উঠাইতে হুকুম দিল। হুকুম

পাইয়া কৃষক অম্লানবদনে মোট লইয়া চলিল। পথে শৌচের আবশ্যক হওয়াতে সিপাহী উর্দ্দী খুলিয়া গামছা পরিয়া মাঠে গেল। কৃষক দেখিয়া অবাক, এ ত সিপাহী নয়, মানুষ; সিপাহী যে মানুষ, কৃষকের সে বিশ্বাস ছিল না। শৌচান্তে সিপাহী ফিরিয়া আসিয়া মোট উঠাইতে বলিল; কৃষক অকুণ্ঠভাবে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, তুমি সিপাহী নও; তুমি যে মানুষ।

মানুষ দেবতাকে যথেচ্ছাচারী বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি কোনও নিয়মের অধীন নহেন। সাধুর দণ্ড, অসাধুর পুরস্কার, রোগ শোক জরা মৃত্যু, যথেচ্ছাচারী দেবতার প্রসাদ বা অপ্রসাদ জন্য। সাধারণ নিয়মে লোকের রোগ হয়, বর্ব্বর জাতি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। বিদ্যুৎ ও বজ্র কখন কোথায় তিনি প্রক্ষেপ করিবেন, প্রফুল্ল কুসুম কখন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবেন, কখন কাহাকে শূলে দিবেন, কাহার মাথায় রাজটীকা দিয়া হাতীতে চড়াইয়া সিংহাসনে বসাইবেন, কেহ জানে না। কল্পনা করিতে পারে না, কারণ তিনি স্বেচ্ছাচারী, আইন কানুনের অধীন নহেন। এ জন্য পাঁঠা কাটিয়া নৈবেদ্য দিয়া হাতযোড় করিয়া থাকিতে হয়। বড়দিনের ডালি উপহার না দিলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; আপশোষ, এই ডালি দিয়াও তাঁহার মন পাওয়া যায় না। খামখেয়ালী না হইলে রাজা কি? যথেচ্ছাচারী না হইলে দেবতা কি? সাধারণতন্ত্র, আইন কানুন বেনে মুদির জন্য, নবাব ও বাদশাহ আইনে নিত্য পদাঘাত করেন।

মনুষ্য জীবের শ্রেষ্ঠ। সাধারণ পশু পক্ষীর মত নিয়মবদ্ধ নহেন। মনুষ্য দেবতার নিকট আত্মীয়, কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে? স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলে পীড়া হয়, এখন নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও ইহা জানে; কিন্তু এই সত্য আবিষ্কার করিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল। এখনও বর্ব্বরমাত্রের বিশ্বাস, ডাকিনীর কুহকে বা প্রেত-পুরুষের অপ্রসাদে পীড়া হয়। দেহ কলের ন্যায় নিয়মে চলে, জলাগুনের কম বেশী হইলে বিকল হয়, এ জ্ঞান অতি আধুনিক। দেহের উপর প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যাহত শাসন স্বীকৃত হইলেও, মনের উপর কোন নিয়মের শাসন আছে, এ কথা অদ্যাপি কয় জনে স্বীকার করিয়াছে? শিশুর হাসি কান্না প্রাকৃতিক নিয়মের অতীত। সূতিকাগৃহে মায়ের কোলে শিশুকে যখন ষষ্ঠীদেবী বলেন, "তোর মা ম'ল", তখন শিশু হাসে; যখন বলেন, "তোর বাপ ম'ল", তখন শিশু কাঁদে। একটা অজ্ঞাত বিস্ময়পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিয়মে মানসবাজ্য

শাসিত হয়, পণ্ডিতেরা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। মূর্খের বিশ্বাস, ভূতের খেলার মত মনের লীলা যথেচ্ছাচারী দেবতার অসংযত আদেশ বা ইহাই মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা। মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ইচ্ছা, হাসি কান্না, কাম ক্রোধ, মস্তিষ্কের পরমাণু-আন্দোলনের উপর নির্ভর করে। যে নিয়মে দেহ শাসিত, সেই নিয়মে মন শাসিত, মস্তিষ্ক শাসন করিয়া হাসির সময় কান্না, কান্নার সময় হাসি, রাগের সময় ভয়, ভয়ের সময় রাগ উৎপাদন করা যাইতে পারে, ইহা কয় জনে এখন বিশ্বাস করে? অথচ অনেকেই শুনিয়াছেন, দেহ শাসন করিয়া ঋষিরা চিত্তসংযম করিতেন।

জলবায়ুর উপর যেমন দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, জলবায়ুর উপর তেমনি মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। হয় ত এ কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন। অপরাধ-তত্ত্ব প্রবন্ধে বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট প্রমাণ সহিত দেখাইয়াছেন,—চুরি, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ সকল শীতাতপের উপর নির্ভর করে। প্রমাণ পাইয়াও কয় জনে একথা বিশ্বাস করিয়াছেন? ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি অর্থশূন্য প্রলাপ। "রাম গোপালের বই চুরি করিয়াছিল কেন"? ইচ্ছার স্বাধীনতাবশতঃ, এ কথা বলিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। কেবল বলা হইল, রাম ইচ্ছা করিয়াছিল, তাই চুরি করিয়াছিল। রাম চুরি করিতে কেন ইচ্ছা করিয়াছিল? আর কোনও উত্তর চলে না।

অথচ শাখা হইতে ফলপতনের ন্যায় রাম কর্ত্তৃক গোপালের বই চুরি একটি ঘটনা। নিউটন ভাবিয়াছিলেন, ফলপতন এ ঘটনা কেন হইল? এই অনুসন্ধানের ফলে একটি নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—যে নিয়মে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বাঁধা আছে। বৃক্ষের শাখা হইতে ফলপতন অপেক্ষা গোপালের বই চুরি সামান্য ঘটনা নহে। সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাধী। আত্মীয় স্বজন পরিবার বন্ধু বান্ধব, দেশের ও সমাজের সুখ দুঃখ অপরাধীর উপর নির্ভর করে। অপরাধনিবারণের জন্য আদালত মাজিষ্ট্রেট পুলিসের সৃষ্টি, সে সকলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিরপরাধীকে ট্যাক্স দণ্ড সহিতে হয়। শিক্ষা অপরাধনিবারণের জন্য। দুষ্প্রবৃত্তির মূল উৎপাটিত হইয়া সৎপ্রবৃত্তির অনুশীলন জন্য শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের সৃষ্টি। পুত্র কন্যাকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, শেষে তাহার কলঙ্কে জীবনমৃত্যুলাভ বিরল ঘটনা নহে। সুতরাং, অপরাধতত্ত্বের আলোচনা অনাবশ্যক নহে।

অপরাধ-ইচ্ছা মানসিক পীড়া। জ্বর বিসূচিকার ন্যায় এ পীড়ার চিকিৎসা আবশ্যক। নিদাননির্ণয় না হইলে রোগের চিকিৎসা হয় না। অপরাধনিদানের আলোচনা সামাজিকের আবশ্যক। ভারতবর্ষে দৈহিক পীড়ার নিদান আলোচিত হইয়াছিল। অপরাধনিদান আলোচিত হয় নাই। অপরাধনিবারণের বিবিধ উপায় বিবিধ গবর্মেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অপরাধনিদানের আলোচনায় কোনও গবর্মেণ্ট উৎসাহ দেন নাই। ফ্রান্স ও ইতালীতে সম্প্রতি বিশেষ উৎসাহের সহিত অপরাধনিদান আলোচিত হইতেছে। অপরাধনিদানের প্রধান আচার্য্য লম্ব্রোসো।

বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় জলবায়ুর উপর অপরাধপরিমাণ নির্ভর করে—দেখাইয়া বিরত হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবু অপরাধতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার অন্য নিদানগুলি নির্দ্দেশ করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইত। তিনি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বিবর্ত্তবাদের পরিচয় দিতে আবার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অপরাধতত্ত্বের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া, আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তিনি একটি নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের উপকার হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে অপরাধনিবারণে আমাদের সামর্থ্য জন্মে নাই। বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া হয়, এ কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া-নিবারণের কোনও ক্ষমতা জন্মে নাই। বাঙ্গালী বাঙ্গালা ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইয়া বসবাস করিতে পারিবে না। কয় জন দেশের মমতা ছাড়িতে পারে? অপরাধের অন্য নিদানগুলি শিক্ষার আয়ত্ত। সেগুলির নির্দ্দেশ করিলে পুত্র কন্যাকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

আনি বেসাণ্ট।

বৈরাগ্যপ্রবণ আর ধর্ম্মপ্রবণ বলিলে, প্রাচ্যজীবন ও প্রতীচ্যজীবনের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝা যায়। প্রতীচ্যজীবনের অপেক্ষা প্রাচ্যজীবন উৎকৃষ্ট, এই ভাবের একটা হাওয়া কিছু দিন হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি আনি বেসাণ্ট আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসাময়িক না হইতে পারে।

বৈরাগ্য অর্থে জীবনে অনাসক্তি; এবং এই অর্থে বৈরাগ্য আধুনিক হিন্দুর মজ্জাগত, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। কর্ম্ম এ দেশে নাই, এমন নহে; কেন না, কর্ম্মই জীবন। কর্ম্মলোপে জীবনের অস্তিত্ব টিকে না। তবে বৈরাগ্যধর্ম্মের এতটা প্রাদুর্ভাব, অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্য্যমানবের জীবন সংসারে বীতস্পৃহ হয় নাই। তখন কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইত না। যখন চারি দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবনযাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে ছিল, আশা আর উদ্যম, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম; আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থময়তা।

আজি কালি যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া বৈদিকধর্ম্মের স্তুতিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দটার কিরূপ অর্থবিপর্য্যয় করিয়া ফেলেন,—দেখিয়া একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় রিলিজন শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম শব্দটার সে অর্থে ব্যবহার করিতে আমরা বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক্ পাওয়া যায় না; কেন না, ভারতবর্ষে সুতরাং বঙ্গদেশে, রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল না। খৃষ্টানের রিলিজন কতকটা খৃষ্টানের জুতা, টুপি প্রভৃতি পরিচ্ছদের স্থলীয় একটা কিছু; কতকটা শোভার জন্য, কতটা লোকদেখানর জন্য, এবং হয় ত শরীরটা একটু গরম রাখিবার জন্য উহার আবশ্যকতা। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহবর্ত্তী ও সহব্যাপী; জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ। মনুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার সমষ্টিকে যদি জীবন বলা যায়, মনুষ্যের সম্পাদ্য কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে এক Duty ভিন্ন ইহার সমার্থসূচক সমকক্ষ প্রতিশব্দ আর পাওয়া যায় না।

মানুষের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে স্থূলতর তিন ভাগ করিতে পারা যায়; নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্য। এই তিন কর্ত্তব্যের সমষ্টিতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানটারই

উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখিলে দেখা যায়, আত্ম-প্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সমাজবন্ধনের সহকারে পরপ্রীতি আত্মপ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশঃই প্রীতিটা আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া বাহিরের অপরের অভিমুখে প্রসার লাভ করে। পরপ্রীতি কতকটা আত্মপ্রীতির প্রতি-কূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূল নহে, কতকটা অনুকূল। পরকে ক্রমশঃ আপনার করিয়া না নিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীতি ক্রমশঃ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কোনও কোনও বিচক্ষণ শাস্ত্রকারের মতে পরার্থপরতাই ধর্ম্ম; এবং স্বার্থপরতাই অধর্ম্ম। প্রকৃত-পক্ষে উভয়ের সামঞ্জস্যেই ধর্ম্মের স্থিতি।

আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ও পরের প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের পরিধির অন্ত-র্গত; খানিকটা সেই পরিধির বাহিরে। এই সীমাবিভাগ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষ যেটুকু বুঝে, তাহার আবার কতকটাকে ভালবাসে; কতকটা ভালবাসে না; অথবা অগত্যা ভালবাসে। আর যেটুকু বুঝে না, সেইটুকুকে ভালবাসিতেও পারে না, না বাসিতেও সাহস করে না; সেইটুকুকে ভয় করে। জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশটুকু মানুষের চক্ষে বিভী-ষিকাময়। অকস্মাৎ, অতর্কিতে, এমন ভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের জীবন-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়া যায়। ইহা মানু-ষের শক্তির অধীন নয়; মানুষের ক্ষমতায় আয়ত্ত নহে, তাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায় ভাবে, কাতরনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে; স্তুতি করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে সময়ে নিতান্ত হীন-প্রাণ দুর্ব্বল অসহায়ের মত উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্তুতিবাদ, এই তোষামোদ, দুর্ব্বলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশে এই একমাত্র অবলম্বন। অসহায় মানুষ জগতের সেই জ্ঞানাতীত পরাক্রান্ত শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করি-য়াছে, ইহাকে আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়াছে। উপায়-টাকে হীন বল, কাপুরুষোচিত বল, আর যাহাই বল, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে বলিয়ো। মুক্তকণ্ঠে বলিলে মনুষ্য সমাজের সমবেত শক্তি বজ্রের ন্যায় তোমার উপর আপতিত হইবে।

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়া মনুষ্য-জীবনের আর একটা অর্থ আছে, আর একটা কর্ত্তব্য আছে; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ্ঞেয় শক্তিকে যেন তেন সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তোমারই মঙ্গল; তবে কিসে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বোধ করি—যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে! ইহজীবনে সকল সময় ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল পাইবে। দুর্ব্বলের এইরূপ সান্ত্বনা, অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা।

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ ছিল; আপনার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা ছিল, এবং আত্মরক্ষণের কামনায়, শত্রুনিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, রুদ্রের প্রতি, স্তুতিপ্রয়োগ ও উৎকোচপ্রয়োগেরও অভাব ছিল না। পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক-সময়ে ধর্ম্মের অন্তর্গত হয় নাই। হয় নাই; তাই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। জাতিমাত্রেরই অভ্যুদয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ্ ও দর্শন। এখন আর শত্রুভয় নাই, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা নাই, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা; অন্নকষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আর্য্যজাতির ধীশক্তি জীবনের রহস্যের, জগতের রহস্যের তত্ত্ব তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিযুক্ত। বিশ্লেষণে স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত সুখেরও পরিণাম দুঃখ, দুঃখময়তাই জীবন। নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব; দুঃখনিবৃত্তিই সুখ; দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখনিবৃত্তির উপায় শুদ্ধ জ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, ও সত্যজ্ঞানে মোক্ষ। সত্যজ্ঞান কি? না জগৎ কল্পনা; আমি মাত্র আছি; জগৎ আমার কল্পনা, আমার সৃষ্টি, আমার অংশ। এই জ্ঞানলাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, দুঃখ জীবনের সহচারী হইলেও আমারই কল্পিত পদার্থ। সুতরাং দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না। ফল হইল সংসারে বিরক্তি,—বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে সেই অবধি হিন্দুর অস্থি মজ্জা শোণিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্তি, কর্ম্মে অনাসক্তির রস মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

তাহার পর বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব জগতে দুঃখ ভিন্ন সুখ দেখিতে পাইলেন না। কর্ম্মবশে জীব কেবল দুঃখের চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন, এই দুঃখনিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। ভোগবিলাস, সুখ ঐশ্বর্য্যের

আবজ্ঞা পরিহার করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি বিতরণ কর। ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যের কর্ম্ম। এমন মহতী বাণী ইতিপূর্ব্বে এরকণ্ঠ হইতে কখনও নির্গত হয় নাই; পরেও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বৈরাগ্য হইতে কর্ম্ম প্রসূত হইল; কর্ম্ম ধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইল; শত্রু মিত্র হইল, পর আপনার হইল। আর্য্য অনার্য্যের সহিত মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধপ্রচারক এই অপূর্ব্ব উপদেশ লইয়া দেশে বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া, ভারতসাগর পার হইয়া, বুদ্ধপ্রচারিত প্রীতি-ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যপিপাসায় বা পোষিততৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীমা পার হয় নাই; ধর্ম্মপ্রচারের নামে জীব-রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্ম্মপ্রচার ভান করিয়া পরস্বাপহরণ ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরেই তাহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই চতুঃসীমা পার হইয়াছিল; কটিতে তরবারি ও করপুটে ধর্ম্মপুস্তক তাহারা সঙ্গে যায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবল মনুষ্যত্ব, ললাটে জ্ঞানের প্রতিভা ও কণ্ঠে প্রীতির অমৃতময়ী বাণী।

প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা ছিল না; তথাপি জীবন দুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কেন, ঠিক্ বলা যায় না। বোধ করি, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। অন্য দেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবনসমরের কঠোরতার মাত্রা পূর্ণ। অথচ জীবনে সেখানে আসক্তি প্রবল। যে কারণেই হউক, আর্য্যাবর্ত্তে জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখমুক্তি পরমপুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। ফলে দাঁড়ায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই মূর্ত্তি গ্রহণ করে; দুই পথে চলিত হয়। কেহ বলেন, মুক্তি জ্ঞানে; কেহ বলেন, মুক্তি কর্ম্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান; কর্ম্মের অর্থ প্রীতি ও মৈত্রী। বৈরাগ্যের স্রোত দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখনও বোধ করি, দুই মুখেই দুই প্রবাহ চলিতেছে। দুই স্রোত মিলিবে কি না, জানি না। যে দিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেই দিন পুণ্য দিন। যে স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগসঙ্গম।

তবে ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্য জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। চীন তিব্বতে, অসভ্য জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান, বুদ্ধের জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাদর নাই; এই বলিয়া একটা হাহাকার আজি কালি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই হাহারবের ভিত্তির ঠাহর পাওয়া যায় না। ভিন্ন

দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ ভারতবর্ষে যেরূপে যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অন্য কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই নিরীহ, দান্ত, শান্ত, ধীর, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান্ প্রকাণ্ড হিন্দুজাতিই ইহার প্রমাণ।

ভালর মন্দ আছে। আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ফল যে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা শিখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধমাত্রই পরার্থপর হইয়াছিল, বলা যায় না। মনুষ্যচরিত্র এইরূপ। শুনা যায়, যীশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন, একগণ্ডে চপেটাঘাত পাইলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে চপেটাঘাত-সহিষ্ণুতা খৃষ্টানের লক্ষণ বলিয়া কোন কালে গণ্য হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ কথা লেখে না। বিনা বাক্যব্যয়ে নিরীহের গণ্ডে চপেটাঘাত দ্বারা পরম সুখের অনুভবলিপ্সু যদি কেহ থাকেন, তিনি খৃষ্টান। যাহাই হউক, ভারতবাসী মাত্রই বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে নাই। তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধুনা আরতি দ্বারা প্রসাদলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টি দ্বারা নানা কৌশলে অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। জ্ঞানচর্চ্চার খরস্রোত প্রতিহত হইয়াছিল। শূদ্র ও অন্ত্যজ সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্য-শোণিতের বিশুদ্ধতার সহিত আর্য্যপ্রতিভার খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের নূতনভাবে পুনরভ্যুদয়ের সময়, ব্রাহ্মণমহিমার পুনঃস্থাপনের সময়, দুই একবার সেই প্রতিভা, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মত দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, সুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে নাই; মলিন প্রতিভা পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয় নাই।

বৈদিক কালের অতিপ্রাকৃতের নিকট অসহায় স্তুতিবাদের সহিত দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বুদ্ধপ্রচারিত প্রীতি, ও বৌদ্ধগণপ্রচারিত যন্ত্র মন্ত্র উপাসনা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি। আধুনিক হিন্দু সংসার মিথ্যা ও স্বপ্ন বলিয়া জানে, আপনাকে কর্ম্মবশে দুঃখবর্ত্মে ভাগ্যমান বলিয়া

স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, সর্ব্বদা মুখে কহিয়া থাকে। হিন্দু পরোপকারে কুণ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব করে, সংযম ও ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হিন্দু, রাজার নিকট দণ্ডসহিষ্ণু প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য। অত্যাচারী রাজপুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্‌স্ফূর্ত্তির ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। জীবনধারণের উপযোগী অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিতুষ্ট; কঠোর জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাঙ্মুখ, শ্রমসাধ্য জ্ঞানার্জ্জনে কাতর। সংসার মায়াময়, জীবন মোহময়, সুতপরিবার ভববন্ধনের শিকল; এমন কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কি একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি তাহাকে কাজ করায়, তাই সে কাজ করে; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকেও সেই অনির্দ্দেশ্য শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করেন। মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনি পরাধীন। তথাপি হিন্দু বিরাগী হইয়াও গৃহী; এবং সংসার মিথ্যা জানিয়াও, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, হিন্দু পুত্রকামনায় দেবতার নিকট বলি মানস করে, পরকালে সুখের কামনায় গঙ্গাস্নান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনায় গাছিতলে মাথা ঠুকে, এবং সময়ে সময়ে শত্রুনিপাতকামনায় গুপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে।

মোটের উপর ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য জাতির তুলনায় ভারতবাসী দুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারতবাসী দরিদ্র; কিন্তু সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্তু পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ভারতবাসী ঠিক বুঝে না। তাহাতে ভারতবাসী নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহে; কেন না, সে ত বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোন উপায় নাই। ভারতভূমির শস্যসম্পত্তি কখনই অপ্রচুর নহে; সুতরাং জঠরজ্বালা কখন বেশী তীব্র হয় নাই। অথবা কোনও বার ফসল না জন্মিলে ভারতবাসী দল বাঁধিয়া মরিয়া যাইতে কোনও মতেই পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে এ বিষয়ে কখনও কাপুরুষ বলিও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা ভারতবাসী ঋষিমুখে শুনিয়াছে; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান-আহরণের দরকার নাই; তাহা তাহার পূর্ব্বপুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। কর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়, তাহাও সে জানে; তাই সন্ধ্যাবন্দনা তাহার নিকট ফাঁক যায় না, এবং মাসের মধ্যে ঊনত্রিশটা একাদশীর ব্যবস্থা হইলেও তাহার লোমহর্ষের সম্ভাবনা নাই। এর চেয়ে মহত্তর কর্ম্ম আর

কি হইতে পারে? আর সংসারে অনাসক্তি তাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও গৃহিরূপে অবস্থানকালে এই উপদেশটার সম্যক্ প্রতিপালন সহজ হয় না; তবে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সুত পরিবার বিধাতার মরজিতে সমর্পণ করিয়া গৃহাশ্রম হইতে দূরে পলায়ন করিয়া কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিয়া হাঁফ ছাড়িবার পথ পায়।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির ইতিহাস এইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, যে প্রতীচ্য জাতিদের সহিত ভারতবর্ষের সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মূলতঃ বিভিন্ন। হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তে মূলকথা—তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাত্য দেশের ইতিবৃত্তে মূল কথা—অন্ন আর অন্ন। ইউরোপে যতদিন লোক সংখ্যা অন্নসংস্থানের সীমা ছাড়াইয়া উঠে নাই, ততদিন ইউরোপের লোকে পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্ব্বর, লোকসংখ্যা বর্দ্ধমান, সকলের অন্ন জোটে না; জঠরজ্বালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপের লোক স্বদেশ ছাড়িয়া বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় স্পানিয়ার্ড। দেখা দেখি পোর্টুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউরোপ হইতে লোক দলে দলে বাহির হইল; সঙ্গে ছিল জঠরজ্বালা ও তজ্জনিত অমানুষিক উত্তেজনা, অর্থতৃষা ও রক্তপিপাসা। আর তার সঙ্গে ছিল ধর্ম্মপ্রচারের ভান। এই ভান ও এই পিপাসা লইয়া দস্যুর দল লোকোপপ্লবের জন্য পূর্ব্বে পশ্চিমে যেখানে সেখানে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু হায় ধূমকেতুর আবির্ভাব অচিরস্থায়ী; আর এই নৃশংস দস্যুর দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর বাহির হইল না। প্রাচীন রাজ্য ছারখারে গেল, প্রাচীন সভ্যতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানববংশ ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে অস্থিকঙ্কাল রাশিয়া বরাধমি হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। একমাত্র ভারতবর্ষে এই ধ্বংসদাবানল সম্যকভাবে জ্বলিতে পায় নাই; অন্ততঃ ভারতবাসী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সে ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পুণ্যফলে বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ইউরোপ পরস্বাপহরণ ও পরের সর্ব্বনাশ চারি শত বৎসর ধরিয়া করিতেছেন বটে, কিন্তু ইউরোপের জঠরজ্বালার তীব্রতা তাহাতে কমে নাই। জীবনের কঠোরতা, অতৃপ্তির তীব্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরাজের,

রূপের, ফরাসীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জর্ম্মনি ইতালি প্রভৃতিও বহিঃসাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। অল্পচেষ্টার অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি বিপুল-বেগে ঘটিয়াছে। যশোগৌরবে, জ্ঞানগৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মহিমাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণেরও সীমা আছে। লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর এখানে ওখানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি জায়গা আছে, তাহা কিছু দিনেই জনপূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ সেখান হইতে অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা।

ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমানের চাকচিক্য শোভার অন্তরেও গোল-যোগ দেখা যায়। ইউরোপে যেন একটা মহা কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জাতিই তাহার উদ্যোগপর্ব্বে ব্যতিব্যস্ত ও উৎ-কণ্ঠায় নিমগ্ন। হয় ত সেই মহা কুরুক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিস্তূপে পরিণত হইবে। সমাজের অভ্যন্তর হইতেও একটা অতৃপ্তির ও অশান্তির ও যাতনার তীব্র নিনাদ উঠিতেছে। সমাজ প্রতিক্ষণেই বিপ্লবোন্মুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠশোণিতপানে ক্ষুৎযন্ত্রণা মিটাইতে প্রস্তুত। উপরে জ্ঞান বিজ্ঞান শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য লোক-নয়ন ঝলসিতেছে। অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা ক্ষীণ চর্ম্মে কঙ্কাল আচ্ছাদন করিয়া ত্রাহিস্বরে ডাকিতে ডাকিতে পৈশাচিক বদন ব্যাদান করিয়া সমাজ-শরীর গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। রাজপুরুষগণ রাক্ষসীকে শাসনে রাখি-বার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু শাসন আর মানে না।

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, এই জীবনমরণ-সমস্যা লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। আনি বেসাণ্টের বিচিত্র জীব-নের বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা-সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যাপূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। লণ্ডনের দরিদ্রতার সহিত বহু দিন ধরিয়া তিনি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে তিনি এই শান্তরসা-স্পদ পুরাতন পুণ্যতপোবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধা স্থির ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সংযত জাতির প্রতি চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর হয় না; ইহার আর তুলনা নাই।

ইউরোপ কর্ম্মপ্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দু জাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয় ত আকাশবাহী উল্কার মত, অগ্নিগিরির উদ্গীরিত বহ্নির মত, ক্ষণস্থায়ী শোভাবিস্তার করিয়া নির্ব্বাণ হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্ত্তী দুই পথ বর্ত্তমান। কোন্ পথ অবলম্বনীয়, ইহাই হিন্দুসন্তানের প্রধান বিচার্য্য। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আয়েসা।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

পাঠক! আমাদের "আয়েসা" কবিকুলপিক, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা "আয়েসা সুন্দরী" নহেন। আমাদের চিত্র ঐতিহাসিক।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের শীর্ষোল্লিখিত আয়েসা, সাহানসা মহাপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর সাহজাহানের পৌত্রী, এবং বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা, তৎপুত্র সাহসুজার একমাত্র কন্যা।

আয়েসা সুন্দরী—সে সৌন্দর্য্যে প্রাণোন্মাদিনী মোহিনী শক্তি ছিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ছায়া বিস্তার করাতে, তাহা আরও মধুর, আরও মনোহর, হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতেশ্বরের পৌত্রী—তাহাতে আবার দিল্লীর রাজগৃহে প্রতিপালিতা, সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার সকলই হইয়াছিল। নৃত্যগীতে, চিত্রাঙ্কনে, সুকুমার শিল্পে, সেই অতুল সৌন্দর্য্যাধিকারিণী রমণীর কমনীয়তা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। রাজান্তঃপুরে আমীর ওমরাহ ও প্রধানবর্গকে লইয়া যখনই কোনও সমারোহ উপস্থিত হইত, বাদসাহ সাগ্রহে স্বীয় পৌত্রীকে তথায় উপস্থিত রাখিতেন। খোস্‌রোজের উৎসবে, নওরোজের কোলাহলে, যমুনার নীলতরঙ্গময় বক্ষে "সখের ভ্রমণে," সমানভাবে আয়েসার সহকারিতা আবশ্যক হইত।

মোগল রাজান্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ অতি বিরল ছিল। যাঁহারা এ সম্বন্ধে আয়েসার পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য তখন সম্পূর্ণরূপে কালের অস্তাচলশিখরে অস্তমিত হইয়াছে। নুরজাহান তখন শীতল সমাধিগর্ভে, মমতাজ্ তখন তাজমহলের বেষ্টনীর মধ্যে; কেবল একমাত্র আয়েসাই, সেই সময়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

আর ছিলেন বটে, জেহানারা, রসিনারা। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা দুই ভগিনীতে এত ব্যস্ত যে, অন্য দিকে রাজপুরীর মনোযোগ আকর্ষণে তাঁহাদের আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না।

অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ সুন্দরী আয়েসার হস্তপ্রার্থী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। একমাত্র রাজকুমার মহম্মদই এই বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন।

যুবরাজ মহম্মদ কূটবুদ্ধি আরঙ্গীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সুপুরুষ, সুচতুর; তাঁহার প্রকৃতিও সুমধুর ছিল। তাঁহার বুদ্ধি পিতার অনুরূপ, শৌর্য্য পিতামহের অনুরূপ, কিন্তু একমাত্র একাগ্রতার অভাবে তিনি পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী হইতে পারেন নাই।

কবি বলেন, প্রণয়ের পথ সরল নহে; উপন্যাসিকার বলেন, প্রেমের পথে অনেক বিঘ্ন; একটু বেশী দরের ভাবুক বলেন, প্রকৃত প্রণয় যেখানে, সেইখানেই অশ্রুবিনিময়ের অভিনয়। আরম্ভটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ার মত, কিন্তু পরিণামে অশ্রুধারাই থাকিয়া যায়। এই তিন শ্রেণীর কথাই আমরা মানিয়া চলিতে বাধ্য। আয়েসা ও মহম্মদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সেইটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক।

রাজত্বকালের একোনত্রিংশ বৎসরে সাহজাহান বাদসাহ মূত্রকৃচ্ছ রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের পরিণামস্বরূপ আংশিক পক্ষাঘাতও ঘটে। সাহজাহান পুত্রদিগের ক্ষমতা সংযত রাখিবার জন্য, দ্বিতীয় পুত্র সাহসুজাকে বঙ্গদেশে, তৃতীয় মুরাদকে গুজরাটে, এবং চতুর্থ আরঙ্গীবকে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার দিয়া প্রেরণ করেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র পুত্রেরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে রাজধানী অভিমুখে সিংহাসনের জন্য ধাবিত হইলেন।

যুবরাজ দারা দিল্লীতে পিতার নিকটেই থাকিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ, সিংহা-

সেনাধিকারী, সুতরাং তিনি পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তার জন্য রাজধানীতেই ছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগের মধ্যে কুমার আরঙ্গীব স্বীয় কূটনীতিকৌশলে পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

আরঙ্গীব ভাণ্ড ধার্ম্মিকতায় স্বীয় অগ্রজ মুরাদকে হস্তগত করিয়া, উভয়ের একত্রিত সৈন্যবলের সহায়তায়, সিংহাসন-অধিকার করেন; পরে গোয়ালিয়রের দুর্গে তাঁহাকে বিষধর সর্প দ্বারা দংশিত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত করেন। দারা চৈত্রবায়ুবিতাড়িত প্রচণ্ড তরঙ্গমালার ন্যায় অগণ্যবাহিনী সহিত গুজরাটে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু আরঙ্গীব তাঁহারও প্রাণবধ করিয়া সেই রুধিরপ্লাবিত, সদ্যবিখণ্ডিত, ছিন্ন শির স্বীয় পিতা সাহজাহানের নিকট ভীষণ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

একমাত্র অবশিষ্ট কেবল সাহসুজা। সুজা কয়েক বার পরাজিত হইয়াও পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত রাজভ্রাতার প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত ছিলেন। আরঙ্গীব সম্রাট হইয়া সুজার বিরুদ্ধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ ও প্রধান সেনাপতি মীর জুমলাকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। সুজা এই সময়ে মুঙ্গেরে থাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাদল কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন। মুঙ্গের সুরক্ষিত করিয়া, তিনি সম্রাটসৈন্যের অপেক্ষায় সেই স্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ মহম্মদ ইতিপূর্ব্বেই আয়েসার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মধুর প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আয়েসাও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। আয়েসার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ পর্ব্বতবক্ষমধ্যস্থ প্রস্রবণের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতেছিল। যদিও এই সব যুদ্ধবিগ্রহে পরস্পরের সাক্ষাৎসন্দর্শন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল, তথাপি অন্য পক্ষে অনুরাগের পরিমাণ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আরঙ্গীবও পুত্রের প্রণয়কাহিনী অবগত ছিলেন, কিন্তু সিংহাসনাধিরোহণের অব্যবহিত পরেই এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, সুজার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুদূরপরাহত।

কর্ত্তব্যপরায়ণ, পিতৃভক্ত মহম্মদ কর্ত্তব্যের চরণতলে প্রণয়কে বলিদান করিয়া, অগণ্য সৈন্য লইয়া পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, কয়েক দিন পরে মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুঙ্গেরে দুই একটা সামান্য যুদ্ধের পর অসুবিধা বুঝিয়া সুলতান সুজা রাজমহলে স্বীয় সৈন্যবৃন্দ পরিচালিত করিলেন। সেই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

সম্রাটের সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সুজা ছয় দিন ধরিয়া অকুতোভয়ে যুঝিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া তিনি স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদি, এক ঝটিকাময় নিশীথে একখানি নৌকায় তুলিয়া দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাণ্ডায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তাণ্ডায় কয়েকবার বাঙ্গলার রাজধানীও স্থাপিত হইয়াছিল। সুজার তাণ্ডায় পৌঁছিবার দিন হইতেই বাঙ্গলায় ভয়ানক বর্ষা আরম্ভ হইল। বর্ষা দেখিয়া সম্রাটসৈন্য কয়েক মাসের জন্য যুদ্ধবিমুখ হইয়া একস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল; সুজা ইত্যবসরে পুনরায় বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, কার্য্যস্রোত বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল। রাজকন্যা আয়েসা তাণ্ডা হইতে যুবরাজকে গোপনে পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে প্রেমময় মধুর ভৎর্সনা, তাঁহার পিতার শোচনীয় অবস্থা প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ ছিল। মহম্মদ সেই পত্র পাইয়া প্রেমোদ্বেলিত চিত্তে প্রণয়ের প্রতিদানে অগ্রসর হইলেন।

সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ আশা, পিতার রোষময় কটাক্ষ, সাম্রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য, বিদ্রোহীর প্রতি শত্রুতাচরণ ভুলিয়া গিয়া, তিনি প্রেমের সম্মুখে আত্মবলি প্রদান করিলেন।

আয়েসার পত্রের উত্তরে যুবরাজ লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রিয়ে! তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক, আমি আমার অধীনস্থ সৈন্যসামন্ত লইয়া গোপনে পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হইব।"

সেই দিন রাত্রে যুবরাজ তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সেনানায়কগণকে ডাকিয়া নিভৃতে তাঁহার মনোভিলাষ পরিব্যক্ত করিলেন। মীর জুমলা অন্য কার্য্যে সেই সময়ে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সুবিধা ও অবসর সুতরাং বিলক্ষণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ সামন্তেরা তাঁহার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করিল।

যুবরাজ মহম্মদ স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া তাণ্ডায় গিয়া সুজার সহিত মিলিলেন। সাহ সুজা যুবরাজকে স্বীয় দলভুক্ত দেখিয়া, অধিকতর আশান্বিত চিত্তে তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনেক দিনের পর বিরহী প্রণয়ীযুগলের পূর্ণমিলন হইল। সে মিলনে বহুকালের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল। যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা বিধাতার লিপিবশে অখণ্ডনীয় হইয়া উঠিল।

সাহ সুজা এই রুধিরোৎসবের মধ্যেও বিবাহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র নগরী তাণ্ডা এক দিন রজনীযোগে শত সহস্র আলোকময় নেত্র উন্মীলিত করিয়া, ফুলমালায় বিভূষিতা হইয়া সাধারণের নেত্রে অপরূপ শোভা বিকাশ করিল। সে বিবাহোৎসবে সকলে দুই চারি দিনের জন্য যুদ্ধকোলাহল ভুলিয়া গেল। প্রণয়ীযুগল পরস্পর মিলিত হইয়া, সমসূত্রে তাঁহাদের ভাগ্য বন্ধন করিয়া, ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কে জানিত, অমৃতে হলাহল মিশিবে,—সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রমোদকানন শ্মশানের কালধূমে আচ্ছাদিত হইবে, শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কালমেঘে আবৃত হইবে, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বাসন্তীপ্রসূন ঝটিকাহত হইয়া ভূপাতিত হইবে? ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া কবে কোথায় কার্য্যস্রোত থামিয়াছে? সে নিজের কার্য্য করিয়া নীরবে চলিয়া যায়, তাহার সহিত সমসূত্রপাতে জড়িত ভাগ্যের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না।

প্রণয়ের মধুর মিলন শেষ না হইতে হইতে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, মলয়পরিসেবিত, বাসন্তী রজনী না পোহাইতে পোহাইতে, উৎসবের কোলাহল না ডুবিতে ডুবিতে, আবার রণকোলাহল জাগিয়া উঠিল। প্রেমিকযুগল যখন মথমলমণ্ডিত কক্ষে বসিয়া, আত্মহারা হইয়া, পরস্পরের প্রেমদৃষ্টিতে নিবদ্ধ, তখন সহসা সেই পুষ্পপরিমলবাহী প্রভাতবায়ু তাঁহাদিগের কর্ণে কামানের ভীষণ গর্জ্জন আনিয়া দিল।

মহম্মদ বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টচক্র ক্রমশঃই সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্রপথে অগ্রসর হইতেছে। ঘটনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি প্রেমোন্মত্ততায় মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত সৈন্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা আমীর জুমলার সৈন্যদলের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাণ্ডা অবরোধ করিয়াছে। কিন্তু তখন তিনি নিঃসহায় ও নিরুপায়। একমাত্র শ্বশুরের সৈন্যবলই তাঁহার প্রধান সম্বল।—তাহাদের সহায়তাতেই তিনি পিতার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইল। মহম্মদও সুজার পক্ষে অনেক সৈন্য অকারণে নিহত হওয়াতে, তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর বলক্ষয় নিবন্ধন পরাজয়

ঘটিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া তাঁহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নগরও তখন নিরাপদ নহে; অগত্যা তাঁহারা নৌকায় মাল পত্র বোঝাই করিয়া গোপনে ঢাকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

মীরজুমলা যুবরাজের মোগলশিবিরত্যাগের সংবাদ দিল্লীতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরঙ্গীব প্রথম জয়লাভসংবাদে আনন্দিত হইবেন কি, পুত্রের বিদ্রোহব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহার রোষাগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইল। আয়েসার সহিত, শত্রুর কন্যার সহিত, সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীর কন্যার সহিত, তাঁহার পুত্রের, তাঁহার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর পরিণয়, তাহাও আবার তাঁহার অজ্ঞাতে অসম্মতিক্রমে হইয়াছে, এ ব্যাপারে বাদসাহের সেই স্থির মস্তিষ্ক সংক্ষুব্ধসাগরবৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাদসাহ স্বয়ং বাঙ্গলার দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যখন মীরজুমলার নিকট হইতে তাণ্ডা-অবরোধ ও যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার মন কতক প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। আরঙ্গীব স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন, সুজার সহিত মহম্মদের মিলনব্যাপার ভবিষ্যতের পক্ষেও সুখাবহ নহে। সুতরাং তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া এক কৌশলাবলম্বনে উভয়কে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

সুজার শিবিরে আরঙ্গীবের নিকট হইতে এক পত্র গেল। পত্রবাহককে এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল—সে যেন কৌশলক্রমে, পত্র খানি কোনও উপায়ে সাহ সুজার নজরে ফেলিয়া দেয়। তাহাই হইল। সাহসুজা পত্র পাঠ করিয়া *

* পত্রে লেখা ছিল—প্রাণাধিক কুমার। সুজার—রাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রকৃতরূপে সৈন্য চালনা করিয়া যে ক্ষেত্রে তাহাকে দমন করা আবশ্যক, সেই স্থলে তুমি তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাকে ও তোমার স্নেহময় পিতাকে বিপন্ন করিতেছ। ইহাতে আমাদের অতিশয় মর্ম্মপীড়া জন্মিয়াছে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী; কোথায় তোমার জয়শ্রীলাভ-পূর্ব্বক প্রত্যাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিব, তাহা না হইয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে নিরানন্দ হইতে হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে শত্রুকে আমার পদতলে বন্দী করিয়া দিবে, এই কথা বলিয়া তুমি দিল্লী ত্যাগ করিয়াছিলে; কিন্তু সাত মাস অতীত হইয়া গেল, তাহার কিছুই হইল না। তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার স্নেহময় পিতার সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তোমার নিষ্কলঙ্ক যশে কলঙ্কারোপ করিয়াছ। হায়! হায়! কি পরিতাপ! পিতৃস্নেহ কি না রমণীর মধুর হাস্যে ডুবিয়া গেল? যশোভাতি কি না রমণীর সৌন্দর্য্যের নিম্নে স্থান পাইল? যে এক সময়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইবে, সে কি না আজ সামান্য রমণীর পদানত হইল? কিন্তু তুমি যদি স্বীয় দোষের জন্য অনুতাপ করিতে প্রস্তুত থাক, ঈশ্বরের নামে সরলতার সম্বন্ধে শপথ কর, তাহা হইলে আবার তুমি পিতার স্নেহ ফিরি-

বিস্ময়বিমূঢ়নেত্রে একবার চারি দিকে চাহিলেন; পরে যুবরাজ মহম্মদকে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, কিন্তু এখন তৎপরিবর্ত্তে আমার 'বিশ্বাসটি' ফিরাইয়া লইতেছি। এই দেখ তোমার পিতার পত্র। তুমি পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে আসিয়াছ, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সন্দেহ আমার স্নেহপ্রবৃত্তিকে ক্ষীণতেজ করিয়া দিয়াছে। তুমি মক্কায় গিয়া শপথ করিয়া বলিলেও এতৎসম্বন্ধে আমি বিশ্বাস করিব না। এত দিন তোমায় মিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আজ হইতে তুমি আমার শত্রু হইলে। আমার কন্যাকে লইয়া ধনরত্নাদি সমেত তুমি এখনই আমার স্কন্ধাবার পরিত্যাগ কর। কোনও দূষণীয় কর্ম্মে হস্তদ্বয় শোণিতরঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে তোমায় এ স্থান পরিত্যাগ করাইলে; আরঙ্গীব আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।"

মহম্মদ দুঃখিতচিত্তে সুলতান সুজার নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিলেন। একদিকে তিনি তাঁহার অকারণ তিরস্কারে যেরূপ ব্যথিত হইলেন, অন্য পক্ষে আবার তাঁহার উদারতা দেখিয়া সেইরূপ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পিতা সম্রাট আরঙ্গীবকে তিনি বিশেষ চিনিতেন। পিতৃবিদ্রোহিতার পরিণাম যে গোয়ালিয়রের অন্ধতমসাবৃত দুর্গ, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বৃথা চিন্তায় কি হইবে, তিনি অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতৃশিবিরে যাত্রা করিলেন।

অশ্রুধারা ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বিদায় লইয়া, পরদিন প্রাতে কুমার মহম্মদ স্বীয় বনিতাকে লইয়া বাদসাহশিবিরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর অশ্রুপূর্ণ নয়নে মিনতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার! কোথায় যাইতেছেন? একবার পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দিল্লীর রাজপ্রাসাদে আর আপনার স্থান নাই। চলুন, রাজমহলের জঙ্গলে এই জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করি।" মহম্মদ সেই বিশ্বাসী অনুচরকে তাহার মঙ্গলেচ্ছার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল না।

যে সকল সৈন্য এক সময়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, যাহারা তাঁহার আজ্ঞার

পাইবে। তোমাকে মার্জ্জনা করা হইয়াছে, কিন্তু তুমি যাহা সম্পন্ন করিতে গিয়াছ, তাহার কত দূর হইল?"

আরঙ্গীব অত্যন্ত লিপিকুশলী ছিলেন। উল্লিখিত পত্রানুবাদই তাহার সাক্ষ্যস্থল। তাঁহার অনেক পত্রের প্রতিলিপি আজও দিল্লী ও পল্লাবের বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

অপেক্ষায় সঙ্গীণ ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিত, যাহাদের পরিচালিত করিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতামহ ভারতেশ্বর সাহজাহানকে বন্দী করিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে বন্দীভাবে দিল্লীতে লইয়া যাইবে, এ চিন্তায় যুবরাজের হৃদয় সম্পূর্ণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন, হায়! কেনই বা পিতৃশিবির পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কেনই বা ভবিষ্যতের অত্যুচ্চ আশা পদতলে দলিত করিলাম। কিন্তু যখন সেই পথশ্রমক্লিষ্ট, বিষাদ-মণ্ডিত, আয়েসার মলিন মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন, তখন গতানুশোচনা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে প্রেয়সীর অশ্রু-পূর্ণ মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার জন্য মহম্মদ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সিংহাসনের পরিবর্ত্তে তোমায় কারাগার আশ্রয় করিতে হইবে। সযত্নপালিত উদ্যানলতাকে পূতিগন্ধময় ভীষণ শ্মশানে রক্ষা করিতে হইবে।

শিবিরসন্নিহিত হইয়া তিনি মীর জুমলার নিকট দূত পাঠাইলেন। মীর জুমলা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে শতাধিক, উন্মুক্তকৃপাণহস্ত সৈনিক দৃঢ়পদবিক্ষেপে কুমারের সম্বর্দ্ধনার জন্য ছুটিল। মীর জুমলা সেই অস্ত্রধারী সৈন্যে বেষ্টিত করিয়া কুমারকে শিবিরে লইয়া গেলেন। সৈন্যগণ চিরকালের মত একবার তাহাদের অস্ত্র নোয়াইয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। অভ্যর্থনার ব্যাপার শেষ হইলে জুমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জাঁহাপনা! কুমার! আপনি রাজবিদ্রোহী। দিল্লীর ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছেন। সম্রাটের আদেশে আপনি আমার বন্দী। বাদসাহ আপনাকে দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

পিতার স্নেহময় ক্রোড় আর তখন তাঁহার নাই। বন্দীদশায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, আরঙ্গীব পিতাগত পুত্রকে মার্জ্জনা করা দূরে থাক, বরং যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, রোষকষায়িত লোচনে আদেশ করিলেন, "ইহাকে গোয়ালিয়ারের অন্ধতমসাবৃত কারাগারে লইয়া যাও।"

সেই নির্জ্জন কারাগারে, সেই সুদৃঢ় প্রস্তরমণ্ডিত কক্ষের মধ্যে, সেই মর্ম্ম-পীড়িত, নিরাশাদলিত, যন্ত্রণাবিদগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ দম্পতি নির্জ্জনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই কারাগারের ভীষণ অন্ধকারে, ভবিষ্যতের সেই ঘোর কৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে একমাত্র আলোকস্বরূপ, সেই প্রণয়িনী আয়েসা।

মহম্মদ এক দিনের জন্যও নিজের অসম্ভাবিত অদৃষ্টপরিবর্ত্তন জন্য, আয়েসাকে তাহার মূলীভূত কারণ জানিয়াও তিরস্কার করেন নাই। তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়ের জন্য, স্বার্থ, সিংহাসন, সম্মান, জগতের সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই অকাতরে বলিদান করিয়াছিলেন। +

এই অন্ধতমসাবৃত সময়ের মধ্যে আয়েসার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। আমাদের "আয়েসার" ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ।

প্রতিবাদ।

গত জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' প্রতীচ্য সাহিত্যের আলোচনায় 'বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ' সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিচারসাপেক্ষ; এবং সে বিচার প্রাচ্যনীতি মতে করিলেই ভাল হয়।

লেখক বাস্তব ও আদর্শ কথা দুইটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিদেশী আমদানী; দেশী অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। একটা প্রাচীন কথা এই যে, "সত্যের অতিরিক্ত কিছুই নাই বা থাকিতেও পারে না, তবে 'সত্যের' বিকৃতি হয় বটে।" কিন্তু তাহা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য দর্শনের সৃষ্টি; দর্শন মানুষকে মূল পদার্থ দেখাইতে চেষ্টা করে, তাহার উপর যে একটা বিকৃত আবরণ থাকে, সেটা নষ্ট করিয়া দেয়। বাস্তববাদ যদি তাহাই হয়, তাহাতে দোষ কি? আদর্শবাদ মানে বুঝাইতেছে যে, সত্যের উপরে একটা উজ্জ্বল আবরণ দেওয়া, এবং তাহার অনুসরণ করা। ইহা টিকে কি? বেঁটু ফুলকে কুৎসিত বলিলে পাছে মন্দ শুনায়, এই জন্য তাহার উপর মল্লিকার সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের আরোপ করা চলে কি?

* * * * *

বাস্তববাদকে 'সদ্বাদ' বলিব, না 'অসদ্বাদ' বলিব?

অবশ্য শ্লীলতা, অশ্লীলতার কথা আমি বলিতেছি না; আদর্শচিত্র যতই উন্নত হউক না

---

* অন্য মতে, কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর, আরঙ্গীব পুত্রকে ক্ষমা করিয়া ১৬৭২ খৃঃ অব্দে মুক্তিদান করেন। এই সময় হইতে ইঁহারা "সিবনী গড়" নামক স্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাওয়া যায়, মহম্মদ সিপাহীরী মনসবদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে আরঙ্গীব তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা উপহার দেন। আরঙ্গীবের সিংহাসনাধিরোহণসময়ে কুমার মহম্মদ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই বোধ হয় এই কৃতজ্ঞতা। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে রাজকুমারের মৃত্যু হয়। আয়েসার মৃত্যুসম্বন্ধে কোনও কথা আমরা জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ, বোধ হয়, জীবনের শেষ অবস্থায়, হতভাগিনী আংশিক সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

কেন, বাস্তবচিত্রের কাছে তাহার মূল্য অনেক কম; এই জন্যই 'কৃষ্ণচরিত্র' মহাগ্রন্থে স্বর্গীয় গুরু বঙ্কিম বাবু 'অতিপ্রকৃতের' সাহায্য-মাত্র না লইয়া, শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবচরিত্র অঙ্কিত করিবার এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছেন।

* * * * *

কাব্যের ঈশ্বরে এবং দর্শনের ঈশ্বরে ভেদ অনেক; কাব্য প্রকৃত রহস্য না জানিয়া, একটা কৃত্রিম ঈশ্বর গড়িয়া মানুষের সমক্ষে খাড়া করে, এবং দর্শনকে উপহাস করিয়া বলে, "দেখ, তোমার নীরস কথা, নীরস ঈশ্বর কেহ গ্রহণ করিবে না; আমার কেমন সুন্দর চিত্র! ইহাতে কত সুখ!" সুখ কিসে, বলে কে? যে চিরকাল অবিনশ্বর সত্যের অনুসন্ধান করে, সে সুখী? না যে তাহার উপর একটা আপাতরমণীয় কৃত্রিমতার আবরণ ঢাকা দেয়, সে সুখী?

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

"সহযোগী সাহিত্যে" যাহা লিখিত হইয়াছিল, আপত্তিকারী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার একটা কথারও প্রকৃত প্রতিবাদ হইল না। তিনি কেবল কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কাব্যগত বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ কাহাকে বলে, প্রতিবাদকারী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাই আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার "স্বর্গীয় গুরু বঙ্কিম বাবু"র কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রতিবাদলেখক দেখিবেন, আদর্শের অর্থ "কৃত্রিমতার আবরণ" নহে; "অতিপ্রকৃতও" নহে। কারণ, মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় অতিপ্রকৃত কোনও মতে তাহার আদর্শ হইতে পারে না। প্রতিবাদ-লেখক যাহাকে "সৎ" বলেন, বাস্তবের ন্যায় আদর্শও তাহার অন্তর্ভূত। কাদাখোঁচাও পাখী বলিয়া পাপিয়াকে কি পক্ষী-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে? "কৃষ্ণচরিত্রে" বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে কোথাও বাস্তব (realistic) বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তিনি পদে পদে তাঁহাকে "আদর্শমনুষ্য"রূপে আমাদের নয়নপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। লেখকের সকল ভ্রমের উল্লেখ করিতে গেলে বাহুল্য হয়। সুতরাং স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই শেষ করিলাম:—

"সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া, শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।

"কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না? রহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি।"

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

শ্যামরাজ।

শ্যামের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সকল সময় সম্ভব নহে। এই সকল বৃত্তান্তের জন্য আমাদিগকে অনেক সময় ইংরাজ লেখকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইংরাজ লেখকদিগের গুণের সময় আমরা অন্ধ নহি, কিন্তু ইহাও এক প্রকার প্রমাণিত সত্য যে, 'পরের ভাল' জন-পুঙ্গবের প্রায় সহ্য হয় না। গালি দিবার সময় ইংরাজ লেখকের কলম পিচ্ছিল কাগজের উপর বড় দ্রুত চলিতে আরম্ভ করে। তাঁহারা সে কাজ বড় সহজে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। এই দোষের জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড মেকলেও বাঙ্গালীদিগের মিথ্যা নিন্দাবাদে আপনার অমর প্রবন্ধ কলঙ্কিত করিয়াছেন। ইংরাজের গুণ অনেক, দোষ কি নাই? তাই আজ পর্য্যন্ত শ্যামের একখানি ভাল, নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই।

শ্যাম।

এপ্রিল মাসের "লিজার আওয়ার" পত্রিকায় মিষ্টার ষ্ট্যানডিং, শ্যামের বাঙ্কক নগরের বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি ব্যাঙ্কক সহরের বড় প্রশংসা করেন না। পূর্ব্ব মহাদেশের এই জিনিস তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বর্ত্তমান শ্যামরাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এখানে দিলাম।

শ্যামরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি যথাসাধ্য সংস্কার করিয়াছেন; শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আপনিও যথাসম্ভব পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে যত দাস হইয়াছে, তিনি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলেও, এখনও অনেক দাস আছে।

সংস্কার।

কোনও বুদ্ধিমান ইংরাজকে পাইলেই তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিসে শ্যামের শাসনকার্য্য আরও ভাল হইবে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হয়।

ব্যাঙ্কক সহরে রাজউদ্যান নামক একটি শোভাময় সুন্দর উদ্যান আছে। সেখানে ইউরোপ হইতে আনীত একটি সূর্য্যঘড়ি ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেখা যায়। রাজা সেগুলি আপনি ব্যবহার করেন, এবং করিতেও জানেন। ধর্ম্মযাজক প্যালি গোয়ি রাজাকে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান।

ব্যাঙ্কক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় মতের অদ্ভুত সংমিশ্রণে সজ্জিত। বৈদ্যুতিক আলোকের জন্য একটি কোম্পানী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা চলিল না। তবে ট্রাম কোম্পানী ভালরূপ চলিতেছে। লাভ দেখিয়া তাহারা স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক ট্রামের বন্দোবস্ত করিয়াছে; তাহাতেও লাভ হইতেছে। বাস্তবিক দৃশ্য চমৎকার। একই রাস্তায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চ্চার ফল বৈদ্যুতিক ট্রাম চলিতেছে, আবার সেই ইতিহাসাতীত অন্ধকারযুগের গোশকটও আছে। সাহেব বলেন, ইহা আশ্চর্য্য।

সহর।

আফগানিস্থানের আমীর।

আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ।

আফগানিস্থানের সহিত আমাদিগের দেশগত সান্নিধ্য অপেক্ষা আজকাল রাজনৈতিক নৈকট্য আরও অধিক দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে অজ্ঞাতরহস্যময় উদ্দেশ্যপূর্ণ রুস ভল্লুক, অপর দিকে ভারতবর্ষের শান্তিবিধাতা ইংরেজ-সিংহ। এসিয়া খণ্ডে এতদুভয়ের মধ্যে আফগানিস্থান রহিয়াছে, কাজেই আফগানিস্থান একটা রাজনৈতিক সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন দুই দিক হইতে দুইটি খরবাহিনী স্রোতস্বতী আসিতেছে; মাঝে একটা বালির বাঁধ। এখন প্রবাহ মুখে নীত বালিতে বাঁধ দৃঢ়ীকৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাঁধ দৃঢ় হউক। যাঁহারা জগতে শান্তিস্থাপনেচ্ছু, এবং মানবের শুভানুধ্যায়ী, তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে, এই বাঁধ স্থায়ী হউক। এই দুই খরস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে, প্রাচ্য মহাদেশের বক্ষে সেই গণনাতীত কালের সভ্যতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যেন বিধ্বস্ত হইয়া না যায়। এই সেদিনও ত ইংরাজদূত আফগানিস্থানের চোবাবালিতে আবার টাকা ঢালিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সেই আফগানিস্থানের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা আমীরের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সহজেই ইচ্ছা হইতে পারে।

আমীর।

এপ্রিল মাসের "এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লী" সাময়িক পত্রিকায় আমীরের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক সিষ্টার জন, এ, গ্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্থানের আমীর যথেচ্ছাচারী, সেখানে তাঁহার ইচ্ছাই আইন। সংবাদপত্রাদি সেখানে নাই, এবং আমীর ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতাও কমাইয়া দিয়াছেন; এখন প্রধান ধর্ম্মযাজকের ক্ষমতা একজন সাধারণ বিচারকের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক নহে।

শিক্ষা ও শাসন।

আমীর আবদার রহমান বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া, লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়, শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। দ্রোস্ত মহম্মদের মত তাঁহার আচার ব্যবহার নিতান্ত সরল এবং আতিথেয়তাও প্রবল। তিনি যদিও নানা প্রলোভন এবং হীন-তোষামোদের মধ্যে বাস করেন, তথাপি তিনি গম্ভীর এবং স্থির। প্রজারা তাঁহার সহিত সহজেই সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ; এবং বাতবোগে ক্লিষ্ট হইলেও, তিনি সকলের অভিযোগ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ এবং ন্যায়বিচার করেন।

শান্তি।

ডাক্তার গ্রে বলেন যে, বর্ত্তমান আমীরের শাসনকালে আফগানিস্থানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। সহরে এখন চৌর্য্য বা হত্যা আর দেখা যায় না, এমন কি, বাহিরেও আর ডাকাতি বা হত্যা নাই। এখন ইংরাজেরা নিরাপদে ভারতসীমা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন, কোনও বিপদাশঙ্কা নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসালয়ের কার্য্যের জন্য টার্কিস্থান হইতে কাবুলে দুই জন লোক আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা সঙ্গে একটা মাত্র ধাঁকা বন্দুক লইয়াছিল, পথে কোনও বিপদ হয় নাই। এই পাপনিবারণকার্য্য সহজে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে; তাহা হয়ও নাই। তবে তাহার জন্য যে সকল নরহত্যাদি করিতে হইয়াছিল, তাহা না করিলে চলিত না।

টাকা ধার।

আমীর ভাবেন যে, দেশের লোকের উপকারার্থ রাজ্যশাসন করিতে হইবে, তাহাই রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য। তাঁহার ঋণদানপদ্ধতি চমৎকার, ঋণের সুদ নাই। যদি কোনও কাবুলী মূলধনাভাবে ব্যবসায়াদি চালাইতে অসমর্থ হয়, সে আমীরকে সে কথা জানাইলেই হইল। আমীর তখনই কয়েক বৎসরের জন্য তাহাকে বিনা সুদে ঐ টাকা ঋণ দিবেন।

আমীর আফগানিস্থানে কতকগুলি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলিকে জাতীয় শিক্ষালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; পার্শ্ববর্ত্তী রুসিয়া বা ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল অস্ত্রাদি তিনি সস্তাদরে কিনিতে পারেন, কিন্তু তাহা করেন না। কারণ, তাঁহার উদ্দেশ্য দেশীয়দিগকে শিক্ষাদান। কেবল যুদ্ধসজ্জা নহে, এখন য়ুরোপের সকল দ্রব্যই কাবুলে আদৃত।

কারখানা।

একটা চিলাজামা ও কোট সামগ্রীটা বড় তুচ্ছ নহে। আমীর বিলাতী পোষাক ভালবাসেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে এক জন দরজি আনাইয়াছিলেন, সে কাবুলী দরজিদিগকে ইংরাজের মত পোষাক তৈয়ারি করিতে শিখাইয়া আসিয়াছে, এখন কাবুলেই তাহা প্রস্তুত হইতেছে।

পোষাক।

ইহাই আশ্চর্য্য যে, যে-জাতি চিরদিন অর্দ্ধবর্ব্বর, সমরদক্ষ এবং দস্যুবৃত্তি-অবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই জানিত না যে, এই জাতির মধ্যে শিক্ষা এত দূর বিস্তৃত হইতে পারে। আমীর কোনও মৌলিক, এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য বহুমূল্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।

কাবুলীগণ।

ডাক্তার লিট্‌নার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, আফগানিস্থান ও গ্রেটব্রিটেন, এতদুভয় রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন, সার মর্টিমর দুর্য্যাণ্ডের কৃত নহে। সার মর্টিমর্ কাবুলে যাইবার পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে (২২শে আগষ্ট, ১৮৯৩) আমীর তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, এই-দুই রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, উভয়েরই হৃদয়ে কোনও রূপ কুভাব নাই। অসদভিপ্রায়ে কুলোকে যাহাই করুক, এ সদ্ভাব নষ্ট হইবে না।

আফগানিস্থান ও গ্রেট ব্রিটেন।

সদ্ভাব যেন নষ্ট না হয়, ইহাই আমাদিগেরও প্রার্থনা।

সাহিত্য।

হাইন এবং লেডী ডফ্‌গর্ডন।

আজ কত দিন হইল, হাইনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু জর্ম্মান কবির প্রেমসঙ্গীতগুলির আজ পর্য্যন্ত বড় আদর। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সেগুলি অনুবাদিত হইয়াছে। য়ুরোপ প্রতিভার সম্মান করিতে জানে, সেখানে প্রতিভার পুরস্কার ও পূজা আছে; য়ুরোপ বাঙ্গালা নহে, সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির গ্রন্থ ওজনদরে বিক্রয় হয় না। সেখানে লোকে পরলোকগত মহাত্মাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহাতে কখনও শ্রান্তি বোধ করে না। সম্প্রতি কোনও পত্রিকায় Early Days Recalled প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী শ্রীমতী জেনেট রসের জননী লেডী (লুসি) ডফ্‌গর্ডনের সহিত কবির পরিচয়াদির বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

হাইন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লুসি অষ্টিনের সহিত বোলোন সহরে কবির পরিচয় হয়। তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া, বিশালাক্ষী এবং সুকেশী। জর্ম্মান ভাষায় বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই এই পরিচয়ের মূল। বালিকা মাতার সহিত জর্ম্মন ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন, হাইন তাহা দেখিলেন, এবং বালিকাকে বলি-

প্রথম পরিচয়।

লেন, "যখন তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবে, তখন বন্ধুবর্গকে বলিতে পাব যে, তুমি হেনরিচ্ হাইনকে দেখিয়াছ।" বালিকা বলিলেন, "হাইন কে?" এই প্রশ্নে কবি বড় আনন্দিত হইলেন, এবং বুঝাইয়া বলিলেন যে, হাইন একজন জর্ম্মন কবি।

— তখন হইতে উভয়ের বন্ধুত্ব। লুসি তাঁহাকে ইংরাজী গীত গাহিয়া শুনাইতেন, আর কবি তাঁহাকে মৎস্য এবং জলদেবীদিগের গল্প শুনাইয়া আনন্দিত করিতেন। হাইন তাঁহার নিকট একজন ফরাসী বেহালাবাদকের গল্প করিয়াছিলেন; তাহার একটা কৃষ্ণকায় কুকুর ছিল, এবং সে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিত। তাহা ভিন্ন জলদেবগণ তাহার সহিত আলাপ করিতেন। কবি ইংরাজ বালিকার নামে তাঁহার একটি কবিতা উৎসর্গ করেন।

লুসির সহিত লার্ড ডফ্‌গর্ডনের বিবাহ হইয়া গেল। আঠার বৎসর পরে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, প্যারিসে লুসি শুনিলেন যে, তাঁহার বাসার নিকটেই হাইন বাস করেন। তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যে ইংরাজ বালিকাকে গল্প শুনাইতেন, তাহাকে তাঁহার মনে আছে কি না, এবং সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে কি না। উভয়েরই হৃদয় সুখময় অতীতের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। হাইন তখন বড় রুগ্ন, এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। মৃত্যুশয্যাশায়ী কবি তখনই তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। লুসি তাঁহাকে যে সকল গান শুনাইতেন, তাহা আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া লেডী বড় ব্যথিতা হইলেন; কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি সমধিক প্রবল। দেহ যত জীর্ণ, মন তত নহে।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।

শীর্ণ শ্বেত অঙ্গুলি দ্বারা তিনি তাঁহার শক্তিহীন নয়নপল্লব উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, লুসির নয়নদ্বয় এখনও সেইরূপ বড় বড় আছে। তবে ক্ষুদ্র লুসি এখন বড় হইয়াছে, এবং বিবাহিতা হইয়াছে, সেইটুকুই আশ্চর্য্য।" তিনি এখন সুখী এবং সন্তুষ্ট কি না, কবি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। লুসি বলিলেন যে, বাল্যকালের মত প্রফুল্ল না হইলেও তিনি সুখী এবং সন্তুষ্ট। কবি বলিলেন, "সেই ভাল। ফরাসী রমণীরা সকল প্রকারের মানব দ্বারা হৃদয় জুড়াইতে চায়। যাহারা সেরূপ করে না, তাহাদিগকে দেখিলে বড় আনন্দ হয়। সেরূপ করা যে দোষ, ফরাসী মহিলাগণ তাহা ভাবে না; তাহাদিগের হৃদয় নাই।"

ফরাসী মহিলা।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেডী ডফ্‌গর্ডন দুই মাস প্যারিসে ছিলেন। এক স্থানেই কবি ও তিনি মাস কবিতেন।—তাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া কবি এক টুকরা কাগজে পেনসিলে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন:—

"গ্রেটব্রিটেনের শ্রদ্ধেয় দেবী! এই চাকরের কাছে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তুমি আসিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু দেবীর সেই শুভাগমনের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছি। আর দেরী করিও না। আজ আসিও, কাল আসিও, সদাসর্ব্বদা আসিও। আমাকে যেন আর অধিক অপেক্ষা করিতে না হয়। আমার গ্রন্থের মধ্যে যেগুলির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে, তাহার প্রথম চার খণ্ড এই সঙ্গে পাঠাইলাম। দেবীর অনুগত পুত্তক হেনরিচ্ হাইন।"

পত্রপ্রাপ্তির অল্পক্ষণ পরেই লেডী ডফ্‌গর্ডন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে শয্যায় ছিলেন, সেই শয্যা। দেহ শীর্ণ, তিনি যেন মৃতের মত। লেডীকে দেখিয়া কবি বলিলেন:—

"জগৎ এবং ঈশ্বর, উভয়ের সহিত আমার শান্তিস্থাপন হইয়া গিয়াছে—ঈশ্বর তোমাকে দেবদূতের মত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি জানি, আমি শীঘ্রই মরিব। আমি জানি না, কেন আমি ইংলণ্ডকে ভাল বাসিতে পারি নাই; তবে আমি ইংলণ্ডকে কখনও

যুদ্ধ করি নাই। একবার আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম; লণ্ডন আমার কাছে বড় প্রীতিহীন বোধ হইয়াছিল—রাস্তার লোকেরা ত একেবারে অসহনীয়। কিন্তু প্রতিফলস্বরূপ ইংলণ্ড আমাকে কয় জন চমৎকার বন্ধু দিয়াছে—তুমি, মিল্‌নেস্ এবং আরও কয় জন।"

মিল্‌নেস্ (লর্ড হুটন) কবি এবং রাজনৈতিক ছিলেন।

এই সময় লেডী ডফগর্ডন প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার কবিকে দেখিতে যাইতেন। হাইন তাঁহার কবিতাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি লেডী ডফগর্ডনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহাকে গ্রন্থস্বত্ব দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যেখানে আবশ্যক হইবে, ছাঁটিয়া কাটিয়া লইবার অনুমতি দান করেন, এবং কবিতাগুলির সাজানর জন্য একটা খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে গদ্যে অনুবাদ করিতে বলেন। লেডী যখন তাঁহাকে Almansor এর অনুবাদ শুনাইলেন, তখন কবি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং যাহাতে তিনি অন্যগুলির অনুবাদ করেন, সে জন্য অনুরোধ করিলেন।

লেডী ডফগর্ডনের অনুবাদ।

হাইন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতেন, এবং তাঁহার কষ্টে যদি লেডী ডফগর্ডনের চক্ষে জল আসিত, তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইতেন—কিন্তু যদি তাঁহার কোনও বন্ধুকথা শুনিয়া তিনি হাসিতেন, তবে কবির আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কবির ইংলণ্ডে আসিবার কথা ছিল—সেখানে দুইজনে আবার সাক্ষাৎ হইবে, লেডী ডফ সেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবির মৃত্যুতে সে আশা ফলবতী হইল না।

হেন্‌রী রচফোর্ট।

এপ্রিল মাসের "আইডলার" পত্রিকায়, কুমারী বেলক, এই বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদপত্রলেখকের জীবন বড় বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

যদিও তিন বৎসর হইতে তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ইংরাজী শিক্ষা করিলে তাঁহার ফরাসী লেখার ধরণ খারাপ হইয়া যাইবে। সেই ভয়ে তিনি কেবল ফরাসী ভাষার চর্চ্চা করেন। তিনি ফরাসী পুস্তকাদি পাঠ করেন, ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, কাজেই তাঁহার দেহ ইংলণ্ডে থাকিলেও, প্রাণ সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রাণপ্রিয় প্যারিসের সভ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকে। তিনি মনে করেন যে, এইরূপ দূরে থাকিয়া তিনি ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভাবের নাড়ীনক্ষত্র নখদর্পণে দেখিতে পারেন।

ইংলণ্ডে বাস।

ষষ্ঠি বৎসর বয়সের বয়স অধ্যয়নাভিলাষে তিনি লেচ্‌লুই কলেজে আসেন। কিন্তু সেখানে উপন্যাসপাঠে এবং কবিতারচনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এই কবিতার জন্যই তাঁহাকে প্রথম রাজনৈতিক মতের জন্য বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। হার কোমলপ্রাণা, কল্পনাসেরিভা কবিতা! সেই সাধারণতন্ত্রমূলক কবিতা লইয়াই গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

যৌবন।

সাহেব এখন একজন প্রসিদ্ধ মসীযোদ্ধা—ঐন্দ্রজালিকের মত কলমের সাহায্যে লোকের মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন; কিন্তু পূর্ব্বে একজন অসিযোদ্ধাও ছিলেন বটে। বিলাসের অভাব নাই। সাহেব কত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তবে কয়েকটি আজও মনে আছে। তাঁহার প্রথম দ্বৈরথ যুদ্ধ এক জন স্পেনদেশীয়

বিলোল তরঙ্গে মন্দ মন্দ আন্দোলিত ফরাসী সমাজে বীর বালকের

দ্বৈরথ যুদ্ধ।

রাজকর্ম্মচারীর সহিত। সে ভাবিয়াছিল যে, তিনি একটা প্রবন্ধে সেই মহিমাময় সম্রাটকে উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রিন্স মুবাটের সহিত, তাহাতে সাহেব আহত হইয়াছিলেন। আর একটি পল ডি কসাগ্ন্যাকের সহিত, তাহাতেও সাহেব আহত হইয়াছিলেন। আর একবার এক জন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করে; সে বলিয়াছিল যে, তিনি কোনও প্রবন্ধে তাহার অপমান করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাহেব জানেন না, তিনি কি দোষ করিয়াছিলেন।

লিখিবার সময় তাঁহার বড় আনন্দ হয়। তাঁহার পুত্র আমেরিকা হইতে তাঁহার জন্য একটি Stereoscopic কলম আনিয়াছিলেন, তিনি সেইটিই ব্যবহার করেন। প্রবন্ধ লিখিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি কি লিখিবেন, স্থির করিয়া লিখিতে বসেন।

রচনা।

লোকে অনেক সময় তাঁহার কাছে অনেক প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দলিল আনে, (তিনি) সময়ে সে সকলের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, পানামাষড়যন্ত্রকেলেঙ্কারীর সময় যে সকল ডেপুটী এবং সিনেটর ঘুস লইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নামের তালিকা তাঁহার কাছে আছে। আশ্চর্য্য সংগ্রহ বটে।

উইডা।

মার্চ্চ মাসের "কালিফর্ণিয়ান ম্যাগাজিনে" মিষ্টার চার্লস রবিন্‌সন্ অধুনা ফ্লোরেন্স-বাসিনী শ্রীমতী উইডার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমতীর চিত্র বড় সন্তোষজনক নহে।

শ্রীমতী উইডার পাণ্ডুবর্ণ পুরুষোচিত বদনে সর্ব্বদা ক্লান্তির ছায়া দৃষ্ট হয়, সেই বিশাল ধূসর নয়নদ্বয় যেন একটু জ্যোতিঃহীন। তাঁহার কুন্তলজালও যেন একটু ধূসর—লোকে কানাকানি করে যে, তাঁহার দাসী বহুক্ষণ ধরিয়া এই কেশরাশির সজ্জা করে।

পোষাকে বাবুগিরি।

তিনি বহুমূল্য সুগন্ধি ব্যবহার করেন। পোষাকে তিনি চিরদিন অকাতরে অনেক সময় অকারণে অপব্যয় করেন। তাঁহার একজন রুস ভক্ত তাঁহাকে এক সেট সেবল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি বড় ভাল বাসেন। পুরাতন ফিতা তিনি অবসর পাইলেই সংগ্রহ করেন, এখন তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প নহে; তিনি সেগুলিও বড় ভাল বাসেন। তাঁহার জুতাও অনেক, এবং নানা রূপের, সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত। তাঁহার দস্তানাগুলিও ফরমাইস মত প্রস্তুত।

পুস্তকে রচনা দ্বারা তিনি যেমন প্রচলিত সমাজনীতিকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার আচার-ব্যবহারও সেইরূপ। তিনি গৃহে ব্র্যাণ্ডি পান করেন, চুরুটের ধুম পান করেন, এবং অনেক সময় আগন্তুকদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী লুইসাডিলা রেমির বয়স এখন প্রায় ৫৩ বৎসর। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বেরি-সেণ্ট-এড্‌মন্‌সে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন ফরাসী গলাতক; তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। অল্প বয়সে তিনি ও তাঁহার মাতা লণ্ডনে আগমন করেন, এবং সেই সময় তিনি "উইডা" নাম অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উইডা কি? শিশু লুইস বলিতে উইডা উচ্চারণ করে, তাহা হইতেই উইডা নামের উৎপত্তি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার Held in Bondage নামক উপন্যাস অল্প বয়সে রচিত।

জীবন ও সাহিত্য-সেবা।

বিগত ২০ বৎসর হইতে শ্রীমতী উইডা ফ্লোরেন্সের সহরতলীতে বাস করিতেছেন। যে কক্ষে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, সে কক্ষটি বড় সুন্দর—তাহা ইতালীয় ধরণে চিত্রিত—তাহাতে পদ্মফুল অনেকগুলি। অগ্নিকুণ্ডের কাছে (Hearth stone) একখানি বহুমূল্য পারস্যদেশীয় গালিচা পাতা আছে। তিনি তাহার উপর শয়ন করিয়া সময় সময় চিন্তামগ্ন থাকেন, এবং সময় সময় এক একবার চীৎকারও যে করেন না, এমন নহে। তাঁহার উপাসনাগৃহে স্যাডোনার একটি মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা আলোক থাকে। অগ্রে তিনি প্রায়ই প্রধান যেসুইট ধর্ম্মযাজক অ্যাণ্ডারলেডির কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসার জন্য যাইতেন। এই দুই কারণে লোকে বলিত যে, তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন।

ধরণ-ধারণ।

দুই বৎসর অন্তর তাঁহার এক একখানি পুস্তক রচিত হয়। দীর্ঘপর্য্যটনের সময় তিনি তাহার মূলভাগ ভাবিয়া রাখেন। তবে পূর্ব্বে তিনি যেরূপ কষ্ট সহিতে পারিতেন, এখন আর সেরূপ পারেন না। প্রভাতে ৮টার সময় তিনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। অবশ্য তখনই তিনি লিখিতে বসেন না। তিনি কেবল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন—যখন নিতান্তই ভাব আসে, তখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখেন না। সম্মুখে একটি দোয়াত রাখিয়া একখানি নীচু চেয়ারে উপবেশন করেন, এবং জানুর উপর ব্লটার রাখিয়া তাহার উপর কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। হর্ম্যতল পুস্তকের খসড়ায় প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। প্রত্যেক কাগজে তিনি গুটিকতক মাত্র কথা লিখেন; কারণ, তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত বৃহৎ। লিখিবার জন্য তিনি পেন-কলম ব্যবহার করেন।

রচনা।

শ্রীমতী উইডা খুব বেড়াইতে পারেন, এবং বেড়াইতে বাহির হইলেই তিনি এক পাল কুক্কুর সঙ্গে লইয়া যান। অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র সকল প্রকার কুক্কুর এই পালে থাকে। কুক্কুর সম্বন্ধে উইডা যে সকল অদ্ভুত গল্প বলেন, তাহা ত প্রসিদ্ধ। এক একটি কুক্কুর যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন উপযুক্ত উৎসবের সহিত তাহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুক্কুর।

প্রায়ই দেখা যায়, তিনি তাঁহার বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত একটু অদ্ভুত রকমের খোলা গাড়ীতে Lung-Arnoয় বাইতেছেন। ঘোড়ার সাজও একটু অদ্ভুত রকমের। তিনি সাধারণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন না; সমাজে মিশিতে চাহেন না। গৃহে বৃদ্ধা দাসী ও তিনি নির্ব্বিবাদে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে বাস করেন। Under Two Flags গ্রন্থে মিস্ত্রারেটের আদর্শ এই দাসী।

গৃহে ও বাহিরে।

করমর্দ্দন তিনি ভালবাসেন না, বরং ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, ইহা সর্ব্বনিকৃষ্ট অভিবাদন। কোনও গৃহে প্রবেশ করিলে আগেই তিনি আসন খুঁজিয়া লয়েন। তার পর একবার বসিলে যতক্ষণ না উঠিবার সময় হয়, ততক্ষণ স্থির। কেহ তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, তাঁহাকে তাঁহার কাছে যাইতে হয়। আগন্তুক যেই কেন হউক না, তিনি উঠিয়া তাঁহার কাছে যাইবেন না।

অভিবাদন।

জগতের স্ত্রীজাতির মধ্যে তিনি কেবল রোজা বনহিউরকে ঈর্ষ্যা করেন; তিনি আমেরিকানদের ভালবাসেন না। যখন শ্রীমতী জন বিগিলো এক প্রকার জোর করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই আমেরিকানদিগকে ঘৃণা করেন। শ্রীমতী বলিলেন, "জানি না, কেন আপনি তাহাদিগকে ঘৃণা করেন; কিন্তু তাহারা ভিন্ন আর কেহই আপনার

আমেরিকান।

ঘৃণাস্পদ পুস্তক পাঠ করে না।" শ্রীমতী উইডা আমেরিকানকে নিকটে টানিয়া বলিলেন, "তুমি ভাল লোক, ভিতরে আইস।" যে তাঁহার সহিত ব্যবহারে তাঁহার আপনার অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই জয়লাভ করিবে,—কার্লাইলেরও এইরূপ ছিল।

সমাজনীতি।

সিকিমের বিবাহপ্রণালী।

মে মাসের "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিনে" শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস সিকিমের বিবাহপ্রণালীর বর্ণনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

যে দেশে জাতিভেদপ্রথার বিশেষ প্রাবল্য, সেখানে প্রায়ই বিবাহে ঘটকের সমাগম দেখা যায়। বৌদ্ধ সিকিমে প্রকৃষ্টরূপে জাতিভেদ না থাকিলেও, সেখানেও ঘটকালি দ্বারা বিবাহ-কার্য্যের সূত্রপাত হয়। সকল দেশে যেমন উচ্চ, মধ্যম ও অধম ঘর ও বর। আছে, বৌদ্ধ সিকিমেও তাহা দেখা যায়। সেখানে উচ্চবংশীয়দিগের সহিত নীচকুলোদ্ভবদিগের বিবাহ হয় না; মধ্যবিত্ত লোকের সহিত ধনবানের আদান প্রদান নাই। ঘর সমান সমান হওয়া চাই। ঘটকেরা এই সমান সমান ঘরে বিবাহের কথা কয়। এই ঘটকের দল সিকিমে বর্ম্মী নামে অভিহিত। এই বর্ম্মীরা যখন ঘটকালি করিতে যায়, তখন তাহারা এক পাত্র সুরা ও বিবাহার্থী পাত্রকে সঙ্গে লইয়া যায়। যাত্রাকালে যদি তাহারা কোনও শূন্যপাত্র সম্মুখে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা ফিরিয়া যায়। কারণ, শূন্য-পাত্র, হিন্দুদিগের ন্যায়, তাহাদের চক্ষেও অমঙ্গলসূচক।

শূন্য পাত্র দেখিয়া ফিরিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার তাহারা বহির্গত হয়। যে সুরাপাত্র উপহার লইয়া তাহারা পাত্রীর বাটীতে উপস্থিত হয়, সেই উপহারকে সিকিমি ভাষায় নাংচাং বলে। কন্যাপক্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সুরাপাত্র উপহার-বাগ্দান ও বিবাহ। স্বরূপ গ্রহণ করিলেই বিবাহ একরূপ ধার্য্য হইয়া যায়। প্রায়ই এক বৎসর পরে এই বাগ্দান প্রকৃত বিবাহে পরিণত হয়। এই বিবাহে বরকন্যা ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া চিরসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়।

হিন্দুদিগের বিবাহ সচরাচর পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পিতামাতার অবর্ত্তমানে অন্য কোনও নিকট আত্মীয় ব্যক্তি বিবাহ দিতে পারেন, নহিলে নয়। হিন্দুদিগের বিবাহে পিতামাতার অনুমতি অগ্রে, তৎপরে অন্য-কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা। সম্বন্ধীয়ের বা অন্যলোকের। হিন্দু বিবাহ পিতামাতার অনুমতি-সাপেক্ষ। কিন্তু সিকিমে মাতুলানুমতিই সর্ব্বপ্রথম। এখানে বিবাহে কন্যার মূল্য অধিক। বোধ হয়, সমান সমান ঘরে কন্যা মেলা দুষ্কর, তাই কন্যাপক্ষীয়ের গুমরও অধিক। কন্যাপক্ষীয়ের মধ্যে কন্যার মাতুলই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং বর বা বরপক্ষীয়েরা সর্ব্বাগ্রে পাত্রীর মাতুলের অনুমতিলাভের চেষ্টা করেন। মাতুলকে হস্তগত করাই প্রধান কার্য্য। তজ্জন্য বরপক্ষীয় লোকেরা কন্যার মাতুলকে উত্তমরূপে ভোজে খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে মাতুলানুমতিগ্রহণে কৃত-কার্য্য হইলে, তবে কন্যার পিতামাতার সহিত কথা, এবং তাহার পর কন্যার দর দাম ঠিক হয়। ৪টি ঘোটকের মূল্য এবং আরও তিনটি দ্রব্য দিয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতে

হয়। এক একটি ঘোটকের (Pony) মূল্য ৫০৲ টাকার হিসাবে ধার্য্য হয়। উচ্চশ্রেণীর কন্যার বিবাহে ১৮টি, মধ্যবিত্ত লোকের কন্যার বিবাহে ১২টি, এবং নিম্নশ্রেণীর কন্যার বিবাহে একটি মাত্র ঘোটক দেয়। উচ্চশ্রেণীর বিবাহে কেবল ঘোটকের মূল্য ধরিয়া দিলেই চলে না, আরও অনেক সামগ্রী দিতে হয়। তন্মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা, ৮ আউন্স রৌপ্য, একটি রেসমের পোষাক, এক সেট গরম কাপড়, একখানি র‍্যাগাব, একটি সবৎসা গাভী এবং উৎকৃষ্ট রকমের একটি মুখাচ্ছাদন দিবার প্রথাই দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত লোকেরা আপনাদের পছন্দমত ৫টি দ্রব্য দিলেই চলে, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একটি শূকর বা ছাগ ভোজনের নিমিত্ত প্রদান করে। বিবাহকার্য্য কন্যার সহিত একটি শুভদিন দেখিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবাহের দেনা পাওনা কন্যার মাতুলের অনুমতিগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য ঘটকেরাই করিয়া থাকে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা প্রত্যেক পক্ষ হইতে ৫৲ টাকা করিয়া বিদায় পায়।

কন্যাপণ।

সুরাপাত্র উপহার গ্রহণ করিবার পর বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয় দিন বরের অবস্থা এক জন ভিক্ষুকের অবস্থার ন্যায় হীন বলিয়া বোধ হয়। পাত্রের মাতুলের অনুমতির পর, যদি উভয় পক্ষের বাটীর নিকটস্থ কোনও বাটীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বিবাহে নিমন্ত্রিত লোকদিগের জন্য যাহা ব্যয় হয়, বরপক্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাহার অধিকাংশ বহন করিতে হয়। অন্য অন্য ব্যয়ের মধ্যে বরপক্ষকে একটি গরুর খরচ বেশী দিতে হয়। সেই গরুটি ভোজের জন্য প্রদত্ত হয়। কিন্তু যদি কন্যার নিজবাটীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে কন্যার পিতামাতা অভ্যর্থনা ও ভোজনাদির ব্যয় বহন করেন। এই বিবাহকার্য্য নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে সচরাচর বেলা দ্বিপ্রহর বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, এক জন পুত্রকন্যাবিশিষ্ট পরিমিতব্যয়ী সচ্ছল গৃহস্থ পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ পুরোহিতকে সিকিমি ভাষায় 'থালেনপা' কহে। থালেনপা সিকিমি-যাবতীয় দেবদেবীর স্মরণ করিয়া, বরকন্যার রক্ষার জন্য এইরূপে প্রার্থনা করেন;—"হে বুদ্ধ, হে ধর্ম্মরাজ, হে সঙ্ঘ, হে স্বর্গীয় লামাসম্প্রদায়, হে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ও স্থাপয়িতা পুরুষগণ, হে চতুরব্জিমণ্ডলীর স্বর্গীয় দেহধারিগণ, হে তুষারমণ্ডিত মহান্ হিমালয়, হে পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষয়িতৃগণ, হে যাবতীয় প্রাণিমণ্ডলী ও যাবতীয় সৃষ্টির জনয়িতৃগণ, আপনাদের নমস্কার; আপনারা আমাদের এই নবদম্পতির রক্ষা বিধান করুন। আজ হইতে এই নবদম্পতি চিরসূত্রে বদ্ধ হইল। এই পতির আজ হইতে এই একমাত্র জায়া। এই জায়ার আজ হইতে এই একমাত্র পতি। আজ হইতে এই বর এই কন্যার পূর্ণ অধিকারী, আজ হইতে এই কন্যা এই বরের পূর্ণ অধিকারিণী। ইহারা পরস্পরে নিজ নিজ চরিত্রের জন্য পরস্পরের নিকট দায়ী। এই পতি আজ হইতে আপনাদের সমক্ষে, আপনাদের নামগ্রহণ করিয়া, নিজ জায়াকে অন্য কামপরায়ণ লোকের দ্বারা কলঙ্কিত হইতে দিবেন না, এই ভার লইলেন, এবং আপনাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর এই জায়াও অন্য রমণী যাহাতে আপনার পতিকে কুপথে না লইয়া যান, তাহাও দেখিবেন। এই পতি যাহাতে নিজ জায়ার সম্পত্তি রক্ষা করেন, কিম্বা তাহাকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না করেন, ইহার ভারগ্রহণ করিলেন। হে দেবমণ্ডলী, আপনারা এই বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন।" এই প্রার্থনা শেষ হইয়া গেলে, থালেনপা বরকন্যার মস্তক একখানি রেশমীবস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দেন। তাহার পর, অন্য আত্মীয়গণ স্বেচ্ছামত বরকন্যাকে উপহারাদি প্রদান করেন।

বিবাহের মন্ত্র।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—জ্যৈষ্ঠ। এবারকার সাধনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা—"মৃত্যুর পরে।" এই সুন্দর ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কবিতার নিগূঢ় রহস্যরস কেবল অনুভবগম্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতবর্ষে—বারাণসী" এখনও চলিতেছে। "সাময়িক সারসংগ্রহ" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এবারকার সাময়িক সারসংগ্রহের বিষয়নির্ব্বাচন ও রচনা বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতা" এখনও চলিতেছে। "যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। বিষয়টি সাধারণের জন্য বেশ মধুর ভাবে, মিষ্ট ভাষায় ও প্রাঞ্জল প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "শোকসভা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর, যখন তাঁহার স্মরণার্থসভার উদ্যোগ হয়, তখন অনেকে উদ্যোগকারীদের বাধা দিয়াছিলেন। শোকসভার উপযোগিতা কি, রবীন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে তাহা দেখাইয়াছেন, এবং অতি সমীচীনরূপে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির নিরাস করিয়াছেন।

ভারতী।—জ্যৈষ্ঠ। এবার প্রথমেই একটি এক সংখ্যায় সমাপ্ত গল্প,—"আর একবার।" শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়, এই গল্পটির লেখক। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিল না। ভাষা ছোট গল্পের উপযুক্ত নয়,—গল্পেরও তেমন বাঁধুনি নাই। ছোট গল্পে যে একটা সংযত, সংক্ষিপ্ত রচনাগঠনের আবশ্যক, এ গল্পে তাহারও সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি হীরক প্রস্তুত করণ" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হীরা "সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে খনিজ অকৃত্রিম হীরক সদৃশ।"—শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের "নিজামরাজ্য" প্রবন্ধটি আশানুরূপ হয় নাই। "বিষ্ণুপ্রয়াগ" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু প্রয়াগ ক্রমে পুরাতন হইয়া আসিল। "অশিক্ষিতা" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি ক্ষুদ্র কবিতা, ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছু দেখিলাম না। শ্রীমতী সরলা দেবীর "ল্যান্‌করাণের উজীর"—দ্বিতীয় অঙ্ক এবার প্রকাশিত হইয়াছে। এবারও সুরুচির শ্রাদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "বিদ্বজ্জনমিলন" এবারকার ভারতীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় পর্য্যাপ্ত। লেখক এই প্রবন্ধে কতিপয় নূতন শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সেগুলি সুপ্রযুক্ত ও রুচিমধুর হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী "মুদ্রারাক্ষসের" সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। লেখিকা বলিতেছেন, "দুই শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সহস্র বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত নাটকের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, অথচ সবে খানদশেক মাত্র সুপাঠ্য নাটক আমরা পাইয়াছি—অপাঠ্যের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা নয়, আর গোটাকুড়িক মাত্র।" লেখিকা কি ধ্রুবসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা একুনে ত্রিশখানি মাত্র? কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি "দৃশ্যকাব্য" বুঝাইতে "নাটক" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারে দৃশ্যকাব্যের নানা ভেদ আছে, নাটক তাহার অন্যতম। শ্রীমতী সরলা দেবী কি ত্রিশখানি "দৃশ্যকাব্য" দেখিয়াছেন, না দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত ত্রিশখানি "নাটক" পাইয়াছেন? লেখিকা মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতাদের "ইতর কবি" এই সুমিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সমালোচনাটির মুখবন্ধ বেশ হইয়াছে।

জন্মভূমি।—জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের "স্বাধীন ভারত" সুপাঠ্য, চিন্তা-কর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। "বাণভট্ট সংস্কৃত কাব্যে একজন মহারথি। তিনি অন্ততঃ বার শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের বা আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল," লেখক এই প্রবন্ধে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাণভট্ট কোন্ সময়ের কবি, কাদম্বরীতে সমগ্র ভারতের চিত্র পাওয়া সম্ভব কি না, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা লইয়া তর্ক করুন। তর্করত্ন মহাশয় সাধারণের জন্য বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত হইতে যে ছবি তুলিয়াছেন, তাহা হইতে সহজে অনেক ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ করা যায়। "ভূদেব-বিয়োগ" শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের একটি পদ্য, চৌদ্দ লাইন ইহার কলেবর,—অতএব ইহাও একটি সনেট। এমন কটমট কবিতা কামস্কটকায় চলিতে পারে, ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অপাঠ্য। "অভিমান" শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের একটি কবিতা। গিরীশ বাবু বলিতেছেন,—

"রাখিতে পারি হে যদি শুকপদে মতি,
খুচিবে হে অভিমান। তোমার শকতি।
ইচ্ছামত ধন পাব, "নারী পাব যারে চাব,"
অতি হীন হয়ে হব ধরণীর পতি।" ইত্যাদি।

"নারী পাব যারে চাব"—এ পদটির অর্থ কি? যদি ইহার কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, বলিতে পারি না। কিন্তু সাদা কথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভয়ানক। প্রকাশ্য ভাবে প্রণয়ের এ কামনা জন্মভূমির সম্বন্ধে প্রকাশ না করিলেই ছিল ভাল। "জন্মভূমির" আর একটি দুর্ব্বোধ কবিতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "আহ্বান"। কবিতাটি আন্তরিকতাশূন্য ও কৃত্রিমতাদুষ্ট, সুতরাং হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

জ্যোতিঃ।—জ্যৈষ্ঠ।—এ সংখ্যার "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ"-বেশ সুখপাঠ্য। "বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস" যত দূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ নূতন কথা কিছু নাই।

পূর্ণিমা।—জ্যৈষ্ঠ।—"৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়" এবারকার পূর্ণিমার একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। ইহাতে ভূদেব বাবু সম্বন্ধে দুই একটি সুন্দর গল্প আছে।

অনুসন্ধান।—অষ্টম বর্ষ; সপ্তম সংখ্যা। অনুসন্ধান পাক্ষিক ছিল, সাপ্তাহিক হইয়াছে। এই পত্রখানি মধ্যে "নলের ভাল" হইয়াছিল, আবার অত্যন্ত অধঃপতিত হইয়াছে। সুপাঠ্য ও উল্লেখযোগ্য কিছু থাকে না বলিয়া এত দিন আমরা অনুসন্ধানের কোনও উল্লেখ করি নাই। কিন্তু অনুসন্ধান ভালপথে বড় হইতে না পারিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে। কেহ সুকাজে নাম রাখে, কেহ বা দুষ্কার্য্যে বিখ্যাত হয়। বোমের সম্রাট নীরো নিষ্ঠুরতা ও দুরাচারিতায় নাম কিনিয়া গিয়াছে; অনুসন্ধানেরও সাধ, গালি দিয়া নাম জাহির করিবে। এই সংখ্যার অনুসন্ধানে "চাঁদের হাট" নামক একটা অঘন্য, অপাঠ্য, কুরুচিপূর্ণ পাঁচালীর ছড়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ লেখককে ইতর ভাবে গালি দিয়াছেন। লেখকের মতে "চাঁদের হাট" Satire। লেখককে বলি, ভাটিয়ার লেখা তাঁহার কর্ম্ম নয়। "চাঁদের হাটকে" আমরা আর কি বলিব,—মাইকেলের ভাষায় পাঠকদের অনুরোধ করি,—

"চণ্ডালের হাড় দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।"

এস, স্মিথ এণ্ড কোম্পানী।

প্রসিদ্ধ জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল অর্ডার সপ্লায়ার্স।

৬৭।১৭ ষ্ট্রাণ্ড-রোড, পোঃ বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

আসল কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কার।

ঢাকার প্রসিদ্ধ কারিকরগণ দ্বারা এই স্বর্ণের সর্ব্ব প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করা হইয়াছে। গঠন, শিল্পনৈপুণ্য ও বর্ণের স্থায়িত্বের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন প্রশংসিত।

আমাদের কেমিকেল স্বর্ণ দুই প্রকার; যথা;—১ নং কেমিকেল সোণা ও ২ নং কেমিকেল সোণা। ১ নং কেমিকেল সোণার গহনার উজ্জ্বলতা আমরণকাল স্থায়ী। সদাসর্ব্বদা গহনা ব্যবহার করিলেও রং খারাপ হয় না। অধিকন্তু গহনার গঠন অতি মনোহর।

২ নং গহনা সাবধানে পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে অনেক দিন থাকে, রং সহজে খারাপ হয় না। গ্রাহকগণ অর্ডার দিবার সময় কোন্ নম্বরের গহনা লইবেন, তাহা পত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। (গহনার রঙের গ্যারাণ্টি) ১নং জন্য ৪ বৎসর। ২নং জন্য ২॥০ বৎসর দায়ী।

আমাদের গহনার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে অনেক জজ, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার ও জমিদারগণ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, স্থানাভাববশতঃ প্রদত্ত হইল না। আত্মপ্রশংসা না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, অনেকেই কেমিকেল স্বর্ণের গহনার বিজ্ঞাপন দিয়া মফঃস্বলে পিতল গহনা দিয়া ঠকাইতেছে, আমাদের নিকট সে ভয় নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গহনার নাম।	১নং গহনার মূল্য।	২নং গহনার মূল্য।
১। বাজু কিম্বা হাঙ্গরমুখো উত্তম ডায়মনকাটা বালা এক জোড়া	৬॥০	২৲
(ক) ঐ মাঝারি	৫॥০	১৸৹
(খ) ঐ ছোট	৫৲	১॥০
২। ফুলওয়ালা (ফুলের উপর উত্তম ডায়মনকাটা কেশলা-পাখের বালা এক জোড়া	৫৲	১৸০
(ক) ঐ মাঝারি	৫৲	১॥০
(খ) ঐ ছোট	৪৲০	১।০
৩। উৎকৃ ডায়মনকাটা বেঁচিড়ি		
৪। ডায়মনকাটা ফুলদার পাতাবাহার চুড়ি	৫॥০	১৸০
৫। বাউটী	৮৲	৩৲
৬। ফাঁপা তাবিজ	৬৲	২৲
৭। ডায়মনকাটা তাবিজ	৮॥০	৪॥০
৮। বাজু (উত্তম ডায়মনকাটা) বড় ১ খানা	৪॥০	২॥০
(ক) ঐ মাঝারি	৩৲	২৲
(খ) ঐ ছোট	২॥০	২৲
৯। আরের তিন		

গহনার নাম	১নং গহনার মূল্য।	২নং গহনার মূল্য।
১০। মরদানা	৩	২৷৷০
১১। নারিকেল ফুল	৫	২৷৷০
১২। অনন্ত উত্তম নক্সাশি করা ডায়মনকাটা আসসোটা		
পাকের ১ জোড়া	৭	৫
(ক) ঐ ঝাঁঝারি	৫	৩
(খ) ঐ ছোট	৪	২৷৷০
১৩। চিক উত্তম ডায়মনকাটা সকমলে গাঁথান		
১ ছড়া	৫	৩৷৷০
(ক) ঐ অমৃতপাতা সকমলে গাঁথান	৪৷৷০	৩৷০
(খ) সুইফুলের টিপ	৪	২৷৷০
১৪। হেসেহার	৪	৩
১৫। ছেলেহার	২৷৷০	১৸০
১৬। ঢেউহার ডায়মনকাটা উত্তম খামিসহ	২	১৷৷০
১৭। সুউৎকৃষ্ট ডায়মন্ড সুইহার কাটা কিবা কুঁদে ঠোকা বাঁকমল	৩৷৷০	২৷৷০
১৮। পাঁচনহর দানা ডায়মনকাটা সমস্তে গাঁথান খামিসহ	৪	৩
১৯। সাতনহর দানা ডায়মন-কাটা রেশমে গাঁথা খামিসহ	৪৷৷০	৩৷৷০
২০। নাকফুল	১	৸০
২১। ইয়ারিং ডবলচিলউঁয়ালা ১ জোড়া	২৷৷০	১৷৷০
২২। ঝাড় ইয়ারিং পাতা ফুল এবং ফল সহ	৩	২৷৷০
২৩। কান, পাতায় উত্তম কাজ করা একজোড়ি	১০	৫

গহনার নাম	১নং গহনার মূল্য।	২নং গহনার মূল্য।
২৪। ঝুমকাফুল ১ জোড়া	৩৷০	২৷
২৫। চৌদানী এক জোড়া	৩৷৷০	২৷০
২৬। ঝাকিড়ী	২	১৸০
২৭। কানবালা	৩৷৷০	২৷৷০
২৮। চুলের কাঁটা সুন্দর নক্সা করা ডায়মনকাটা ৩টি কাঁটা	৩	২৷৷০
২৯। সিঁথি ডায়মন-কাটা	৫	৩৷৷০
৩০। মাথার পান সুন্দর ডায়মনকাটা	২৷৷০	২
৩১। গোলাপফুলওয়ালা চিকণী	৩	২৷৷০
৩২। গেটি ডায়মন-কাটা	৪	৩৷৷০
৩৩। চন্দ্রহার ডায়মনকাটা খামিসহ	৮	৬
৩৪। জসম	৪৷৷০	৩৷০
৩৫। গোলাপফুল	২৷৷০	২
৩৬। আংটি। আংটি।		
(ক) সর্পমুখো সাপের মাথায় চুনিবসান		২৷৷০
(খ) সিল আংটি		২
(গ) হাতওয়ালা		২
৩৭। চেন্। চেন্।। চেন্।।।		
(ক) ষ্টার প্যাটারণের চেন	৬	৬
(খ) পল্লা প্যাটারণের চেন	৫	৩

প্রতি চেনের সহিত একটি দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র লকেট উপহার দেওয়া হয়।

৩৮। বোতাম হাতে হুই সেট ও গলার চারিটি এনগ্রেভ করা ২৷৷০

এস, স্মিথ এণ্ড কোম্পানী।

কুন্তলীনের

মাণ্ণাসিক পুরস্কার !

নগদ একশত টাকা।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ৪০৲
দ্বিতীয় স্থানীয় গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ২০৲
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ২৫৲
দ্বিতীয় স্থানীয় কবিতার জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত বোধ করিলে, আমরা পাঁচ টাকা বা ততোধিক মূল্যের আরও কতিপয় পুরস্কার দিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলি—

কি গল্প, কি কবিতা, উভয়েতেই কুন্তলীনের উল্লেখ থাকা চাই। গল্পটী সুপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হইবে—প্রত্যক্ষভাবে কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনাদির বহরে চলিবে না; অথচ তাহাতে কুন্তলীনের কথা থাকিবে। কবিতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

রচনা আগামী শ্রাবণ মাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে "কুন্তলীন অফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংবাদপত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাকারীদের নাম প্রকাশিত হইবে।

একজনের যত ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এক ব্যক্তি একটির অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব। রচনাকারী সে বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পরীক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে, এবং তাঁহারা যাহা স্থির করিবেন, তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

এইরূপ পুরস্কার, পূজার পূর্ব্বে একবার ও বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে, একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। সবিশেষ বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য।

কুন্তলীন পঞ্জিকা।

বিনামূল্যে বিতরিত।

রঞ্জিত কাগজে রঙ্গীন কালীতে সুন্দররূপে মুদ্রিত। কাছে থাকিলে তারিখ তিথি দেখিতে আর কটিভলার পাঁজী খুলিতে হইবে না। যাঁহারা এই সুদৃশ্য ও সুন্দর পঞ্জিকা খানি গৃহে রাখিতে চান, তাঁহারা কুন্তলীন আফিস হইতে বিনা মূল্যে লইয়া যাইতে পারেন। মফঃস্বলবাসীরা অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক,
এইচ, বসু।—ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার।
২৪নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

দন্ত-শোধন চূর্ণ।

আমি, কতিপয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ ও দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, এই দন্তশোধন চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি। যে সকল দ্রব্যে, দাঁত পরিষ্কার হয় ও দাঁতের বিশেষ উপকার দর্শে, তাহার অনেক গুলিই, ইহাতে মিশ্রিত আছে। যাহাতে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন, সে জন্য মূল্য কতিপয় অল্প করিলাম। একবার ইহা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, দাঁত উজ্জ্বল হইবে, মুখের দুর্গন্ধ ও বিবর্ণতা বিনাশ করিবে। দন্তপূত, জিহ্বাগত বা মুখগত, সকল প্রকার পোকাকে দূর করিবে। দাঁতের নোড়া শক্ত হইবে, রক্তপড়া নিবারণ হইবে।

৪টি প্রকার টিনের [আবশ্যক হইলে কাচের] কৌটায় বিক্রয় হয়। আট কৌটার মূল্য ৴০, ৴১০, ৵১ ও ১০ আনা মাত্র। কেবল চূর্ণের মূল্য— আট ডজন ৴২০ দেড় আনা। পত্র লিখিলে পাইকারি দর জানা যায়।

পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আমি বহু কাল, রায়ের দন্ত-শোধন চূর্ণ ব্যবহার করিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমি যে যে দন্ত-শোধন চূর্ণ ক্রয় করিয়াছি, তাহার সকল গুলি অপেক্ষা ইহা উত্তম। ২৩ মে, ১৮৮৩।

তারা, রায়।

৩১, ৩২, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

FOR SALE :—RARE *BOOKS ON INDIA AND THE EAST.*

1. Pennethorne and Robinson : The Geometry and optics of ancient Architecture Illustrated by examples from Thebes, Athens and Rome 54 large plates, some splendidly executed in colours and gold and 230 pages of Text, large Volume, Atlas folio, half morocco. Price Rs 50 (very rare).
2. Asiatic Journal : Neatly bound 40 vols, Rs 60.
3. Sir John Shore's Indian Affairs 2 vols, (out of Print) Rs 20.
4. Heber's Indian journals 3 vols, Rs 16.
5. Transactions of the Royal Asiatic Society London vols, I, II, III, each Rs 5.
6. Sir William Jone's works 6 vols, Complete Rs 45.
7. Stewert's History of Bengal Original Edition, Rs 12.
8. A rare collection of 39 views of old Calcutta Rs 12.
9. Calcutta Review old Numbers, Ten annas each.

Orders for Books of India are promptly attended to. A trial is solicited.

List of Books are sent on application.

R. B. MITRA,

14/1 Hidaram Banerjey's Lane ; Bowbazar ;

Calcutta.

৪র্থ খণ্ড। ১৩০১; ১৬ই শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺রাজকৃষ্ণ রায়, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র

VALUABLE BOOKS.

Fundamental Problems.—The Method of Philosophy as a Systematic Arrangement of Knowledge. By Dr. Paul Carus. Price Rs. 3-8. Postage As. 2.

"The purpose of philosophy" is not, as has often been misconceived, "grand and beautiful air castles, not ontological systems of pure thought, not new original ideas of what the dreamland of the Absolute might be like." Nor is it "a profitless intellectual gymnastics, a mere playing with words and subtle distinctions for the gratification of a few *beaux esprits* who delight in mental somersaults." But "Philosophy is the most practical and most important Science, because its problems lie at the bottom of all the single sciences." "It is," in fact, "the Science of Science."

Nature's Finer Forces and Their Influence in Human Life and Destiny. To which are added Translations of The Science of Breath, and The Philosophy of Tatwas from the Sanskrit, with a Glossary of the Terms used. By Pandit Rama Prasad, M. A. Cloth. pp. 258. Price. 2-12.

Amarkosha.—Sanskrit Dictionary with Annotations and English Interpretations. To which is added a Copious Index both in Sanskrit and English.—By H. T. Colebrook. Rs. 4-4.

Sanskrit & English Dictionary.—Translated, Amended and Enlarged, from an original Compilation made by the learned Pandits for the College of Fort William by Prof. H. H. Wilson, M. A., F. R. S. etc. Third & Unabridged Edition Cloth-bound Gilt-lettered. Getting Rare. Rs. 10-12.

Three Introductory Lectures on the Science of Thought.—By Prof. F. Max Muller. Cloth. Rs. 2-6.

The Psychic Life of Micro-organism.—A Study in Experimental Psychology. By Alfred Binet. Cloth. 16mo. 135 pp. Rs. 2-6.

The Psychology of Attention.—By Th. Ribot. Authorized Translation. Cloth. Price Rs. 2-4 Postage As. 2.

SURENDRA NATH BHATTACHARJEE,
80, Hari Ghose's Street, *Calcutta.*

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, প্রণীত

যমপুর ॥০, প্রেমকাব ॥০, এবং বিবিধ প্রবন্ধ ॥০, এই তিন খানি পুস্তক এক টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ডাক মাসুল লাগিবে না।

সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরি। } শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } ম্যানেজার।

মধুচ্ছন্দার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা।

মাসিকপত্রের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব, এবং তজ্জন্য যে বহু অধ্যয়নের প্রয়োজন, তাহাও আমার নাই। আমি কেবল এই বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিব। মধুচ্ছন্দার বেদ বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে, ঐ কয়েকটি কথার প্রয়োজন বলিয়া, এখানে তাহার অবতারণা করা হইল।

বেদপাঠীগণ বেদের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, তাহা "বেদাঙ্গ" বলিয়া গণ্য। সচরাচর "বেদাঙ্গ" ছয় প্রকার বলিয়া পরিগণিত, যথা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা উচ্চারণবিষয়ক বিজ্ঞান। শিক্ষ ধাতুর মূল অর্থ,—দান। গুরু শিষ্যকে বেদ দান করিতেন; শিষ্যকে গুরুর মুখে শুনিয়া বেদ কণ্ঠস্থ করিতে হইত। সুতরাং তৎকালে আবৃত্তি ও উচ্চারণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটি অতি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। আবৃত্তি ও উচ্চারণের নিয়ম সকলের নাম ছিল "শিক্ষা"। কেন না, এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া গুরু বেদ "দান" করিতেন, এবং শিষ্যেরা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। দ্বিতীয় বেদাঙ্গের নাম "কল্প"; অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী। যজ্ঞ লইয়াই বেদ; যজ্ঞে ব্যবহারই বেদের প্রয়োজন; যজ্ঞের জন্যই বেদের রচনা। বেদের আগেই যজ্ঞ, যজ্ঞের আগে বেদ নহে। যাঁহারা ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ কথা প্রমাণিত করিবার জন্য বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী ঋষিদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল।

পাঠকবৃন্দকে মনে রাখিতে হইবে, "বেদ" বলিলে একটি বিশেষ পদার্থ বুঝিলে চলিবে না। বহুসংখ্যক ও নানাজাতীয় বাক্যরাশির নাম "বেদ"। বহু শতাব্দ ব্যাপিয়া বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত হয়। যে সময়ে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে পৌঁছেন নাই, তখনও তাঁহারা অগ্নি জ্বালিয়া সোমাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিতেন; তখনও তাদৃশ যজ্ঞে "মন্ত্র"-নামক বাক্য (যাহা পরে বেদের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়) ব্যবহৃত হইত; তখনও হোতা ও অধ্বর্য্যু নামক ব্যবসায়ী যাজকের দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইত। সেই প্রাচীন সময়ের অনেক পরে মধুচ্ছন্দার আবির্ভাব। মধুচ্ছন্দার সময়ে বেদ সুবিস্তীর্ণ এবং গদ্য পদ্য ও

গানে বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে তখনও বেদের কিয়দংশ রচিত হইতেছিল—তখনকার ঋষিরা আপনাদিগকে নবীন ঋষি বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রাচীন ঋষিদের বেদ-শিক্ষার নিয়মানুসারে উচ্চারিত,—এবং কল্পের নিয়মানুসারে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদের বেদের অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক হয়। এই দুই শাস্ত্রের নিয়মাবলী অনুসারে কোন বৈদিক শব্দ কিরূপে গঠিত, তাহা জানা যায়, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের অর্থবোধের সাহায্য হয়।

ছন্দস্ শাস্ত্রে পদ্য রচনার নিয়ম নিবদ্ধ। ঋক্ সকল গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ অনষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী, পংক্তি, উষ্ণিক্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সুললিত ছন্দে বিরচিত; যে যে নিয়মে ঐ সকল ছন্দ গঠিত হয়, তাহাদের নাম ছন্দস্ শাস্ত্র।

ষষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান বেদাঙ্গের নাম জ্যোতিষ। যে সকল নিয়মের অধীন হইয়া জ্যোতিষ্ক সকল নভোমণ্ডলে ভ্রাম্যমাণ হয়, তাহাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়।

এই ষড়ঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গই কেবল কতকগুলি নিয়ম। যাঁহারা এই ষড়ঙ্গের সঙ্কলয়িতা, তাঁহারা নিয়ম কি পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে নিয়মের একাধিপত্য, তাহা তাঁহারা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদায় কার্য্যই নিয়মের অধীন। নিয়মকে অবগত হওয়াই বিজ্ঞান; নিয়মই বিজ্ঞানের কেন্দ্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে—সেই সকল নিয়ম যে অচল অটল, তাহা ষড়ঙ্গাধ্যায়ীরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সংসারে নিয়মেরই রাজত্ব দেখিয়া, তাঁহারা শিক্ষার নিয়ম, কল্পের নিয়ম, ব্যাকরণ ও নিরুক্তের নিয়ম, ছন্দের নিয়ম এবং জ্যোতিষের নিয়ম সকলের অনুশীলন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের আকারে সঙ্কলন করেন।

এই ষড়ঙ্গের মূলে মীমাংসা বা হেতুশাস্ত্র। তর্কের দ্বারাই নিয়মের অবধারণ ও প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ঋষিসমাজে তর্ক বা ন্যায়শাস্ত্রের যে অনুশীলন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার বেদাঙ্গেরই মূলীভূত বলিয়া ইহা পৃথক্ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র যখন আপনার গুরুকে "বক্তানাং মেলিং" (ঋগ্বেদ ৩।২৬।৯) বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তৎকালে তর্কবিতর্ক যে অধ্যাপনার অঙ্গ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। "বক্তানাং" = বক্তব্যানাং বিষয়ানাং। "মেলিং" = মেলকং। অর্থাৎ, যিনি বক্তব্য বিষয়ের বিরোধ বা বিরো-

ধাভাসের মীমাংসা করেন। কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিলে তাহার যিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। তৎকালে গুরুশিষ্যের মধ্যে তর্কবিতর্কের এবং পূর্ব্ব পক্ষ ও সিদ্ধান্ত-করণের রীতি যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল—তাহা বিশ্বামিত্রের বাক্যে বেশ বুঝা যায়।

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বৈদিকঋষিরা সংসারে যদি নিয়মের একাধিপত্য বুঝিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা নিয়মের কোনও পারিভাষিক নামকরণ করিয়াছিলেন কি?—ইংরাজিতে Law যেমন পারিভাষিক শব্দ, তাদৃশ কোনও শব্দ বেদে পাওয়া যায় কি?—তদুত্তরে বলিতে পারি যে, একটি নয়, তাদৃশ অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ঋগ্বেদে দৃষ্টিগোচর হয়। যথা,—"ধাত", "সত্য", "ধর্ম্ম" ও "ব্রত"।

১। ধাত=ধা (ধা-গতৌ)+ক্ত। অর্থাৎ, যাহা-গত হইয়াছে। অতীতের মধ্যেই আমরা নিয়ম দেখিতে পাই। অগ্নি বহুকাল হইতে দাহ করিয়া আসিয়াছে, সূর্য্য বহুকাল হইতে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া আসিয়াছে, অঙ্কুর সকল বহুকাল হইতে বীজ হইতেই উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে; অতএব, যে যে নিয়মের অধীন হইয়া অতীত ঘটনা সকল ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাদের বৈদিক পারিভাষিক নাম "ধাত।"

২। সত্য=সতে হিতং যৎ। যাহা বর্ত্তমান, তাহার নাম "সৎ"; যাহা সেই বর্ত্তমানের অনুকূল (হিত), তাহার নাম "সত্য।" অর্থাৎ, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান ঘটনা সকল নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছে, তাহার নাম "সত্য।" যে নিয়মের অধীন হইয়া সূর্য্য আজিও পূর্ব্ব দিকে উঠিতেছেন, বহ্নি আজিও উত্তাপ দিতেছেন, অঙ্কুর কেবল বীজ হইতেই জন্মিতেছে, তাহারা যেমন "ধাত", তেমনি আবার "সত্য"। ধাত ও সত্য সমানার্থক;—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে একই ভাব প্রকাশ করে বলিয়া, ইহারা অনেক সময়ে যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। ধর্ম্ম। সংস্কৃতে "ধৃ" ও "ভ্রি" বিপরীতার্থজ্ঞাপক দুইটি ধাতু। ধৃ=স্থিতৌ। ধ্রিয়তে, যাহা বাঁচিয়া আছে; ভ্রিয়তে, যাহা মরিতেছে। এই "ধৃ" ধাতু হইতে "ধর্ম্ম" পদ সিদ্ধ। পরিবর্ত্তমান সংসারে যাহা স্থায়ী, তাহার নাম "ধর্ম্ম।" সংসারে সকলই পরিবর্ত্তনশীল, স্থায়ী কেবল নিয়ম; তাই তাহার বৈদিক পারিভাষিক নাম "ধর্ম্ম।"—যাহা নশ্বর বর্ত্তমান ঘটনা সকলের পর ভবিষ্যতে স্থায়ী হইবে, তাহার নাম ধর্ম্ম।

৪। ব্রত শব্দের ব্যুৎপত্তি কিছু অস্পষ্ট। তাহা হইলেও ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

সকল বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিতেই ব্রত শব্দে জগন্নির্ব্বাহক নিয়ম বুঝিয়া থাকেন। ইয়ুরোপীয় বেদপাঠীগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রশংসনীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক মার্টিন হৌগ সাহেব তন্মধ্যে একজন। হৌগ সাহেব ব্রত শব্দকে Laws of nature বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা প্রকৃত অনুবাদ।

আমাদের পাঠকবৃন্দ নূতন বর্ষাগমে পল্লীগ্রামে মণ্ডূকের শব্দ অবশ্যই শুনিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে বিল, খাল, পুষ্করিণী যখন নূতন জলে প্লাবিত হইতে থাকে, তখন অসংখ্য ভেকে যুগপৎও পর্য্যায়ক্রমে শব্দ করিয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করে। বসিষ্ঠ ঋষি এই মণ্ডূকধ্বনিকে তাঁহার টোলের ছাত্রদের অধ্যয়নকালীন নির্ঘোষের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। এই উপমাটি বড়ই কৌতুককর। কুতূহলী পাঠক ঋগ্বেদের ৭।১০৩ সূক্ত দেখিবেন। আমরা এই অতিবিচিত্র সূক্ত হইতে কেবল একটি ঋকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিব। তাহা এই,—

যদেষাম্ অন্যা অন্যস্য বাচং শক্তেব বদতি শিক্ষমাণাঃ।

এষাং মণ্ডূকানাং মধ্যে অন্যঃ মণ্ডূকঃ অন্যস্য মণ্ডূকস্য বাচং বদতি অনুবদতি অনুকরোতি। কথমিব? শক্তস্য ইব শক্তিমতঃ শিক্ষকস্য বাচং যথা শিক্ষমাণাঃ শিষ্যাঃ অনুবদতি॥

এ স্থলে শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। শক্তিমান অর্থাৎ শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শিষ্যকে অধ্যাপক করাইতে সমর্থ শিক্ষকেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এইরূপ গুরুর মুখ হইতে পাঠ লওয়ারও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের সমকালীন বসিষ্ঠ ঋষির সময়ে "শিক্ষা" নামক বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রচলিত ছিল।

অধিকন্তু তৎকালে "কল্প" নামক বিস্তারও যে অনুশীলন ছিল, তাহা ঋগ্বেদের সহিত যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। তবে আমরা যে সূক্ত হইতে একটি ঋক্ এইমাত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে অপর একটি ঋক্ এ স্থলে উদাহরণ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাহা এই,—

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচম্ অক্রত ব্রহ্মকৃণ্বতঃ পরিবৎসরীনং।

অধ্বর্য্য বো ঘর্ম্মিণঃ সিদ্ধিদানাঃ আবির্ভবতি গুহা ন কেচিৎ॥

এ স্থলে সোমযাজী ব্রাহ্মণগণের, সংবৎসরব্যাপী সত্রের, এবং প্রবর্গের অনুষ্ঠাতা

অধ্বর্য্যুগণের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ইহারই পূর্ব্বের ঋকে "ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে" ইত্যাদি বাক্যে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অতিরাত্রনামক সোমযাগের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যে সময়ে যজ্ঞক্রিয়ার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, যখন ব্রাহ্মণেরা সম্বৎসর ধরিয়া "সত্র" নামক যাগের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন যে "কল্প" নামক বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল না, এ কথা কোনও ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারে না। এক বৎসর ধরিয়া ষোড়শ সম্প্রদায় ঋত্বিকের দ্বারা যে সত্রের অনুষ্ঠান হইত, তাহা যে "কল্প" শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

পাঠকবৃন্দ যে কোনও কোনও আধুনিক ইংরেজী বিদ্যালঙ্কারদের মুখে শুনিতে পান যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে ব্রাহ্মণ ছিল না—যজ্ঞের আড়ম্বর ছিল না—প্রত্যেক House father (গৃহস্থ) আপন আপন গৃহে অতি সরল ভাবে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন, এক বাটী "সোম" সুরা বা এক চামচ ঘি আগুনে "স্বাহা" বলিয়া নিক্ষেপ করিয়া দিলেই তৎকালে যজ্ঞ হইয়া যাইত,—এ সকল কথা যে কত অলীক, তাহা উল্লিখিত উদাহরণে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। উহাতে আমরা "অধ্বর্য্যবঃ"=অধ্বর্য্যুগণের, অর্থাৎ বহুসংখ্যক অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিকের অস্তিত্বের পরিচয় পাই। তাহার পর স্বয়ং মধুচ্ছন্দা এক স্থানে বলিতেছেন—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ অর্চ্চন্তি অর্কম্ অর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্বা সতক্রতো উদ্বংশমিব যেমিরে॥

এ স্থলে গায়ত্রীগণ অর্থাৎ উদ্গাতাগণ, অর্কীগণ অর্থাৎ হোতাগণ, এবং ব্রহ্মাগণের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাতে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের "চত্বারস্ত্রিপুরুষাঃ" নামক সূত্রের ষোড়শ সম্প্রদায়ের সমুদায় ঋত্বিকই যে মধুচ্ছন্দার সময়ে বিদ্যমান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা নামক চারি সম্প্রদায় ঋত্বিক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন প্রধান এবং তিনজন সহকারী ঋত্বিক ছিলেন। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া মহাড়ম্বরে মধুচ্ছন্দার পিতার সময় হইতে নানাবিধ সোমযাগের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সমুদায় সোমযাগের মধ্যে "সত্র" নামক সোমযাগ "পরিবৎসরীন" ছিল, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে এক বৎসর লাগিত। সোমযাগ সকল তৎকালে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা মধুচ্ছন্দাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"যৎ সানোঃ সানুম্ আরুহৎ ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্বং।"

যজমানকে সোমযাগের জন্য "ভূরি" পরিমাণে ক্রিয়া করিতে হইত; ভূরি

আয়োজনের আবশ্যক ছিল। তখন যজ্ঞক্রিয়া আড়ম্বরের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে বলিলেও বলা যায়।

এক্ষণে ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রের বিষয় কিছু বলিব। যে ভাষায় ঋগ্বেদ রচিত, তাহা মধুচ্ছন্দার সময়ে চলিত ভাষা ছিল কি না, ইহার নিরূপণ করা কিছু কঠিন। আমার বিবেচনায়, বেদভাষা মধুচ্ছন্দাদির সময়ে প্রচলিত ভাষা ছিল না। সায়ণাচার্য্য-ধৃত এক "ব্রাহ্মণ" প্রমাণে শুনা যায়, "তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণা উভয়াং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যানামিতি।" ইহাতে অন্ততঃ বেদের ব্রাহ্মণভাগরচনাকালে বেদভাষা "দেবভাষা" মনুষ্যভাষা হইতে পৃথক বলিয়া পরিগণিত ছিল, দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরা এই দেবভাষাতে এবং লৌকিক ভাষাতে, উভয়েই কথা কহিতেন, শুনা যায়। তাহার পর ঋগ্বেদে দীর্ঘতম ঋষির এক প্রসিদ্ধ মন্ত্রে দেখা যায়,—

"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নেহিতা নেংগয়ন্তি তুরীয়ং বাচঃ মনুষ্যা বদন্তি।" ১।১৬৪।৪৫

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দীর্ঘতমার সময়ে ভাষা চারি প্রকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। মনীষী ব্রাহ্মণেরা এই চারি প্রকার ভাষাই অবগত ছিলেন; কিন্তু ইহার মধ্যে তিন প্রকার ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিত না, কেবল চতুর্থ প্রকার ভাষাই সচরাচর অশিক্ষিত লোকের বোধগম্য ছিল। এই চারি প্রকার ভাষা কি কি, তদ্বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন; সায়ণ তাহার অধিকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাজ্ঞিকেরা ও নৈরুক্তেরা যে অর্থ বুঝিতেন, তাহাই আমার বিবেচনায় সমীচীন। যাজ্ঞিকেরা বলেন, মন্ত্রের ভাষা, কল্পের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, এবং প্রচলিত লৌকিক ভাষা, এই চারি প্রকার। নৈরুক্তেরা বলেন, ঋক্, যজু ও সামের ভাষা তিন প্রকার, আর লৌকিক ভাষা চতুর্থ প্রকার। কল্প ও ব্রাহ্মণ বেদেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত। কল্প সকল পরে সংগৃহীত হইয়া সূত্রের আকারে নিবদ্ধ হয়। যাজ্ঞিকদের অপেক্ষা নৈরুক্তদের ব্যাখ্যাই আমার অধিক প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দীর্ঘতমার অর্থ এই যে, ঋকের ভাষা, যজুর ভাষা, এবং সামের ভাষা তদানীং সচরাচর লোকের বোধগম্য ছিল না। "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেংগয়ন্তি" সাধারণ লোকের নিকট এই ত্রিবিধ-ভাষাই অন্ধকারময় ছিল, কিন্তু মনীষী ব্রাহ্মণেরা যেমন লৌকিক ভাষা বুঝিতেন, তেমনি উক্ত ত্রিবিধ ভাষাও বুঝিতেন।

ইহা অতি বিচিত্র কথা। ইহার পোষকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ

১০।৭১ সূক্ত)। বেদের ভাষা কিরূপ, তাহা উক্ত সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের ভাষা "সংস্কৃত" ভাষা। যেমন চালনার দ্বারা শস্যকে পরিষ্কার (সংস্কার) করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমানেরা মনের দ্বারা সংস্কারসাধনানন্তর বেদভাষা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা বিদ্বানগণের "মনের দ্বারা নির্ম্মিত ভাষা।" ইহা রচনার ভাষা; ইহা সংস্কৃত, পূত। সচরাচর লোকে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা অসংস্কৃত, অপূত। প্রথমোক্ত ভাষার রহস্য কেবল সখাগণ অর্থাৎ ঋষিগণ অবগত আছেন। ইহাতে ভদ্রা লক্ষ্মী অর্থাৎ গুপ্ত মঙ্গলময়ী শোভা নিহিত। প্রচলিত লৌকিক ভাষাতে সে শোভা নাই। যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যনির্ব্বাহের দ্বারা ঋষিরা ভাষায় এই অভিনব পদবী লাভ করিয়াছিলেন; সাধারণ লোকে ঋষিদের মুখেই সেই ভাষা শুনিতে পাইত। সেই ভাষায় রচিত মন্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া বহুসংখ্যক পরিষদে সংরক্ষিত ছিল। তাহার পর বলা হইতেছে,—

উতত্ব পশ্যম্ ন দদর্শ বাচম্ উতত্ব শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।

সাধারণ লোকে ইহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনেন না; কেন না, ইহা অস্পষ্ট অপ্রচলিত ভাষা। ইহাতে সুস্পষ্ট জানা যায়, তদানীং লৌকিক ভাষা ও বেদভাষা বিভিন্ন ছিল। সাধারণ লোকে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা কিছুই বুঝিত না। ঋষিসমাজে সেই ভাষা বুঝিবার জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, "বাগ্‌বৈপরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তাম্ ইন্দ্রঃ মধ্যতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাক্ অভ্যুদ্যতে"।— অর্থাৎ, এক সময়ে বেদভাষা সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। পরে সেই ভাষার প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ সংসাধিত হইলে, তাহা "ব্যাকৃতা" ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। এই মহৎ কার্য্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি "ব্যাকৃত" বাক্য ঋষিদের মুখে অভ্যুদিত হইতেছে।

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানা।"—ঋগ্বেদ, ১০।৭১ সূক্তে।

এই ঋকে যে "নামধেয়ং দধানাঃ" পদ আছে, আমার বিবেচনায় তাহার অর্থ— যাহারা "বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করে—"অর্থাৎ প্রধানতঃ নৈরুক্তগণ। তাঁহারা এক বস্তুর যত প্রকার নাম, তাহা সংগ্রহ করেন।—মূলের তাৎপর্য্য এই যে, নিরুক্তের সাহায্যে বেদবাক্যের স্থূলার্থ অবগত হইয়াছি; এক্ষণে হে বৃহস্পতি, বেদভাষার মর্ম্মার্থ প্রকাশিত কর—ইহা অনুদ্ধৃত অপরাংশের অর্থ। ফলতঃ, "নামধেয়ং দধানাঃ শব্দে, এ স্থলে নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ, উভয়বিধ শিক্ষকেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, বিবেচনা হয়। অতএব, আমার বিবেচনা হয়, মধুচ্ছন্দার

সময়ে ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রেরও অনুশীলন ছিল। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সাহায্য ব্যতিরেকে, অপ্রচলিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তদানীং লোকে শিখিতে পারিত না। ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

পরাগলী মহাভারত। (১)

হুসেন সাহার সেনাপতি পরাগল খাঁ অতি সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। হুসেন সাহা তাঁহাকে বিপুল বৈভবের অধীশ্বর করিয়া চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরাগল খাঁ ফেণী (২) নদীর তীরে তাঁহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। পরাগলপুরে (৩) এখনও তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষী ভগ্ন ইষ্টকাবলী পড়িয়া আছে। বিখ্যাত পরাগলের দীঘির জল এখনও নির্ম্মল। যাঁহার আদেশে ঐ দীঘি খাত হয় ও যাঁহার নাম উহা এখনও ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার হৃদয় উদার ও নির্ম্মল ছিল, তাঁহারই পুণ্যে অদ্য প্রায় ৪০০ বৎসর পরেও ঐ দীঘির জল পান করিয়া লোক পরিতৃপ্ত হইতেছে।

পরাগল খাঁ যখন চট্টগ্রামে আগমন করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। তাঁহার গৃহ পুত্রপৌত্রে পরিপূর্ণ; অতুল বৈভব ও রাজসম্মানে তাঁহার জীবনের সায়ংকাল সমুজ্জ্বল। নব-অধিষ্ঠিত শৈলবেষ্টিত রাজ্যে, ঐহিক সমস্ত সুখের অধিকারী পরাগল খাঁ কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন, পরাগলী মহাভারতে তাহার আভাষ আছে। তিনি অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রতিদিন অমৃতময় মহাভারতের প্রসঙ্গ শুনিতেন। আমরা ভাবি, ইংরাজী পড়িয়া আমরা উদার ভ্রাতৃভাব শিখিয়াছি; ইতিপূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে অহিনকুল-সম্বন্ধ ছিল, মুসলমান খাদক ও হিন্দু খাদ্য ছিল। ইংরেজ-লিখিত ইতিহাস পড়িয়া আমরা আমাদিগের সুহৃদ্‌দিগের প্রতি সন্দিগ্ধ ও অযথাবিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছি।

প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা; তখন কাশীদাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহও জন্মগ্রহণ করেন নাই; সেই সময় পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইয়া-

(১) পরাগল খাঁর আদেশে অনুবাদিত মহাভারতকে পূর্ব্বে চট্টগ্রামের লোকগণ "পরাগলী মহাভারত" বলিয়াই আখ্যাত করিতেন, এখন আর সে দেশে উক্ত মহাভারত প্রচলিত নাই।

(২) ফেণীনদী—এই নদী নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তে। পূর্ব্বে এই নদীর নাম ছিল ফণী নদী, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এই নদী ফণীনদী বলিয়াই উল্লিখিত দেখা যায়।

(৩) পরাগলপুর চট্টগ্রাম জোরায়োবগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

ছিল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ। এই অনুবাদ জৈমিনির মহাভারত দৃষ্টে সংকলিত হইয়াছিল, এইরূপ উক্ত আছে। পরাগলী মহাভারতের ভাষা অতি প্রাচীন। আমরা যত পুস্তক পড়িয়াছি, তন্মধ্যে পরাগলী ভারতের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন ভাষার পুস্তক আর দেখি নাই। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বঙ্গীয় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামের পর্ব্বত-রক্ষিত ভাষায় প্রাকৃতের দুরূহতা বহুলপরিমাণে রহিয়া গিয়াছে, তাই ভাষার প্রাচীনত্বে এই পুস্তক এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কিন্তু পরাগলী মহাভারতের ভাষা প্রাচীন হইলেও প্রাঞ্জল। কবি যে ভাষায় কথা কহিতেন, পুস্তকে তাহারই ব্যবহার করিয়াছেন, কালাতিপাতে তাহা কঠিন হইয়াছে; তিনি মুখে বিদ্যুৎ বলিয়া লেখনী দ্বারা ইরম্মদের সৃষ্টি করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম, পরাগলী মহাভারতের ভাষা প্রাচীন হইয়াও প্রাঞ্জল ও সরস। এই গ্রন্থ প্রায় ১৫০০০ শ্লোকে পরিসমাপ্ত, মুদ্রিত কাশীদাসের মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ৩৭০০০।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্বীয় পুস্তকের পত্রে পত্রে তাঁহার অনুগ্রাহক পরাগল খাঁর স্তুতির জন্য দুইটি করিয়া সুমিষ্ট পদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃতজ্ঞ হৃদয় মুসলমান প্রভুর গুণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল; ইহা বঙ্গদেশে নূতন কথা নহে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে হুসেন সাহের স্তুতি করা হইয়াছে, (৪) চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য প্রভুর মহিমা ও গৌরব স্বীকার করিতেন বলিয়া হুসেন সাহার প্রশংসা কীর্ত্তিত আছে। বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে হুসেন সাহ ও তৎপুত্র নছরত জঙ্গের প্রশংসাসূচক পদ আছে। রাজভক্তি হিন্দুর মত আর কোনও জাতির নাই, হিন্দুর মত উদার আর কোনও জাতি নহে, এ দেশে যে রাজা প্রজার বিরাগভাজন, অন্য দেশে প্রজার লোষ্ট্রক্ষেপে সে রাজার মৃত্যু অবধারিত।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বর্ণিত বিবরণে আমরা জানিতে পাই, পরাগল খাঁর পিতার নাম ওয়াজি খাঁন, তাঁহার পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, উহাতে আর দুইটি আবশ্যক কথা আছে। ১ম, পরাগল খাঁর খুল্লতাত নসরত খাঁনের আদেশে একবার "ভারতপাঞ্চালী" রচিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বর্ণিত মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী। ২য়, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁন অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

(৪) ছায়া শূন্য রবি শশী পরিমিত শক,
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।—বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

শেষোক্ত কথাটি আমরা কেন মূল্যবান বিবেচনা করিলাম, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। আমরা একখানা প্রাচীন মহাভারতের কিঞ্চিৎ অংশ পাইয়াছি, তাহা শ্রীসুরনন্দী প্রণীত। এই সুরনন্দী লিখিতেছেন, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁনের আদেশে তিনি মহাভারত রচনা করিলেন। সুতরাং পুরুষানুক্রমে এই উদারচেতা মুসলমান জমীদারগণ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে মুসলমানদের সর্ব্বদা বৈরিতা ছিল না, এই বৈরিতার সৃজন করা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা আপনাদের কুটনীতিতে আপনারা আবদ্ধ হইবে।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমার পিতৃতুল্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে যে সব উপকরণ দিয়াছেন, তাহা অতি অভিনব পদার্থ। তাহার প্রসঙ্গ এখানে সমস্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন লেখক; "বঙ্গবাসী" তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার বংশাবলী পাইয়াছিলাম, ও সময় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে যদি কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করিয়া থাকেন, তবে তাহার ২৫০ বৎসর পরে, (কারণ, কাশীদাস ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচনা করেন) মহাভারতের প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ আমরা দেখাইয়াছি, পরাগল খাঁর মহাভারত প্রায় ৪০০ বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত। চট্টগ্রামস্থ মুসলমান জমীদার মহাভারত শুনিতে উৎসুক হইয়া তাহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন, আর সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর অধিষ্ঠানক্ষেত্রে কি তখন মহাভারতের অন্য কোনও অনুবাদ প্রচলিত ছিল না? এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে সময় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, প্রায় সেই সময় অপর এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কাশীদাস তাঁহারই রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আঁধারে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। নিগুতা-নিবাসী কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর ও রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর কে পড়ে? ভারতচন্দ্র পরস্ব গ্রহণ করিয়াও কবিচূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর-রচকগণ,—যাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি যশের অমৃত ফল আহরণ করিতেছেন,—তাঁহারা কেবল ভারবহনের জন্যই এ সংসারে আসিয়াছিলেন। কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-রচকেরও সেই অবস্থা। ইহা আমাদের শুধু অনুমান-গড়া কথা নহে। আমরা বোধ করি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনকে পাইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ে নিরাপদ স্থানে না

দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আলোকে আনিতে সাহসী নহি। আর এক কথা, পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থান কাশীদাসী মহাভারতের মত। যে পুস্তক আমরা পাইয়াছি, তাহার হস্তলিপিই কাশীদাসের প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং কাশীদাসের পদ তাহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, কাশীদাস পশ্চিম বঙ্গের বিহঙ্গ হইয়া যে চট্টগ্রামের জঙ্গল হইতে মহাভারতের ভাষা চুরি করিতে আসিবেন, এ কথায়ও সহজে প্রতীতি জন্মে না। বোধ হয়, সেই লুপ্ত মহাজনের গৌরব উভয় লেখকই অপহরণ করিয়াছেন, তাই এই সাদৃশ্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্কিম বাবুর কবিতা।

এই কবিতাটি হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় বঙ্কিম বাবু রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আমি আমার পিতৃদেব ৺ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত নোট-বুকে পাইয়াছি। ৩৫।৪০ বৎসর হইল, তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে এই নোট বুক লিখিয়াছিলেন; ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি সেই সময়ের প্রসিদ্ধ কবিদিগের অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত আছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রভাকর অথবা সাময়িক অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানি না। ইহা বঙ্কিম বাবুর বাল্যকালের রচনা। তাঁহার প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের এক নব উৎস ঢালিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই কবিতায় সেই প্রতিভা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের অনুসৃত পথে সীমাবদ্ধ। যাঁহারা "সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং" কি "মুকুলিত মলী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মালা" প্রভৃতি মধুবর্ষী পদের কর্ত্তা; বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁহাদেরই শিষ্য।—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বর্ষার-মানভঞ্জন।

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ—
হেরিতেছি অপরূপ ভাব
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয়, রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন।

বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষাকালেতে সব ভবে;
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে
শোভাহীন হয়ে সদা রয়;
তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।

আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর
ঢাকি আছে দিবস যামিনী;
কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে
অম্বর অধরে বিনোদিনী।
মান ভাঙ্গিবার তরে, ধরিলাম দুই করে
মুখ-পদ্মে কর পদ্ম দিলে;
বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার
কমলিনী মুদিতা-সলিলে।
এ কলির প্রতিকূল, কাননে কোকিলকুল
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বুঝি, তাই আছ মুখ-বুজি
মৌনবতী বরষার ডরে।
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা
সদা কাল নহে প্রকটিত;
তাই বুঝি জ্যোতিহারা, তোমারি নয়ন-তারা
অভিমানে রোধেছে মুদিত।
বরষার অনুক্ষণ, বারি ধারা বরিষণ
ধারে ধারে ধরা পূর্ণ তায়;
তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর
নীর ধারে ফেলিছে ধরায়।

নায়িকার উক্তি।

পয়ার।

শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী,
বিধুমুখে মৃদু রবে কহিল মানিনী।
বরষার ধর্ম্ম যদি বারি বরিষণ,
তবে কেন বলহীন তোমার নয়ন।
দুঃখিনীর দুখতাপে হইয়া সদয়,
তোমারি নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়।

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

চেও না চেও না আর, অধীনের অশ্রু ধার
এক বিন্দু নাহি প্রাণধন,
তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া খেদে
নীর-হীন করেছি নয়ন।
নাহি আর জলধার, কোথা বল পাব আর
প্রেমাধার, ধার বটে যারি,
প্রাণের সম্বল বল, দুই এক ফোঁটা জল
যদি থাকে, দিতে নাহি পারি।
যে হেতু যখন পুনঃ, তোমার নয়নাগুণ
কবিবেক দহন আমারে;
নিবারিতে সে অনল, তখন না পেলে জল
প্রাণান্ত হইবে একেবারে।

পয়ার।

শুনিয়া শুনিল না ভামিনী কামিনী,
পূর্ব্ববৎ মৌনভাব রহিল মানিনী।
ঘোমটা টানিয়া দিল মুখের উপরে,
বারিদে রসনে বিধু আচ্ছাদন ক'রে।

নায়কের পুনরুক্তি।

ত্রিপদী।

থাক থাক মানে থাক, বদনে বসন রাখ
ঢাক ঢাক শশী ঢাক মেঘে,
দীর্ঘশ্বাস বায়ু মোর, এখনি করিবা জোর
জলদে উড়াবে অতি বেগে।

পয়ার।

তবু না কহিল কথা মানিনী রমণী,
হাসিয়া কহিছে শুন কান্ত গুণমণি।

ত্রিপদী।

একি বিপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আবির্ভাব
সতত চপলা চমৎকার,
তোমার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার
চমক নাহিক হায় হায়।

পয়ার।

দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে,
ফলতঃ বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে।
পরে নিজ গাঢ় মান জানাবার তরে,
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাহিরে যাত্রা করে।
মধুভাষে বঁধু কহে কি কর ললনা,
যেও না যেও না ধনি, বাহিরে যেও না।

ত্রিপদী।

প্রণয়িনী মান পালা, ঘোর কাল-মেঘমালা
ঝালাপালা করিল আমারে;
শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও
দোহাই দোহাই বারে বারে।
দুরন্ত অবোধ মন, ঢাকিতেছে ঘন ঘন
গগন প্রেডিল শশধরে;
কি জানি যদ্যপি পুন, প্রকাশিয়া নিজগুণ
তব মুখশশী গ্রাস করে।

তাহা হ'লে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ
রহিবে না শরীর-পিঞ্জরে ;
তাই বলি-প্রাণপ্রিয়ে, বাঁচাও ধরেতে গিয়ে
এসো এসো ধরি দুই করে।

পয়ার।

নিবিড় নীরদ নব নিরখি নয়নে,
বাহিরেতে গিয়া ধনি ভাবিতেছে মনে।
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী,
পলকে পলকে তায় নলকে দামিনী।
মানে মানে-মান-হরি মানিনী ভামিনী,
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্রগামিনী।
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা,
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ইতিহাস।

৺বিষ্ণু শাস্ত্রী মহোদয় "নিবন্ধমালার" ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় ইতিহাস সম্বন্ধে যে অতি-বিস্তৃত চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে (তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে) স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকার শেষে শাস্ত্রী মহোদয়ের একটি চিত্র ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। জীবনীলেখকের মতে,—This worthy Indian citizen displayed an enterprise and energy in the pursuit of benevolent aims which is nowhere too common, and is especially valuable in India, where the people are rather wont to lean upon the Government for every improvement. * * * He deserves a hearty recognition as one of those pioneers of progress who, if they become numerous enough, will some day make India a self-governing community." দুই তিন বৎসর হইল, মারাঠী ভাষায় তাঁহার এক স্বতন্ত্র বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহোদয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্থাপনের জন্য সংগঠিত সমিতি দ্বারা বহুদিন হইতে অর্থসংগ্রহ হইতেছিল। এতদিন পরে তাঁহাদের চেষ্টা-কার্য্যে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে প্রভৃতি দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ শাস্ত্রী-মহাশয়ের-স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুণা নগরীতে "মহারাষ্ট্র-সরস্বতী-মন্দির" নামক এক পাঠাগার স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সরস্বতী-মন্দিরে সর্ব্বপ্রকার মহারাষ্ট্রীয় পুস্তক সংগৃহীত হইবে। সমিতির চেষ্টা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে, আশা করা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

লেখক, প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ইতিহাস-শব্দের বুৎপত্তি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলেন,—

"ইতি—হ—আস" এই পদত্রয়ের সংযোগে "ইতিহাস"-শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। "ইতি"—এই ; "আস"—হইয়াছিল ; "হ"—একটি অব্যয় ;—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এতাবতা ইতিহাস শব্দের ধাত্বর্থ,—"পুরাকালে সংঘটিত ঘটনাবলী।" কিন্তু এই শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অর্থ—যুক্তি-মূলক প্রামাণিক ইতিহাস। প্রাচীন কালে পৌরাণিক উপকথা অর্থাৎ পুরাণাদিতে প্রসঙ্গক্রমে কীর্ত্তিত প্রাচীন উপাখ্যানাবলী বুঝাইবার জন্য 'ইতিহাস' শব্দ ব্যবহৃত হইত, দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালে আমরা ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝি, পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে তাদৃশ ইতি-হাসরচনার প্রথা ছিল না।"

ইতিহাসের বুৎপত্তি।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি জ্ঞানগৌরবে জগতের তদানীন্তন প্রাচীন জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাসরচনায় অনভিজ্ঞতা ও অপ্রবৃত্তি, বস্তুতই অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। লেখক বলেন,—

"বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুগণের ইতিহাসরচনায় অপ্রবৃত্তির কয়েকটি বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিরূপ অবস্থায় ইতিহাসের উৎপত্তি সম্ভব, এ কথার বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যখন রাজ্যমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি মহাবিপ্লবকর ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হয়, তখনই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সাধারণতঃ লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। গ্রীক, রোমান ও ইংরাজগণের ন্যায় মুসলমান, মোগল ও মারাঠাগণের মধ্যেও এইরূপ অবস্থাতেই ইতিহাসরচনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। (১) প্রাচীন হিন্দুগণকে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই বলিয়াই, তাঁহাদের মধ্যে ইতিহাসগ্রন্থের এতাদৃশ অভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে ভূখণ্ডে বাস করিতেন, তাহার চতুঃসীমা প্রায় সর্ব্বপ্রকারে অলঙ্ঘ্য ছিল। এই নিমিত্ত প্রাচীন চীনবাসীগণের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও স্বস্থানে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান প্রভৃতি জাতিগণকে যেরূপ তাহাদের প্রতিবেশীগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কখনও তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইতে হয় নাই। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে কখনও যুদ্ধবিবাদাদি না হইত, তাহা নহে। কিন্তু সে সকল ঘটনা, বোধ হয়, কখনই এরূপ গুরুতর ছিল না, যাহা ইতিহাসরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের অভাব কেন?

প্রথম কারণ।

কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির বর্ণনাপাঠে অনুমিত হয় যে, তদানীন্তন অধিকাংশ নরপতিই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধীনস্থ প্রদেশাদি শাসন করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূপালবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পদানত করিয়া কেহ সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। (২) অতএব ইতিহাসরচনার উপাদানভূত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিপ্লবাদি ঘটনার অভাব, হিন্দুগণের ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্তি না জন্মিবার এক প্রধান কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে।

"হিন্দুগণের মধ্যে ইতিহাসের অভাবের দ্বিতীয় কারণ এই যে, হিন্দুগণের মন স্বভাবতঃ নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী। সমগ্র জগৎ ও জাগতিক ঘটনাসমূহ সর্ব্বদা যাঁহাদের চক্ষে ক্ষণিক মায়াময় ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, পরমার্থের প্রতি যাঁহাদের আসক্তি অত্যন্ত অধিক, তাঁহাদের নিকট বজ্রপাত ও রাজ্যবিপ্লবাদির বর্ণনা দ্বারা নরবৃত্তি পীন করা যে বিরক্তিকর ও উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয় কারণ।

---

(১) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য লইয়া যখন হইতে বিবাদের সূত্রপাত হয়, সেই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ জাতীয় ইতিহাসের (বখর) রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের অবস্থাজ্ঞাপক কোনও ইতিহাস (বখর) মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত দৃষ্ট হয় না।—অনুবাদক।

(২) যে দুই এক জন নরপতি এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আংশিক (যেহেতু ধর্ম্মেতিহাসবর্ণনই পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য) বিবরণ পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সামাজিক বিপ্লবের বিবরণও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফলকথা, বোধ হয় এরূপ ঘটনা তৎকালে অতি বিরল ছিল বলিয়াই সে কালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার বিশেষ আবশ্যক হয় নাই।—অনুবাদক।

তার পর লেখক রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া বলেন; "আমাদের দেশে ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি ও প্রথা একবারেই ছিল না, এমন নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি ইতিহাস দেখিয়াছিলাম; মনে পড়িতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশীয় মোগল নরপতিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। 'কাশীরাজ' নামক জনৈক পণ্ডিত নবাবের অনুমতিক্রমে পানিপ্রথের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধের বিবরণ ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কাশীরাজ পণ্ডিতের ইতিহাসরচনায় উপযুক্ত শক্তি, ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়াই নবাব অপর কোনও সুদক্ষ পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।" লেখক অনুমান করেন, (আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ তাদৃশ প্রবল না হইলেও) এরূপ গ্রন্থ আমাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প ছিল না; বোধ হয়, কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে।

ইতিহাসও ছিল।

ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক অতি বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহার বহুদর্শিতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানাভাবে এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তদীয় আলোচনার স্থূলমর্ম্ম প্রকাশিত করিলাম। যথা,—

"ইতিহাসপাঠের প্রথম ফল জিজ্ঞাসাতৃপ্তি, ২য় ফল, সদুপদেশ; ৩য়, চিত্তের উদারতা ও শান্তি; ৪র্থ, মনোরঞ্জন; ৫ম, রাজনীতিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; ৬ষ্ঠ, স্মৃতি, চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তিনিচয়ের উন্মেষ ও পুষ্টিবর্দ্ধন। ইতিহাস প্রাচীন মহাপুরুষগণের বিবরণ সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুকরণে স্বদেশের ও সমাজের উপকারসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে সাধারণকে উৎসাহিত ও পাপপুণ্যের ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক সৎপথে পরিচালিত করে। হোমার যদি অ্যাকিলিসের বীরত্ববর্ণনা না করিতেন, তাহা হইলে সেকন্দর সাহার আবির্ভাব সম্ভব হইত কি? সেকন্দরের ইতিহাস পাঠ না করিলে সীজার খ্যাতিলাভের উপযুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ব্যাস যদি পাণ্ডবগণের জীবনী লিপিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে মহাত্মা শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া যবনগণের হস্ত হইতে রাজ্যশ্রী পুনরুদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেন কি? ফলকথা, ইতিহাস থাকিলে, দেশের অবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, উহা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনেরও লোকহিতকর কার্য্যসাধনে উৎসাহ হওয়া সম্ভব। অধিকন্তু কিরূপ অবস্থায়, কিরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল কীদৃশ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে মনুষ্যসমাজ সংসারপথে সাবধান হইতে ও সুখলাভ করিতে পারে। গ্রীক, রোম, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক রাজ্যসমূহের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বেরও প্রধান কারণ,—ইতিহাসের আলোচনা। ইতিহাসের আর এক উপকারিতা এই যে, ইহা পাঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসনপ্রণালী, জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে ও তদ্দ্বারা কুসংস্কার ও বুথাহঙ্কার দূরীভূত এবং দূরদর্শিতা ও সত্যাসত্যনির্ব্বাচনশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইতিহাস এইরূপে আমাদের নানাপ্রকার উন্নতির কারণ হইলেও, অনেকে ইহার আবশ্যকতা বুঝিতে অসমর্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাঃ জনসনের ন্যায় সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণও ইতিহাস, বিশেষতঃ প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা ও তিরস্কারবুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া, স্ব স্ব স্থূলবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

ইতিহাসপাঠের ফল।

ইতিহাসের উপকারিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা সমাপ্ত করিয়া লেখক ভারতবাসীসম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের মতের আলোচনা করিয়াছেন। মেকলে ও মিল প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে ইউরোপবাসীর

গণের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, ভারতবাসীমাত্রই দুর্নীতিপরায়ণ, অসভ্য, মূর্খ, ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে অস্মদ্দেশীয় স্বাধীনচিন্তা-শক্তিশূন্য কতিপয় নবশিক্ষিত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিও সেই সকল গ্রন্থকারদের অলীক উক্তি পাঠ করিয়া স্বদেশবাসীগণকে অতিনিন্দ্য কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করেন। মিশনরীগণের ত কথাই নাই। তাঁহারা আপনা-দিগকে একপ্রকার "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়াই মনে করেন। এই মিশনরীগণের কল্যাণে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ স্বদেশে ও বিদেশে, উভয়ত্রই সমানরূপে বিড়ম্বিত। লেখক বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় পাদকে "মিশনরীযুগ" নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং বিশিষ্ট দক্ষতাসহকারে তাঁহাদের ও মেকলে, মিল প্রভৃতির মতের তীব্র সমালোচনা ও যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষার যে তেজস্বিতা, যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রসরসিকতা, সরস উক্তি ও অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল মূল প্রবন্ধেই অনুভবনীয়,—তাহার অনুবাদ বা সারসংকলন অসম্ভব।

ভারতবাসী সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মত।

মেকলে ও মিলের ন্যায় ভারতবিদ্বেষী লেখক আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতের প্রশংসনীয় বিষয়গুলিও তাঁহাদের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইত। তাঁহারা ভারতবাসীকে সুসভ্য ইউরোপীয়গণের সহিত কথা কহিবারও অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিজ্ঞবর স্যার জন মালকম সাহেব এই মতের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যে ভারতবর্ষ রত্নপ্রসূ বলিয়া চিরকাল বিখ্যাত, যাহার অতুলনীয় ধনসম্পত্তি তাহার বর্ত্তমান পরাধীনতার প্রধান কারণস্বরূপ, যাহার সম্পত্তি-লইয়া ইংলণ্ড আজ ইয়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা-অধিকতর ধনশালী রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই ভারতের দরিদ্র্যসম্বন্ধে মেকলে বলিয়াছেন,—The most absurd notions were then entertained in England regarding the wealth of India. Nobody seemed aware of what was nevertheless most undoubtedly the truth, that India was a poorer country than countries which in Europe are reckoned poor, than Ireland for example or than portugal."—*Warren Hastings.*

মেকলে ও ভারতের দারিদ্র্য।

এখানে সাহেব মহোদয় স্বীয় সত্যপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"দেখা যায়, জেমস্ মিল প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লেখনী চালিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ হইতে স্বীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থে ভারতবাসীর যে সকল প্রশংসার কথা আছে, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের অগৌরবের কথাগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া তিনি স্বীয় ইতিহাসের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন (৩)। এমন কি, আগ্রার তাজমহল, ঢাকার মলমল, কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" ও ইরুলের বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরসমূহও সাহেব মহোদয়ের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই সকল মন্দির সম্বন্ধে তিনি অতি অদ্ভুত বিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট গুহামন্দিরগুলি হিন্দুগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে; এগুলি সম্ভবতঃ ভূগর্ভ হইতে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়াছে।" পাঠক। বিলাতী কল্পনার দৌড়টা কত দূর দেখিলেন ত? এই

মিলের ইতিহাসে ভারতবিদ্বেষ।

(৩) মিল এক স্থলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ জয় করিয়া ইংলণ্ডের কিছুমাত্র লাভ হয় নাই; বরং ক্ষতিই হইয়াছে। তাঁহার ইতিহাসের প্রকাশক উইলসন সাহেব এই উক্তির সমুচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সকল উৎকৃষ্ট ইতিহাস পাঠ করিয়া ভারতের সম্বন্ধে জগতের কিরূপ ধারণা জন্মিবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।"

"কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিকতর মূর্খতাপরিচায়ক ও লজ্জাকর বিষয় এই যে, যে ভারতের সহিত ইংরাজগণের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেরও অভিজ্ঞতা অতি অল্প। * * * * উপাহরণস্বরূপ সম্প্রতি সর্ব্বত্রপ্রচলিত "মরিস" সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ইতিহাসে আর্য্যগণের ভারতে আগমনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত কালের ইতিবৃত্ত, ৩০।৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত হইয়া অবশিষ্ট সমগ্র গ্রন্থখানি ইংরাজগণের বিবরণে, বিশেষতঃ মেজর লরেন্স, কর্ণেল ম্যালসন্ প্রভৃতি মহাশৌর্য্যশালী বীরপুরুষগণের স্তুতিগানে পরিপূরিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে পেশওয়েগণের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। যে সকল মুসলমান রাজবংশ ভারতবর্ষে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজবংশের বিবরণ ২।৪ পংক্তিতে ও আকবরের ৫০ বৎসরের ইতিহাস এক পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের শিবাজীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শিবাজীকে প্রথমেই দস্যুরূপে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত ও কেবলমাত্র তৎকৃত প্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ডটি (আফজুল খাঁর হত্যা) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা কল্পনাবলে বুঝিয়া লইবার ভার পাঠকগণের উপরেই সমর্পিত হইয়াছে। এইরূপে ২।৩ পৃষ্ঠার মধ্যে মহারাষ্ট্র-রাজ্যসংস্থাপকের যে ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাও শত শত ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। এই সুবিজ্ঞ ইতিহাসলেখক শিবাজীর রাজ্যাভিষেক দশ বৎসর পূর্ব্বে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং আফজুল খাঁকে তিন বৎসর বিলম্বে নিহত করাইয়াছেন। শিবাজীর জীবদ্দশাতেই তৎপুত্র সম্ভাজীর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন। * * * 'পেনী সাইক্লোপীডিয়া' নামক সর্ব্বসংগ্রহরূপ গ্রন্থে মারাঠাগণের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আরও অদ্ভুত। তাহাতে লিখিত আছে,—বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র 'বালাজী বাজীরাও'। মাধবরাও নারায়ণের প্রকৃত নাম শিবাজী মাধব রাও।। এবং তাঁহার পুত্র সর্ব্বশেষ পেশওয়া বাজীরাও।।। (৪) ফলকথা, আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য এখনও ইংরাজগণ উৎসুক নহেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব প্রণীত ইতিহাসের প্রারম্ভে প্রকাশিত একটি পত্রে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যাইবে।"

ইংরেজের রচিত ভারত-ইতিহাসে মিথ্যার আধিক্য।

উপসংহারে শাস্ত্রী মহোদয় স্বদেশীয় ইতিহাসালোচনায় আমাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমাদের দেশের ইতিহাস মনোরঞ্জকত্বে অন্য কোনও দেশের ইতিহাস অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। বৈদেশিকগণের লিখিত ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের বিবরণ ব্যতীত, আমাদের (মহারাষ্ট্রজাতির) শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থাদি সম্বন্ধে কিছুই বর্ণিত থাকে না। সাধারণের পাঠোপযোগী মনোরঞ্জক ইতিহাসের অভাবও ইতিহাসের প্রতি সাধারণের অনাস্থার এক প্রধান কারণ। গ্রাণ্ট-ডফ্ ও মালকম্ প্রণীত ইতিহাস বিশেষ যত্নপূর্ব্বক লিখিত হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। অতএব আমরা স্বয়ং আমাদের স্বদেশের ইতিহাস না লিখিলে সে অভাব দূরীভূত হইবে না। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাচীন দেশীয়

স্বদেশীয় ইতিহাসের প্রয়োজন।

(৪) ইহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ এইরূপ,—"বালাজী বাজীরাও" বালাজী বিশ্বনাথের পৌত্র। মাধবরাও নারায়ণ সাধারণতঃ "সওয়াই মাধবরাও" নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অপুত্রক অবস্থায় আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। শেষ পেশওয়া বাজীরাও রঘুনাথ বাওএর পুত্র।

রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। এবং সেই সঙ্গে আমাদের অল্পকালমৃত পবাক্রমশালী পূর্ব্বজগণের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ের কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত ও পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণ পরিশোধিত হইবে না। কারণ, তাঁহাদের কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও, উহা বিলুপ্ত হইতে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ইংলণ্ডাদি দেশের "Pictorial Hand-book of London" প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী রচনার উপাদান, আমাদের দেশে এখনও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বীরপুরুষগণের বংশধরদিগের নিকট এখনও নানাবিধ ঐতিহাসিক কাগজপত্র অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

দেশীয় ইতিহাসের উপকরণ এখনও প্রাপ্তব্য।

আমাদের বন্ধু "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক এই সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্র প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া, কতিপয় বৎসর ও পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণের উৎসাহের অভাবে তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন কালের বিবরণপূর্ণ প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থসমূহ হইতেও মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাৎকালিক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস অনেক পরিমাণে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি এখন আর তাদৃশ প্রচলিত দেখা যায় না। ইহাঁরা মহাজ্ঞানী মেকলের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ পূর্ব্বক এ দেশে আগমন করেন নাই। এই নিমিত্ত ইহাঁরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই নিরপেক্ষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবং এই নিমিত্তই ইহাঁদের গ্রন্থে ভারতবাসীর প্রশংসার কথা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয়, বোম্বাইয়ের মেকর্ডার স্যার জেম্‌স্ ম্যাকিন্টোস্ ইহাঁদিগকে 'Bramhanised Europeans' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বলেন, ইহাঁরা অতিশয় অমায়িক, দয়ালু ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। ম্যালকম্ ষ্টুয়ার্ট ও মেডোজ্ টেলার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস অপক্ষপাতিতার সহিত সঙ্কলন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আজকালকার ২।১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসেও এইরূপ পক্ষপাতশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে বোধ হইতেছে যে, ভারত সম্বন্ধে য়ুরোপীয় লেখকদিগের পূর্ব্বের অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ সত্য জ্ঞানের উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক জগতে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহম্মদীয় নরক।

১

শৈশবকালে জ্ঞানের উন্মেষ হইবার সময় হইতেই আমরা ঠাকুরমার উপকথায় নরকের সহিত প্রথম পরিচিত হই, এবং এই অপার্থিব জগতের বিভীষিকাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের রোমাঞ্চকর কল্পনায় আমাদের সেই সদানন্দময়, নির্ভীক, বিধাতার পুণ্য আশীর্ব্বাদবেষ্টিত কোমল শিশুহৃদয়ে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়।

ক্রমে জ্ঞানের পরিসরবৃদ্ধির সহিত আমরা রামায়ণ মহাভারতে, কাব্য উপন্যাসে নরকের উজ্জ্বল ছবি চিত্রিত দেখি, এবং হিন্দু নরকের বর্ণনায় যখন আমরা অভ্যস্ত হইয়া যাই, তখন খৃষ্টানের নরক আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমরা যুনানীর অন্ধকবি মিল্টনের বর্ণিত, বহুযোজনবিস্তৃত, অন্ধকারময়, কিন্তু দৃশ্যমান গন্ধকাগ্নিতে কর্দ্দমিত, নিরাশার চিরবিরাজ-ক্ষেত্র অনন্ত নরকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভীত হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই। কিন্তু এখানেই শেষ নহে; ইহার উপর দান্তের প্রখর কল্পনা শিক্ষার্থীর মস্তিক পরিপূর্ণ মাত্রায় আলোড়িত করিয়া তুলে। অতএব, নরক ইহলোকের পরপ্রান্তে অবস্থিত হইলেও, ইহলোকে আমরা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষিত পাঠকমণ্ডলী এই সকল নরকযন্ত্রণাতে অস্থির, তাহার পর আজ আবার মহম্মদীয় নরকের চিত্র তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিতেছি, এ অপরাধ হয় ত অমার্জ্জনীয়; কিন্তু আশা আছে, যাঁহারা পুণ্যাত্মা, পরলোকে তাঁহাদিগকে কখন এ দৃশ্য দর্শন করিতে হইবে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু সংবাদ জানিতে পারিলে তাঁহাদের কৌতূহলবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু লেখকের ন্যায় যাঁহাদের স্বর্গগমনের সম্ভাবনা অল্প; (যদি এমন কেহ থাকেন) তাঁহাদের এই নরকের পরিচয় জানিয়া রাখা নিতান্ত অন্যায় নহে। কারণ, যদি সত্যসত্যই মুসলমানের একটা স্বতন্ত্র নরক থাকে ও কাহারও তাহাতে পদার্পণ করা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে পথঘাট কতক কতক জানিয়া রাখা ভাল।

কোরাণের মতে অবিশ্বাসীগণের জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে সকল সনাতন মোল্লা মৌলবী মহাশয়েরা উক্ত পবিত্র গ্রন্থের এবং মহম্মদের উক্তির টীকাটিপ্পনী ও ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, মানুষের মৃত্যুর পর তাহার প্রতি "সওয়াল কবর" হয়; "সওয়াল কবরের" অর্থ "সমাধিমধ্যে প্রশ্ন"। মৃতব্যক্তি সমাহিত হইবামাত্র, দুই জন যমদূত সেই সমাধিমধ্যে প্রবেশ করে; এই দুই জনের সাধারণ নাম "ফতানান্" অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তা; কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র নাম আছে; একজনের নাম "মুনকর," অন্যের নাম "নকির।" এই যমদূতদ্বয় বিকটাকৃতি, ভীষণদর্শন, নীলনেত্র ও কৃষ্ণকায়; ইহাদের নাম উচ্চারণ করিতেই আরব জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোনও কোনও মতে ইহারা অন্ধ, মূক ও বধির, কিন্তু এ কথা সত্য হইলে তাহারা কিরূপে "সওয়াল" জিজ্ঞাসা করে, এবং কিরূপেই বা মৃত ব্যক্তিদিগের "জবাব" শুনিতে পায়, এ তথ্য

আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তাহারা যমদূত, তাই বোধ করি, চক্ষু কর্ণ এবং জিহ্বার অভাব তাহাদের নিকট সেরূপ গুরুতর নহে।

যাহা হউক, এই যমদূতের সম্মুখে মৃত ব্যক্তির উপবেশন করিতে যাহাতে স্থানাভাব না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে মুসলমানেরা কবরের ভিতর অনেকটা যায়গা খালি রাখে। যমদূত কবরে প্রবেশ করিয়াই তাহার ক্ষমতাবলে মৃত ব্যক্তিকে উঠাইয়া বসায়, এবং জিজ্ঞাসা করে, "তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম্ম কি? কাহাকে তুমি প্যাগম্বর বলিয়া স্বীকার কর? তোমার কিব্‌লা কোথায়?" যদি এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে যম-দূতদ্বয় মৃত ব্যক্তির প্রতি যে দণ্ড বিধান করে, তাহা মুসলমান বাদসাদিগের দণ্ডবিধির সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহারা অপরাধীর কর্ণ-দেশে লৌহ দণ্ড দ্বারা এমন গুরুতর আঘাত করে যে, তাহাতে মৃত ব্যক্তি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গভীর আর্ত্তনাদে পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের জীবিত প্রাণীর কাণে তালা লাগাইয়া দেয়, কিন্তু মনুষ্য ও জীনগণ এই কাতর চীৎকারধ্বনি শুনিবার অধিকারী নহে। অনন্তর সমাধি-মধ্যে সহসা নিরেনব্বইটি "তান্নিম" আসিয়া উপস্থিত হয়; "তান্নিম" শব্দটির সহিত বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকের পরিচয় নাই। "তান্নিম" আমাদের পুরাণোক্ত নাগাধিরাজ বাসুকির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; ইহাদের সাতটি করিয়া ফণা, এই ফণা দ্বারা তাহারা মৃতব্যক্তিকে ক্রমাগত দংশন করিতে থাকে, এবং যখন তাহাদের পরিতৃপ্তি বোধ হয়, তখন এমন জোরে নিশ্বাস ছাড়ে যে, সেই মৃত ব্যক্তি অন্তিম বিচার দিন পর্য্যন্ত শূন্যমার্গে ঘুরিতে থাকে। আবুসৈয়দ নামক জনৈক ভাষ্যকার বলেন যে, "তান্নিমের" বিষ এমন তীব্র যে, দংশন দূরের কথা, যদি কখনও একটি "তান্নিম" পৃথিবীতে কেবল নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে এই সসাগরা ধরা মরুভূমিতে পরিণত হয়। যাহা হউক, মুসলমান ধর্ম্মবৈজ্ঞগণ ইস্‌লাম-শিশুদিগের প্রতি তাহাদের অতি শৈশবকালেই আধ্যাত্মিক রোগের অব্যর্থ টীকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রত্যেক মুসলমান বালক (আমাদের দেশের সর্ব্বত্র নহে বলিয়া বোধ হয়) বাল্যকালেই শিক্ষিত হয়, "আল্লা আমার প্রভু, ইস্‌লাম আমার ধর্ম্ম, মহম্মদ আমার প্যাগম্বর, কাবা আমার কিব্‌লা"। *

* "কিবলা"র অর্থ যে দিকে সম্মুখীন হইয়া উপাসনা করা হয়। মুসলমানগণ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া "নমাজ" করেন, তাহার অর্থ, এই দিকে, অর্থাৎ মক্কায় কাবা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত

"সওয়াল্ কবর" সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা লিখিলাম, এ বিষয়েও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এলিজা বেন আসের তাঁহার "তিস্‌বি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর কোনও ব্যক্তি সমাধিস্থ হইলেই যমদূত তাহার সমাধিমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সেই মৃত দেহে তাহার দেহমুক্ত আত্মার পুনরাবির্ভাব হয়, এবং সে উঠিয়া দাঁড়ায়। যমদূতের হাতে একগাছি শৃঙ্খল থাকে, তাহার কিয়দংশ অগ্নিময় এবং কিয়দংশ লৌহময়; এই শৃঙ্খলের দ্বারা যমদূত সমাহিত ব্যক্তির দেহে আঘাত করে। প্রথম আঘাতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহচ্যুত হয়, দ্বিতীয় আঘাতে অস্থি ও মাংস পৃথক হইয়া যায়; তখন যমদূত সেই অস্থিগুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার আঘাত করে; এই তৃতীয় আঘাতে সমস্ত অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ হয়। সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক বৃদ্ধ হইতে নিষ্পাপ শিশু পর্য্যন্ত সকলকেই এই কঠোর দণ্ড সহ্য করিতে হয়; তবে যাহারা পবিত্র দিনে, বা মুসলমানের বারাণসীধামে দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

এতদ্ভিন্ন ইহাও লিখিত আছে, যে, কোনও ব্যক্তি সমাহিত হইবামাত্র, যমদূত মহম্মদের সহিত সেখানে উপস্থিত হয়, এবং মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি ইহার সম্বন্ধে কি জানেন?" মৃত ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য কি কপটাচারী হইলে মহম্মদ উত্তর করেন, "ইহাকে আমি জানি না, অন্যলোকে ইহার সম্বন্ধে যাহা বলে, আমি তাহার অধিক বলিতে পারি না।" তখন ক্রুদ্ধ যমদূত গর্জ্জন করিতে করিতে সেই হতভাগ্যের মস্তকে লৌহদণ্ডের এমন নির্ঘাত আঘাত করে যে, সে আঘাতে পর্ব্বতশৃঙ্গও গুঁড়াইয়া যায়। অনন্তর স্বর্গ হইতে দৈববাণী হয়, "ইহার জন্য অগ্নিময় শয্যা প্রস্তুত কর, ইহাকে অগ্নিনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে দাও, এবং নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখ।" তাহার পর পাপীকে প্রচণ্ড উত্তাপ ও অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত, শুষ্ক, শ্বাসরুদ্ধকারী বায়ুর প্রখর প্রবাহ সহ্য করিতে হয়; পৃথিবী ক্রমে তাহার উপর চাপিয়া বসে, সেই কঠিন চাপে তাহার অস্থি স্থানচ্যুত হইয়া যায়, এবং পৃথিবীর প্রলয় পর্য্যন্ত সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

আছে। "কাবা" মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমামন্দির ছিল, এবং যখন আরবীয় মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ জড়োপাসক ছিলেন, তখন আরবে কাবার গৌরব ও প্রতিপত্তি অখণ্ড ছিল। মহম্মদ সিদ্ধি লাভ করিয়া মেদিনা হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কাবার অভ্যন্তরস্থ প্রতিমাগুলি ধ্বংস করেন, এবং সেখানে একেশ্বরবাদের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করেন। তাহার পর হইতে কাবা পবিত্র মস্‌জিদ্ শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

মতান্তরে জানিতে পারা যায়, কাহারও মৃত্যু হইলেই যমদূত এজরাইল মৃত-দেহের সমীপস্থ হয়, এবং "পাপ দেহ হইতে দূষিত আত্মা বাহির হইয়া আয়।" এই কথা বলিয়া শরীরের ভিতর হইতে আত্মাকে টানিয়া বাহির করে; তাহার পর তাহা লইয়া স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু দূষিত আত্মার দুর্গন্ধে স্বর্গদ্বার আপনা হইতেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়; তখন সেই আত্মা "সিজ্জিনে" নিক্ষিপ্ত হয়। "সিজ্জিন" নরকের অংশবিশেষের নাম, ইহা পৃথিবীর নিম্নতম-তলবর্ত্তী সপ্তমস্বর্গের নিম্নস্থ একটি হরিদ্বর্ণ পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। অন্য কোনও দেহে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সেই আত্মাকে এই স্থানে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবস্থান করিতে হয়।

শেষ বিচারের অবসানে সকল আত্মাকেই "সিরাতের সেতু" অতিক্রম করিতে হয়; "সিরাত" কোরাণোক্ত নরকের গন্তব্য পথ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সেতু বলিয়াই বিখ্যাত। এই সেতু পৃথিবী হইতে নরকের ভিতর দিয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার পরিসর একগাছি লোম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এবং তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্ণধার; এই সেতুর উভয় পার্শ্ব তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে পরিপূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, এই পথ এমন পিচ্ছিল যে, পাপীগণ ইহার উপর দিয়া যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও পদস্খলিত হইয়া কণ্টকের মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু "ইয়াকুৎরুবেণী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সেতু একগাছি সূত্রের ন্যায়, পৌত্তলিকগণকে ইহার উপর দিয়া যাইতে হয়, এবং যাইতে যাইতে তাহারাই পদস্খলিত হইয়া কণ্টকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। মহম্মদ বাকির মজ্‌লিসি নামক একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রণীত "হাক্‌আল্‌ ইয়াকীন্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এই সেতু অতিক্রম করিতে তিন সহস্র বৎসর সময়ের প্রয়োজন; তন্মধ্যে এক সহস্র বৎসর নিম্নদিকে চলিতে হয়, এক সহস্র বৎসর ক্রমাগত কণ্টকপূর্ণ, সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত সরীসৃপসঙ্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধাভিমুখে যাইবার নিয়ম। মহম্মদ বাকির ইহাও বলেন, এ বিষয়ে যে বিশ্বাস না করে, সে সয়তানের মন্ত্রশিষ্য।

যাহা হউক, এই পথে পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলকেই যাইতে হয়, এবং সকলেই "মিজান" অর্থাৎ তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়া থাকে। "আল্‌ আরফে" লিখিত আছে, এই তুলাদণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম; যাহারা লঘুভার, তাহারাই পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়।

"আরফের" অর্থ, স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা। যাহাদের পাপ পুণ্যের

পরিমাণ সমান, স্বর্গ বা নরকে তাহাদের স্থানাভাব; এই "আরকের" উপর তাহাদিগকে অধিষ্ঠান করিতে হয়। স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরাল কতটুকু, ইহা লইয়া মুসলমান শাস্ত্রবেত্তাগণ অনেক আলোচনা এবং বাদানুবাদের পর স্থির করিয়াছেন, একটি প্রাচীর দ্বারা এই ব্যবধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার কেহ কেহ কল্পনা করেন, ইহা অর্দ্ধ হস্ত মাত্র; কাহারও মতে এই ব্যবধানের মধ্যে কোনও আবরণ নাই, এবং ইহা এত সামান্য যে, এক স্থান হইতে অপর স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদীয় নরকের সাধারণ নাম "জাহান্নম"; কাহারও অনুমান, ইহুদীয় 'বেহিন্নাম' শব্দ হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বেহিন্নাম্' জেরুজেলাম নগরের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী একটি উপত্যকার নাম।

'আল্‌হিদরে' লিখিত আছে, জাহান্নমের দ্বার সাতটি, এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া নরকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে হয়। ধর্ম্মে আস্থাহীন মুসলমানগণ প্রথম দ্বারপথে প্রবেশ করে; দ্বিতীয় দ্বারের নাম "লাখা", অর্থাৎ অগ্নিময়; এই দ্বারপথে খৃষ্টানগণের প্রবেশের ব্যবস্থা; তৃতীয় দ্বারের নাম "হুতামা" অর্থাৎ চূর্ণকারী; এই দ্বার ইহুদীদিগের জন্য; চতুর্থ দ্বারের নাম "সাইর," অর্থাৎ জ্বালাময়; সেবিয়ানদিগের জন্য এই দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে; পঞ্চম দ্বারের নাম "সাকর," অর্থাৎ দগ্ধকারী; মেজিয়ানগণ এখানে দগ্ধ হয়; ষষ্ঠের নাম "জাহিম"; পৌত্তলিকদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য "জাহিমের" সৃষ্টি। সপ্তমের নাম "হাউইয়া," অর্থাৎ গহ্বর; কপটাচারীগণ এই দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে নিপতিত হয়; নরকের মধ্যে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

কিন্তু নরকের এই অধিকার লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে "জাহান্নম" "দরিয়া"দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যাহারা পৃথিবীকে চিরস্থায়ী মনে করে, এবং পৃথিবীর লয়তত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তাহারাই "দবিয়া"। এতদ্ভিন্ন "লাখা"তে পৌত্তলিক আরবগণ, "হুতামা"তে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ, "সাইরে" ইহুদীগণ, "সাকরে" খৃষ্টানগণ, এবং "জাহিমে" মেজিয়ানগণ নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, অনেকে দৈববাণী করেন। ইব্রাহিমে লিখিত আছে; যে সকল লোক অবিনীত ও অহঙ্কারী, নরকে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে "সাদিদ্" নামক অতি তীব্র কটু দ্রব্য পান করিতে দেওয়া হয়; ইহা অধিক মাত্রায় পান করা যায় না, এবং তাহা গলাধঃকরণ করিবার সময় অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হয়।

নরকের আর এক প্রকার পানীয়ের নাম "ঘসাক্"; আবুসৈয়দ আল্-খাদ্‌রি বলেন যে, যদি এক বাল্‌তি "ঘসাক্" পৃথিবীর উপর ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত লোক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিতে কিয়ৎপরিমাণে সাদিদেব মত; কিন্তু ইহা দুর্গন্ধময়, কর্দ্দমের ন্যায় দ্রব, অত্যন্ত আঠাল, এবং এরূপ ভয়ানক শীতল যে, ইহা জিহ্বাসংলগ্ন হইবামাত্র প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হয়। "জাখুম" বৃক্ষের ফল এবং নরকের প্রধান খাদ্য; নরকের অধিবাসীগণের জন্যই ইহার প্রয়োজন; আরবের সমতলক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা বিস্বাদ ফল কিছুই নাই।

আবু সৈয়দাল্ খাদ্‌রি বলেন, নরকের চতুর্দ্দিকে ধূমময় যবনিকা নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই যবনিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। শেষ-বিচারদিনে নরক ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইবে। প্রলয়পয়োধিজলে ধরাতল নিমগ্ন হইলে ভগবান বিষ্ণু যেমন বরাহমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক বিশাল দংষ্ট্রায় তাহা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপে উৎক্ষিপ্ত হইবে; কিন্তু এক জনের দ্বারা নহে, জালালের মতে সত্তর হাজার দেবদূত সত্তর হাজার লাঠি ধরিয়া ইহাকে ঠেলিয়া তুলিবে, নরক তখন ক্রোধে চীৎকার আরম্ভ করিবে।

নরকে একটি অগ্নিময় বৃহৎ পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই পর্ব্বতের নাম "সাউদ"; আবু সৈয়দ বলেন, পাপীদিগকে সত্তর বৎসর ধরিয়া এই পর্ব্বতের উপর উঠিতে হয়; কিন্তু শিখরদেশে আরোহণ করিবামাত্র তাহারা পর্ব্বতের পাদদেশে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এই আর্ত্তনাদের সময় তাহাদের যেরূপ মুখভঙ্গী হয়, আবু সৈয়দ তাহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যন্ত্রণার সময় তাহাদের উপরের ওষ্ঠ মস্তক এবং নিম্ন অধর নাভিদেশ স্পর্শ করে।

কথিত আছে, অবিশ্বাসীগণ সত্তর হাত দীর্ঘ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে; এই অলৌকিক শৃঙ্খল সম্বন্ধে আবদুল্লা উমার বলেন, পাপীদিগের মস্তকের ন্যায় এক একটি গোলা যদি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে পাঁচ শত বৎসরে সেই গোলা পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু এই শৃঙ্খলের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়।

"আল্ আরকে" লিখিত আছে, নরকের অধিবাসীগণ স্বর্গস্থ পুণ্যাত্মাদিগকে সকাতরে আবাহন করিয়া বলে, "আমাদের উপর একটু জলসেক কর, পরমে-

ঈশ্বর তোমাদিগকে যে জলে পবিত্র করিয়াছেন, তাহা দাও" ; স্বর্গ হইতে উত্তর আসে, "তোমরা অবিশ্বাসী, তোমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ নিষিদ্ধ।"

কোরাণের "গো" নামক সুরা বা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, মুসলমান ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই; তাহাদিগকে চিরকাল নরকে পচিতে হইবে; কিন্তু জেলাল মন্তব্য করিয়াছেন, নরক হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তবে মুসলমানগণ কর্ম্মফল অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ইহা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারেন; এই নির্দ্দিষ্ট কালের পরিমাণ নয় শত বৎসরের কম, এবং সাত সহস্র বৎসরের অধিক নহে। এখানে যাহারা আসে, তাহাদের ত্বক নরকাগ্নির উত্তাপে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু তাহাদের জানুদ্বয়, ললাটদেশ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপাসনাকালে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, তাহা শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কারণ নরকাগ্নির সেই সকল স্থান স্পর্শ করিবার কিছু মাত্র অধিকার নাই। কাহারও কাহারও অনুমান, শরীরের এই সকল পবিত্র অংশের প্রভাবে নরকাগ্নির ভীষণতা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস, যে সকল আত্মা নিরয়গামী হয়, তাহারা যতদিন "জাহান্নমে" থাকে, তত দিন এক প্রকার গভীর নিদ্রা তাহাদিগের চেতনা বিলুপ্ত করিয়া রাখে ; কিন্তু পাপের অবসানে যখন তাহারা স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারী হয়, তখন সুরতরঙ্গিণীর পুণ্যসলিলে সমস্ত কলঙ্ক এবং অপবিত্রতা ধৌত হইয়া সুপবিত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া থাকে।

কোরাণে পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায় যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, "তোমাদের দ্বারা আমি নরক পূর্ণ করিব।" গোঁড়া মুসলমানেরা বিবেচনা করেন, অন্তিম বিচারদিনে নরক বিলক্ষণ গুলজার হইয়া উঠিবে। "কাফ্" নামক একখানি আরবী ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, শেষ বিচারদিনে যদি কেহ নরককে প্রশ্ন করে, "তুমি কি পরিপূর্ণ হইয়াছ ?" তাহা হইলে নরক উত্তর দিবে, "আমার সীমাবৃদ্ধির আরও কি প্রয়োজন আছে ?" আনাস্ বলেন, নরক ক্রমাগত পাপীদিগকে গ্রহণ করিবে, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া এই প্রকার উত্তরই প্রদান করিবে ; অবশেষে মহিমাময় পরমেশ্বর ইহার ভিতর পদপ্রবেশ করাইলে নরকের পরিসর সহসা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, এবং সে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, "আপনার মহিমায়, অপনার দানশীলতাগুণে যথেষ্ট হইয়াছে ! যথেষ্ট হইয়াছে ! যথেষ্ট হইয়াছে !" আবু হুরাইয়া নামক প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, স্বর্গের সহিত যখন অগ্নির ঘোরতর বিবাদ বাধিবে, তখনই এই ঘটনা সংঘটিত হইবে।

কোরাণের "আল্ মোতাপ্‌ফিফিন" নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে, "এমন এক দিন আসিবে, যে দিন বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদিগের দিকে চাহিয়া ঘৃণার সহিত হাস্য করিবে, এবং তাহাদের সুখময় বাসরশয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক দেখিবে—" কি দেখিবে, এ সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু বাইদাওয়াই তাঁহার স্বরচিত ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহারা দেখিবে, অবিশ্বাসীগণ নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহার পর হঠাৎ তাহারা "বাব্লা" অর্থাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে, এবং দৈববাণী শ্রবণ করিবে, "যাও, এই দ্বারপথে প্রবেশ কর," এই কথা শুনিবামাত্র সকলে দ্রুতবেগে সেই পথে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, কিন্তু দ্বারদেশে তাহারা পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গের সেই মুক্তদ্বার সহসা রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং পাপীদিগের অবস্থা দেখিয়া অভ্যন্তরস্থ বিশ্বাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিবে।

মুসলমানদিগের মধ্যে "আল্‌সাফি" নামক জ্ঞানীগণের এক সম্প্রদায় আছে। "আল্‌সাফির" অর্থ "জ্ঞানসাগর;" এই সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান ব্যক্তি ৫১৬ হিজিরা সালে অর্থাৎ ১১২২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এই জ্ঞানসাগরের নামটি কিঞ্চিৎ আড়ম্বরযুক্ত, যথা—আবু মহম্মদ আল্ হোসেন ইব্নো মস্থদ ইব্নো মহম্মদ; কিন্তু এই নামে তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকিয়া উঠা মানুষের ক্ষুদ্র পরমায়ুর পক্ষে একটু দুঃসাধ্য ভাবিয়া, লোকে সাধারণতঃ তাঁহাকে আলকরো-আল্ রাবাউই (অর্থাৎ, রাব্ সহরের পালকবিক্রেতা) এই নামে আহ্বান করিত। এই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির জীবন অতি সংযত ভাবে অতিবাহিত হইত; অল্প পরিমাণ শুষ্ক রুটী তাঁহার একমাত্র আহার্য্য ছিল, কিন্তু অবশেষে কোনও রক্ষুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই রুটীর সহিত অল্প পরিমাণ অলিভ তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কোরাণের আনুষঙ্গিক মহাজনোক্তির এক খানি অতি উৎকৃষ্ট টীকা প্রস্তুত করেন; এই টীকার নাম "মসাবি আল্‌সুনান", অর্থাৎ "মহাজনোক্তির লণ্ঠন"। কিন্তু সেক্‌ওয়ালী আল্‌দীন আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইব্নাবদুল্লা আলখাতি নামক আর একজন পণ্ডিত এই গ্রন্থের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, এবং তাঁহার গ্রন্থের "নিসকাত আল্‌মসাবি" অর্থাৎ "লণ্ঠনের মধ্যভাগ" এই আখ্যা প্রদান করেন; এই লণ্ঠনের আলোকে অন্ধকারপূর্ণ নরকের অনেক ব্যাপার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

আবু হরাইরা বলেন, পৃথিবীতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে তাহা নরকাগ্নির সপ্ততিভাগের একভাগ মাত্র। নরকের অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু চিরকাল

ইহা কৃষ্ণবর্ণ ছিল না; প্রথম সহস্র বৎসর ইহার আভা লোহিত ছিল; দ্বিতীয় সহস্র বৎসর তাহা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, অবশেষে তৃতীয় সহস্র বৎসর হইতে ইহা কৃষ্ণাভ হইয়া গিয়াছে। পুনরুত্থানদিনে চন্দ্র সূর্য্য দুই খণ্ড পনীরের ন্যায় এই অগ্নিমধ্যে নিপতিত হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের উক্তপ্রকার দুর্গতি সম্বন্ধে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আল্ হাসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের অপরাধ?" আবু হরাইরা বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ এইরূপই কহিয়াছেন।" অগত্যা আল্হাসেন তাঁহার নিরুপায় কৌতূহলবৃত্তিকে নিঃশব্দে পরিপাক করিতে বাধ্য হইলেন।

সুমানবসির বলেন, পদদ্বয়ে অগ্নিনির্ম্মিত পাদুকা পরিধান করান নরকের সর্ব্বাপেক্ষা লঘুদণ্ড; কিন্তু এই পাদুকা পরিধান করিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইব্ন আব্বাসের মতে এ পর্য্যন্ত একজন মাত্র লোক এই লঘুদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছেন; এই ব্যক্তি আর কেহ নহেন, ইনি মহম্মদের পিতৃব্য আবু তালিব।

আবদুল্লা ইব্নল হারিথ লিখিয়াছেন, নরকে যে সকল সর্প আছে, সেগুলি বাক্ট্রিয়াদেশীয় উষ্ট্রের ন্যায়; এই সর্প কোনও নারকীকে দংশন করিলে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাহার বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার বৃশ্চিক আছে, সেগুলি দেখিতে অনেকটা জিন ও লাগামে সজ্জিত অশ্বতরের মত, এবং ইহাদের দংশনজ্বালাও উক্ত সর্পাঘাতের ন্যায় তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নরকাগ্নির কথা উল্লেখ করিয়া আবু হোরাইরা বলিয়াছেন, এই অগ্নির সৃষ্টি হইলে পরমেশ্বর গেব্রাইলকে ডাকিয়া এই অগ্নি পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন। তদনুসারে গেব্রাইল পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু, যাহারা ইহার কথা অবগত হইবে, তাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না।" এই কথা শুনিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা কামজ মোহ এবং ইন্দ্রিয়সুখের আবরণে এই নরকাগ্নি আচ্ছাদিত করিলেন ও গেব্রাইলকে পুনর্ব্বার তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে বলিলেন। গেব্রাইল এবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, এমন ব্যক্তি কেহই থাকিবে না, ইহার মধ্যে যাহার প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা অল্প।" যাহারা এই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, ইব্নমারের মতে তাহারা বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, ও স্থূলকায় হইবে; উল্লিখিত মৌলবী সাহেব এই স্থূলতার পরিমাণ প্রকাশ করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে, স্থূলকায় নারকীগণের কর্ণমূল ও স্কন্ধদেশের দূরত্ব সাত শত বৎসর ভ্রমণের পথ;

কিন্তু আবু হোরাইরা তাঁহার এই বিচক্ষণ সহযোগীটির উক্তির প্রবল প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, নরকাগ্নিস্থ অবিশ্বাসীগণের স্কন্ধদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের অধিক সময় লাগে না। মৌলবী সাহেব আরও বলেন যে, এই পাপীগণের জিহ্বা ছয় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ও তাহার উপর দিয়া মনুষ্যগণ গমনাগমন করে; তাহাদের এক একটি দন্ত 'উহুদ' পর্ব্বতের ন্যায়, এবং ত্বকের স্থূলতা সত্তর হাত। ইহাদের উরুদেশ বৈদা পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল, এবং নিতম্বের উভয় অংশের দূরত্ব, মক্কা ও মেদিনার দূরত্বের সমান। আবু বুর্দা নামক আর একজন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বলেন, নরকে "হাভাব" নামক একটি উপত্যকা আছে; "হাভাবে"র প্রকৃত অর্থ ক্ষীণকায়, দ্রুতগামী নেকড়ে বাঘ। উদ্ধত, অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের বাসের জন্য এই উপত্যকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

কস্‌মিকাল-টেলিফোন।

জগদ্বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন নানা অদ্ভুত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বহু পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্যে, আজকাল যে সকল বিস্ময়কর যন্ত্রাদির গঠন করিতেছেন, তাহা দেখিলে এডিসনকে বাস্তবিকই অলৌকিক ক্ষমতাশালী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ফোনোগ্রাফ প্রভৃতির আবিষ্কারের পর, সম্প্রতি এডিসন আর একটি অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রনির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছেন; উপস্থিত ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে, ইহাও এডিসনের অপর একটি অমর-কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া, আবিষ্কারকের নাম নিশ্চয়ই চির-স্মরণীয় করিবে।

সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ; এই মহাজ্যোতিষ্কের অবস্থাবৈচিত্র্য দ্বারা সৌর গ্রহ উপগ্রহাদিরও নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, দূরবীক্ষণ দ্বারা অথবা কখনও কখনও নয়নচক্ষুতে সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা করিলে, সৌরশরীরে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন (Dark Spots) পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিহ্নসংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না; বৎসরের সকল অংশেই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন অবধি এই আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজও কোনও সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং চিহ্নগুলির হ্রাসবৃদ্ধির কালনিরূপক প্রকৃষ্ট উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বদাই মহাঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, এবং এই ঝটিকাবর্ত্তেই সূর্য্যাবরণস্থ বাষ্পরাশি সৌরশরীরে প্রোথিত হইয়া গিয়া,

উক্ত কৃষ্ণচিহ্ন উৎপন্ন করে। যাহাই হউক, সহস্র কোটী যোজন ব্যবধানস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলস্থ এই ক্ষুদ্র ঘটনা বড় উপেক্ষণীয় নয়। সৌরচিহ্নের বৃদ্ধি হইলে, পৃথিবীতে তাহার প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়া থাকে,—ইহা দ্বারা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশেই চৌম্বক শক্তির এক মহাবিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, চুম্বকশলাকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং পৃথিবীর চৌম্বকরেখাও (Magnetic Meridian) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত রৌদ্র বাত্যাদি প্রাদেশিক আবহাওয়া, এই সৌরচিহ্ন দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে, দেখা গিয়াছে। কাযেই এই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবসম্পন্ন চিহ্নগুলি দ্বারা আমরা সময় সময় নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ, যাঁহারা চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি লইয়া কার্য্যকর্ম্ম করেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয়; এই ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণাদি জানিবার কোনও উপায় না থাকায়, অনেক সময়েই ইহা কার্য্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এখন এডিসন তাঁহার নবকল্পিত কসমিকাল টেলিফোন নামক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা না করিয়াই, সৌরচিহ্ন সকলের অবস্থা নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা চৌম্বক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা প্রথম হইতেই জানিয়া ও সকলকে সতর্ক করিয়া, ইহার অনিষ্টকারিতা বিদূরিত করিবেন, আশা দিয়াছেন।

কসমিকাল টেলিফোন যন্ত্রটির নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সহজ। একটি বৃহৎ লৌহ (Soft Iron) স্তম্ভে একগাছি সুদীর্ঘ তার উপর্য্যুপরি পুনঃপুনঃ জড়াইয়া * এই তারের মুক্ত প্রান্তদ্বয়, অপর আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্তম্ভের (Electro-magnet) তারের উভয় প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া, এবং ইহার মধ্যস্থ লৌহের এক প্রান্তের অতি নিকটে, একখানি অতি সূক্ষ্ম লৌহফলক রাখিয়া, এই কল্পিত যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিবার কথা হইতেছে। এডিসন বলিতেছেন, যখন সৌরচিহ্ন সকল দ্বারা পৃথিবীতে নানা চৌম্বক উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিরও কিঞ্চিৎ অল্পাতিরেক হইতেছে, সুতরাং এখন এই চৌম্বক শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা, পূর্ব্ববর্ণিত সামান্য যন্ত্রটি অতি সহজেই চালাইতে পারা যাইবে।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন, একটি তারের মোড়কের (Coil) মধ্যে, একটি চুম্বকশলাকার এক প্রান্ত সহসা প্রবিষ্ট করাইলে, বা প্রবিষ্ট করাইয়া হঠাৎ টানিয়া লইলে, মোড়কের তারে একটি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে; পাঠক হয় ত আরও দেখিয়া থাকিবেন, শলাকা মোড়কে প্রবিষ্ট না করাইয়া, যদি একটি বৃহদায়তন চুম্বক মোড়কের সম্মুখে রাখিয়া, ঘন ঘন আন্দোলিত করা যায়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিদ্যুৎপ্রবাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল বৈদ্যুতিক ব্যাপারের কারণোল্লেখকালে বলেন,—শলাকা প্রবিষ্ট বা চুম্বক আন্দোলিত করায়, মোড়কের নিকটস্থ স্থানের চৌম্বক শক্তির (Lines of force) পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এখন যদি এই কথাই সত্য হইল, তাহা হইলে সৌর কৃষ্ণচিহ্নজাত চৌম্বকশক্তির পরিবর্ত্তন দ্বারাও, মোড়কের তারে তড়িৎপ্রবাহ লক্ষিত হইবে। † এডিসন এই

---

* পাঠক তার জড়াইবার প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক হইলে Hopkin's Experimental Science নামক গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিবেন।

† তাড়িতপ্রবাহের উৎপাদনকার্য্যে, লৌহস্তম্ভ (Iron Core) ব্যবহারের উপযোগিতা জানিতে হইলে, S. P. Thompson's Electricity and magnetism গ্রন্থের ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কথা ভাবিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে, আপনা আপনিই বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইবে বলিয়া, তদ্যুক্ত বৃহৎ মোড়কটি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং আরও বলিতেছেন, উল্লিখিত উপায়ে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইলেই যন্ত্রটি নিরুপদ্রবে চলিতে থাকিবে; কারণ, এই প্রবাহ তার দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দ্বিতীয় ক্ষুদ্র মোড়কের (Electro-magnet) তারে প্রবেশ করিয়া, তদভ্যন্তরীণ লৌহখণ্ডকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করিবে, এবং এই চুম্বক ইহার লৌহাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা নিকটস্থ সূক্ষ্ম লৌহফলককে, তাড়িতপ্রবাহের অল্পাধিক্যানুসারে, ক্রমাগত আন্দোলিত করিয়া এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিতে থাকিবে, এবং এই শব্দ দ্বারাই চৌম্বকশক্তির পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ সৌবচিহ্নের হ্রাসবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। এই যন্ত্রের কার্য্যের সহিত টেলিফোনের কতকটা ঐক্য আছে বলিয়া, এটিকে কস্‌মিকাল টেলিফোন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আজও যন্ত্রটির নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই, তবে এডিসনের অতীত কীর্ত্তির কথা ভাবিলে, এবং তাঁহার যন্ত্রনির্ম্মাণকুশলতার পরিচয় পাইলে, এই দুরূহ কার্য্যের ভার উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ইহার আশু কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

ভূ-গর্ভ।

পৃথিবীর রত্নগর্ভা আখ্যাটি প্রায় সকল দেশের সকল ভাষাতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এ সম্বন্ধে নানা প্রবচনও শুনিতে পাওয়া যায়। আজ কাল অনেকেই বলেন, প্রবচন মাত্রই সত্যমূলক; কিন্তু পৃথিবীর সুবৃহৎ উদরের সহিত, প্রাপ্ত রত্নরাশির পরিমাণ তুলিত করিলে, ধরাদেবীর রত্নগর্ভা বিশেষণটি বাস্তবিকই অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েকটি বহুদর্শী মার্কিন বৈজ্ঞানিক, ভূগর্ভনিহিত রত্নাদির বাস্তব অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া, সত্যের আবিষ্কারার্থ, কিছু দিন নানা চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং অদ্য দিন হইল, পরীক্ষাদি দ্বারা বিষয়টির কতকটা মীমাংসা করিয়াছেন। ইহারা বলেন, বাস্তবিকই পৃথিবীর মধ্যভাগ বহুমূল্য ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং ইহার পরিমাণ এতই অধিক যে, মনুষ্য হস্তগত ধনরাশি একত্র করিলে, ভূগর্ভস্থ ধনরাশির সহিত তুলনা করা যায় না।

ভূগর্ভস্থ অধিকাংশ স্থানই ধাতুপরিপূর্ণ বলিয়া, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেকদিন হইতে অনুমান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইহার কোনও সন্তোষজনক প্রমাণাদি দিতে না পারায়, কথাটি কেহ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন না, এখন পূর্ব্বোক্ত মার্কিন পণ্ডিতগণ, নানা উপায়ে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাদির গুরুত্ব বাহির করিয়া, ইহা জল অপেক্ষা কেবলমাত্র দুই গুণ ভারি দেখিয়া, এবং ভূমধ্যস্থ পদার্থের গুরুত্ব এগার গুণ অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ভূগর্ভ ধাতুময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যখন পার্থিব সমস্ত পদার্থই তরল অবস্থায় ছিল, সেই সময় হইতেই ধাতব পদার্থ সকল ভারাধিক্যপ্রযুক্ত কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নামিয়া আসিয়া, কেন্দ্রেরই চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইয়া আছে। এখন তাপবিকীরণাদি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ক্রমে কঠিন ও শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত ধাতু প্রায় অবিকৃতাবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে। আমরা এখন খনি হইতে যে সকল ধাতু পাই, সেগুলি পৃথিবীর কঠিনাবস্থায় পরিণত হইবার সময় সহসা জমিয়া বা অন্য কোনও কারণে নিম্নে তলাইতে না পারিয়া, ভূমধ্যস্থ ধাতুসমুদ্র হইতে পৃথক রহিয়া গিয়াছে, এবং কাজেই অনেক সময় মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

ধাতুর অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইলে পর, ভূগর্ভস্থ দ্রবধাতুর মধ্যে কি কি ধাতু সংমিশ্রিত

আছে,—এই প্রশ্নটি লইয়া অনুসন্ধানপরায়ণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে কিছু তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং কয়েকটি পণ্ডিত উক্ত দ্রবধাতুর অধিকাংশই লৌহ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ধাতুর অধিকাংশই লৌহ থাকিলে, ভূমধ্যস্থ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, পরীক্ষালব্ধ ফল অপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইত বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, লৌহ ব্যতীত ইহাতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি গুরুভারবিশিষ্ট ধাতুর অস্তিত্ব আছে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত পণ্ডিতগণ ভূগর্ভস্থ ধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, এখন বহুমূল্য ধাতু সকল কি প্রকারে সহজে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট রহিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ ধাতু উত্তোলনের অন্য কোনও সদুপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, ভূপৃষ্ঠ হইতে কূপ খনন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি ইঁহাদেরই পরামর্শে জর্ম্মানিতে একটি কূপ খননও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার গভীরতা এক মাইল হইতে না হইতেই ধাতুর পরিবর্ত্তে জল উঠিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে ব্যর্থমনোরথ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া,—আমেরিকার এক স্থানে নানা কৌশলে ইঁহারা আর একটি কূপ খননের চেষ্টা করিতেছেন; এইটি ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার হাত গভীর হইয়াছে; কিন্তু এখনও জল বা পেট্রোলিয়ম্ উঠিয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় নাই।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই অদ্ভুত চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না স্থির করিয়া, ইহা কেবল কয়েকটি উষ্ণমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকের আসন্ন উন্মত্ততার পরিচায়ক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন,—পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ চারি হাজার মাইলের মধ্যে কেবলমাত্র এক মাইল পৌঁছিতে যখন এত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, তখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আরও যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভিনব বিপদ উপস্থিত হইবে না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? এবং যদি বা কোনও অলৌকিক উপায়ে কূপের গভীরতা কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে কূপখননস্থানে একটি ছোটখাট আগ্নেয় গিরির আবির্ভাব হইবে বলিয়া ভয় হয়; আবার এ দিকে স্বর্ণরৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতু উত্তোলিত করিবার সম্ভাবনাও বড় কম, কারণ লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতু আপেক্ষিক গুরুত্বের অল্পতাবশতঃ প্রথমেই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে, কাযেই ভূগর্ভস্থ সমগ্র লৌহ নিঃশেষিত করিয়া ও ভূতলে স্থানদান করিয়া, পরে স্বর্ণাদি ধাতু উত্তোলন করিতে হইবে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু পক্ষান্তরে অনুসন্ধানপরায়ণ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, কার্য্যসিদ্ধির জন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত খনন করিবার কোনও আবশ্যক নাই, কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত কূপ খনন করিলেই যথেষ্ট হইবে; কারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে কুড়ি মাইল নিম্নে সকল পদার্থই দ্রবাবস্থায় আছে, কোনও উপায়ে মুক্তপথ পাইলে এইগুলি সবলে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইতে থাকিবে, এবং ধাতুনির্গমনপথ স্বতঃই প্রশস্ত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, এখন এই অত্যদ্ভুত প্রয়াস কার্য্যে পরিণত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু এককালে মূল্যহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের এই উন্মত্ত চেষ্টা সার্থক হইবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক লক্ষণ।

জনৈক সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক, নানা পরীক্ষাদি দ্বারা, আবহাওয়ার সহিত, প্রাকৃতিক লক্ষণাদির কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি "সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান" নামক সাময়িক পত্রে ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, আবহাওয়া পরিবর্ত্তন ঠিক কোন সময়ে হইবে, শীঘ্র হইবে কি না, তাহা পূর্ব্বে জানিবার বিশিষ্ট উপায় আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, মেটিরিওলজি এখনও সম্পূর্ণ শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে, ইহাকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্র করিয়া গড়িতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) দ্বারা কেবল ঝঞ্ঝাবাত্যাদি পরিবর্ত্তনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বকার লক্ষণগুলি জানিতে পারা যায় মাত্র, তাহাও আবার সকল সময় ঠিক হয় না; তাই সাহেবটি বলিতেছেন, যন্ত্রাদি বৃথা নাড়া চাড়া না করিয়া, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক লক্ষণগুলি দেখিলে, অনেক সময়েই সুফল লাভ হইবে।

সাহেব লিখিয়াছেন, প্রাণীগণের মধ্যে পক্ষী জাতিরই আকাশের পরিবর্ত্তন অনুভবশক্তি, সমধিক প্রবল দেখা যায়। গল নামক একজাতীয় সমুদ্রচর পক্ষী, জলঝড় আসিবার অনেক পূর্ব্বে, ভবিষ্য বিভ্রাটের কথা ঠিক জানিতে পারে বলিয়া কথিত আছে। এই পক্ষী জাতি আত্মরক্ষার্থ বৃষ্টিপতনের অনেক পূর্ব্বে তাহাদের উপকূলস্থ ক্ষুদ্র গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিপদব্যঞ্জক মহা-কলরব করিতে থাকে, এইজন্য অসময়ে ও পরিচ্ছন্ন-আকাশেও দুই এক ঝাঁক গলপক্ষী উপকূলাভিমুখী হইতে দেখিলে, নাবিকগণ বিপদ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া সতর্ক হইয়া থাকেন। নাবিকগণ আর এক জাতীয় পক্ষী দ্বারা (Black Petrel) আসন্ন বিপদের কথা প্রায়ই জানিয়া থাকেন। এই জাতীয় পক্ষীকে জাহাজের নিকটে উড়িয়া বেড়াইতে বা সানন্দে মুক্তাকাশে বিচরণ করিতে দেখিলে, নাবিকগণ মহা ভীত হইয়া থাকেন, এবং আকাশে মেঘচিহ্ন না থাকিলে ও বায়ুমান-যন্ত্রে আশু বিপদের চিহ্ন সূচিত না হইলেও, ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে লাভের আয়োজন করিতে থাকেন। নাবিকসমাজে, ইহা মৃত্যুর চির-কিঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ।—এতদ্ব্যতীত, গৃহপালিত ও গ্রাম্য পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও, লেখক পূর্ব্বোক্ত শক্তিটি দেখিয়াছেন;—তালচোঁচ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষী যখন ঊর্দ্ধ বিহার ত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠের অনতিদূরে বিচরণ করিতে থাকে, তখন প্রায়ই শীঘ্র বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। রাজহংস সকল বৃষ্টির পূর্ব্বে অত্যন্ত অধীর ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, এবং কাঠঠোক্রা এক প্রকার শব্দ করিতে আরম্ভ করে। ইহা ছাড়া, ভেকজাতির আকাশ পরিবর্ত্তনানুভবশক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহারা প্রায়ই বৃষ্টিপাতের অনতিপূর্ব্বে বিকটস্বরে চীৎকার করে। কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যেও লেখক পূর্ব্বোক্ত শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। মেঘ সঞ্চিত হইবার ও বৃষ্টিপতনের অনেক পূর্ব্বে, প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল মুদিত হইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে গন্ধের তীব্রতাও কিছু বাড়ে, এবং যতক্ষণ অবধি আকাশ পরিচ্ছন্ন ও বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পুষ্প সকলও সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রস্ফুটিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্যতীত, লেখক মাকড়সার মধ্যে আকাশ-পরিবর্ত্তন-অনুভবশক্তি অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মাকড়সা, জালবয়নকালে সহসা কার্য্যে বিরত হইলে, শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হইবে বলিয়া স্থির করা যায়; তদ্ব্যতীত মাকড়সার তন্তু পরীক্ষা করিলেও, অনেক সময় আকাশের অবস্থা জানিতে পারা যায়,—সাহেবটি বলেন, তন্তু আকুঞ্চিত হইলে, আশু ঝড়বৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিতে হয়; কিন্তু পরে ইহা প্রকৃত দৈর্ঘ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, সে সম্ভাবনা আর থাকে না। লেখক কয়েকটি মাকড়সা পুষিয়া উক্ত উপায়ে আকাশের অবস্থা জানিতেন। পরিষ্কার মেঘহীন দিনে, মাকড়সার উপদেশানুসারে, তিনি প্রায়ই ছাতা হস্তে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং ইহার জন্য তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রায়ই নানা বিদ্রূপ সহ্য করিতেন, কিন্তু পরক্ষণে আবার তাঁহারাই জলসিক্ত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী আবৃতমস্তক বন্ধুটির অসাধারণ দূরদৃষ্টির প্রশংসা করিতেন।

গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে কুকুটের ব্যবহার দেখিলে, আকাশের ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক জানিতে পারা যায়। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে যদি কুকুট আহার ত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে বৃষ্টি শীঘ্রই প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কিন্তু ইহারা বৃষ্টিপাতে লক্ষ্য না করিয়া যদি কেবলমাত্র আহারান্বেষণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কিছুতেই হঠাৎ বৃষ্টি নিবৃত্ত হয় না, এবং দুই এক দিবসের মধ্যে আকাশ পরিচ্ছন্ন হইবার আশাও বড় থাকে না। চন্দ্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল চক্র দৃষ্ট হইলে প্রায়ই আশু বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন, আকাশের অবস্থা জানিবার, সাহেবটি আরও কয়েকটি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া বা চতুর্থীর চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, এবং চন্দ্রের শৃঙ্গদ্বয় অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া বিবেচিত হইলে, পরবর্ত্তী দুই তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। আর চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইলে, অচিরাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সহসা ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হয়। সাহেব বহু অনুসন্ধানের পর বিষয়টি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে আশা করা যায়, কথাগুলি নিতান্ত অমূলক হইবে না। যাহা হউক, এখন ইহাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, এবং এ গুলিকে দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগান কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহাও দেখা আবশ্যক।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গুরুদ্বার।

আজ একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে ইতিহাস-পাঠের দুর্দ্দশা অসাধারণ। অনেকে বলেন, উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ; কিন্তু অনেকে এরূপ মতও ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, ইতিহাসপাঠে লোকের তেমন স্পৃহা নাই, তাই এদেশে উৎকৃষ্ট ইতিহাসের অভাব। কোন্ কথাটি সত্য, তাহা সমালোচকগণ আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে এক একটি 'হেরোডোটস্' করিয়া তুলিবার পথ পরিষ্কার করুন; "টেক্‌স্টবুক কমিটী"র মনোনীত পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে যতটুকু তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমানে আমরা ততটুকু মাত্র শিক্ষক ও নোটের সাহায্যে অতি কটু পদার্থের ন্যায় গলাধঃকরণ করি। কিন্তু বলা বাহুল্য, ইহাতে ফলও সেইরূপ হইয়া থাকে;—অর্থাৎ "পাশ" বা "ফেলের" সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল বরণীয় কীর্ত্তির গৌরবপূর্ণ স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। ইহার পর কোনও সময়ে কোথাও কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বের কথা উঠিলে, বা কোনও বীরশ্রেষ্ঠের চরিত্রসম্বন্ধে কিছু আলোচনা উত্থাপিত হইলে, আমরা তামাক টানিতে টানিতে "হাঁ, হাঁ, এমনিতর কি যেন

একটা ব্যাপারের কথা ছেলেবেলায় পড়া গিয়াছিল" বলিয়া, মুরুব্বিয়ানার পরিচয় দিই; যেন সে কথাগুলি বাল্যকালেই ভাল সাজিত, এখন আর তাহা লইয়া আলোচনা করা ভাল দেখায় না, বরং তাহা অপেক্ষা তামাক টানিতে টানিতে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সকলের না-হউক, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিতের এইরূপ গতি!

বিদেশের, রোম গ্রীশের ইতিহাস দূরে থাকুক, আমাদের গৃহপ্রান্তে, আমাদের নয়নসমক্ষে অবস্থিত যে একটি মহাপরাক্রান্ত জাতির অতুলকীর্ত্তির দুই একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আমাদের কর্ণগোচর হয়, যাহাদের দুই একটি সামান্য কথামাত্র "টেক্‌স্‌টবুকে"র সাহায্যে আমরা অবগত হই, সেই অমিতবলশালী, প্রচণ্ডতেজা শিখজাতির ইতিহাসের সহিত আমরা কতটুকু পরিচিত? ইংরাজীতে "কি" সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নানা কারণে তাহা নির্দ্দোষ নহে; হুইলারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহাদের বিড়ম্বনা ততোধিক। বাল্যকালে বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্র ইতিহাসে যাহা লিখিত দেখিতাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। অবশেষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ও 'শিখ' নামক সুন্দর প্রবন্ধে শিখজাতির বীরত্ব ও মহত্বের অনেক বিবরণ পাঠকসাধারণের গোচর হইয়াছে। রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার গৌরবময় সংগ্রামক্ষেত্রে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোকে সমগ্র ভারত আভাময় করিয়া তুলিয়াছিল, অপক্ষপাত লেখকের লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, আমাদের এই দুর্ব্বল অসাড় হৃদয়েও মৃদু কম্পন উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডের স্বাধীনতার গৌরবস্বরূপ "মারাথান" ও "থর্ম্মাপলী" স্বাধীন য়ুরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে যে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতার যেরূপ মহাতীর্থরূপে পরিগণিত রহিয়াছে, আমাদের দেশের মারাথন ও থর্ম্মাপলী, আমাদের সুপবিত্র পুণ্যতীর্থ হলদীঘাট, রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালাকে আমরা এখনও সেরূপভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমি ইতিহাসের পাঠক নহি, যতক্ষণ ইতিহাস পড়িব, ততক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলে আমার লাভ আছে; কিন্তু আমি যেখানে থাকিতাম, পাঠ না করিলেও সেখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়নগোচর হইত, এবং সেই সকল ব্যাপার একত্র লিপিবদ্ধ করিলে একখানি সুবৃহৎ সুন্দর ইতিহাস প্রস্তুত হইতে পারে। প্রতিদিন যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন আমার নয়নপথে পতিত হইত,

আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না; "ওটা কি একটা ছিল" এইটুকু মাত্র বলিয়াই অনেকের কৌতূহলবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই বীরভূমি পঞ্চনদের লুপ্তগৌরবের নীরব শ্মশানে দাঁড়াইয়া আর শুধু "ওটা কি একটা ছিল" বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সমস্ত দেখা শেষ হইলে একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, চক্ষুঃপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসে। পঞ্চনদের প্রাচীন গৌরব অধিক নাই, এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের উপর যে যুগব্যাপী অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি আধিপত্য করিতেছিল, মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে তাহার অবসান হয়, এবং ধর্ম্মবীর নানক তাহার শুকতারা। দেখিতে দেখিতে যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং পঞ্চনদবাসীগণ দীর্ঘনিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; সে আজ কয় দিনের কথা, কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যেই সে সূর্য্য অস্তমিত হইল; শুধু একটা সুখের স্মৃতি, এবং অতীত গৌরবের চিহ্ন চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে কেবল হৃদয় ব্যথিত হয়।

কিন্তু আমি আজ যে ক্ষুদ্র কাহিনী বলিতে যাইতেছি, ইতিহাসের বিষয় হইলেও, প্রচলিত ছাপার বহিতে সে সম্বন্ধে অধিক কথা দেখা যায় না। মনে হয়, একখানি মাত্র পুস্তকে এ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ দেখিয়াছিলাম; সুতরাং বিষয়টি অধিকাংশ পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হইবে, এরূপ আশা বোধ করি দুরাশা নহে।

দেরাদুন সহরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেই বাজারের নিকট একটি সুবৃহৎ মন্দির সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মন্দির বলিলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, এবং হঠাৎ দেখিলে ইহাকে মন্দির বলিয়া মনে না হইয়া মুসলমান বাদসাহদিগের সমাধিমঞ্চ বলিয়া বোধ হয়। মনোহরকারুকার্য্যময় উচ্চপ্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি স্থান, প্রাচীরের চারি কোণে চারিটি উচ্চ মনুমেণ্টের মত মিনার, এবং পশ্চিমদিকে একটি প্রকাণ্ড সিংহদ্বার,—তাহাতে লৌহ কবাট শোভা পাইতেছে, যেন কত দিনের পুঞ্জীকৃত রহস্য এই কপাটের অন্তরালে গুপ্ত রহিয়াছে। এই মন্দিরের অপর তিন দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আরও তিনটি দ্বার রহিয়াছে, সেগুলি এই লৌহদ্বারের ন্যায় "সদর দরজা" নহে।

লৌহনির্ম্মিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারা যায়; এই প্রাঙ্গণটি প্রস্তরমণ্ডিত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,

মানবের মলিন পদস্পর্শে সেই পবিচ্ছন্নতার ঈষৎ হানি হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও বোধ করি ক্ষণকালের জন্য ইহার প্রস্তুতকারীর মনে স্থান পায় নাই। এই প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড-মন্দির; মন্দিরের উপর উঠিতে হইলে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়, এবং এইজন্য মন্দিরের চারি দিকে সিঁড়ি আছে। মন্দিরটি অষ্টকোণ, অতি সুন্দর বিচিত্র চিত্রে ভূষিত; ইহার অভ্যন্তরে কোনও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত নাই; মুসলমানেরা উপাসনা করিবার জন্য যেরূপ মসজিদ প্রস্তুত করেন, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। এই মন্দির শিখগুরু রামরায়ের সমাধিমন্দির; আর এই প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে যে চারিটি মনুমেণ্টের ন্যায় মঞ্চ আছে, তাহা রামরায়ের চারি স্ত্রীর সমাধিস্থান; এই মন্দিরের নাম অনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে,—"গুরুদ্বার" বা "গুরুদেরা"। মন্দিরসম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, রামরায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র একখানি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন, কি জন্য ধর্ম্মবীর, শান্তপ্রকৃতি, সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নানকের মন্ত্রশিষ্যেরা কর্ম্মবীর, মহাপরাক্রান্ত দুর্জ্জেয় যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং একটি সংসারবিরাগী, ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্বিরোধ সম্প্রদায় কিরূপে কয়েক জন অবিমৃশ্যকারী মুসলমান-সম্রাটের অমানুষ অত্যাচার ও পাশবিক কঠোরতায় উৎপীড়িত হইয়া, সাম্প্রদায়িক ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক সুবিখ্যাত রাজনৈতিক জাতিতে অভ্যুত্থান লাভ করিল; শিখজাতির ক্রমপরিবর্ত্তনের সেই ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে, আমরা এখানে কেবল শিখসম্প্রদায়ের আদিগুরু নানকের তেজস্বী বংশতরুর একটি শাখার ইতিহাস বর্ণন করিব।

রামরায় শিখগুরু; ইনি গুরু হরগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র। যে সময়ে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রভূত ক্ষমতার পীঠস্থান দিল্লীর রত্নসিংহাসন লইয়া, দারা, সুজা, আরঞ্জেব ও মুরাদ, পবিত্র ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় পরস্পরের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবেশ করাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিল; এবং রোগক্লিষ্ট অক্ষম বৃদ্ধ সম্রাট অন্ধকারময় কারাগারের বিষাদময় কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক অনুতপ্তহৃদয়ে প্রতি দিন মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন, সেই অরাজক-সময়ে যিনি শিখসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তাঁহার নাম গুরু হররায়; ইনিই রামরায়ের পিতা। গুরু হররায়, বাদসাহ পুত্রগণের ভ্রাতৃ-

বিরোধে যোগদান করেন, এবং সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র "দারাশেকো"র সহায় হন। যাহা হউক, এই ভ্রাতৃবিরোধের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন; আরঞ্জেব ধূর্ত্ততাপ্রভাবে সিংহাসন লাভ করিয়া বিদ্রোহাপরাধে গুরু হররায়কে সপরিবারে দিল্লীতে আবদ্ধ রাখেন। গুরু হররায় কারারুদ্ধ হন নাই বটে, কিন্তু সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত দিল্লী ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এই সময় গুরু রামরায়ের জন্ম হয়, এবং এই দিল্লী নগরেই ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পনের বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃহীন হন। সিংহশাবক পিঞ্জর মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত, যে স্বাধীনতার উষ্ণ শোণিত স্রোত তাঁহার গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষদিগের ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, গুরু রামরায় জীবনে এক দিনের জন্যও সে স্বাধীনতার মাধুর্য্য আস্বাদনের অবসর পান নাই; দিল্লী তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিলাসিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরশ্রেণীর মধ্যে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বিরাজিত ছিল, মোগলসাম্রাজ্য তখন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ়, এবং তাহার বিশাল বীর্য্য, অখণ্ড প্রতাপ, অসীম অর্থগৌরব, এবং অনিয়ন্ত্রিত আনন্দোৎসব ও উচ্ছৃঙ্খল হর্ষকোলাহল, সেই জনাকীর্ণ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যবহুল রাজধানী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই উৎসবময় নাট্যশালায় উপবিষ্ট হইয়া, বিস্মিতপ্রায় দর্শকের ন্যায় গুরু রাম কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই, কর্ম্মস্রোত কি গভীর গর্জ্জনে তাঁহার পিতৃভূমি পঞ্চনদের পুণ্যপ্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উপর কূটবুদ্ধি সম্রাট আরঞ্জেবের স্নেহ ও যত্ন তাঁহার পিতৃস্নেহের স্থান পূর্ণ করিল, তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম বাদসাহপুত্রগণ অপেক্ষা ন্যূন রহিল না, সুতরাং বালক দিল্লীশ্বরের সুবর্ণশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এক দিন এ জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল, এক দিন তিনি এ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অভীষ্টপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। শিখজাতির হৃদয় হইতে, বিশ্বাস ও ভক্তি হইতে তখন তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত; তাই রাজপ্রাসাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে নাই। অবশেষে তিনি বিলাসের কাম্যকানন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের একটি নির্জ্জন নেপথ্যে উপস্থিত হইয়া উদাসভাবে জীবনযাপন করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

আরঞ্জেব যতই কূটবুদ্ধি ও ধূর্ত্ত হউন, তথাপি তিনি মানব; মানসুলভ ভ্রমজাল হইতে মুক্ত থাকা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। যে অভিপ্রায়ে তিনি রামরায়ের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, যাঁহারা সেই সময়ের রাজ-

নৈতিক ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ক্রূরচেতা আরঙ্গজেবের সেই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত। স্নেহের অনুরোধে স্নেহ করা, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যত্ন বা আদর করা, আরঙ্গজেবের স্বভাবে বা কার্য্যে কখনও দেখা যাইত না; স্নেহ, মমতা, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি তাঁহার শঠতাময় অভিপ্রায়সিদ্ধির প্রধান সহায় ছিল, সুবিধা বুঝিয়া তিনি অপরকে যত্ন করিতেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি পরের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তাহার পর কার্য্য সফল হইলে, সেই হতভাগ্যদিগকে কীটের ন্যায় পদতলে দলিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দিল্লীর বাহ্যদৃশ্য যতই উজ্জ্বল ও উৎসবপূর্ণ থাক, এবং দিল্লীর পুষ্পসমাচ্ছন্ন রত্নরাজিপরিশোভিত রাজপ্রাসাদে অপ্সরোসদৃশী সুন্দরীবৃন্দের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে যতই হর্ষ স্ফুরিত হউক, সম্রাট আরঙ্গজেবের হৃদয় চিন্তা কিম্বা ভয়শূন্য ছিল না। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে রাজপুত জাতি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃততর হইয়া বিপুল মোগলসাম্রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল; তাহার উপর যদি পঞ্চনদের এই যুদ্ধকুশল পরাক্রান্ত বীরজাতি মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য, এই মনে করিয়াই ক্রূরচেতা সম্রাট আরঙ্গেব রামরায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বৃথা হইয়াছিল। শিখেরা রামরায়কে গুরুপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন; শিখ সম্প্রদায় এখন মুসলমান সম্রাটের শত্রু, সুতরাং গুরুপুত্র হইলেও আরঙ্গেবের বন্ধুকে তাঁহারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। সত্য বটে, এক দিন তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, বিনীত সাধুসম্প্রদায় ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ম্মপ্রাণ, মহাযোদ্ধা, অমিততেজা বীরজাতি; শান্তস্বভাব ধার্ম্মিক রামরায়কে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার অনুতম ভ্রাতা হরিকিষণকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এই শিশু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করায়, রামরায় শিখসম্প্রদায়ের গুরুপদলাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিখসমাজে প্রবেশদ্বার চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। হরিকিষণের মৃত্যুর পর, শিখেরা একমত হইয়া গুরু হরগোবিন্দের পুত্র, মহাতেজস্বী, স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাবীর তেগবাহাদুরকে গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তেগবাহাদুর সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শিখগুরুর খ্যাতি, শিখপরাক্রমের প্রতিষ্ঠাতা গুরুগোবিন্দ সিংহ ভিন্ন সকলের অপেক্ষাই অধিক। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে

মুসলমানের তীক্ষ্ণ-তরবারীতে তেগবাহাদুরের ছিন্ন শির ধূলিলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই শোণিতস্রোত বৃথা-প্রবাহিত হয় নাই; তাহা শিখজাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-অনলে আহুতিস্বরূপ হইল। অবশেষে তেগবাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দ সিংহ, শিখ জাতির হৃদয়ে যে অভিনব-শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, তাহা মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ডের পর গুরু রামরায় আর একবার গুরুপদপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার তৃতীয় উদ্যম; ক্রমাগত তিন বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন, শিখেরা এবারও পূর্ব্ববারের ন্যায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দ সিংহকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গোবিন্দ সিংহের ন্যায় কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? পৌরাণিক ভারতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আধুনিক জগতের চারি জন মহাপুরুষকে স্বদেশহিতৈষী বীরের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে; এই চারি জন—প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এবং রণজিৎসিংহ।

গোবিন্দ সিংহ শিখগুরুর পদে আরোহণ করিলে রামরায়ের সমস্ত আশা বিদূরিত হইল; তিনি বুঝিলেন, এই নবদীক্ষিত যুদ্ধনিরত জাতির গুরুগিরি করা তাঁহার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি উদাসীনের কর্ম্ম নহে। তিনি স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং গুরু নানকের নামে ধর্ম্মপ্রচারের অধিনায়কত্ব করিবার ব্রত-গ্রহণ করিলেন। লোকালয়ের বিচিত্র ক[illegible] দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই নির্জ্জনব[illegible]নর অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রা[illegible] নিকট হইতে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজার নামে এক খানি অনু[illegible] ১৯ খৃষ্টাব্দে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। গাড়ো[illegible] সশিষ্যে দেরাদুনে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, তদনুসারে [illegible] প্রথমে টনস্ নদীর তীরে 'কাণ্ডলী' নামক একটি নির্জ্জন স্থানে কিছু দিন বাস করেন। এই স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, (এখন আর নাই, অতি-অল্প দিন হইল, বিনষ্ট হইয়াছে।) জনরব তিনি স্বহস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধিক দিন এখানে বাস করা তাঁহার অনভিপ্রেত হওয়ায়, "ধামুওয়ালা"তে তিনি এই বর্ত্তমান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন; 'ধামুওয়ালা' এখন দেরাদুন নগরের মধ্যে পড়িয়াছে।

এই স্থানে মন্দির স্থাপিত হইলে, নানাদিগ্দেশ হইতে দলে দলে সাধু

সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল, শোকতাপে জর্জ্জরিত, ব্যথিত-হৃদয় নরনারীগণ তাঁহার পবিত্র উপদেশে হৃদয় সংযত করিবার জন্য তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইল, এবং ধীরে-ধীরে দেরাদুন সহর সংস্থাপিত হইল। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'গুরুদ্বার' বা 'গুরুদেরা,' ক্রমে-ক্রমে 'গুরু' লোপ পাইয়া, ইহা 'দেরা' নামেই প্রসিদ্ধ হইল, ও 'দুন' প্রদেশে অবস্থানের জন্য "দেরাদুন" এই পূর্ণ নাম গ্রহণ করিল। কিন্তু 'দেরাদুন' নাম এইরূপে উৎপন্ন হইলেও, ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সাধারণ লোক এই স্থানকে "দ্রোণকা ডেরা" অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের আচার্য্য দ্রোণের 'দেরা' বা বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তাহাদের মতে এই জন্যই এ প্রদেশের নাম "দুন" হইয়াছে। এই উভয় মতের মধ্যে কোন মতটি যথার্থ, ঠিক বলা কঠিন, তবে যাঁহারা মহাভারতোক্ত ঘটনাকে একটা রূপক জ্ঞান করিয়া কুরুপাণ্ডবের অরণিস্থিত সেই বৃহৎ গুরুটিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের নিকট প্রথমোক্ত মতই আদরণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য।

দেরাদুনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, রামরায় আর কখনও শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদলাভের চেষ্টা করেন নাই; তাঁহার শিষ্যশ্রেণী 'উদাসী সাধু' নামে প্রসিদ্ধ। গুরু নানকের নামে তিনি যে সাধুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন, পঞ্জাবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোকও আছেন।

গাড়োয়াল রাজ্যের [illegible] এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই সময় চারি খানি গ্রাম প্রদান করেন। প্রথমে এই গ্রাম কয়েক খানি হইতে যে আয় হইত, তাহা কিন্তু এখন তাহার যথেষ্ট আয় হইয়াছে। গুরুদ্বারের দেরাদুনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী ও পদস্থ ব্যক্তি। অনেক দিন হইল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে সাত খানি গ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিহরীর রাজার নিকটও তাঁহারা ছয়খানি গ্রাম লাভ করিয়াছেন।

অনেক দিন হইল, এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং তাহার কোনও প্রকার অবস্থান্তর ঘটে নাই, আর যদি কখনও ইহার জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের মন্দিরসংস্কারের জন্য যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, এই মন্দিরসংস্কারের জন্য সেরূপ ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যক হইবে না। গুরুদ্বারের অর্থগৌরব এবং সম্পত্তির ইয়ত্তা নাই; তথাপি ইহা পরিমিতসংখ্যক শিখ ও

উদাসী সন্ন্যাসীগণের পুণ্য তীর্থ মাত্র; আর আমাদের পুরুষোত্তম আট কোটী বঙ্গবাসীর এক মহাতীর্থ; শুধু বঙ্গবাসী কেন, উৎকল, বিহার, উত্তরপশ্চিম, ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই অগণ্য ভক্ত, অসংখ্য পাপী তাপী প্রতি বৎসর জলস্রোতের ন্যায় শতশতক্রোশবিস্তৃত দুরতিক্রমণীয় পথ অক্লান্তভাবে অতিক্রম করিয়া, বঙ্গসাগরোপকূলবর্ত্তী এই মহাতীর্থে সমাগত হইয়া, জগন্নাথের প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জীবন পবিত্র করিয়া লয়; বিধাতার বিড়ম্বনা! আজ সভাস্থলে ক্ষীণকণ্ঠে সেই জগন্নাথদেবের প্রাচীন মন্দিরের গৌরবকাহিনী ঘোষণা পূর্ব্বক মন্দিরসংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

গুরুদ্বারের মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী বর্ত্তমান; এদেশে পুষ্করিণী খনন করা বিলক্ষণ কষ্টকর ও অর্থসাধ্য ব্যাপার, এইজন্য এখানে প্রায়ই পুষ্করিণী দেখা যায় না। এই পুষ্করিণীর জল অভ্যন্তরস্থ প্রস্রবণ হইতে সমুদ্ভূত নহে, রাজপুর খাল হইতে এই জল আনয়ন করা হয়। এই পুষ্করিণীতে নানাবিধ মৎস্য আছে।

প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র এখানে একটি মেলা হয়, তাহার নাম "ঝাণ্ডার মেলা"। "ঝাণ্ডা" কথাটির অর্থ আগে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। উদাসীদিগের হস্তে এক গাছি করিয়া লাঠী থাকে, কোনও স্থানে বাস করিতে হইলে প্রথমে সেইখানে লাঠী প্রোথিত করে, এবং তাহার অগ্রভাগে নিশানের মত এক খণ্ড লালকাপড় বাঁধিয়া দেয় ও তাহার পর সেইখানে আসন পাতে। আমাদের দেশেও কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ফকিরের মধ্যে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু রামরায়ও চৈত্র মাসের প্রথমদিনে এখানে আসিয়া আড্ডা করেন ও ঝাণ্ডাস্থাপন করেন। সেই উপলক্ষে এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। পঞ্জাব হইতে এখন দলে দলে শিখ এখানে এই "ঝাণ্ডার মেলা" দেখিয়া ও গুরু রামরায়ের "ঝাণ্ডা" নামাইয়া উঠাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। রামরায়ের সেই 'ঝাণ্ডা' এখন আর ক্ষুদ্র লাঠী নাই, সুবৃহৎ জাহাজের মাস্তলের মত একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বশরীর লাল বস্ত্রখণ্ডে পরিবৃত, শিরোদেশে সমুজ্জ্বল লোহিত নিশান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার নিয়ম নাই; সিংহদ্বারের সম্মুখে, পুষ্করিণীতীরে প্রায় ১৫।২০ হস্ত উচ্চ স্থান ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান হইয়াছে; তাহারই ভিতর সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠ 'ঝাণ্ডা' দণ্ডায়মান থাকে। প্রতি বৎসর তাহার এক পার্শ্বের ইষ্টকস্তূপ ভাঙ্গিয়া ঝাণ্ডা নামান হয়, এবং

যদি সেই কাষ্ঠদণ্ডের অবস্থা ভাল থাকে, তবে তাহার গাত্রেই নূতন লাল কাপড় জড়াইয়া নূতন নিশান খাটাইয়া 'ঝাণ্ডা' উঠান হয়, নতুবা কাষ্ঠদণ্ড বদলাইয়া দিতে হয়। ঝাণ্ডা তুলিবার সময়ের দৃশ্য অতি চমৎকার, আমাদের দেশে এত উত্তেজনাপূর্ণ কোনও উৎসবই নাই, এবং অতি অল্পসংখ্যক উৎসব উপলক্ষেই বিদেশ হইতে এত জনসমাগম হইয়া থাকে।

১লা চৈত্রের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে, সহস্র সহস্র নরনারী ঝাণ্ডা তলে সমবেত হইতে আরম্ভ করে; সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, এবং সর্ব্বশরীর অবস্থানুরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত। ক্রমে ঝাণ্ডা তুলিবার সময় হইলে মন্দিরের মহান্ত সেখানে উপস্থিত হন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকগণ উৎসাহে "জয় গুরুজি কি জয়" শব্দে কর্ণ রধির ও আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঝাণ্ডা নামাইয়া ফেলে, তাহার অল্পক্ষণ পরে সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার সেই 'ঝাণ্ডা' পূর্ব্ব স্থানে সংস্থাপিত করে; অনন্তর প্রত্যেকে 'ঝাণ্ডার' গাত্রে "রাখি" বাঁধিয়া দেয়। গুরুদ্বারের মহান্ত সেদিন অনাহারে, গলে উত্তরীয় বাঁধিয়া, নগ্নপদে, কৃতাঞ্জলিপুটে ঝাণ্ডার নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। যে মহান্ত মঠপ্রান্তে পদার্পণ করিতেও অপমান বোধ করেন, যাঁহার মস্তকে ছত্রধারণের জন্য এবং পাদুকাপ্রদানের নিমিত্ত শত শত ব্যক্তি সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করে, আজ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীনবেশে, বিনীত ভাবে, গললগ্নীকৃতবাসে ঝাণ্ডার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আজ জনসাধারণের মধ্যে তিনি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দূরে দাঁড়াইয়া আমি এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম; আমার মনে হইল, বিধাতার সিংহাসনের সম্মুখেও বুঝি এই নিয়ম, সমদর্শিতাই বুঝি সেখানকার অলঙ্কার, এবং সেই সুখস্বর্গে অহঙ্কার ও অবিনীত ভাব লইয়া মানবের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেই দিনের পবিত্র দৃশ্য চিরকাল আমার মনে থাকিবে।

এক বৎসর এমন হইয়াছিল যে, 'ঝাণ্ডা' আর কিছুতেই তুলিতে পারা যায় না; যাহারা ইহা তুলিবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতেছিল, তাহারা আমাদের মত দুর্ব্বল বাঙ্গালী নহে; এক একটা অসুরের মত বলবান। সহস্র সহস্র লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ঝাণ্ডা উঠাইতে পারিল না, তখন সেই উৎসবক্ষেত্রে সমাগত ভক্ত নরনারীর মধ্য হইতে একটা ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, এবং এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলেই ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বয়ং মহান্তজী (বয়স ৩০।৩৫ বৎসর) আকুল হইয়া

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে আরও অধিক ভীত হইয়া পড়িল, হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সকলের মুখেই বিষাদকালিমা পরিব্যাপ্ত। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে উৎসবক্ষেত্র আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা যেন তরঙ্গায়িত শোকসাগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "হো গুরুজী, হো গুরুজী"; অর্ণবযান সমুদ্র মধ্যে বিপথগামী হইলে বা ঝঞ্ঝাবাতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম ঘটিলে, যেমন বিপন্ন আরোহীগণ আকুলভাবে পোতচালকের মুখে একটি আশ্বাসবাণী শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে, এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাঁহার মিনতি করে, এই সমাগত দর্শক ও ভক্তগণের অবস্থাও সেইরূপ। কিন্তু কে তাঁহাদের আশ্বাসবাণী দিবে? মহান্ত নিজে মুহ্যমান।

যাহা হউক, চেষ্টার ত্রুটি হইল না; ক্রমে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, কিন্তু এতগুলি লোক চেষ্টা করিয়া কিছুতেই 'ঝাণ্ডা' উঠাইতে পারিল না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি শক্ত, স্থূল কাছি ধরিয়া উন্মত্ত ভক্তগণ টানাটানি করে, আর সেগুলি জীর্ণসূত্রের মত ছিঁড়িয়া যায়। আর উপায় নাই, সকলের বিশ্বাস হইল, গুরুজীর অকৃপা হইয়াছে; নতুবা 'ঝাণ্ডা' এমন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিবে কেন? অনেকে বলিতে লাগিল, হয় ত মহান্ত মহাশয়ের সেবার ত্রুটি হইয়াছে, তাই এ বিপদ। কেহ কেহ মহান্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা মহান্তকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিয়া নূতন মহান্ত নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিল।

অবশেষে মহান্ত মহাশয় উন্মত্তের মত হইয়া সেই জনতার চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; রৌদ্রে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার উপর নিরাশা ও বিষাদের মলিনতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেকেই সন্তপ্ত হইল, তাঁহার উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সকলে আর একবার অগ্রসর হইল, শরীরের সমস্ত বল এবং প্রাণের সমস্ত ভক্তি নিয়োজিত করিয়া, স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, আর একবার 'ঝাণ্ডা' উঠাইবার জন্য টানাটানি করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝাণ্ডা উঠিয়া গেল। সহসা সেই বিষাদাচ্ছন্ন জনস্রোতের মধ্যে যে আনন্দকল্লোল উত্থিত হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়; উৎসাহে সকলে "জয় গুরুজী কি জয়" রবে আকাশ বিদীর্ণ করিল; এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া দুর্ব্বলপ্রাণ, উৎসাহহীন বাঙ্গালী যে

আমি, আমার হৃদয়ও যেন এই বীর জাতির ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে সমস্বরে "জয় গুরুজী কি জয়" বলিয়া উঠিলাম।

এই দিনে মহান্তের বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, সকলেই তাঁহাকে প্রণামী দেয়। গুরুদ্বারে নিত্য অতিথিসেবা আছে। 'ঝাণ্ডা' মেলার ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে অহোরাত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে গান হয়, দলে দলে গায়কেরা চারি দিকে গান করিতেছে, দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে, এক দল আসিতেছে; লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পায় না, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় জুতা চুরী যাইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

গুরুদ্বার এবং ঝাণ্ডার কথা কিছু কিছু বলা হইল। গুরু রামরায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রামরায় মধ্যে মধ্যে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই তিন দিন ধরিয়া তাহার অভ্যন্তরেই বাস করিতেন; ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিতেন, সুতরাং অন্য কেহই সে ঘরে যাইতে পারিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় তিনি যোগবলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একবার তিনি তাঁহার চারি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি সপ্তাহ কাল গৃহমধ্যে থাকিবেন, এই সময়ের মধ্যে যেন কেহ তাঁহাকে না ডাকে। প্রথম চারি দিন এক ভাবেই অতিবাহিত হইল, কিন্তু গৃহমধ্যে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন; পঞ্চম দিনে তাঁহার পতিপ্রাণা তৃতীয়া স্ত্রী আর থাকিতে পারিলেন না, ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গুরুজী যোগাসনে বসিয়া আছেন, চক্ষু নিমীলিত মুখে প্রসন্ন ভাব বিরাজিত, কিন্তু দেহ স্পন্দহীন, দেহে প্রাণ নাই। চারি দিকে হাহাকার রব উঠিল; সকলেই বুঝিল, দেহে প্রাণ আর ফিরিয়া আসিবে না, তাঁহার ইহ-জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

রামরায় যে আসনে বসিয়া যোগমগ্ন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন, সেই আসন এই মন্দিরমধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। গুরুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা পত্নী মাতা পঞ্জাব কুমার সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন; অবশেষে গুরুজীর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হরপ্রসাদ, মহান্ত পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে নিয়ম হয় যে, মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য মহান্ত হইবেন। বর্ত্তমান মহান্তের নাম প্রয়াগদাস; এই যুবক মঠধারী

কোনও কোনও মহান্তের ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ব্যসনাসক্ত না হইলেও, বিলাসিতাশূন্য নহেন। যে দেবসম্মান ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইঁহারা প্রতিপালিত, তাহাতে বিলাসী হওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরং বিলাসশূন্য হওয়াই বিচিত্র। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে মঠ সংস্থাপিত করেন, তাঁহারা প্রায়ই অনাসক্ত যোগী, কিন্তু পরবর্ত্তী মহান্তেরা সেই সকল মহৎপ্রকৃতি গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও, তাঁহাদের অলৌকিক গুণগ্রাম, অবিচল একনিষ্ঠা এবং একান্ত নির্লিপ্ততা লাভ করিতে পারেন না, বিবিধ কামনা কঠোরতার আবরণের অভ্যন্তরে সামান্য বহ্নিকণার ন্যায় লুক্কায়িত থাকে; এবং কালক্রমে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করে; এবং তাহাতে মঠের পবিত্রতা, গৌরব সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। গুরুদেবের এই মঠ সম্বন্ধে অবশ্য এতখানি কথা বলা যায় না; কারণ, এই মঠ বঙ্গদেশে নহে, এবং এই স্বাধীনপ্রকৃতি বীরজাতির মধ্যে এখনও ইহার অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। বিবাদ-বিসম্বাদে, ক্রিয়া মামলা মকদ্দমায় ইহার অর্থভাণ্ডার শূন্য হইবার এখনও কোনও কারণ ঘটে নাই; কিন্তু পূর্ব্বের সেই ভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস এখন আর নাই। তবে শিখজাতির মঠ, তাই ইহা হইতে এখনও প্রাণ অন্তর্হিত হয় নাই; হইলে, আমাদের দেশের মঠগুলির ন্যায় ইহা ধর্ম্মমহিমার স্থায়ী উপহাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। শ্রীজলধর সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

দর্শন।

অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ।

মে সংখ্যা কণ্টেম্পোরারি রিভিউয়ে বিবি এমা কেলার্ড 'অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ' বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয়, বিবি পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞা। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রেরও দুই চারিটা তত্ত্ব যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, বোধ হয়।

অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ।

বিবির বিবর্ত্তনবাদে পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁহার মতে নিরুষ্ট জড়জগৎ হইতে সাঙ্গ চেতন জগতের বিকাশ। ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভিদ হইতে ইতর প্রাণী, শেষ মানুষ। অতএব মানুষ জগতের অংশভূত, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র নহে। জড় বা জীব জগৎ হইতে মানুষের এইমাত্র প্রভেদ যে, মানুষ উন্নতির পথে সমধিক অগ্রসর। অতএব যাহা ইতর জগতে বীজ বা অঙ্কুর, মানুষে তাহা শাখাকাণ্ডবিশিষ্ট। সুতরাং এই অহংজ্ঞান (Personality) মানুষের অসাধারণ সম্পত্তি

মানব জগতের অংশ।

নহে। নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু—অধিক কি, নিম্নতম প্রাণীও অহংজ্ঞানাপন্ন। সকলেই অনুভব করিতে পারে যে, তদিতর জগৎ হইতে সে স্বতন্ত্র। তবে মানুষেই এই জ্ঞান বিশেষ স্ফূর্ত্ত।

মানুষ যখন জড়জগতের বিবর্ত্তন এবং জড়জগতে যাহা বীজভূত, তাহাই যখন চেতন মানুষে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, তখন এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জড়জগৎ বাস্তবিক জড় নহে। ইহাকে জড় বলা বড় ভ্রম। জড়বাদী জড়জগৎ বা প্রকৃতিকে (matter) জৈব জগতের মূল বলিয়া বর্ণনা করেন। যেমন বটবীজ বটবৃক্ষের মূল, অথবা গর্ভবীজ জীবদেহের মূল, ইহাও সেইরূপ। কথা যথার্থ, কিন্তু বটবীজ বা গর্ভবীজ কি, জড় না জীবন্ত? অবশ্যই জীবন্ত। প্রকৃতিও এইরূপ। প্রকৃতি জড় নহে, জীবন্ত। জীবন হইতে জীবনের উদ্ভব সম্ভবে, জড় হইতে নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে, এই মানুষের উদ্দাম আশা, অতুল্য ধী, অমেয় প্রেম, উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা—এ সকল নগণ্য প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত? হইবে বৈ কি। প্রকৃতি নগণ্য নহে, প্রকৃতি (matter) জীবন্ত, চিতিময়।

জগৎ চিতিময়।

জড়বাদ এই ভাবে বুঝিলে ইহাতে আমরা নিত্য সত্যের সাক্ষাৎ পাই। বাস্তবিক চিতিময় বলিয়াই প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি, তাই ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বিচিত্রতম মানুষের পরিণতি। মানুষে যে অহংজ্ঞান সুব্যক্ত, তাহা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই অনুস্যূত। প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অন্ধ জড়শক্তির অর্থহীন ক্রীড়ামাত্র নহে, কিন্তু ঈক্ষাময় চিতি শক্তির সার্থক লীলাতাণ্ডব।

প্রকৃত জড়বাদ কি?

জড় জগৎ চিতিময়; কিন্তু চিতি ও জড় এক পদার্থ নহে। তবে ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য। চিতিশক্তি অনাদি, এই সম্বন্ধও অনাদি, সুতরাং জড়জগৎও অনাদি। অতএব যাহাকে সৃষ্টি বলা যায়, তাহা অভাবের ভাব নহে, অসত্তার সত্তা নহে। কিন্তু অবিশেষের বিশেষ, সতের পরিণাম, ভাবের অভিব্যক্তি।

জগৎ অনাদি।

জগৎ চিন্ময়—এই চিতিশক্তি আবার ঈক্ষান্বিতা (Intelligent); অতএব জগৎ ঈশশক্তির অভিব্যক্তি, অর্থাৎ জগতের আদি অন্ত ঈশ্বরে; তাঁহা হইতে উদ্ভব, তাঁহাতেই লয়। ঈশশক্তিতে জগৎ অনুপ্রাণিত, জড়ে চেতনে, সাঙ্গ জগতে নিরঙ্গ জগতে সর্ব্বত্রই সমান বিকশিত। জগতের স্থিতি ঈশ্বরাবলম্বী, জগতের গতি ঈশ্বরাভিমুখী। ঈশ্বর ভিন্ন জগৎ নাই।

জগৎ ঈশ্বরের রূপ।

বিবির প্রবন্ধ যাঁহারা অনুধাবন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বিবির সিদ্ধান্তিত তত্ত্বের সহিত আর্য্যদর্শনের তত্ত্ব সকলের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—'আমাতে জগৎ প্রোত সূত্রে মণিগণ যথা'। গীতার উক্ত মহাবাক্যের সহিত কি বিবির সিদ্ধান্ত অভিন্ন নহে? ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের আদ্যন্তমধ্য বলিয়া জগৎকে 'তজ্জলান' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ জগতের ঈশ্বরেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে। জগৎ তজ্জ (ঈশ্বরজাত) তল্ল (ঈশ্বরে লীন) এবং তদন (ঈশ্বরে অবস্থিত) একটি সূত্রে কি গভীর তত্ত্বরাশি। বিজ্ঞান এত দিনে দূরে দূরে তাহার অনুসরণ করিতেছে। 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'—'প্রকৃতি পুরুষ আর অনাদি উভয়'। বিবি জগৎকে চিন্ময় বলিয়া ও প্রাকৃত সৃষ্টির অপলাপ করিয়া ঐ কথারই সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃতিই বিবির জড়জগৎ (matter) এবং পুরুষ চিৎশক্তি। গীতাকার বলেন,—

মতামত।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। স্থাবর জংগম কিবা যাহা কিছু জগন্ময়,
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ প্রকৃতি পুরুষ যোগে জাত তাহা সুনিশ্চয়।

চিন্ময় জগতের বিবর্ত্তবাদ কি ঐ এক শ্লোকে সূত্রিত নহে? বেদান্ত মতে মায়োপহিত চৈতন্য হইতে জগতের বিকাশ বা আভাষ। এই মায়া-প্রকৃতির নামান্তর। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—'মায়ারে প্রকৃতি মান'। অতএব, চিন্ময় প্রকৃতি বা জগন্ময় চিতিই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। ইহাই অব্যক্ত অবিশেষ অব্যাকৃত নামে পরিচিত। ইহাই বিবির ঈশ্বরীপ্রাপিত জড়জগৎ।

পাশ্চাত্যেরা অল্পে অল্পে গভীর গবেষণা ও মার্জ্জিত ধীশক্তিবলে আর্য্যযোগীর আবিষ্কৃত তত্ত্বে উপস্থিত হইতেছেন। জগতের শুভাদৃষ্ট বটে।

সাহিত্য।

জোলার জীবন ও কার্য্য।

বর্ত্তমান যুগে জোলা এক জন প্রতিভার অবতার। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এক্ষণে নানা দিক হইতে এত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইতেছে যে, সে সকলের উপর সহসা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলেন, জোলার প্রণীত উপন্যাস গুলিতে সমাজের অন্ধকার বা দুঃখময় অংশ প্রদর্শিত হয়—আমরা বুঝিতে পারি, আমাদিগের এই বাহ্যচাকচিক্যময় সমাজ কিরূপ অন্তঃসারশূন্য—কিরূপ পাপপঙ্কিল,—ইহাতে অনেক উপকার আছে। আবার অনেকে বলেন যে, জোলার উপন্যাস সকল সমাজে ব্যাধির বিস্তার করে মাত্র, উপকার অপেক্ষা তাহাতে অপকার অনেক অধিক। টেনিসনের ন্যায় রসজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। Locksly Hall কবিতার উপসংহারভাগে তিনি লিখিয়াছেন,—

জোলা।

"Feed the budding-rose of boyhood with the drainage of your sewer;
Send the drain into the fountain, lest the stream should issue pure.
Set the maiden fancies wallowing in the troughs of Zolaism,—
Forward, forward, ay and backward, downward too into the abysm."

কিন্তু জোলার মত প্রতিভাশালী লেখক যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অল্প, তাহা ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নীতির উপাসক-সম্পাদক মিষ্টার ষ্টেডও স্বীকার করিয়াছেন। কয় বৎসর হইল, "নর্থ আমেরিকান রিভিউ" পত্রিকায় সার এডউইন্ আর্ণল্ড লিখিয়াছিলেন যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জোলার "La Bete Humaine" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ পুস্তকে এমন সকল কদর্য্য ভাব আছে যে, পাঠমাত্রের অব্যবহিত পরে, তিনি ঐ পুস্তক আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিপুল বারিগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেন, কিন্তু তথাপি তিনি মনে করেন যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মধ্যে ঐ পুস্তক সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। হায়! যদি এই প্রতিভাবান্ লেখকের প্রতিভা যোগ্যতর-বিষয় ব্যবহৃত হইত!

এপ্রিল সংখ্যা "ম্যাক্‌লুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার সারার্ড, জোলার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘ; আমরা সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

যাঁহারা কখনও জোলাকে দেখেন নাই, তাঁহাদিগের জোলার চেহারা সম্বন্ধে ধারণা বড়ই ভ্রান্ত। তাঁহারা মনে করেন, জোলার শরীর মেদাধিক্যযুক্ত, আলস্যজড়িত, এবং ইন্দ্রিয়সুখলোলুপের মত। বাস্তবিক জোলার চেহারা এরূপ নহে। তিনি ক্ষীণশরীর এবং দীর্ঘও নহেন। সমস্ত মুখমণ্ডলে গভীর চিন্তার রেখা অঙ্কিত, দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত এবং সংসারাসক্তিশূন্য। যে সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন; কেবল সেই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার

আকার প্রকার।

সময় সেই চিন্তাক্লিষ্ট বদন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, এবং সেই প্রতিভাদীপ্ত-নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে থাকে, তখন সেই বিরূপ দেহাবরণ ভেদ করিয়া অসামান্য প্রতিভা-জ্যোতিঃ আপনাকে প্রকাশ করে।

অন্ধকারবাদ।

জোলা মনে করেন যে, তাঁহার মত সম্বন্ধে লোকের প্রচলিত বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত। লোকে মনে করে যে, তিনি অন্ধকারবাদের অন্ধ উপাসক; কিন্তু তিনি আলোক বা সুখ-বাদের উপাসক। তিনি বলেন, বংশানুক্রম বড় ভয়ানক, ইহাতে পূর্ব্বপুরুষদিগের পাপের ভার পরবর্ত্তী বংশধরদিগকে বহন করিতে হয়। যদি স্ত্রীপুরুষের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বৈষম্যগত প্রভেদ লইয়া এই বংশানুক্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের কোনও নিয়মানুসারী উপায় হয়, তবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে অনেক আশা করা যায়।

প্রথম পুস্তক।

অল্প বয়সেই জোলা গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। এইক্স কলেজে অধ্যয়নকালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম পুস্তক রচনা করেন। বোধ হয়, সেখানি "মধ্যযুগের ইতিহাস" (History of the Middle Ages) গ্রন্থ পাঠ করিবার পর ধর্ম্ম সংগ্রাম (the Crusades) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—কাজেই সেখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস "বোধ হয়"। কেন না, এখন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যদিও গ্রন্থকারের নিকট সেই গ্রন্থলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান, তথাপি তখন তাঁহার হস্তাক্ষর এতই কদর্য্য ছিল যে, এখন তিনি আর তাহার এক বর্ণও পাঠ করিতে সমর্থ নহেন। তিনি এত দিন পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কাগজখণ্ড যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছেন।

প্যারিসে আসিয়া যখন জোলা জীবিকার উপযোগী অর্থের জন্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সে সময়কার জীবন বড় যাতনা ও দুঃখময়। উপযুক্ত কার্য্যাভাবে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর যখন স্রোত ফিরিল, তখন তিনি এত কার্য্য পাইলেন যে, সে সকল এক জনের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই সহসা মনে হয়। তবে সুশৃঙ্খলানুসারে কার্য্য করিয়া জোলা এখন বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

কার্য্যের নিয়ম ও নিয়মপ্রিয়তা।

জোলা অভ্যস্ত নিয়মপ্রিয়; তিনি এক-নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। বহু দিন হইতে তিনি প্রতিদিন প্রভাতে নিয়মমত তিন হইতে চারি ঘণ্টা সাহিত্য-সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। তিনি প্রতিদিন দ্বিখণ্ডিত ফুল্‌স্‌কেপ্ কাগজের চারি হইতে ছয়খানি পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকেন। তিনি ধীরে ধীরে লেখেন, এবং চিন্তাপূর্ব্বক যত্নসহকারে প্রতি ছত্র লিখিয়া থাকেন। ইহাতে এই হয় যে, তাঁহার রচনায় আর সংশোধনের আবশ্যক হয় না। প্রতিদিন তিনি প্রায় ১৫০০ কথা লিখিয়া থাকেন; সুতরাং বর্ষশেষে তাঁহার রচনা বড় স্বল্পায়তন হয় না। যদি একটি ছত্র শেষ করিবার পূর্ব্বেও তাঁহার মনে হয় যে, যথেষ্ট কার্য্য করা হইয়াছে, তবে তিনি তখনই লিখিতে বিরত হয়েন। কিন্তু রচনার বিষয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, এবং পর-দিবস তিনি সেই অসম্পূর্ণ ছত্র পাঠ না করিয়াও তাহার ঠিক পর হইতে লিখিয়া যাইতে পারেন।

জোলা চিরদিন নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, এবং কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। তিনি মনে করেন, সাহিত্যচর্চ্চার জন্য নিয়মিত পরিশ্রম অত্যাবশ্যক; কাজেই পুস্তকরচনা করিতে হইলে নিয়মিত পরিশ্রম না করিলে হইবে না। তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন কার্য্য কখন ভাল হয় না—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

এক এক খানি পুস্তক রচনা করিতে যথেষ্ট শ্রম এবং সময় সময় যন্ত্রণা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে

হয়। পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিবার সময় সেখানি যে কি হইবে, তাহা স্থির হয় না; সারাংশ পূর্ব্বেই স্থির হয় না; কেবল বড় জোর একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া থাকেন। প্রথমেই তিনি পুস্তকের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া লয়েন। লিখিতে বসিলে তবে তাঁহার রচনাশক্তি আসে, তৎপূর্ব্বে নহে; অলস ভাবে বসিয়া তিনি ভাবিতে পারেন না। তাঁহার খসড়াগুলি যেন তিনি আপনাকে পত্র লেখেন—তাহাতে, ঘটনা, নরচরিত্র প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচিত হয়, সেগুলি প্রায় উপন্যাসের সমান হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর গল্পাংশ এবং চরিত্রতালিকা লিখিত হয়। তাহার পর, প্রত্যেক চরিত্র বিশেষরূপে আলোচিত হয়, এবং যে সকল স্থানের বা দ্রব্যের বর্ণনা করা আবশ্যক হইবে, সে সকল দৃষ্ট হয়। সেই সময় সে সকলের বিশেষত্ব খসড়া করিয়া তিনি লিখিয়া আনেন। "La Curee" রচনার সময় তিনি বর্ণিত যান সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং কয় জন প্রসিদ্ধ যাননির্ম্মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া আসিয়াছিলেন। "Renee"র উদ্ভিদগৃহ বর্ণনার সময় তিনি "Jardin des Plantes"এর উদ্ভিদগৃহ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ "La Dibacle" গ্রন্থ-রচনার সময় তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আর একখানি গ্রন্থরচনার জন্য তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ ধর্ম্মপুস্তক হইতে ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তখন ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ধর্ম্মযাজকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আসিতেন।

পুস্তকরচনা।

এখন তিনি একখানি উপন্যাসরচনায় ব্যাপৃত আছেন। ইহার পর জোলা কি করিবেন, তাহা তিনিও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। ইহার পর তাঁহার শিশুদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বহুকাল হইতে তাঁহার আর একটি ইচ্ছা আছে, তিনি ফরাসী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস রচনা করিবেন—সেখানি ঐ বিষয়ে প্রচলিত সকল পুস্তক হইতে বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চিত। কারণ জোলার প্রতিভা যে বিষয়ে নিয়োজিত হয়, সেই বিষয়কেই নূতনত্বময় করিয়া তোলে। বর্ত্তমান পুস্তক সমাপ্ত করিবার পর, হয় ত তিনি সেই ইতিহাস রচনা করিতে আরম্ভ করিবেন।

জোলার ভবিষ্যৎ গ্রন্থ।

সংবাদপত্রের জন্য রচনা।

এখন সভ্যজগতে কোনও মতামত প্রচারের এবং সাধারণ উন্নতিসাধনের উপায় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র একমাত্র উপায় না হইলেও মুখ্য উপায় বটে। বাগ্মীর উত্তেজক, গম্ভীর বা বাগ্-বৈদগ্ধপূর্ণ বক্তৃতা অনেক সময় সভাগৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে নিগড়বদ্ধ; এবং তাঁহার অসীমক্ষমতাশালী অগ্নিময় বাক্যস্রোত প্রায় সভাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়কন্দরে উপস্থিত হইয়া, সেইখানেই পর্য্যবসিত হয়; সেই কয়টি ক্ষুদ্রপ্রাণীর হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াই সে অনলরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। পুস্তকরচনাও একটি উপায় বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের মত পুস্তকের বহুল প্রচার নাই; সংবাদপত্র যত লোকে পাঠ করে, পুস্তক তত লোকে পড়ে না। সংবাদপত্র সাধারণের, পুস্তক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির। সেই জন্যই পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনা অপেক্ষা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত রচনা অধিক ফলোপধায়ী হইয়া থাকে। দেশের সাধারণ জনগণের উপর

সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের প্রভাব অপ্রতিহত, অসীম। কাজেই তাহাদিগের মতামতের জন্য সংবাদপত্রের লেখকগণ অনেক সময় দায়ী। তাঁহাদিগের সাময়িক অবিবেচনার ফলে, অনেক সময় অনেক লোক ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অকার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ উপদেশ লাভ করিয়া পরে তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হওয়া উচিত।

"ন্যাশান্যাল রিভিউ" পত্রে প্রসিদ্ধ লেখক মিষ্টার ফ্রেন্চলী ষ্টিফেন, গ্রন্থকারদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহার মধ্যে তিনি সংবাদপত্রলেখকদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে বিশেষ কিছু নূতন কথা না থাকিলেও, সেই উপদেশ সারগর্ভ ও সুন্দর। অস্মদ্দেশে এখন সংবাদপত্রের অভাব নাই। আমরা মিষ্টার ষ্টিফেনের উপদেশের সারভাগ এইখানে দিলাম।

উচ্চচিন্তা ও ভাব।

সংবাদপত্রলেখকদিগের মধ্যে যিনি উচ্চচিন্তাশীল ও মহৎভাবময়, এবং যিনি সময়ে বা অসময়ে প্রকৃত সহৃদয়তা ও দৃঢ়তার সহিত সেই সকল চিন্তা ও ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব শীঘ্রই অধিক হইয়া উঠে। মহৎ বিষয়ের চিন্তা করাই কর্ত্তব্য, এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে মহৎভাবময় করিতে পারিলে সাফল্য নিশ্চিত।

মৌলিক চিন্তা।

লেখক বলেন যে, নব্য লেখকদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম উপদেশ এই যে, তাঁহারা কোনও মৌলিক চিন্তায় নিরত থাকিবেন; পুরাতন চিন্তার প্রভু হওয়া অপেক্ষা মৌলিক মহৎ চিন্তার দাস হওয়াও ভাল। মৌলিক চিন্তায় ব্যাপৃত না থাকিলে, বচনার নিকট, সংবাদপত্রের নিকট, আত্মবিক্রয় করিতে হয়। তাহা অপেক্ষা হীন আর কি হইতে পারে।

সত্য।

এই সকল লেখকদিগের পক্ষে সত্য অত্যাবশ্যক। যদি কোনও লেখক সত্যসত্যই কোনও মহৎ সত্যের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং প্রকৃত অপরাধকে তাড়না করেন, তবে তাঁহার কার্য্য আত্মসম্মানোপযোগী হয়। লেখকের মনে থাকা উচিত যে, সত্য জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব নহে; সময় সময় তাহা কষ্টসাধ্যও হইতে পারে, কিন্তু কখনই অসম্ভব নহে।

কার্য্য ও কারণ।

লেখক বর্ত্তমান সকল ঘটনার ও প্রশ্নের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিবেন, সে সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং সে সকল রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহারও অনুশীলন করিবেন। তিনি উদারহৃদয় দার্শনিকের মত উচ্চ মতের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বর্ত্তমান ঘটনা ও প্রশ্ন সকল দর্শন করিবেন। কোনও সম্প্রদায় বা বিশেষ মতামতের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবেন না। তিনি বর্ত্তমান সময়ের সকল বিষয় সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; কারণ, ঐরূপ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। যদি লেখক এইরূপে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা করেন, তবে তিনি লোকের অনেক উপকারসাধনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, সাধারণের এবং লেখকদিগেরও অনেক উপকার হয়, কারণ লেখকদিগের দায়িত্ব গুরুতর, কর্ত্তব্যও সহজ নহে।

সমাজনীতি।

ইংরাজ ও ফরাসী।

বাবিধিব বিস্তৃত বিশাল বক্ষে জলবিম্বেব মত, ইংলণ্ড ও মহাভূখণ্ডেব প্রান্ত সীমায় সভ্যতাব সুন্দর আলোকে উজ্জ্বল, বিলাসতরঙ্গরঙ্গে প্লাবিত ফ্রান্স। যেন দুইটি বিপরীতগামী স্রোত। এক জন কর্ম্মকে জগতেব সার বলিয়া মনে করে, এক জন আরামকে জগতের সার বলিয়া মনে করে; এক জন ধনদেবতা কুবেরের উপাসক, এক জন সভ্যতা-সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করে। এমন বিষম বিরোধ বৈচিত্র্য সচরাচব দৃষ্ট হয় না। তাই বুঝি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেব মধ্যে বিদ্বেষভাব উভয় দেশেব মজ্জাগত রোগ। তাই বুঝি, শত-সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তনস্রোত আজ-পর্য্যন্ত উভয় দেশের হৃদয় হইতে সেই ইতিহাসপত্রবদ্ধ কালের প্রাচীন-ভাব মুছিয়া দিতে পারে নাই। যেখানে সবল সহৃদবতার অভাব, সেখানে প্রকৃত ভালবাসা জন্মিতে পারে না।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স।

"ফর্টনাইট্‌লি বিভিউ" পত্রিকায় মিষ্টাব ফ্রেডবিক হারেল, এই দুই দেশের আচার ব্যবহারাদির তুলনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

ফরাসীগণের চরিত্রে সর্ব্ববিষয়ানুভাবকতা এবং প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে দৃষ্টিব ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাই তাহাবা সামান্য দ্রব্য হইতে এত নূতন নূতন দ্রব্য আবিষ্কার কবিতে সমর্থ। ইংরাজগণের চরিত্রে দ্বিধাশূন্য হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাচ্ছীল্যভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রথমটি না থাকিলে লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লি প্রভৃতি কোথা হইতে জন্মিত? দ্বিতীয়টি না থাকিলে ইংরাজ ইচ্ছামাত্র প্রজাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আইন জারী করিতে পারিত না। উচ্চ ও নীচের মধ্যে ভদ্রব্যবহার ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে অধিক দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সে বর্ত্তমান সমাজনীতি অনুসারে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থাই ভাল।

প্রধান বৈষম্য।

ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে, বিশেষ প্যারিসে, সাধারণ লোকদিগের অবস্থা অনেক উন্নত। তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল, সুখ অধিক, এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান। তাহাদিগের পরিচ্ছদ ব্যবসার উপযোগী, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারা মিতব্যয়ী, এবং কখনও নিতান্ত ইতরের ন্যায় ব্যবহার করে না। তাহারা রমণীদিগের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান। রমণীগণও চিন্তাভারাকান্ত নহে, এবং তাহাদিগের শারীরিক বিকাশ ইংরাজরমণীর মত মানসিক উদ্বেগজনিত শ্রমে শীঘ্র থামিয়া যায় না। ইংরাজরমণীর ধর্ম্মভাব, ফরাসী রমণীর অপেক্ষা প্রবল হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজরমণীর তেমন মিতাচারিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি নাই।

সাধারণ জনগণ।

ফরাসীগণ দেশহিতৈষিতার বড় আদর করে। তাই বলিয়া দেশহিতৈষিতা যে সকল সময় তাহাদিগের সমগ্র হৃদয়-অধিকার করিতে সমর্থ, তাহা নহে। সেই জন্যই বিলাসের বঙ্গভূমি ফ্রান্সে মাঝে মাঝে এই মহৎ প্রবৃত্তি হইতে অত্যাচারাদি কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যবহারদোষে সুধাও গরল হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসায় বাণিজ্যগত দেশহিতৈষিতা অনেক সময় উপযুক্ত দ্রব্যের অনাদর করিতে শিক্ষা দেয়। ইংরাজের দেশহিতৈষিতায় ফরাসীর দেশহিতৈষিতার স্বপ্নাবেশ নাই, তাহা নিতান্ত হৈ-চৈ প্রবণ নহে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অটল সাহস

দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি।

ইংরাজচরিত্রের ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান। সেই জন্যই কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজের সাফল্যও এত অধিক। লেখকের মতে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বন্দোবস্ত ফরাসী শাসনপ্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট।

ফরাসী সংবাদপত্রের মত, বৈচিত্র্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংবাদপত্র আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সাহিত্যের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা ফরাসীপত্রে যেরূপ ভাবে আলোচিত হয়; সেরূপ আর কোথাও হয় না। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র অপেক্ষাকৃত শান্ত-প্রকৃতি, এবং ঠিক কাজের কথাটুকু লইয়াই ব্যস্ত, ফরাসী সংবাদ-পত্র রহস্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক।

সংবাদপত্র।

ইংরাজের নৈতিক মতানুসারে বিচার করিতে গেলে, ফ্রান্সবাসীদিগের নৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয়। এমন কি, সেখানে পুরুষদিগের নীতিজ্ঞান প্রায় নাই; কারণ, রমণীদিগের সহিত অনৈধ প্রণয় সেখানে ইংলণ্ডের মত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না। দুই শ্রেণীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়। অধিকাংশ ফ্রান্সরাসী ইংরাজের প্রিয় প্রেমখেলা (Flirting) অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া মনে করে। তাহারা মনে করে যে, কোনও পুরুষ তাহার কাহিনী কোনও রমণীর নিকট ব্যক্ত করিলে, রমণীর কর্ত্তব্য তাহাকে সান্ত্বনা দান করা। ইংলণ্ডে নীতিহীনতা বড় অসংযত হইয়া পড়ে, এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থায় তাহা একেবারে নিতান্ত নীচ, এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়।

নীতি।

ইংরাজগণ যদি বা নীতিজ্ঞানে প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহারা তাহাদিগের দুর্নীতিকে নীতিপরায়ণতার আবরণে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইংরাজেরা জাতীয় ভাবে পবিত্র বলিয়া খর্ব্ব করিতে চাহে। ইহা প্রথম দৃষ্টিতে হীন ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাতে বড় উপকার হয়; যাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না, লোকে সহসা তাহার অনুকরণ করে না। ইংলণ্ডের দুর্নীতি নীতির আবরণে আবৃত থাকায়, সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, তাই তাহার ব্যাপ্তিও অল্প।

নীতির ভণ্ডামি।

ইংলণ্ডে বিবাহিতা রমণীদিগের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবলতর, তাহাদিগের নৈতিকজ্ঞানও প্রবল। ব্রিটিশ রমণীর ধর্ম্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগেচ্ছার স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যায় না; তাহা পর্ব্বতের মত সে প্রবাহবেগ প্রতিহত করে। ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগলালসা ইংলণ্ডীয় রমণীর বিবাহের মূল নহে। অন্যান্য বিষয়ের মতামত এবং প্রেমই তাহার মূল।

রমণীদিগের নৈতিকজ্ঞান।

ইংলণ্ডের সমাজে, ধনী এবং দরিদ্র, এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ দুর্নীতিপরায়ণ হয়; কারণ, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দুই কারণে তাহাদিগের দুর্নীতি আবৃত রাখিতে সমর্থ। ধনী ধনবলে, দরিদ্র আপনার নগণ্যতায়। ইংলণ্ডের সামাজিক সোপানের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন সীমায় দুর্নীতি প্রবল।

দুর্নীতি।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্তে ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতায় ইংরাজ ফরাসী অপেক্ষা অগ্রসর, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্সের পদতলে উপবেশন করিয়া এখনও বহুকাল শিরঃশিক্ষা করিতে পারে।

জীবনচরিত।

লুই কসাথ।

মধ্য-শতাব্দীর মহান্ রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় যে সকল মহারথী কীর্ত্তিগৌরবে সমস্ত সভ্য জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, একে একে তাঁহারা সকলেই মরণের মহাগর্ভে অভিভূত

হইয়াছেন। হেমান্ত অমুদময় পশ্চিমগগনে অস্তগমনোন্মুখ তপনের মত একে একে সকলেই যশগৌরবময় জীবনের দিন ও সীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। সভ্য-

কসাথ।

দেশে যুবকের আদর্শ, প্রৌঢ়ের ভক্তিপাত্র, বৃদ্ধের শ্রদ্ধাভাজন সেই সকল কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ একে একে ধরণীর কার্য্যক্ষেত্র হইতে কার্য্যাবসানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাজিনী, গ্যারিবল্ডী, হুগো, কসাথ, একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত—এখন কেবল তাঁহাদিগের জীবনের সমাধিমন্দির তাঁহাদিগের বিপুল যশঃসৌরভে সৌরভময়। লুই কসাথ সেই সকল মহাপুরুষদিগের শেষ। এখন যাঁহারা প্রাচ্য জীবনের প্রান্ত সীমায় উপনীত, তাঁহারা সেই বিপ্লবের ভীষণ রাজনৈতিক আকাশের এই ভাস্কর প্রখর জ্যোতিষ্কের উদয়ের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; কারণ, সেই উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপর্য্যয়করী বাত্যা বহিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। হাঙ্গেরির, অন্ধকারময় রাজনৈতিক আকাশে কসাথের মত জ্যোতিষ্কের উদয় বড়-সাধারণ ঘটনা নহে। এখন শান্তির শুদ্ধতায়—অশান্তির ভেরীনিনাদ নিমগ্ন, এখন রাজনৈতিকের জীবন শান্তিসুখে পূর্ণ; পীড়ন ও অত্যাচারের ভয় নাই। এখন তাঁহার উপর বিদ্বেষ কেবল সাধারণ সভাস্থলে অগ্নিময় বক্তৃতাস্রোতে ও সংবাদপত্রে বাক্যলহরীস্ফীত প্রবন্ধেই শেষ হয়,—কঠোর কারাগার, নির্দ্দয় নির্ব্বাসন, তীক্ষ্ণ তরবারি, এই সকল জীবন্ত যাতনার ভয়ে এখন রাজনৈতিকের হৃদয় ভীত নহে। সে সময়কার রাজনৈতিককে যে কত ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইত তাহা বর্ত্তমান শান্তিময় সময়ের লোকেরা ভাবিতেও পারিবেন না। সেই সকল ভীষণ ভীতির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, মহাবলশালী এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, মানবজাতিকে এক এক উচ্চ আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, যাহা স্মরণ করিয়া মানবকুল চিরদিন ধন্য হইবে।—কসাথ তাঁহাদিগেরই অন্যতম।

জুন মাসের "সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন" পত্রে, মিষ্টার-ষ্টিল্‌ম্যান, লুই কসাথের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। কসাথের আমেরিকায় অবস্থানকালে যে সকল যুবক তাঁহার মুখে হাঙ্গেরির কথা শুনিয়া হাঙ্গেরির উদ্ধারসাধন এক মহান্ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিল, এবং সেই উত্তালতরঙ্গময় রাজনৈতিক বিপ্লব সমুদ্রে আপনাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান তাঁহাদিগের এক জন। তাঁহার এই বিবরণ সাধারণের পক্ষে কৌতূহলজনক হইতে পারে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, কসাথ হাঙ্গেরির স্বাধীনতার প্রচারক হইয়া মানবকুলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিবার অভিলাষে আপনার বাগ্মিতার সহায়তা লইয়া, নবসভ্যতাগৌরবের রঙ্গভূমি আমেরিকায় উপনীত হইলেন। দীর্ঘ-

আমেরিকায় কসাথ।

কালব্যাপী কারাবাসের সময় তিনি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে দুই-খানি মহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—বাইবেল ও সেক্সপীয়র এখন তিনি সেই অগ্নিময় প্রাচ্য চিন্তাস্রোত ইংরাজী ভাষার স্রোতে মিশাইয়া ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হাঙ্গেরির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম লোকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিল। সে সংগ্রাম যেন, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষিত ধর্ম্মসংগ্রাম। যে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিল, সেই মোহিত হইল, তাহারই হৃদয় যেন বিদ্যুৎস্পর্শে আলোড়িত হইল। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়ের প্রত্যেক অংশে আঘাত করিত। কেবল দাস প্রদেশে (Slaves states) তিনি কিছু হতাশ হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক স্থানের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন, কাজেই যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলে শ্রোতার হৃদয় আলোড়িত হইবে, সময়ে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারিতেন।

এই সময় মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান, কসাথের নির্ব্বাসনসঙ্গী, এবং ইংরাজী কার্য্যকারক পাল্‌জকীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাঙ্গেরির কার্য্যের জন্য আত্মসমর্পণ করেন। পাল্‌জকী কসাথের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন; এবং তিনি নিশীথের অন্ধকারে একাকী কসাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। অষ্ট্রিয়ার গুপ্তচরগণ কসাথের কার্য্যাবলি লক্ষ্য করিত, তাই এতই সতর্কতা।

ইহার অল্পদিন পরেই কসাথ আমেরিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গমন করেন। যুবক ষ্টিল্‌ম্যানও কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। যে সকল স্থানে দূতগণের গতায়াতের বড় সম্ভাবনা নাই, সেই সকলের একস্থানে যুবক বাসা লইলেন, এবং গভীর নিশীথে হাঙ্গেরির মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

লণ্ডনে কসাথ।

ভূমধ্যসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিবার সঙ্কল্প, এই সময় কসাথের মনে উদিত হয়, পরে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্থির ছিল, একই সময়ে ম্যাজিনীর নেতৃত্বাধীনে মিলানবাসীগণ, এবং কসাথের নেতৃত্বাধীনে হাঙ্গেরিবাসীগণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে। কসাথ স্থির করেন যে, যুবককে তিনি হাঙ্গেরিতে পাঠাইবেন; তিনি সেখানে সৈন্যদিগকে তাঁহার নাম করিয়া বলিবেন যে, মিলানবাসীগণ বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রাঘাত করা না হয়; কারণ স্বদেশীয়ের রক্তস্রোতে ক্রীড়া করা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। কোনও কারণবশতঃ ঐ কার্য্যভার অন্যের প্রতি অর্পিত হয়। ম্যাজিনী আর অপেক্ষা করিলেন না, একাকী অগ্রসর হইলেন। কসথ বুঝিলেন, তাঁহার আপনার চেষ্টা বৃথা হইবে।

কসাথের তুরস্কে পলায়নের পূর্ব্বে, তিনি হাঙ্গেরির রাজমুকুটাদি ড্যানিউব নদীর তীরে এক স্থানে প্রোথিত করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্ধারের জন্য যুবক ষ্টিল্‌ম্যান হাঙ্গেরি যাত্রা করিলেন। গুপ্তচরদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য তিনি প্যারিস, বার্লিন, ড্রেসডেন প্রভৃতি ঘুরিয়া ভিয়েনায় গমন করেন। কসাথ তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ার জনগণের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন।

হাঙ্গেরি যাত্রা।

কাজেই এখন সাঙ্কেতিক পত্রের আবশ্যক হইল। যাহাতে বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর আছে সেইরূপ একটি গান স্থির করা হইল। কোনও অক্ষর লিখিবার আবশ্যক হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে একটি ভগ্নাংশ ব্যবহৃত হইত। ঐ অক্ষরটি যে ছত্রে থাকিত, সেই ছত্রের সংখ্যা ভগ্নাংশের "লব" (numierator) এবং সেই অক্ষরটি যে কয়েকটি অক্ষরের পরে থাকিত, সেই সংখ্যাটি ভগ্নাংশের "হর" (Denominator) রূপে ব্যবহৃত হইত। ষ্টিল্‌ম্যানের সহিত পত্রব্যবহারে সচরাচর এই জটিল প্রণালী ব্যবহৃত হইত না। সনআয়তন বিশিষ্ট দুইখানি কাগজ উভয়ের নিকট ছিল; দুই খানির ঠিক একস্থানে ছিদ্র করা ছিল। কাগজের উপর সেইখানি রাখিয়া ছিদ্রে ছিদ্রে পত্রলেখা হইত; পরে মধ্যেস্থিত অলিখিত অংশ অন্য কথা দিয়া পুরাইয়া দেওয়া হইত। পত্র পাইয়া পাঠক তাঁহার নিকটস্থিত কাগজখানি ঐ কাগজের উপর স্থাপন করিয়া ছিদ্র অংশে পত্র পাঠ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না।

সাঙ্কেতিক পত্র।

ষ্টিল্‌ম্যান যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কসাথ তাঁহাকে একজন বিদ্রোহীদলভুক্ত দেশহিতৈষির বিবরণ বলিয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাকে ধৃত করে। যদি যন্ত্রণার ভয়ে তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। কারাগারে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গাত্রে শয্যা জড়াইয়া তিনি তাহাতে অগ্নিসংযোগ করেন, এবং যখন জীবনের আর কোনও আশা রহিল না,

আর একজন।

তখন কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারিবে না। ষ্টিল্‌ম্যান বুঝিলেন, তাঁহারও ঐরূপ সাহসের প্রয়োজন। ভিয়েনায় আসিয়াই, তিনি যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তবে তিনি তাঁহার পরিবারপরস্থ পাঁচ জন মহিলার নিকট তাঁহার পরিচয় দেওয়াতে যুবক ভীত হইয়াছিলেন।

পেষ্ট।

ভিয়েনা হইতে ষ্টিল্‌ম্যান পেষ্টে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কারণ পুলিস সন্দেহ করিয়া তাঁহার সন্ধান করিতেছিল—কাজেই তাঁহার তখন অজ্ঞাতবাস। ষ্টিল্‌ম্যান এখানে কাজে কাজেই হতাশ হইলেন। এই সময় পুলিস সন্দেহ করিয়া তাঁহার কার্য্য এবং উদ্দেশ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিল।

এইখানে একবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। লণ্ডন হইতে আসিবার সময় তিনি জুতার গোড়ালীর ভিতর ছিদ্র করিয়া, তাঁহার মধ্যে সাঙ্কেতিক পত্রাদি পটাপার্চা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়া, ছিদ্রমুখ আবার চামড়া দিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। ব্যবহারে ব্যবহারে সেই চামড়া ক্ষয় হইয়া গেল, কাজেই ছুরি দিয়া চামড়া খুলিয়া তিনি সেই প্যাকেট বাহির করিয়া লইলেন, কিন্তু জুতার কি করিবেন? ঐরূপ ছিদ্রযুক্ত জুতা দেখিলেই হোটেলের লোকেরা সন্দেহ করিবে। কাজেই অন্ধকারময় রজনীতে তিনি জুতা লইয়া ডানিউব তীরে উপনীত হইলেন। জুতা জোড়াটি সেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তখন সহরে নিয়ম ছিল যে, রাত্রি আটটার পর কেহ পুলিসের অনুমতি ভিন্ন রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। ষ্টিল্‌ম্যান তাহা জানিতেন না; প্রহরী দেখিতে পাইল। তিনি ছুটিয়া আলোকস্তম্ভের নিম্নে আসিলেন। এরূপ করিবার দুই উদ্দেশ্য ছিল; আলোকের নিকট দূর হইতে গুলি করা সহজ নহে, এবং আলোকে বিদেশীয় দেখিলে প্রহরী ছাড়িয়া দিতেও পারে। তাহাই হইল। গৃহে আসিয়া প্যাকেটে পিচ মাখাইয়া, তাহা দীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রত্যাগমন।

বৃথা বসিয়া থাকিলে লোকে সন্দেহ করিবে ভাবিয়া, তিনি অসুস্থতার ভান করিয়া, কসাথের সেনাদলের চিকিৎসককে সংবাদ দিলেন। কয় দিবস পরে চিকিৎসকের নিকট সকল ব্যক্ত করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিবেন না, এবং তিনি সংবাদ অবগত আছেন জানিলে তাঁহার শাস্তি হইবে। ভয়ে ষ্টিল্‌ম্যান যথাসম্ভব শীঘ্র পেষ্ট ত্যাগ করিলেন। লণ্ডনে আসিলে কসাথ সকল শুনিলেন। কেবল একবার বলিলেন, "তিন মাস বৃথা নষ্ট হইল!" তাহার পর আবার সরলভাবে আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। প্রাথেয় লইয়া তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুকুটাদির বিষয়ে কসাথের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। তিনি ঐ সকল আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন জানিয়া, তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু জিমিযার গভর্মেণ্টকে ঐ সকলের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ঐ সকল রত্নাদির কথা জানিতেন।

আর একবার।

চল্লিশ বৎসর পরে, গত গ্রীষ্মকালে মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান টুরিনে আবার কসাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন কসাথ বার্দ্ধক্যভারাবনত, তাঁহারও জীবনের অপরাহ্ণ উপস্থিত। ষ্টিল্‌ম্যান তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন যে, তিনিই মুকুটাদি আনয়ন করিবার জন্য হাঙ্গেরিতে গিয়াছিলেন। কসাথ বলিলেন যে, তিনি সে সম্বন্ধে ত কিছুই জানেন না, সে সকল জিমিযার জানিতেন। এই বয়সে অনেক কথা বিস্মৃত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। যখন ষ্টিল্‌ম্যান তাঁহার নিকট পূর্ব্ব কাহিনী ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে, কতক কতক ঘটনা মিলিতেছে বটে, কিন্তু সকল তাঁহার

স্মরণ নাই। কথার যাথার্থ্য প্রমাণার্থ তিনি তাঁহার নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রাদি প্রেরণ করেন, কিন্তু সেগুলি আর প্রাপ্ত হয়েন নাই।

কসাথ ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃভূমি হাঙ্গেরিতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন, তবে কেবল অষ্ট্রিয়ার রাজাকে হাঙ্গেরির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না বলিয়া, এবং মনোদুঃখে হাঙ্গেরিতে কখনও প্রতিগমন করেন নাই। পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ ক্ষীণজ্যোতিঃ সূর্য্যের মত, রাজনৈতিক আকাশে বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্ষীণপ্রভ কসথ কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন—জগতে রহিল কেবল তাঁহার অমর কীর্ত্তি।

নির্ব্বাসন।

বাঘের নখ।

১

সরলা! নামটি তোমার কেমন লাগে? প্রথম যৌবনে যখন আমার বাসনা কামনা সেই প্রথম মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই নাম শুনিলে আমি মুগ্ধ, চকিত হইতাম। হায় সেই প্রথম যৌবন!

সরলাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাহার বয়স আট বৎসর। আমার পিতা বসন্তপুরে কর্ম্ম করিতেন, সরলার পিতাও তথায় বদলী হইয়া আসিলেন। তিনি সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আসিয়াছিলেন।

বিদেশে শীঘ্র মিত্রতা হয়। চিরপরিচিতদের মুখ দেখিতে না পাইয়া মানুষ হাঁপাইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিচয়লাভে ব্যগ্র হয়। প্রবাসে, যেখানে স্বদেশী জনমানবের গতিবিধি বড় বিরল, সেখানে উৎসুক হৃদয় সহজেই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উভয় পরিবারে প্রথমে আলাপ, পরে মিত্রতা জন্মিল। বন্ধুত্ব শেষে আত্মীয়তায় পরিণত হইল।

সরলাদের বাড়ী একটু দূরে, কিন্তু রোজ আমরা একত্র খেলা করিতাম। আমি প্রতিদিন সরলাদের বাড়ী খেলা করিতে যাইতাম; সরলা আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত,—দূর হইতে আমায় আসিতে দেখিলে তাহার সুন্দর শ্রী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত।

২

চারি বৎসর এই প্রকারে কাটিল। সরলা ভিন্ন আমার অন্য সুখ ছিল না, আমি তখন সতের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। এই সময়ে আমি সহসা এক দিন নিজের মন দেখিতে পাইলাম।

বাবা দারাগঞ্জে বদলী হইয়াছিলেন। আমরা বসন্তপুর হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার এই প্রথম দুঃখ, অথবা দুঃখের প্রারম্ভ। সে কষ্ট বলিবার নয়। সরলার অশ্রুজলসিক্ত রোদনলোহিত, আকর্ণবিশ্রান্ত, বিরহকাতর নয়ন দুটি এখনও আমার মনে আছে। সেই শিশির-মাখা যুগল কমল কি জীবনে ভুলিতে পারিব?

৩

দারাগঞ্জে পঁহুছিয়া যেন সব শূন্য বোধ হইল। খেলিবার অনেক সঙ্গী ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত খেলিতাম না। আর কিছু আমার ভাল লাগিত না। দারাগঞ্জে আমার একমাত্র সুখ ছিল,—সরলার চিঠি। বসন্তপুরে আমি ভাল ছেলে ছিলাম; দারাগঞ্জে আসিয়া আমার কি হইল বলিতে পারি না। সেবার স্কুলের পরীক্ষায় আমি পাস হইতে পারিলাম না। বাবা বড় দুঃখিত হইলেন,—আমায় কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইলেন।

৪

মেসে থাকি, স্কুলে পড়ি, আর বিস্ময়বিহ্বল হইয়া কোলাহলপূর্ণ কলিকাতার রাজপথের জনতার দিকে চাহিয়া দেখি।

এক বৎসর বাসায় কাটিয়া গেল। পূজার সময় দারাগঞ্জে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে বাবার বাসায় পঁহুছিলাম। একবারে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিলাম, "মা!"

কে বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "উপেন দা!"

আমি চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সরলা! মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আমার সরলা।

সরলার এমন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। কি উজ্জ্বল মধুর মিষ্ট শ্রী! প্রথম বর্ষার তটিনীর যে আবেগ, নববসন্তাগমে ব্রততীর যে হরিত শোভা, প্রথম বিকাশকালে কোরকের যে উদ্ভিন্ন সৌন্দর্য্য,—সরলার ঈষদুদ্ভিন্নযৌবন কমনীয় দেহে সেই সৌন্দর্য্যরাশি মৃদু মৃদু তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত, স্বপ্নাবিষ্টের মত সরলাকে দেখিতে লাগিলাম।

মার আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল; অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করিলাম। শুনিলাম, সরলার বাবা দেশে গিয়াছেন; সরলার মাকে ও সরলাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, ফিরিবার সময় বসন্তপুরে লইয়া যাইবেন।

৫

সরলার বিবাহের কথা হইতেছিল। সরলার বাপ কুলীন, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। সরলার মা বলিলেন, "কুলীনের মুখে ছাই, ভাল বর ভাল ঘর না পাইলে আমি মেয়ের বিয়ে দিব না। আমার সোনার প্রতিমা রাজমন্দিরে না দিয়া কুলীনের কুঁড়ে ঘরে পাঠাইব কেন?"

আমার হৃদয়ে সহসা আগ্রহ বড় প্রবল হইল। সরলা আমার হয় না? লজ্জায় মুখ ফুটিল না; কিন্তু আশাও ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

সরলার বাবা দারাগঞ্জে আসিলেন। সরলাদের লইয়া বসন্তপুরে চলিয়া গেলেন। আমার হৃদয় অন্ধকার হইল। যাইবার সময় হরিহর বাবু বলিয়া গেলেন,—"উপেন! কলিকাতায় গিয়া একটা ছোট বাড়ী দেখো। আমি এক বৎসরের ছুটী লইতেছি, কলিকাতায় থাকিব, স্থির করিয়াছি।" তথাস্তু!

৬

কলিকাতায় আসিয়া মহা উৎসাহে বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। একটা বাড়ী ঠিক করিলাম। হরিহর বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। আমি ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের লইয়া আসিলাম।

হরিহর বাবু বাবাকে চিঠি লিখিলেন,—"যে ক'দিন আমি কলিকাতায় আছি, উপেন আমার কাছে থাক।" বাবা আমাকে হরিহর বাবুর বাসায় গিয়া থাকিতে লিখিলেন। আমি প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিলাম, শেষে হরিহর বাবুর আগ্রহে সম্মতপ্রায় হইলাম। তার পর সরলা যখন সস্মিতমুখে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিল, "উপেন দা'! বড় হয়ে এখন আমাদের পর ভাব", তখন রাজী হইয়া বাসায় ফিরিলাম। পর দিন প্রভাতে বাসা ছাড়িয়া হরিহর বাবুর বাড়ীতে আসিলাম।

৭

এই বৎসর আমি এল্-এ দিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। হরিহর বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, আমায় শতমুখে উৎসাহিত করিলেন।

বাবা ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সরলার সম্বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যহ ঘটকেরা যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাকে ধরিয়া বসিল, "ছেলের বিয়ে দাও।" বাবা বলিলেন, "পড়া শুনা শেষ করিয়া বিবাহ করিবে।" মা শুনিবার পাত্র নন, জেদ করিতে লাগিলেন। আশায় ভরে আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। সরলা!—সে আশা কি আছে?

মা ও বাবার দারাগঞ্জে ফিরিবার দিন স্থির হইল। যাত্রার পূর্ব্ব দিন মা বলিলেন, "বাবা, বিয়ে কর।" আমি একবারে বলিয়া ফেলিলাম, "সরলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ত করিব।"

শুনিয়া মার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। কেন?

৮

রাত্রি।—শুইতে যাইতেছি, বাবা ডাকিয়া বলিলেন, "উপেন! আমার সঙ্গে চল। সব গুছাইয়া রাখিয়া শুইতে যাও, ভোরে আমরা যাত্রা করিব।"

আমার ত সঙ্গে যাইবার কথা ছিল না। সহসা এ বন্দোবস্ত কেন?

আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। কখনও বাপ মার অবাধ্য হই নাই, কলিকাতায় থাকিবারও আপাততঃ বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। একটা ট্রঙ্কে খান কত বহি ও কাপড় পুরিয়া ঠিক হইয়া রহিলাম।

ভোরে আমরা কলিকাতা ছাড়িব। প্রস্তুত হইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

সরলা আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সরলার মাকে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখী হও!" আমি মনে-মনে বলিলাম, আমার সুখ তোমাদের হাতে।

বাহিরে আসিবার পথে একটা ঘরের দ্বারে সরলা দাঁড়াইয়াছিল। সরলা ডাকিল, "একটা কথা শুনে যাও।" আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "কি সরলা?"

অসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম, সরলার কাছে সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। সরলা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "উপেন দা'! বিয়ে কত্তে যাচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "কে বলিল?"

সরলা বলিল, "তুমি জান না?—কাল রাত্রে মা ও সইমা তোমার বিয়ের কথাই বলিতেছিলেন।"

আমি একটু বিচলিত হইলাম। কেমন একটু সাহস হইল, ইচ্ছা হইল,—দমন করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "সরলা! যদি তোমাকে পাই, বিবাহ করিব। নহিলে এ জীবনে নয়।"

সরলা কথা কহিল না। সরিয়া আসিয়া আমার বুকের চেনটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সরলা বলিল, "তোমার চেনে ওটা কি? বাঘের নখ?"

—আমি বলিলাম, "কেন সরলা?" সরলা আমার মুখে দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিল, "বাঘের নখটা আমায় দাও; দেবে?"

তুচ্ছ বাঘের নখ, সরলাকে অদেয় আমার কি ছিল? তখনই চেন হইতে খুলিয়া, সোনা দিয়া বাঁধান বাঘের নখটি সরলার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসিলাম, "কি হবে সরলা?"

সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যত দিন বাঁচিব, আমার কাছে রাখিব।"

জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, কেন? এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন, সরলার নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

সমস্ত পথটা অস্থির হৃদয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া অতিক্রম করিলাম। সরলা স্মরণচিহ্ন চাহিয়া লইল কেন? সরলাকে কি পাইব না? কে বলিল, আমার বিবাহ? বিবাহ কথাটি মনে হইবামাত্র প্রতিজ্ঞা করিলাম, সরলাকে না পাইলে বিবাহ করিব না। যদি বাবা জোর করেন? তবুও না; কখনও না।

৯

দারাগঞ্জে বড় কষ্ট হইতেছিল।

চারি দিকে স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ, ঘনপত্র তরুশাখায় পাটল নব কিসলয়, হরিত ক্ষেত্রে সোনার ধান, দূর প্রান্তরে কাশকুলের শ্বেত চামরশোভা,—স্নিগ্ধ, সুন্দর। কিন্তু শান্তি কোথায়?

দারাগঞ্জে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক দিন বসিয়া কি পড়িতেছি, এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন। আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, "পড়।" হরিহর বাবুর হস্তাক্ষর; তিনি বাবাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমার পড়িবার দরকার? বাবার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি আবার বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।" হরিহর বাবু লিখিতেছেন,

"নমস্কারা নিবেদনঞ্চ,

"তুমি সরলার সহিত উপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব আবার করিয়াছ। কলিকাতায় যখন তুমি এ প্রস্তাব কর, আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। উপেন্দ্রনাথের মত জামাতা লোকের প্রার্থনার বস্তু। কিন্তু কি করিব বল, গৃহিণী তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহেন। তাঁহার কন্যাকে তিনি রাজরাণী না করিয়া ছাড়িবেন না।

"সম্প্রতি এক বিপদে পড়িয়াছি। জালালপুরের স্বর্গীয় জমীদার ৺ রামরতন

চৌধুরীর পুত্র শরৎকুমার চৌধুরী, পড়াশুনা উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। গৃহিণী ও সরলা এক দিন বিকালে উমাচরণ বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাড়ী হইতে গাড়ীতে উঠেন, সেই সময়ে শরৎকুমার বেড়াইতে যাইতেছিলেন। সরলাকে দেখিয়া তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছে,—সেই দিনই শরতের দেওয়ানজী আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। পাত্র ঐশ্বর্য্যশালী বটে, কিন্তু কুলীন নহেন। গৃহিণীর ধনুর্ভঙ্গ পণ, শরতের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমি কি বৃদ্ধ বয়সে অর্থলোভে কৌলীন্যরত্নে বিসর্জ্জন দিব? আর এ বিবাহে তুমিই বা কি মনে করিবে? যাহা হউক, এ বিষয়ে তুমি আমাকে সুপরামর্শ দিয়া উপকৃত করিবে। এখানকার সকল মঙ্গল। ও বাটীর মঙ্গলাদি লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি তাং ২৪ শে কার্ত্তিক ১২—সাল।

"গুণমুগ্ধস্য

"শ্রীহরিহর শর্ম্মণঃ।"

আমি পত্র পড়িয়া বাবার হাতে দিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

আমি আর কি বলিব? বাবা বলিতে লাগিলেন, "চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কিন্তু দেখিতেছি,—সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ অসম্ভব। হরিহর পত্রে যাহাই লিখুন, জমীদার শরৎকে ছাড়িয়া আমার ঘরে কন্যা দান করিবেন না। এ দিকে তোমার গর্ভধারিণী বলিতেছিলেন, সরলা ভিন্ন আর কাহাকেও তুমি বিবাহ করিবে না, বলিয়াছ। সরলা ভিন্ন দেশে কি আর পাত্রী নাই?"

আমি অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলাম। উপেক্ষার শেলটা বড় জোরে বুকে বিঁধিয়াছিল। মনে-মনে ভাবিতেছিলাম, টাকাই কি বড়! বাবা আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন,—"কি বল?"

নিরাশেরও সুখ আছে। সে সুখ গর্ব্ব। বলিলাম, "সংসারে টাকাই বড়। আমি টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

বাবা বলিলেন, "বেশ কথা!"

১০

সংবাদ পাইলাম, শরতের সঙ্গে সরলার বিবাহ হইয়া গেল। তখন মনে হইতে লাগিল, সরলা এ বিবাহে সুখী হইবে ত? নিশ্চয়। নহিলে সে ত এক-বার ঘুণাক্ষরেও মনের ভাব জানাইতে পারিত, তাহার অসম্মতি হইলে কিন্তু আর হরিহর বাবু এ বিবাহে সম্মত হইতেন না। মেয়ের জন্যই ত সব? যাক্, আমার এ চিন্তা কেন?

মধ্যাহ্নে আহার করিতেছি, মা সম্মুখে বসিয়া। মা বলিলেন, "তুই এবার বিয়ে কর; সবলার ত বিয়ে হয়ে গেল। আমিও এবার ঘরে বউ আনি।"

বাবার কাছে চোখের জল ফেলি নাই, কিন্তু মার কাছে চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। যে স্নেহে তন্ময়তা আছে, সেখানে বুঝি লুকোচুরী চলে না। আমি তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "বলিয়াছি ত মা; টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

আমি রুড়কীর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে পড়িতে গেলাম।

১১

অনেক দিন, প্রায় দশ বৎসর হইল, কলেজ ছাড়িয়াছি, ইঞ্জিনীয়ার হইয়া গভর্মেণ্টের চাকরী করিতেছি। টাকা করিতেছি বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইতেছি না।

দুঃখের উপর দুঃখ। যে অমৃতপ্রস্রবণের ধারায় এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, সে প্রস্রবণও শুকাইয়া গেল। স্নেহের প্রতিমা মা আমার দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাবা মাঝে মাঝে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু আর কেন?—আমি উত্তরে লিখি,—"এখনও টাকা করিতে পারিলাম কৈ?"

১২

ঘন ঘোর বর্ষা। মেঘের অম্বরে মেঘের মালা,—অজস্র ধারায় ধরা প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। শীতল উগ্র পবনে কদম্বকেশরমিশ্র সৌরভ বহিয়া আনিতেছে। বৃষ্টিস্নাত তরুলতা উজ্জ্বল, হরিত; দূরে বনমধ্যে কেতকী ফুটিয়া বেণু ও গন্ধ ছড়াইতেছে।

আমি একটা বাঁধের তদারকে আসিয়াছিলাম। ডাকবাঙ্গলার বারাণ্ডায় বসিয়া দূরে প্রান্তরে বন্যার জল দেখিতেছিলাম। আকাশ অন্ধকার, প্রকৃতি মলিন, বায়ুর প্রবাহ শীতল, উগ্র,—যেন প্রকৃতির মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস।

বন্যার শান্ত, মলিন জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া, বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন একখানা দৈনিক কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। নোট, প্যারা, তার, কিছুই ভাল লাগিল না। বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলাম,

"হাজার টাকা পুরস্কার!

"জালালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি কলিকাতা হইতে জালালপুরে আসিবার পথে, একটি সোনা বাঁধান

"বাঘের নখ" হারাইয়াছেন। যে কেহ ঐ বাঘের নখটি আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বাঘের নখটির মূল্য ১০৲।১৫৲ টাকার অধিক হইবে না,—যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তিনি ফিরাইয়া দিলে উল্লিখিত টাকা পুরস্কার পাইবেন। বাঘের নখের উপরে সোনার পাতে, U.L.M. এই তিনটি ইংরাজী হরফ খোদা আছে।

শ্রীরামেশ্বর রায়।
দেওয়ান, জালালপুর।"

আমার নাম উপেন্দ্রলাল মজুমদার, বাঘনখ-চারমের উপর অক্ষর তিনটা খোদাইয়া ছিলাম বটে। কি জানি কেন, এক ফোঁটা চোখের জল কাগজের উপর পড়িল।

* * * *

সেই সময়ে সব্ ওভার্সীয়ারটা সেই দিকে আসিয়াছিল,—সে আমার চোখে জল দেখিতে পায় নাই ত?

প্রমথ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—আষাঢ়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদিত "ভারতবর্ষে—বারাণসী" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রতীচ্য গণিত" একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" তৃতীয় প্রস্তাব, এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "বিহারীলাল" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত, স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিত্ব-সমালোচনা। এই প্রবন্ধটি এবারকার সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এতদ্ভিন্ন এবারকার সাধনায় "সাময়িক সারসংগ্রহ" ও "কৃতজ্ঞতার" কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতী।—আষাঢ়। "প্রলয়" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "ষ্টীমারে" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দের একটি বিলাতভ্রমণের উপক্রমণিকা। প্রবন্ধটি কৌতূহলজনক। "পাণ্ডুকেশ্বর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত। "কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের রচনা। লেখকের ভাষার বাঁধুনি নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্তের "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে, দুই একটি ঘটনা সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" একটি চলনসই রচনা। "যোগী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি দুর্বোধ, অদ্ভুত, অতএব আমাদের মতে অপাঠ্য কবিতা। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "রামমোহন রায়" একটি সুপাঠ্য জীবনসমালোচনা। "হর পার্ব্বতী" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর যুগল কবিতা,—হর ও পার্ব্বতী, এই দুই ভাগে দুইটি কবিতায় সমাপ্ত। কবিতা দুটি সুন্দর ও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক।

তত্ত্ববোধিনী।—আষাঢ়। "বাহিয়ানের ভারতভ্রমণ" শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর রচনা। বহুদিন পূর্ব্বে, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় "ভারতীতে" ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তদপেক্ষা নূতন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত কিছু দেখিতে

পাইলাম না। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাসের আইন আকবরী অবলম্বন করিয়া লিখিত "জৈন, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী" ইতিহাসের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি মৌলিক না হইলেও মন্দ নহে।

সুহৃদ্।—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। এই মাসিক পত্রখানি 'ইডেন্ হিন্দু হষ্টেল' হইতে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক লিখিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সুহৃদের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আশা করি, সুহৃদের উদ্যোগীগণ সফলতা লাভ করিবেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বঙ্কিম বাবুর ছবি খানি ভাল হয় নাই। "আমি কি হত্যাকারী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। "সৌরজগৎ—সূর্য্য" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে।

জ্যোতিঃ।—আষাঢ়। "প্রাচীন আর্য্যসমাজে বর্ষা ঋতু" একটি উল্লেখযোগ্য, গবেষণাপূর্ণ, সুপাঠ্য প্রবন্ধ। লেখক বলেন, প্রাচীন ভারতেও গোবধ হইত, তবে এখন গোবধের নামে শিহরিয়া উঠিবার কারণ কি? আমি লেখকের মতের প্রতিবাদ বা সমর্থন করিতেছি না;—আমার অনুরোধ, সকলে একবার প্রবন্ধটি পড়িয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিবেন। শ্রীযুক্ত ধনিলচন্দ্র সাধু খাঁর "বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য" একটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর প্রবন্ধ।

সাধনী।—জুন। "স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর বচনা। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। "কালীকৃষ্ণ মিত্র" প্রবন্ধটি এক বার "ধর্ম্মবন্ধুতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবন উপদেশপূর্ণ বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার" সাধনীতে প্রকাশ করা ভাল হয় নাই।

পূর্ণিমা।—আষাঢ়। এ মাসের পূর্ণিমাতে একটিও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দেখিলাম না। শেষ পৃষ্ঠায় হিমাচল প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, "লজ্জাকর ভাবে অনভিজ্ঞ।" একে এই বিলাতী বাঙ্গলা, তদুপরি "লজ্জাকর"! গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।

সমীরণ।—৯ম ও ১০ম সংখ্যা।—"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" উল্লেখযোগ্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সুন্দর প্রবন্ধ। "অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। "দ্রাদামভাশয়ের স্বর্গলাভে" ভাষার বৈচিত্র্য ও বাহার আছে, আশা করি, লেখক উত্তম আখ্যানবস্তু লইয়া ভাষার সদ্ব্যবহার করিবেন।

ভিষক্-দর্পণ।—জুলাই। "বঙ্গভাষায় চিকিৎসাতত্ত্ববিষয়ক মাসিকপত্র।" এই মাসিক খানি চিকিৎসকগণের উপযোগী। "বিবিধ তত্ত্বে" সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলে মন্দ হয় না। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী দাসের "শারীরিক শ্রম" প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের উপযোগী ও উপকারী হইয়াছে।

সখা ও সাথী।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মৃত সখার ভূত ঘাড়ে করিয়া সাথী এতকাল পরে দেখা দিয়াছেন। সখা ও সাথীর মিলনে দ্বিগুণিত উৎকর্ষের আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যা দেখিয়া, "সখার" জন্য আমাদের চোখে জল আসিয়াছিল। সখাকে এতদিন পরে নামশেষ হইতে দেখিয়া, বাস্তবিক আমরা ব্যথিত হইয়াছি। আজ সেই স্বর্গীয় সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণকেও মনে পড়িতেছে। শুনিয়াছিলাম, প্রমদাচরণ বাবু নিজের জীবন বিমা করিয়াছিলেন, এবং সেই অর্থ "সখার" জন্য দান করিয়া যান। এ কথা সত্য কি? তাহা হইলে সহসা "সখার" অকালমৃত্যু হইল কেন? বাঙ্গলায় শিশুপাঠ্য কাগজ আর রহিল না, সুতরাং এই খানির উপর সকলের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। কাগজ খানি অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত সুসম্পাদিত না হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে।

ডাক্তার শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষাল এম্‌ডি.ও সার্জ্জনের

ভিক্টোরিয়া অয়েল।

ইহাতে সকল প্রকার পুরাতন ও নূতন বাত, গেঁটেবাত, ফুলাবাত, হাত পা কামড়ানি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, কটি, জানু, প্রভৃতির বেদনা সত্বর ও নিশ্চিত আরোগ্য হয়। ফিক্‌বেদনা, পতনজনিত বেদনা ও অন্যান্য বেদনা একদিনে দূরীভূত হয়। মূল্য ১৲ টাকা শিশি।

স্থানাভাবে কেবলমাত্র কয়েকখানি প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরামপুরের সিভিল মেডিকাল অফিসার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয় বলেন,—"মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "ভিক্টোরিয়া অয়েল" এত উপকারী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশীয় পেটেণ্ট মেডিসিনে আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু ইহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। কি পুরাতন, কি নূতন সকল বাতই এই তৈলে আরোগ্য হয়। ইতি ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ সাল।"

বঙ্গের অদ্বিতীয় লেখক পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহোদয় বলেন,—"ভিক্টোরিয়া অয়েল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যথা ও সকল প্রকার বেদনার পক্ষে বিশেষ উপকারী। বলা বাহুল্য যে একদিবসের ব্যবহারে যন্ত্রণা অনেক উপশম হয়।" ইতি ২৩-৭-৮৯।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালের হাউস সার্জ্জন মাননীয় শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ হালদার মহোদয় বলেন,—"মহাশয়! আপনার প্রেরিত "ভিক্টোরিয়া অয়েল" বাতরোগাক্রান্ত কতকগুলি রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম। অন্যান্য তৈলে এরূপ আশু ফল দৃষ্ট হয় নাই।" ইতি ১২-৩-৮৭।

একমাত্র বিক্রেতা—শ্রীবটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সমস্ত ঔষধবিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য। কতকগুলি লোক ইহা নকল করিতেছে, এজন্য "লক্ষ্মী-মূর্ত্তি" দেখিয়া লইবেন, নচেৎ ঠকিবেন।

বাণ্মাসিক পুরস্কার।

নগদ একশত টাকা।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ৪০৲
দ্বিতীয় স্থানীয় গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ২০৲
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ২৫৲
দ্বিতীয় স্থানীয় কবিতার জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ১৫৲

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত বোধ করিলে, আমরা পাঁচ টাকা বা ততোধিক মূল্যের আরও কতিপয় পুরস্কার দিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলি—

কি গল্প, কি কবিতা, উভয়েতেই কুন্তলীনের উল্লেখ থাকা চাই। গল্পটি সুপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হইবে—প্রত্যক্ষভাবে কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনরূপের হইলে চলিবে না। অথচ তাহাতে কুন্তলীনের কথা থাকিবে। কবিতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

রচনা আগামী শ্রাবণ মাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংবাদপত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকলেখিকাদের নাম প্রকাশিত হইবে।

একজনের যত ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এক ব্যক্তি একটির অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব। রচনাকারী সে বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পুরস্কার তার দ্বারা হইবে, এবং তাঁহারা যাহা স্থির করিবেন, তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

এইরূপ পুরস্কার, পূজার পূর্ব্বে একবার ও বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। সবিশেষ বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য।

কুন্তলীন পঞ্জিকা।

বিনামূল্যে বিতরিত।

রঞ্জিত কাগজে রঙ্গীন কালীতে সুন্দররূপে মুদ্রিত। কাছে থাকিলে তারিখ ইত্যাদি দেখিতে আর বটতলার পাঁজী খুলিতে হইবে না। যাহারা এই সুন্দর ও সুলভ পঞ্জিকা খালি গৃহে রাখিতে চান, তাঁহারা কুন্তলীন আফিস হইতে বিনা মূল্যে লইয়া যাইতে পারেন। মফঃস্বলবাসীরা অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক,
এইচ, বসু।—ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার।
২৯নং মুসলমানিপাড়া লেন, কলিকাতা।

৫ম ভাগ। ১৩০১; ১৬ই ভাদ্র।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, বি-এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম-এ ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। রাজা বিনয়কৃষ্ণ মিত্র	২৯৭	৪। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও রামাই	৩৪৩
২। বেণু	৩০৩	৫। প্রতিশোধ (উপন্যাস)	...
৩। বহুমোহিনী সাহিত্য	৩৪১—৩৪৩	৬। বৈজ্ঞানিক সংবাদ	৩৪৩
সাহিত্য	৩৪১	৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৩৪৩
শ্রীসমচরিত	৩৫০	৮। সাপ্তাহিক সমালোচনা	৩৫১
সমাজনীতি	৩৫১		

কলিকাতা,

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীগঙ্গেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল গ্রাহক এখনও সাহিত্যের মূল্য পাঠান নাই,
য পাঠাইবেন।

নিবেদন।

বন্ধুবর মিত্রের বিলাতী ছবি আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে।
ণ্ এন্‌গ্রেভিং বিলাতে প্রস্তুত। এরূপ চিত্র কখনও কোনও বাঙ্গলা
াহির হয় নাই। যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকী থাকিবে, তাঁহারা বন্ধু
মিত্রের বিলাতী ছবি পাইবেন না।

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন। } শ্রীমতীশচন্দ্র সমাজপতি।
সিমলা ডাকঘর, কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

বাগানবাড়ী ভাড়া চাই।

কলিকাতার খুব নিকটে, অন্যূন ১৩।১৪ বিঘা জমী ও পুকুর সমেত একটি বাগান ভাড়া লইতে পারি। বড় বাড়ীর আবশ্যক নাই। যদি কেহ ভাড়া দিতে চাহেন,—বিশেষ বিবরণ, ঠিকানা ও ভাড়ার পরিমাণ, আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীমণিলাল সেন।

১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন, সিমলা পোষ্টাফিস্; কলিকাতা।

উচ্ছ্বাস।

নূতন প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ।

পলাশির যুদ্ধ, রৈবতক প্রভৃতির প্রণেতা কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন-কৃত
ভূমিকা সহিত।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ফুলজানি।

উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

রাজা দিগম্বর মিত্র, সি. এস্. আই। *

আত্মাভিমানে আবাত করা অভিপ্রেত নয়,—তাহা করা অতিপাতক বলিয়াই অগত্যা বিশ্বাস করি;—কিন্তু, পুরুষকার পদার্থটা বাঙ্গালীর যে বড় দেশী স্পৃহনীয়, তাহাও বোধ হয়, বলা যায় না;—বলিলে কেহ প্রত্যয় করিবে না। বহুকাল এবং বহু পুরুষ হইতে, পিতৃপিতামহ ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, উক্ত পদার্থ আমাদের মধ্যে বিরল। বিরল,—যে হেতু উহা বাঞ্ছনীয় নয়। এই বিরলতা এবং বাঞ্ছাহীনতার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কারণ আছেও বটে, এবং আমরা ক্রমে, এ ক্ষেত্রে, সে কারণের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানও করিব; কিন্তু, আপাততঃ কারণ নহে, কারণোদ্ভূত কার্য্য যাহা, তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। পরানুবর্ত্তিতা আমাদের পুরুষানুক্রমিক পৈতৃক প্রথা; পরানুবর্ত্তিতা জাতিগত এবং ব্যক্তিগত;—সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বাঙ্গালীকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই জাতির জাতীয় অভিধানে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দটিরই অভাব,—পুরুষকার বহুযুগবিস্মৃত তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত একটা সংজ্ঞামাত্র;—অস্থি-মজ্জা-মেদ-মাংসহীন, তাহা নিঙ্গড়াইলেও রক্তবিন্দু পড়ে না; তাহা শুষ্ক কঙ্কাল অপেক্ষাও শুষ্ক কঠিন, কার্য্যের অনুপযোগী। পুরাতন সংজ্ঞা—পুরুষকার, আমাদের মধ্যে, একান্ত অর্থহীন একটা অপার্থিব পদার্থ;—নেহাত নিরাকার! "নিরাকার" অথচ "চৈতন্যস্বরূপ"ও নহে;—কারণ, অস্মদ্দেশীয় "আর্য্যত্ব" অষ্টপৃষ্ঠললাটে "অদৃষ্ট" দ্বারা আচ্ছন্ন;—"প্রারব্ধে"র পেষণে পুরুষকারের প্রাণ বহুকাল হইল বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তবে আমাদের পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় বৃত্ত-ভাণ্ডারটি নাকি যারপরনাই বিশাল এবং জাতীয় চরিত্রটি ততোধিক উর্ব্বর, সুতরাং স্বভাবতই সংসারে এমন কোনও দ্রব্য থাকিতে পারে না, যাহা তথায় নাই। সকল রত্নই যখন আছে, তখন পুরুষার্থ রতনখানিও বা না থাকিবে কি বলিয়া! পরপদলেহন এবং অবস্থানুকূল্যে তাহা গোপনে-দংশন দ্বারা গৃহলক্ষ্মীকে গহনা এবং গ্রহবিপ্রকে মুগ, মাষকলাই বা স্বর্ণ-মাষা দিয়া, পাপগ্রহের পিত্তদমন করা পরমপুরুষার্থ।—নব্য বঙ্গীয় পাস-করা-পুরুষকারেরও চরম পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠা প্রায় এখন উহাতেই পরিণত হইতে বসিয়াছে। যিনি এ প্রতিষ্ঠালাভে অপারগ, তাঁহার পক্ষে "প্রবৃত্তিনিরোধ"ই অগত্যা পুরুষার্থ;—

* Raja Digambar Mitra, c. s. i. His Life and Career. By Bhola Nath Chunder. Author of the "Travels of a Hindu". Hare Press, Calcutta. 1893.

"যদা তত্ত্বা তত্ত্বচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তত্ত্বচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ"

তবে পোড়া প্রবৃত্তির নিরোধ হয় না, ইহাই যাহা কিছু আক্ষেপ। নহিলে নিশ্চয়ই আমরা এত দিন নির্ব্বাণমুক্তির নৌকা অনড় স্থানে লইয়া গিয়া নঙ্গর ফেলিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরানুবর্ত্তিতা বা পরমুখপ্রেক্ষিতা পূর্ব্বাপর প্রথা; অথচ যে পরানুবর্ত্তিতায় পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে জাতীয়তার ঐকতানিক বাদ্য ধ্বনিত হয়, "বডি পলিটিক" জন্মে, সে প্রকৃতির পরানুবর্ত্তিতা ইহা নহে। ইহা পুরুষার্থ-বিহীনতার বিকৃত ব্যাধি; অসমর্থতার বিদ্বেষবিষে জীর্ণ, জর-জর, ছিন্ন, ভিন্ন; হিংসাধূর্ত্ততা-প্রতারণাময়;—ইহা কাপুরুষের পরানুবর্ত্তিতা। স্বানুবর্ত্তিতার সতেজ সরলতা-প্রাণোদিত পরানুবর্ত্তিতা পুরুষার্থেরই নামান্তর, তাহাতেই সমাজের মঙ্গল, তাহারই শক্তিতে পাশ্চাত্যেরা উন্নতি-মঞ্চে উত্থিত হইয়াছেন। কিন্তু, আমাদের পরানুবর্ত্তিতা সে প্রকৃতির নহে,—ইহাতে ঐক্যের কোলাকুলি নাই, অনৈক্যের কলহ কোন্দলেই ইহার আপাদমস্তক পূর্ণ। ইহা এক অভিনব অমৌলিক পদার্থ। কারণ আমাদের মধ্যে স্বানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাব। "স্বনাশা পুরুষো নষ্টঃ" বলিয়া এ দেশে একটি প্রাচীন প্রবচন ছিল বটে, কিন্তু বহুকাল হইতেই তাহার আর চলন নাই। ইংরেজের অতি প্রকাণ্ড Individuality এ দেশে আমদানি হইয়াও, উন্নতির পথে, আমাদের জাতির বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; বরং তাহার রাসায়নিক সংমিশ্রণে বা বঙ্গীয় রন্ধনশালায় তাহার বিকৃত ভেয়ানে, বাঙ্গালী-চরিত্রে এমন একটি ক্লুৎসিত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার দুর্গন্ধ প্রকৃতই দুরপনেয়। ইংরেজের "ইণ্ডিভিজুয়ালিটী" আমাদের মধ্যে যে দ্রব্যের জন্ম দিয়াছে, তাহাকে নীচাদপি নীচ স্বার্থপরতার অতিনিম্নতম সঙ্কীর্ণতা বলিলেও সমস্ত বলা হয় না। অথচ ইংরেজের Individuality জাতিগত বা ব্যক্তিগতই হউক, তাহার অর্থ নীচ স্বার্থপরতা নহে, পরার্থপরতাবিরহিত অসামাজিক সংকীর্ণতাও নহে;—তাহা সহজ, সরল, শক্তিময় স্বানুবর্ত্তিতার স্বাধীনতা; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক গতি;—তাহা এই পৃথিবীর পুরুষকার,—প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যার অপৌরুষেয় পদার্থ নহে। আমাদের ইতর-সাধারণ সমাজের কথা ধর্ত্তব্য নহে;—কারণ, তাহা একান্ত অব্যবহিত বরকন্নার কথা ভিন্ন, আর কিছুরই কোনও ধার ধারে না; কিন্তু, এ দেশীয় ইদানীন্তন-শিক্ষিত সমাজ সমষ্টিভাবে, এই পুরুষকারে স্পৃহাবান্ কি না, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে।

অতএব আমাদের আলোচ্য এই পুস্তক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে

সাধারণতঃ কত দূর আদৃত হইয়াছে,—উহা সাধারণ্যে আদৌ পঠিত এবং পর্য্যালোচিত হইয়াছে কি না,—কেমন করিয়া বলিব? কারণ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন,—তাঁহার এই জীবনী, পার্থিব পুরুষকারের এক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত; কারণ, ইহা বাঙ্গালী-সুদুর্লভ ব্যক্তিগত স্বানুবর্ত্তিতার এক সুদীর্ঘ বিবরণী।

কিন্তু, এই "বিবরণী" বাঞ্ছানুরূপ বিশদভাবে এবং বিস্তার-পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না; ইহাতে সর্ব্বথা সুবিচারও হইয়াছে, তাহাও নহে;—বহু অর্থব্যয়, শ্রম ও যত্ন সত্ত্বেও, এ দেশে, জীবন-বৃত্তবিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় না; এই অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ইংরেজী গ্রন্থই, তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ দেশে, এ কাল পর্য্যন্ত, যতগুলি জীবন-বৃত্তবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই শীর্ষস্থানে, এই গ্রন্থ সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল সমাবেশে, এবং লিপিনৈপুণ্যে, উপস্থিত আলোচ্য গ্রন্থ, আমাদের এই শ্রেণীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা যত গুলি গ্রন্থ আছে,—আমরা জানি, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট। কিন্তু সর্ব্বাংশে পূর্ণ নহে; উহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টও নহে। ঘটনা অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু, আরও অধিক সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক ছিল;—যে সকল অনতিবৃহৎ বা অতিক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমাবেশে জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দেদীপ্যমান হয়, চরিত্র পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়, এক কথায়, যদ্দ্বারা জীবনীতে জীবনীশক্তি স্বতঃ সঞ্চারিত হয়,—আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য,—তাহার অভাব, আমাদের আলোচ্য এই জীবনীগ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে। গ্রন্থকার প্রবীণ, লিপিশক্তিতে পরিপক্ক এবং প্রতিষ্ঠান্বিত, তাঁহার এই গ্রন্থ তদুপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, এই গ্রন্থ একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, উপাদেয় জীবনচরিত নহে। তবে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জীবনীর উপযোগী সমস্ত উপকরণ এ দেশে সুরক্ষিত হয় না; রক্ষিতই হয় না; অতএব তাহা জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির জীবন-বায়ু নিঃশেষিত হইবার অত্যল্প কাল পরেও সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব; এ কথাও এ স্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য। বোধ হয়, এই কারণেই আলোচ্য গ্রন্থ অনেক স্থলে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ জীবনী-গ্রন্থের প্রধান এবং সুমহৎ গৌরব ও আকর্ষণশক্তি সত্যবিবৃতি; খাঁটি সত্য, নিরবচ্ছিন্ন সত্য, অসঙ্কোচ সরলতার সহিত বলিতে হয়; সরলতার সহিত সাহস এবং সাহসের সহিত সহানুভূতিপ্রবণ উদারতার

উহাতে প্রয়োজন। সত্য সঙ্কুচিত হইবে না, আবৃত হইবে না, তাহার অর্দ্ধাংশও অপ্রকাশিত থাকিবে না। জীবনী গ্রন্থের ইহা প্রথম অঙ্গ, এবং অতি প্রধান অঙ্গ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ অঙ্গে উপযুক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করিতে না পারুন, তাহা যতদূর পারিয়াছেন, তাহাতে উপরি-উক্ত সত্য-বিবৃতি-কার্য্য সরলতা, সাহস এবং সুনৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। জীবনীর হিসাবে এই গ্রন্থের ইহাই গুণ, এবং ইহা অতি প্রধান গুণ। কিন্তু, তথাচ একটি কথা আছে। গ্রন্থকার সরলতা, সাহস এবং সুনৈপুণ্যের সহকারে সত্য বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু সহানুভূতিমূলক উদারতার পরিচয় সর্ব্বত্র দিতে পারিয়াছেন, এমত বলা যায় না। বোধ হয়, সাহসিকতার পরিচয় দিতে যাইয়াই, অতিসাবধানতাজনিত, এক এক স্থলে সহানুভূতির অসামঞ্জস্য এবং অভাব হইয়াছে। সে কিরূপ স্থল, আমরা ক্রমে দেখাইব।

সাহসিকতার সহিত সহানুভূতির সামঞ্জস্য হওয়া উচিত ছিল, সবিশেষ আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র হয় নাই; সুতরাং সমালোচ্য জীবনীর বিষয়ীভূত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বথা সুবিচার হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। অবিচার অপেক্ষা বিচারাভাব শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ, বিচার অপেক্ষা বিবৃতিই জীবনবৃত্তলেখকের অধিকতর উপযোগী। বিবৃতি যথাযথ হইলে, বিচার না করিলেও চলে;—তাহা অতিরিক্ত, অনাবশ্যক। সমালোচনার প্রলোভনে পড়িয়া যদি একান্তই বিচার করিতে বসিতে হয়, তবে অতি সাবধানে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সূক্ষ্ম এবং সুবিচার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু এ কর্ত্তব্যপালন এক কথায়, এবং অল্প কথায় হইয়া উঠে না। এক কথায় "ডিক্রি ডিস্‌মিস্" কাজীর বিচার, তাহাকে বহুদর্শী বিচক্ষণ জজের বিচার বলা যাইতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা কেবল জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি অন্যায় নহে, তাহাতে শিক্ষাপ্রার্থী সাধারণ পাঠকেরও অত্যন্ত অনিষ্ট করা হয়। আদর্শ অত্যুচ্চ হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা যদি এত অধিক উচ্চই হয় যে, সংসারবাসী মনুষ্যমাত্রেরই স্পর্শের অতীত, তবে কাব্যোপন্যাসের কাল্পনিক চিত্রই প্রচুর, স্বভাবাতিরিক্ত দেবচরিত্রই যথেষ্ট, মানুষের উপকারার্থে মানুষের জীবনচরিত লেখার বড় বেশী আবশ্যকতা থাকে না।

কিন্তু জীবনবৃত্তের আরও অঙ্গ আছে। জীবন দীর্ঘ। চরিত্র জটিল। জীবনের অনেক কার্য্য স্বভাবতঃ আত্ম-বিরোধী, পরস্পরে অমিল, হয় ত বৈর-

ভাবাপন্ন; জীবনের এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সহিত হয় ত অপর এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সঙ্গতি হয় না; অন্ততঃ সে সঙ্গতি হয় ত অত্যন্ত অস্পষ্ট। অতএব, জীবনবৃত্তলেখকের যে কিরূপ সাবধানতার সহিত সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম ভাবে ঐ সকল অবিকল অঙ্কিত করা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। উহা এরূপ ভাবে, এরূপ উপযুক্ত এবং প্রকৃত অনুপাতে অঙ্কিত করা চাই, যদ্দ্বারা জীবনী-বিবৃত ব্যক্তি-পাঠকের মানসপটে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন। তিনি নিজে জীবনকালে তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ, অতিঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের নিকট চিত্তমন উন্মুক্ত করিয়া আপনাকে আপনি যেরূপ ভাবে পরিচিত ও প্রত্যক্ষীভূত করিতেন, জীবনীলেখকের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট ঠিক তদনুরূপ প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা। নহিলে জীবন-বৃত্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সাধারণ বাঙ্গালীজীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য অতীব অল্প বটে, কিন্তু তাই বলিয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনঘটনা নিতান্ত অল্প, ইহা আমরা স্বীকার করিতে সম্মত নহি; কারণ, তদীয় জীবনীর কঙ্কালমাত্র দেখিয়াও বিলক্ষণ বুঝা যায়—যে, বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সে জীবন গঠিত, এবং তাহার কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। স্কুলমাষ্টারের আসন হইতে ব্যবস্থাপকসভার বিশাল সৌধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের বহুবৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং অপরিসীম প্রাজ্ঞতা দিগম্বর মিত্রের প্রবল পুরুষকারের অন্যতম ফল, যাহা রাজদরবারের মন্ত্রণাকক্ষের দ্বার তাঁহার জন্য স্বতঃ উন্মুক্ত করিয়াছিল, এবং যাহার জন্য রাজপ্রতিনিধি এবং অত্যুচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষগণ তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন; তাহা,—সেই অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞত্ব, এক দিনে, এক স্থানে, একই কার্য্যে, একই প্রকার বৃত্তিব্যবসায়ে, বা কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে লব্ধ হয় নাই। তাহা জীবনস্রোতের বহু আবর্ত্ত ও বহু বৈচিত্র্য এবং বিপুল পরিশ্রম সঞ্জাত। পুরুষকার অপরিমেয় পরিশ্রম-শীল। পুরুষকারের আর যে যে এবং যত যত লক্ষণই থাকুক, অপরিসীম পরিশ্রম তাহার প্রধান লক্ষণ। প্রতিভা যে প্রকৃতিরই হউক, বিনা পরিশ্রমে তাহা প্রস্ফুট হয় না। প্রতিভা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত আকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া "এক দমকে" উদরে প্রবেশ করে, এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিনা আয়াসে তাহা উদ্গার করিয়া অমর হন, এরূপ মনে করাই মহাভ্রম। প্রতিভামাত্রেরই মূলে, মধ্যে এবং অন্তে, পরিশ্রম, কঠিন পরিশ্রম, সংশ্লিষ্ট; প্রতিভান্বিত ব্যক্তিমাত্রেরই

জীবনবৃত্তের বিশ্লেষণ করিলে ইহা বুঝা যায়। স্কুলমাষ্টারী হইতে আমলাগিরি, আমিনী, তহশীলদারি বা সেরেস্তাদারি এবং কেরাণীগিরি; পরন্তু মুনিটারী, এবং ম্যানেজারী, তৎপরে সওদাগরি, নীল-কুঠিয়ালী, রেশম-কুঠিয়ালী, ব্যাঙ্কের অংশীদারি; পরে জমিদারির সৃষ্টি, সংগঠন এবং শাসন; রাজনৈতিক আলোচনা এবং মন্ত্রণা; রাজনৈতিক সভার সম্পাদকতা সভাপতিত্ব, রাজনৈতিক কমিসনের সদস্যত্ব, রাজধানীর সেরিফত্ব; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, একবার দুইবার নহে, তিনি তিনবার সদস্যত্ব; মধ্যবৃত্ত গৃহস্থসন্তানের রাজসম্ভ্রমে, রাজপদে উত্থান, "ইন্ডাদির" আকাঙ্ক্ষণীয় ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধিপ্রাপ্তি; ৺ দিগম্বর মিত্রের জীবন বহু বিভিন্ন অবস্থা, বহু প্রকৃতির ঘটনা, এবং বহুল বৈচিত্র্যে বিখচিত। ইংরাজীতে যাহাকে eventful life বলে, ইহা তদনুরূপ; ইহা প্রায় তাহাই। জীবনীলেখক জীবনঘটনার কঙ্কালগুলিমাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, তাহার সুবিস্তৃত বিবরণী প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ, গতাসু রাজার সমগ্র জীবনই সুনিয়মিত, তাহাতে সঙ্গতিহীনতা সম্ভবতঃ কখনও ঘটে নাই; অথবা অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। সুতরাং জীবনী লেখার উপরি-উক্ত অঙ্গের প্রথমাংশে বিবৃত বিষয়ে এই জীবনী লেখককে সবিশেষ নৈপুণ্য চালনা করিতে হয় নাই। পরন্তু, জীবনবৃত্তবিবৃতির উল্লিখিত শেষোক্ত প্রয়োজনীয়তাপূরণে জীবনীলেখক সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ, বোধ হয় এই যে, গ্রন্থকার তদীয় নায়কের সংসর্গে সংমিলিত হইয়া তাঁহাকে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিবার তাদৃশ সুবিধা হয় ত কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই সুবিধা অথবা সৌভাগ্যের উপর জীবনবৃত্তের জীবনীশক্তি প্রচুরপরিমাণে নির্ভর করে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এস্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে।

রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন তাঁহার সময়ের প্রায় ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। জীবনীলেখক, সে ইতিবৃত্ত প্রস্ফুট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সে চেষ্টা সাধারণতঃ সফলও হইয়াছে। কিন্তু এ সফলতার পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি হইতে পারিত, এবং তাহার সহিত মিত্র মহোদয়ের রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক জীবন অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইত, জীবনীলেখক যদি জীবনীগ্রন্থপ্রণয়নের একটি অতি অপরিহার্য্য আবশ্যকতার অন্ততঃ কতকাংশেও পরিপূরণ করিতেন। সমালোচ্য সমগ্র জীবনীটিতে নায়কের জীবনবৃত্তবিষয়ক কয়েকখানি মাত্র সরকারী ও অর্দ্ধ-সরকারী পত্র প্রক-

টিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের লিখিত বা তাঁহার অসংখ্য বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রও আমরা ইহাতে দেখিতে পাই না। অথচ, এইরূপ চিঠিপত্রে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হয়,—বর্ণনীয় চরিত্রের অনেক অংশ, অনেক স্থল উজ্জ্বলীকৃত হয়। কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার করি বটে যে, শিক্ষা দীক্ষা এবং সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায়, আচারে এবং অভ্যাসে, বঙ্গ-সমাজ এবং বাঙ্গালী-প্রকৃতি যখন য়ুরোপীয় সমাজ ও ইংরেজ-প্রকৃতির সদৃশ নহে, তখন বাঙ্গালী যত বড় লোকই হউন, চিঠিপত্র খুব কমই লিখেন, অন্ততঃ ইয়ুরোপীয় বড় লোকে যত চিঠিপত্র লিখেন, ইহাঁরা তত লিখেন না; পরন্তু যে দুই দশ খানা চিঠিপত্র লিখেন, তাহাতে অব্যবহিত আত্ম ঘর-গৃহস্থালীর কথা এবং আত্মীয় স্বজনের কথাই থাকে,—সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্য, শিল্প, সাহিত্য রাজনীতির কোনও কথাই প্রায় তাহাতে থাকে না;—কারণ সে প্রকারের পত্র লিখিতে বাঙ্গালী প্রকৃতি অভ্যস্ত নয়,—বঙ্গসমাজের তাহা রীতিও নয়, যে হেতু সমাজ সাধারণতঃ অশিক্ষিত। সুতরাং বঙ্গীয় বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি যে কোনও বৃহৎ বিষয়ে সমগ্র জীবন ব্যাপৃত থাকুন না, চিঠিপত্রে, য়ুরোপীয়বৎ, সে বিষয়ের কচিৎ উল্লেখ করেন *। এ উক্তিতে কিঞ্চিৎ সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহা সম্যক্ সত্য উক্তি নহে; কারণ মনুষ্য-প্রকৃতি ইয়ুরোপে, ইংলণ্ডেও মনুষ্য-প্রকৃতি, ভারতে, বঙ্গেও মনুষ্য-প্রকৃতি। যখন যে বিষয়ে মন ব্যাপৃত থাকে, তখন সে বিষয়ের স্বাভাবিক স্ফূরণ মনের অতি সাধারণ মৌলিক লক্ষণ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন একেবারেই এ লক্ষণবিবর্জ্জিত, ইহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? তবে অভ্যাসবশতঃ ও দেশের অবস্থানুসারে বিষয়ের অল্পাধিক্য সম্ভাব্য বটে। শিক্ষিত ইয়ুরোপীয় যে স্থলে তাঁহার চিঠিপত্রে সাধারণ বিষয়ের বহুল বিবৃতি করেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সে স্থলে না হয় তাহা খুব কমই করেন; কিন্তু একেবারেই না করা সম্ভবে না। কারণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক। পরন্তু, শিক্ষিত লোকের মানসিক সংযোগ শিক্ষিত লোকের সহিতই হয়। রাজনৈতিকের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব নেহাত মুদী বাখালী কুলি মজুরের সহিত হয় না। সাহিত্যসেবকের সাহিত্যবন্ধু, সাহিত্য-সেবী শিক্ষিত ব্যক্তিই হইয়া থাকেন। বন্ধুত্বের চিঠিপত্র বন্ধু বান্ধবকেই লিখিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত বন্ধুবর্গের নিকট শিক্ষিতের চিঠিপত্র,—অশিক্ষিত ইতর সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নহে; অতএব

* Mr. N. N. Ghose's Kristo Das Pa ;—A study.

অশিক্ষিতে বুঝিবে না বলিয়া, সেরূপ চিঠিপত্রে, রাজনীতি সাহিত্যাদি সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ না করা সম্ভবে না। ফলতঃ এমন কখনও হইতে পারে না যে, দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় রাজনীতিবিশারদ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের চিঠিপত্রে ভুলিয়াও কখনও রাজনীতির উল্লেখ করেন নাই। এমন কখনও হইতে পারে না যে, রাজা দিগম্বর মিত্রের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন কয়েকখানি মাত্র সরকারি ও অর্দ্ধ-সরকারি পত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; তিনি নিজে কখনও রাজনীতি-সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখেন নাই, বা কাহারও নিকট হইতে সে বিষয়ের চিঠিপত্র প্রাপ্ত হন নাই, এবং তাহার একখানিও কোথাও কাহারও কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে এমনও যদি হয় যে, আমাদের বড়লোকেরাও তাঁহাদের চিঠিপত্রে আপনার অব্যবহিত ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কিছুই লিখেন না, তাহা হইলেও সে প্রকৃতির চিঠিপত্রও ত দুই চারি খানা আমরা তাঁহাদের জীবনীতে দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঘর-গৃহস্থালীর কথাও বড় কম কথা নহে;—বরং বৃহৎ কথা অপেক্ষা, অনেক সময়ে এই সকল ক্ষুদ্র কথার মূল্য অধিক হয়; কারণ, তদ্দ্বারা চরিত্রের এবং তাহার চৌহদ্দীর অনেক আভাস পাওয়া যায়; চরিত্রের অজ্ঞাত অন্ধকার অংশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। কিন্তু, জীবনবৃত্তের এ অঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থ অত্যন্ত অঙ্গহীন। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

কিন্তু, তাহা হইলেও, আলোচ্য গ্রন্থের উপরি-উক্ত অল্পাধিক অঙ্গহীনতা সকল সত্ত্বেও, আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, এ গ্রন্থ, এ দেশীয় এ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অদ্বিতীয়।

তা, এই অসাধারণ বাঙ্গালী জীবনের এই অদ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন কি? একান্ত চিত্তে অনুধাবন করিয়াছেন কি? না করাবই সম্ভাবনা; কেন না, আমরা পুরুষকারে স্বভাবতই উদাসীন। কিন্তু, আমরা পুরুষকারে উদাসীন বলিয়াই এই গ্রন্থ অধিক পঠিত ও আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দিগম্বর মিত্রের জীবনী সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রত্যেক পাঠশালায় প্রেরিত হওয়া উচিত। শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা সমান পাঠ্য। বৈরাগ্যের ইতিবৃত্ত ও বিরাগীর জীবনাখ্যায়িকা আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি। কিন্তু, দেশশুদ্ধ লোক বিরাগী হওয়া সম্ভবে না। অন্ততঃ অদ্যাবধি তাহা সম্ভব হয় নাই। বুদ্ধ চৈতন্যাদির জীবনবৃত্ত কণ্ঠস্থ করিয়াও সংসারের সাড়ে ষোল আনা লোক বিষয়ী। বৈরাগ্য

নিজেই ব্যবসা বিশেষ। আমরা ঘোর বিষয়ী; অথচ বৈষয়িক পুরুষকার বর্জ্জিত, অধ্যয়ন করি বৈরাগ্যের কাহিনী; বিশিষ্ট বিষয়ী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পুরুষকারের ইতিহাস আমাদের নাইও বেশী; তাহা ক্বচিৎ থাকিলেও আমাদের খবরে আসে না। কিন্তু, এ অবস্থা বড়ই বিসদৃশ,—ইহা সামাজিক স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অন্তরায়। এতদ্দ্বারা "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইতেছে। ইহা বিষয় এবং বৈরাগ্য, উভয়েরই ব্যভিচার। আপাততঃ আমাদের বালক ও যুবকদিগকে "গীতোক্ত ধর্ম্ম" হইতে কিছু অবসর দিয়া, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পার্থিব পুরুষকারের ইতিবৃত্তঘটিত উপদেশ দিলে মন্দ হয় না। সেইটাই প্রকৃত সময়োপযোগী, অবস্থা ও আবশ্যকতার উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করি।

সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজ দুটি অতি কঠিন সমস্যায় আন্দোলিত; কেবল আন্দোলিত নয়, বিব্রত, বিধ্বস্ত। প্রথম সমস্যা, শিক্ষিত বাঙ্গালির অন্ন; দ্বিতীয়, তাহার রাজনীতি। কিন্তু, এ দুই সমস্যাই নেহাত নূতন নয়। দুটিই পুরাতন সমস্যা, এখন তাহার নূতন অভিনয় হইতেছে মাত্র। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ এই উভয় সমস্যাপূরণের ইতিবৃত্ত। দিগম্বর মিত্র, এই দুই সমস্যাই স্বদীয় জীবনে ছিন্ন করিয়া শিক্ষিতদিগের পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে পথ পুরুষকারের পথ; কিন্তু সে পথে আমাদের সম্যক দৃষ্টি পতিত হয় না, ইহাই বড় দুঃখ। সকলেই যে এক পথে যাইবে, তাহা নহে। প্রত্যেকেরই পথ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু, পুরুষকার একই। পুরুষকার নিজের পথ নিজে ক্ষোদিত করে; প্রত্যেকের জন্য পৃথক পথ ক্ষোদিত করে। একজন অপরের পথে প্রায়ই যাইতে দেয় না। ইহাই তাহার ধর্ম্ম, ইহাই তাহার মহীয়সী মৌলিকতা। অতএব সকলেই যে দিগম্বর মিত্র বা দিগম্বর মিত্রের মতন হইবে, তাহা নহে। তাহা সম্ভবই নয়। স্বভাবের মিতব্যয়িতা তাহা মানা করে। দিগম্বর মিত্রের যে বৃহৎ প্রকৃতির পুরুষকার ছিল, তাহা স্বভাবে সুদুর্লভ। তাঁহার স্বদেশীয় পরানুবর্ত্তী, পরানুপ্রিয়, দুর্ব্বল বাঙ্গালী ত দূরের কথা,—স্বানুবর্ত্তী দিগ্‌দেশেও সে প্রকৃতির প্রবল পুরুষকার সচরাচর সম্ভবে না। সে বিষয়ে স্বভাব বড়ই সংযতহস্ত। দিগম্বরের পুরুষকার পাওয়া বা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছান সচরাচর সম্ভব নয়। তবে তাহা স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব বৈষয়িক ও রাজনৈতিক পথে চলিতে পারিলে শিক্ষিতদিগের এবং তাঁহাদের দেশের সবিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

আজ ১৮৯৪ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালী যেমন জীবনসমস্যায় পড়িয়া জীর্ণমৃত,—করণীয় কি ভাবিয়া পাইতেছেন না;—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক

মুষ্টি অন্ন উপার্জ্জনার্থে আবজী হস্তে আপিসে আপিসে ঘুরিতেছেন ;—১৮৩৪ সালে একটি সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক গৃহস্থ যুবক কলেজ ছাড়িয়া, ঠিক এমনি জীবন-সমস্যার অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন। সেই সপ্তদশবর্ষীয় বালকটি আর কেহই নহেন,—পরবর্ত্তী কালের কৌন্সিলের মহামান্য মেম্বর রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই। ইহা অদৃষ্টও নহে, অ্যাক্সিডেণ্টও নহে ;—পুরুষকার ; খাঁটি, নিরেট, নির্জ্জলা পুরুষকার। সে আজ ৬০ বৎসরের কথা, কিন্তু এখনকার সময় অপেক্ষা তখনকার সময় যে কিছু বেশী সহজ ছিল, তাহা নয়। তখনও চাকরীর বাজার চড়া, মুরুব্বীর বাজার কড়া। বরং তখন অপেক্ষা এখন এ বাজারের পথ বহু দিকে বিস্তৃত, পরিষ্কার ও প্রশস্ত হইয়াছে। পরন্তু, এখন যেমন আমাদের অনেকে রাজনৈতিক আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন,—তখনও তেমনি, তখনকার "নব্য বঙ্গ"—দুই চারি ডজন মাত্র শিক্ষিত যুবক,—রাজনীতির আবর্ত্ত অনুভব করিয়াছিলেন। তখনকার আবর্ত্ত এখনকার অপেক্ষা অধিকতর উত্তাল, অধিকতর ঘূর্ণজলপূর্ণ ছিল। তখন "কোম্পানীর মুলুক"—কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। আজ প্রায় দশ বৎসর হইতে চলিল, ন্যাশানাল কংগ্রেস হইয়াছে ; এ দেশবাসী অল্প স্বল্প যতটুকু হউক, আত্মশাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; বিভাগীয় কমিশনরের মসনদে নেটিব বাঙ্গালী বসিতে পাইয়াছেন ; চিহ্নিত সিবিলিয়ানি নেটিবকে দেওয়া হইতেছে ; উচ্চতম আদালতের অত্যুচ্চ অজিয়তি নেটিবের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে ; সর্ব্বোপরি নেটিব এখন বৃটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর। কিন্তু তখন বৃদ্ধ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৩৫ সালে নেটিবদিগকে সবে-ডেপুটীগিরি ও মুন্সেফি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছিল। এখন কলেজে এণ্ট্রেন্স পাস হইয়াছে, তখন সহমরণেরও জের চলিতেছিল। আজ স্যর চার্লস এলিয়ট প্রভৃতি প্রাইমারি শিক্ষার বিস্তারের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে হাঁক ডাক করিতেছেন, কিন্তু তখন রাজকীয় শিক্ষা রাজধানীরও চারিদিকে বিস্তৃত হয় নাই। সমাজের অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা, চাকরীর বাজার এবং রাজনীতির অন্ধকার, সকল দিক ধরিয়া বিচার করিলে, সময় এখনকার অপেক্ষা তখনই বরং বিলক্ষণ কঠিন ছিল। সেই কঠিন সময়ে উপরি-উক্ত দুই কঠিন সমস্যা, দিগম্বর মিত্র নিজের জীবনে মীমাংসা করিয়াছিলেন। যেরূপে করিয়াছিলেন, তাহা পরে বলিব। যদ্দ্বারা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; তাহা পুরুষকার। উহা ভিন্ন পারলৌকিক ও পার্থিব পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।

রাজা দিগম্বর মিত্রের পুরুষকার বৃহৎ, প্রবল, পরিস্ফুট, সফল। উহা সফল, কিন্তু বিফল হইলেও যে উহার মূল্য কমিত, তাহা নহে। তবে মিত্র-মহোদয় যে প্রকৃতির পুরুষকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই বিফল হয় না। সফল হইয়াছিল বলিয়াই যে বিফল হয় না বলিতেছি, তাহা নহে। বিফল হয় না বলিতেছি এই জন্য যে, তাহা বিফলতাকে উপেক্ষা করে, বিফলতার প্রতি লক্ষ্য করে না, সফলতার প্রতিও লক্ষ্য করে না, সতেজে স্বক্ষোদিত সম্মুখস্থিত, আত্মনিরূপিত কর্ত্তব্যের পথে চলিয়া যায়; তাহা অদম্য, অজেয়, অবিচলিত; অবিশ্রান্ত উদ্যমময়; তাহা বহিরন্তরারে ব্যাকুল হয় না, ক্ষুণ্ণ ম্লান ও আচ্ছন্ন হয় না; অপ্রতিহত গতি, কোনও আঘাতি, কোনও আবর্ত্ত, কোনও অননুকূল অবস্থা, তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং সফলতা স্বাভাবিক নিয়মে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সফলতা ও তদানুষঙ্গিক সুযোগ ও সুবিধাকে কেহ বলেন, অদৃষ্ট; কেহ বা বলেন, "অ্যাক্সিডেণ্ট"। পূর্ব্বে যাহাকে অদৃষ্ট বলা হইত, এখন শিক্ষিতগণ তাহাকে অ্যাক্সিডেণ্ট বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন গহ্বরে অদৃষ্ট বা অ্যাক্সিডেণ্ট থাকিতে পারে, আছেও, কিন্তু প্রকৃত ও প্রবল পুরুষকারের পক্ষে তাহা পরাজেয়। পুরুষকার পদে পদে দুরন্ত দুর্যোগ ও বিকট বিফলতার অতিক্রম করিয়া, একটা সুযোগ ও সফলতায় উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে অদৃষ্ট বা অ্যাক্সিডেণ্ট বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি না। তাহা কিয়ৎপরিমাণে পুরুষার্থহীনতারই সান্ত্বনা। তবে এমন হইতে পারে যে, কতকগুলি সানুকূল অবস্থার সমবায়ে পুরুষকারের পুরস্কার অনতিবিলম্বে আনীত হয়। এবং সেই সানুকূল অবস্থার অভাবে তাহার পুরস্কার পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; অথবা তাহা না পৌঁছিতে পৌঁছিতে পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব অবশ্যই স্বীকার করি, পুরুষকার সফল বা বিফলই হউক, তাহার সমান মূল্য। অতএব "গ্রাম্য হ্যাম্পডন্" ও অসম্ভ্রান্ত নীরব মিল্টন অসম্ভাবিত নহে। অসম্ভাবিত নহে, কিন্তু বিরল। নীরব রামমোহন রায়, অজ্ঞাত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর অথবা অন্নহীন দিগম্বর মিত্র যদি দেশে থাকেন, সমগ্র দেশে অতি অল্পই আছেন। পুরুষকার এবং প্রতিভা অপুরস্কৃত থাকিলেও যখন তাহা মূল্যহীন নহে, তখন তাহা সফলমনোরথ হইলে মূল্যে কমিতে পারে না; সংসারের ইষ্টের হিসাবে মূল্য তাহার অবশ্যই অনেক বেশী।

কিন্তু দিগম্বর মিত্রের পুরুষকার ও কার্য্য-প্রতিভা (কার্য্য-প্রতিভা বলিলাম,

কারণ দিগম্বর মিত্র কার্য্য-বীর) কিরূপ ব্যবস্থায় স্থানকাল এবং অবস্থায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল? অবস্থা একান্ত অননুকূল, ব্যবস্থা বিষম বিরোধী; স্থান-কাল দৃষ্টান্ত যারপরনাই দূষিত। পুরুষকার ও প্রতিভা পরিপোষণের যত কিছু প্রতিকূলতা থাকিতে পারে, তাহার সমস্তই আমাদের অন্যান্য স্মরণীয় ব্যক্তি-দিগের ন্যায় দিগম্বরকেও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অনেক স্থলে, ইহা বোধ হয়, স্বভাবের নিয়ম। পুরুষকারের কঠোর পরীক্ষা।

এই আলোচনার প্রথমেই আমরা পুরুষকার এবং প্রধানতঃ তদ্‌বিরহের কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি। অতি আবশ্যক বোধেই, তাহা করা হইয়াছে। আমরা তদ্দ্বারা পাঠককে এ দেশীয়দিগের সাধারণ অবস্থার সহিত ইহাও বুঝাইতে চাহি যে, কিরূপ প্রতিকূল স্রোতে ও প্রতিদ্বন্দ্বী পন্থার মাঝখানে দিগম্বর মিত্রের স্বানুবর্ত্তিতা সৃষ্ট ও সফলীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গসমাজের এবং বঙ্গদেশ-বাসীর উপরি-উক্ত অবস্থা, প্রকৃতি এবং প্রথার মধ্যে দিগম্বরের পুরুষকার প্রস্ফুট হইয়াছিল, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উহাতে কিছুই নাই। পথই যদি পরিষ্কার থাকিবে, তবে আর পুরুষার্থের সবিশেষ গৌরব কি?

কিন্তু এ দেশে প্রতিভা-পরিপুষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ আরও আছে। আলোচ্য গ্রন্থের আরম্ভেই তাহার একটি কারণ সূচিত হইয়াছে। সেটি রাজনৈতিক কারণ, এবং একটি প্রকৃত কারণও বটে। কিন্তু তদতিরিক্ত এবং তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রবল, কারণও কয়েকটি আছে। প্রথমতঃ এই রাজনৈতিক কারণটি কি প্রকার, দেখা যাউক। গ্রন্থকার ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই কারণটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাগ্মিবর, নব্যবঙ্গের স্মরণীয় রাজনৈতিক ঘোষজ মহাশয়ের কথা কয়টির মর্ম্ম এই;—

"এ দেশের যেরূপ অবস্থা এবং এ দেশে যে প্রকৃতির শাসনপ্রণালী, তাহাতে এখানে কোনও প্রকৃতির প্রতিভার গুণ গৃহীত এবং তাহা উৎসাহিত ও উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। এ দেশীয় লোক স্বাধীন দেশে বাস করে না; এ দেশের শাসনপ্রণালীও দেশীয় লোকের প্রতিনিধিত্বে নিয়মিত নহে। বর্ত্তমান শাসনের দোষোদ্ঘাটন অভিপ্রেত নহে; উপস্থিত অবস্থায় এই শাসনই সম্ভবতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার রুদ্ধ; উন্নতি অনুসরণের পন্থা নাই;—কার্য্যক্ষেত্রে শক্তি সাধন ও প্রদর্শন করিবার আকর্ষণ উৎসাহের অভাব।"*

* সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার তখন একেবারেই রুদ্ধ ছিল।

ইহা অবশ্য প্রকৃত কথা। গ্রন্থকার, এই উক্তির রাজনৈতিক অন্তরায়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করিয়া বলেন, এই অন্তরায় নিবন্ধনই এ দেশের ও এ দেশীয়দিগের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; উপস্থিত অবস্থায় এ দেশে পূর্ণ-প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিবার এবং জন্মিলেও তাঁহার পুষ্ট ও পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সম্ভাবনা রণজিৎসিংহের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। তবুও যে ভারতভূমে এখনও রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেন, সে কেবল আর্য্যবংশের বীজের গুণে। শাসননৈতিক অবৈধাচার (২) অন্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এ দেশে হইবে না। পুরাতন মৃত্তিকার মাহাত্ম্যে যদিও বা এখন ক্বচিৎ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহার প্রতিভা ফুটিতে পায় না; অবর্দ্ধিত, অবিকশিত অবস্থায় বা বিকলাঙ্গেই থাকিয়া যায়।

গ্রন্থকারের এ উক্তিও অপ্রকৃত নহে। তবে তিনি যে রাজনীতি বা শাসন-নীতির উপর বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত নহে; কেন না, অন্য প্রকৃতির কারণও বিদ্যমান। সে যাহা হউক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ও অধিকারের অভাব যে এ ক্ষেত্রে একটি অতি-গুরুতর অন্তরায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। শত বন্ধনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তাহা বর্দ্ধিত ও বিকশিত হওয়া সুদূরপরাহত। সাধনারই শত বিঘ্ন, অতএব সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সামরিক ও শাসননৈতিক শক্তি উপস্থিত অবস্থায় প্রায়ই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পরন্তু পরাধীনতা-পাশে ওয়ালেস, ওয়াসিংটন, ম্যাটসিনি, কসথবৎ ব্যক্তি য়ুরোপীয় দেশেই জন্মিতে পারেন;—এ অঞ্চলে নহে;—কারণ এ অঞ্চলের লোক স্বাধীনতার স্বাদ বহু শত বৎসর হইল ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের জল বায়ু ও মনুষ্যপ্রকৃতির অবস্থাও তাহার বিরোধী। পক্ষান্তরে, অন্য প্রকারের প্রতিভারও এ ক্ষেত্রে

(২) "Administrative outlawry"—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্মেণ্টে অবিচলিত বিশ্বাসবান্ রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনীর উদ্বোধনে, এ-উক্তি তাদৃশ সুরুচিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

* তথাচ, সামরিক শক্তি, সাহস, বাঙ্গালী-দেহে বিকাশ লাভ করা একান্তই অসম্ভব, এমন বলি না। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে উহারও বিকাশ বিলক্ষণ সম্ভব। এ মুহূর্ত্তের একটা দৃষ্টান্ত সুদূর ব্রেজিল ভূমে বাঙ্গালীর বীরত্ব। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বিদেশে না যাইয়া যদি স্বদেশে থাকিতেন, কেরাণীগিরি করিয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইত না কি?

উৎসাহাভাব। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীন রাজ্যের লোক হইলে, তাঁহাদের প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিভা কত অধিক পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিত, তাহা কেবল অনুভবনীয়। এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের অধিনায়ক দিগম্বর মিত্রের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাউক।

প্রকৃতির যে সকল অতি মূল্যবান উপকরণে দিগম্বর গঠিত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ গৃহস্থসন্তানের গঠনোপযোগী উপকরণ নহে,—তাহা রাজযোগ্য। চিত; —রাজবংশোদ্ভূত ব্যক্তিরও সে উপাদানে নির্ম্মিত, প্রকৃতির সে অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া বিপুল সৌভাগ্যসাপেক্ষ। দিগম্বর মিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বভাবের সুকুলীন, "a nature's aristocrat"। প্রকৃতি দেবী তাঁহার বিশাল বক্ষের অতি গোপনীয় গৃহ হইতে জ্ঞানের এবং গৌরবের বহুতর, মহৎ ও মহিমান্বিত, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য দ্রব্য বাছিয়া বাছিয়া লইয়া—এই গৃহস্থ সন্তানটির গঠন করিয়াছিলেন। রাজজন-আকাঙ্ক্ষিত সুরুচি ও সমুন্নত বাসনার সহিত সুধীর রাজনৈতিক সচিবোচিত অন্তর্দৃষ্টির অবস্থিতি ও অবস্থানবোধ সংমিশ্রিত; এক দিকে ইংরাজের ন্যায় অদম্য ও অবিচলিত কার্য্যশীলতা ও বৈষয়িক বুদ্ধি, অপর দিকে চতুর বাঙ্গালীর বিদ্যুৎবৎ তীক্ষ্ণতা, দিগম্বর মিত্রের দূরদৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও জটিল হইতে জটিলতর তথ্যসমন্বিত সমস্যার অন্তর্ভেদ করিত। বঙ্গদেশবিষয়ক অভিজ্ঞতায় দিগম্বর অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পরে এবং পূর্ব্বে, তদ্বৎ, বঙ্গীয় রাজস্বতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহই জন্মেন নাই। সে বিষয়ে তিনি তোদরমলের তুল্য, অথবা তোদরমল অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতরধী-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পরন্তু, এক দিকে নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণের তর্কশক্তি, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান, এবং অপর দিকে কায়স্থসন্তানের সুতীক্ষ্ণ গণনানৈপুণ্য;—বৈজ্ঞানিকোচিত বিশ্লেষণশক্তি, ব্যবহারাজীবের সতর্কতা, বণিগ্‌বৃত্তির সাবধানতা, এবং কার্য্যবীরের সাহসের সহিত একত্রিত হইয়া, দিগম্বর মিত্রের মানসিক স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল। সে স্বরূপ কাব্য সাহিত্য সম্ভোগেও উদাসীন নহে। কঠোর কর্ম্মী কুঠিয়াল, বাণিজ্যপণ্যবিক্রয়শীল সওদাগর, এবং বিষয়ী বিষয়জ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ভূম্যধিকারী দিগম্বর মিত্র, গম্ভীরপ্রকৃতি রাজনীতিবিশারদ দিগম্বর মিত্র, "spouting Shakespere and Bacon." সেক্সপীয়র ও বেকন আওড়াইয়া আনন্দানুভব করিতেন। দিগম্বর মিত্রের তেজস্বিতা তাতারীয়, অথচ শিষ্টাচার ও সংযম ছিল তাঁহার অসাধারণ।

সংক্ষেপতঃ এই সকল স্বরূপ একাধারে সমষ্টীভূত হইয়া একটি উন্নত শ্রেণীর রাজনৈতিক, উদারপ্রকৃতির বিশ্বপ্রেমিক, এবং সমগ্র-প্রাণ-ময় স্বদেশহিতৈষী প্রস্তুত করিতেছিল।* কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তাহা করিতে পারিয়াছিল কি? প্রকৃতি দেবী তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কে বলিবে, প্রতিবন্দী কারণপরম্পরায় সে চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণেও সঙ্কুচিত করে নাই? দিগম্বর মিত্র প্রাণপণে রাজার জন্য এবং রাজ্যের জন্য খাটিয়াছিলেন; প্রাণপণে স্বদেশের এবং স্বদেশবাসীর সেবা করিবাছিলেন। তাঁহাকে স্বহস্তে আপন সম্পত্তির সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; কিন্তু "There was no tinge of selfishness in his patriotism." তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতায় বিন্দুমাত্রও আত্ম-স্বার্থের সংস্রব ছিল না। তিনি রাজা প্রজা উভয়েরই জন্য সমপরিমাণে শ্রম ও সাধনা করিয়াছিলেন। মধ্য জীবনে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মিত্রজ মহোদয় এই মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ কার্য্যে তিনি অর্থ সামর্থ্য, সময় এবং স্বাস্থ্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। সাংঘাতিক শোকসন্তাপের মধ্য কেন্দ্রে পতিত হইয়াও তিনি পুরুষকার প্রভাবে স্বকীয় রাজা ও স্বদেশের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু সে কার্য্য, সে শ্রম, সে সাধনা, সম্যক্ উৎসাহিত হইয়াছিল কি? উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইয়াছিল কি? পরন্তু দিগম্বর যে প্রতিভা ও পুরুষকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহাও অবস্থাবৈগুণ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল কি? রাজদ্বারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যতদূর হইতে পারে, দিগম্বর মিত্রের মাহাত্ম্য স্বীকৃত না হইয়াছিল, এমন নয়; রাজা তাঁহাকে রাজপ্রসাদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যক্ সানুকূল অবস্থায় পুরুষকারের তাহাই কি প্রচুর পুরস্কার? ওজনের মাত্রা বাড়াইয়া, ইংরাজীতে যাহাকে "ওভার এষ্টিমেট্" বলে, তাহা করা অভিপ্রেত নয়; কিন্তু স্বাধীন দেশে জন্মিলে, দিগম্বর মিত্র ইতিহাসের অনেকটা স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অমূলক অনুমান মনে করিবেন না। "In England he might have been a Gladstone—in the united states an Arthur." দিগম্বর মিত্র ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় জন্মিলে একজন গ্লাডষ্টোন ও আর্থারের তুল্য আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, কে বলিবে? কিন্তু স্বাধীন রাজ্যের কথা যাউক,

* Rajah Digambar Mitra was a philosopher, a patriot, a philanthrophist. There was no tinge of selfishness in his patriotism:—অমৃতবাজার পত্রিকা।

হিন্দুর হিন্দুস্থানের কথাত পাড়িয়া কাজ নাই। দিগম্বর মিত্র যদি মুসলমান আমলেও এ দেশে জন্মিতেন, তাহা হইলেও ইহা স্থির যে, তিনি বাঙ্গালার বার ভূঁয়ার এক ভূঁয়া হইতেন; সম্ভবতঃ বারভূঁয়ার বৃহত্তম ভূম্যধিকারী হইয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য করিতে পারিতেন। একটা প্রাদেশিক সুবেদারি বা সাম্রাজ্যের রাজসচিবত্ব তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্য হইত না। কিন্তু এ সব এখন কেবল স্বপ্ন মাত্র। তথাচ ইংরেজ সমালোচকও স্বীকার করেন, দিগম্বর মিত্র প্রকৃতই একটি রাজ্য-নীতি-বিশারদ, দক্ষতা এবং স্বাধীনতাসমন্বিত একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যবস্থাপক। He was essentially a statesman, a legislatar of high ability and independence. *

ইংরেজ শাসনের গঠন স্বতন্ত্র। সুতরাং উপরি-উক্ত স্বপ্ন বা সম্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হইবার উপায় ছিল না। শাসনের সুকঠিন-গঠনে, যত দূর সম্ভাবিত হইতে পারে, দিগম্বর মিত্র রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছিলেন; এবং রাজমন্ত্রভবনে সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সম্মান এবং সে সমাদর কেবল মাত্র উপস্থিত অবস্থার অনুরূপ, এবং অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থার অনুপাতে অপ্রচুর হইলেও, সাধারণ হিসাবে বড় কম নহে। দিগম্বরের তুল্য পুরুষকারেই কেবল ইংরেজ রাজার তাদৃশ সমাদর ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, ইংরাজ শাসনে দিগম্বরের মত ব্যক্তির সম্যক্ গৌরব স্ফূরিত হইবার পথ না থাকিলেও, ইংরাজরাজ সে গৌরব স্বীকার এবং তাহার সমাদর করিতে অন্ততঃ একান্ত উদাসীন নহেন, ইহাও দিগম্বর মিত্র আদির রাজ-সমাদর ও সম্মান-প্রাপ্তি হইতে প্রতীত হইতেছে। অতএব প্রতিভার পুরস্কার ও উৎসাহাভাবের জন্য কেবল রাজনীতি দায়ী নহে, সে দায়িত্ব অন্যান্য কারণের উপরও সংস্থাপনীয়। এজন্য রাজনীতি আংশিকরূপে দায়ী বটে, কিন্তু সম্যকরূপে নহে।

গবর্মেণ্ট দিগম্বর-মিত্রকে "রাজ" পদ দিয়াছিলেন; "ভারত নক্ষত্র" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহা ইংরাজি সাম্রাজ্যের উচ্চতর সম্মান। কিন্তু, সম্মান অনেক অযোগ্য লোকেও পাইয়া থাকে। কত কত অকালকুষ্মাণ্ড, অকর্ম্মণ্য ও অন্তঃসারশূন্য লোকেও রাজদ্বারে "ধামা ধরিয়া" খেতাব কুড়াইয়া আনে, তাহা কিনিয়াও আনে, জানি। কিন্তু, তাই বলিয়া, অযোগ্য লোকে উপাধি পায় বলিয়া, যোগ্য লোকের উপাধি অযোগ্য হয় না। অযোগ্য লোকে উপাধি পাইয়া কেবল উপহাসাস্পদ হয় মাত্র। সরকার বাহাদুর সরকারী প্রচ-

* "India"; December, 1893.

লিত রীতির অন্যথা করেন না। অযোগ্যকে উপাধি দিয়া হাস্যাস্পদ করেন, আর মনে মনে হাসেন। বাবুর্চী খানসামা খাঁ বাহাদুর হয়; রাজকীয় রজকের রায়ভেণ্ড রায় বাহাদুর হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না। সার-মেয় "স্যর" হইয়া সিংহত্ব লাভ করে না। গবর্মেণ্টকে স্বভাবতই সাধারণ নিয়মানুসারে কাজ করিতে হয়; সুতরাং কৃষ্ণদাস পাল ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অন্যান্যকে রায় বাহাদুরী ও "সি, আই, ই" উপাধি দিয়াছেন। তথাচ অন্যান্যের এ উপাধির অপেক্ষা কৃষ্ণদাসের ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধির গৌরব অনেক অধিক ছিল। দিগম্বর মিত্রের রাজা উপাধি এবং সি, এস, আই, অলঙ্কার সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা তাঁহার well earned তাঁহার পুরুষার্থের পরিচায়ক; সম্পূর্ণরূপে স্বোপার্জ্জিত পদার্থ। তিনি আত্মপ্রভাবে, পরিশ্রমে, এবং শরীরের রক্ত ব্যয় করিয়া যেমন ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; এ উপাধিও সেইরূপে উপার্জ্জিত। তিনি উপাধিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন,—উপাধিও তাঁহাতে প্রভূত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। অসাধারণ ভাবে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সাধন, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার এবং সাহস, তাঁহার রাজনৈতিক ও প্রজানৈতিক পরিশ্রমের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদত্ত হইয়াছিল। মিত্র মহোদয়কে রাজা উপাধি প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন;—রাজা দিগম্বর মিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"বিস্তৃত বহুকাল হইতে স্থানীয় গবর্মেণ্টের সম্মুখে যত শাসননৈতিক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মীমাংসাকল্পে, আপনার পরামর্শ ও মন্ত্রণাগ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং আপনি তাহা প্রদান করিয়া গবর্মেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন। শাসনকার্য্যের এবং সাধারণের হিতার্থে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিখ্যাত এবং বহুল। তাহারই স্বীকৃতিস্বরূপ, আপনাকে, মহারাণীপ্রদত্ত এই রাজা উপাধি অর্পণ করিয়া, আমি পরম সুখী হইতেছি।"

যাদৃশ সম্ভব, এ দেশের বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক দিগম্বর মিত্রের প্রতিভা পুরস্কৃত, স্বীকৃত ও সম্মানিত, তবুও হইয়াছিল। কিন্তু দিগম্বরের দেশ, তাঁহার নিজের সমাজ, তাঁহার স্বদেশী এবং স্বজাতি বাঙ্গালী বাবু, তাঁহার সদ্‌গুণের ও শ্রমের সম্মানার্থে কি করিয়াছেন,—কিছু করিয়াছেন কি? জিজ্ঞাসা করিতেছি। সম্মান, সহানুভূতি, উৎসাহ ত দূরের কথা, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসী তাঁহাকে অসম্ভ্রম ও উপেক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন কি? পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আমরা এখনি যাহা দেখাইব, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে, এ দেশে পুরুষকারের বিকাশকল্পে বিজাতীয় রাজা অপেক্ষা স্বদেশীয় সমাজ অধিকতর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ দেশের প্রতিভাশালী পুরুষদিগের প্রায় সকলেই দেশীয়দিগের দ্বারা উপেক্ষিত, অসম্মানিত। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু আপাততঃ দিগম্বরের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করি।

"Like all self-made man he was intensely unpopular." * স্বানুবর্ত্তী স্বনাম-ধন্য-পুরুষ ব্যক্তি বঙ্গসমাজে অধন্য, অনাদৃত, নিন্দিত, লাঞ্ছিত; অতএব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি যে, দিগম্বর মিত্র লোকপ্রিয় ছিলেন না। না থাকিবারই কথা। লোকে তাঁহার নিন্দা করিত, কুৎসা করিত, অমূলক মিথ্যা কলঙ্ক রটাইত। বলিত, "এ লোকটা লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াই এত বড় জমিদারিটা করিয়াছে।" †

পুরুষকারের ইহা চমৎকার সম্মান বটে॥ কিন্তু এইরূপ সম্মানই এ সমাজে সম্ভবে। কেন? তাহা পূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি। প্রবন্ধের আরম্ভেই পতিত, গলিত পরানুবর্ত্তী স্বদেশীয় সমাজের যে অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছি, তৎপ্রতি পাঠকের পুনঃ চিত্ত আকর্ষণ করি। এতাদৃশ সমাজে পুরুষার্থের অসম্মান ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবে না। সাধারণের শত পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার এই যে, লোকের সর্ব্বনাশ করা ব্যতীত, "এত বড় একটা জমিদারি" আপন হাতে উপার্জ্জন করিবার আর কিছুমাত্র পার্থিব পন্থা নাই।" তাহার উপর হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মনুষ্যস্বভাবের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্বভাবের কুৎসাপরায়ণতা আছে। সুতরাং পুরস্কারের উপরি-উক্ত অসম্মান। কিন্তু এরূপ অসম্মান কেবল এই অধঃপতিত দেশেই সম্ভবে। মিথ্যা অপবাদের অনুমাত্র কারণ না থাকিলেও লোকে তাহা আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহার যদি যথার্থ কারণ থাকিত, রাজা দিগম্বর মিত্র যদি প্রকৃতই পরস্বাপহরণ করিয়া, "লোকের সর্ব্বনাশ" করিয়া স্বকীয় সম্পত্তি গঠিত করিতেন, এবং তাহার এক কপর্দ্দকও রায়তের উন্নতি-অর্থে, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে, প্রকৃত দরিদ্রের দুঃখমোচনে বা বিদ্যার্থী ছাত্রের অন্নদানে ব্যয়িত না করিয়া, যদি একটি কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিত না,—প্রত্যুত তাঁহার প্রশংসাবাদে

* অমৃতবাজারপত্রিকা।

† There is an impression that he gathered this fortune round a nucleus of wrong—জীবনী।

পৃথিবী পূর্ণ করিত!! রাজা দিগম্বর মিত্র যদি শত অবৈধ উপায়ে, মহাপাতক অতি পাতক করিয়াও ঐশ্বর্য্যশালী হইতেন, এবং সে ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ,—কড়া—ক্রান্তি—ক্রাক, প্রতি দিন আলস্য-পরতন্ত্র, অকর্ম্মণ্য, ঔদরিক, পরান্নবর্ত্তী, পরনিন্দুক, আজন্ম-উমেদার, চাটুকার ও ধামাধরা সম্প্রদায়ের পোষণার্থে ব্যয় করিতেন, এবং ৺ শারদীয়া পূজার নৈবেদ্যে রজতমুদ্রাপূর্ণ একখানা অতিরিক্ত খুরির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই;—কারণ, এরূপ "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" সমাজে সত্য সত্যই বিরাজিত,—অস্মদ্দেশীয় সমাজের সাধারণতঃ অবস্থাই এই!!! অতএব তৎপ্রদত্ত সুখ্যাতি অখ্যাতির বিচার করিতে বসাই পণ্ডশ্রম।

দেশের লোক দিগম্বরকে এই চক্ষে দেখিত বটে; কিন্তু এ দেশীয় ইয়ুরোপীয় সমাজ তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়াছিল। কারণ, পুরুষকার কি পদার্থ, তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ, রাজা দিগম্বর মিত্রের সত্য-পরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার, স্বানুবর্ত্তিতা এবং সৎকার্য্যে সহানুভূতি সম্যক অনুভব করিয়াছিল, এবং তিনি চোগা-চাপকান-পরা নেটিভ বাঙ্গালী হইলেও তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র, সাধারণতঃ নেটিভ-নিন্দুক স্বয়ং ইংলিশম্যান, দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন;—

He (Raja Digambar Mitra) was about as unlike the general class of Bengalees as it was possible to imagine. Upright and stern in all business matters, never afraid to express his opinions before either Europeans or his own countrymen and provided with plenty of good sense and arguments to maintain those opinions, at times the Bengalees hated him, whilst they respected him, and no native gentleman of Calcutta, has ever been held in higher esteem by Europeans. For though he disdained to cringe or flatter, and had a very direct way of expressing his opinion, every European felt that he was dealing with one of nature's gentleman, in whom was no guile. *

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি, ইহা সাধারণতঃ তাঁহারই ইংরেজী আবৃত্তি; অতএব সম্যক্ অনুবাদের আবশ্যক নাই।

ইংলিশম্যানের উল্লিখিত উক্তিতে রাজা দিগম্বর মিত্রের স্পষ্টবাদিতা, স্বাধীন-

* Saturday Evening Englishman.

চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। তিনি বিকৃত বাঙ্গালী প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাকে অগভ্যা মান্য করিলেও ঘৃণা করিত, ইংলিশম্যান ইহাও বলিতেছেন। কিন্তু, ইংলিশম্যানের মতে এ দেশীয় ইয়ুরোপীয়গণ, কলিকাতা-বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দিগম্বর মিত্রকে অধিকতর সম্মান করিতেন। ইংলিশম্যান বলেন, য়ুরোপীয়গণ, দিগম্বরের সহিত আলাপে স্বভাবের স্বহস্তনির্ম্মিত কপটতা-প্রতিশূন্য ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথনের আস্বাদ অনুভব করিতেন।

অথচ, দিগম্বরের স্বদেশীয়েরা সাধারণতঃ "অনুভব" করিতেন অন্যরূপ!! সে কি রূপ, পূর্ব্বেই পুনরুক্ত করিয়াছি। কিন্তু, দূর হউক দেশের সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের কথা। দিগম্বর মিত্র যে সকল স্বদেশীয়, শিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, সদসদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা দিগম্বরের পুরুষকার, প্রতিভা, সদ্‌গুণ এবং স্বদেশহিতৈষিতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা,—পরন্তু যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উন্নতিকল্পে, দিগম্বর জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাহা তাঁহারই জন্য এক সময়ে দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রজানৈতিক শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল,—সেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের অতি বিদ্বান ও বিশিষ্ট সদস্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দিগম্বরের জীবনীলেখক নিজেই ভ লিখিয়াছেন;—তাহা বাঙ্গালী প্রকৃতির কি পলিত অবস্থার পরিচায়ক, তিনিই বলুন না? সে ব্যবহার সম্বন্ধে জীবনী-কারের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি;—

* The members of the Association stultified themselves by their cold refusal of the usual portrait with which it was their rule to honor the memory of all their departed and retiring presidents, and of all their distinguished members. It is surprising that the man, who had always been the foremost volunteer in bearing the burden and heat of all their onerous undertakings, who was their "backbone" and who had largely raised the Association in official and popular esteem, should at last be condemned to posthumous ostracism. Thirteen years have passed without his pictorial honor.

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার চিরন্তন নিয়মানুসারে, ঐ সভার সভাপতিদিগের কার্য্যশেষে বা মৃত্যুর পর, তাঁহাদের প্রতিকৃতির বর্ণালেখ্য, সভাগৃহে সংস্থা-

পিত করার রীতি ;—কিন্তু, দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর, তদীয় মূর্ত্তির বর্ণচিত্র সভাগৃহে রক্ষা করার কথা উত্থাপিত হইলে, অকস্মাৎ এ রীতি অন্তর্হিত হয়, সভার সভ্যেরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতর সভাপতি রাজা দিগম্বরের একখানি প্রতিমূর্ত্তি-পট প্রতিষ্ঠায় অসম্মত হন!!! কিন্তু, কেন? দিগম্বর মিত্র কি উহার অযোগ্য ছিলেন, অথবা তিনি কোনও অপরাধ করিয়াছিলেন? না;—তাহা কিছু নয়। তবে উহার একটি কারণ ছিল বটে। কারণটি এই,—জীবনী-লেখক বলেন যে, এই সভার কোনও স্বার্থপর সর্দ্দার সভ্যের, সভাপতি দিগম্বরের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল। সভাপতির জীবন-কালে সেই বিকার-বিজৃম্ভিত বিদ্বেষের প্রতিশোধ দিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং কল্পিত শত্রুর মৃত্যুর পর, সেই বাদ সাধিয়া বঙ্গীয় পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন!! সভাগৃহে দিগম্বর মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে দেন নাই! এবং তাহার পর ১৩,১৪ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি রাজা দিগম্বর-মিত্রের আলেখ্য জমিদার-সভার অঙ্গ অলঙ্কৃত করে নাই!

তা, প্রতিভা-পূজার, তাহার সম্মান, পুরস্কার, উৎসাহের, ইহা অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে! যে দেশে পণ্ডিতদিগের এই প্রবৃত্তি, তথাকার অশিক্ষিত বা ইতর সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্মৃতি-চিহ্নস্থাপনে, স্বকীয় কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিলে, তাহাদিগকে বড় বেশী অপরাধী করা যায় না।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের যে অধিবেশনে রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি-পট "নামঞ্জুর" হইয়াছিল, তাহার কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ ও বক্তাদিগের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া জীবনীলেখকের কর্ত্তব্য ছিল। কেন না, তাহা বাঙ্গালী-কলঙ্কের কঠোর ইতিবৃত্ত হইলেও, ভবিষ্যদ্বংশাবলীর বিচারার্থে, এই জীবনীর সহিত গ্রথিত হইয়া থাকা উচিত।

এখন, আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরুষকার ও প্রতিভার পরিপোষণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে, রাজকীয় ব্যবস্থা তাদৃশ দোষী নয়, যাদৃশ দোষী দেশের অবস্থা, দেশীয় লোকের প্রকৃতি,—প্রবৃত্তি। রামমোহন রায় এবং তদীয় সময় হইতে, এ কাল পর্য্যন্ত, এ দেশে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই যথাসম্ভব রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত; কিন্তু দেশের লোক তাঁহাদের কাহার জন্য কি করিয়াছেন? দেশীয় লোকের প্রকৃতি প্রবৃত্তি, প্রতিভা-পরিপুষ্টির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ। তাহা ভিন্ন আরও দুইটা কারণ আছে। তাহার একটা জড়, আর একটা তথাকথিত আধ্যাত্মিক। একটা দেশের জলবায়ুর

অবস্থা, আর একটা আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু এই দুই কারণের আর এ স্থলে ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই।

প্রসঙ্গানুক্রমে রাজা দিগম্বর মিত্রের চরিত্রগত যে কয়েকটি স্বরূপ, সামান্যতঃ গ্রহণ করিয়া আমরা এই আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছি, তাহা তাঁহার জীবনের কার্য্য ও কার্য্যগতি দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়া আবশ্যক, এবং তদুপলক্ষে তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হওয়া প্রয়োজন। পরন্তু, তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যাবলী ও অভিমত, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব, যথাসম্ভব সমালোচিত হওয়া উচিত। সমালোচকের কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা তাহা করিতে বাধ্য। অথচ উপস্থিত প্রবন্ধ এত অধিক দীর্ঘ হইয়াছে যে, বাঙ্গালা সাময়িকের পক্ষে ইহা ধারণ করা সুকঠিন। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী পত্রের পাঁচ ফুলে ডালা সাজাইয়া পাঁচ রকম পাঠকের মন যোগাইতে হয়। অতএব সময় ও সুবিধা মতে, বরং অপর একটি প্রবন্ধে এ আলোচনার উপসংহার করা যাইবে। তবে তজ্জন্য আমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে উৎসুক নহি। কিন্তু আপাততঃ এই জীবনী-গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা আছে।

মহজ্জীবনের কোনও অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়; তাহা যে স্থলে একান্ত উচিত বিবেচিত হয়, সে স্থলে জীবনী লিখিত ও প্রকাশিত না হওয়াই শ্রেয়ঃ। জীবনের কেবল আলোকিত অংশের প্রকাশ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রকাশ রাখিলে, অন্ধকার অধিকতর গাঢ় হইয়া উঠে,—সে জীবনী পাঠের যে উপকার, তাহার অনেক লাঘব হয়। রক্ত মাংসে সবই যে উচ্চ এবং উচ্চতর হইবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। এরূপ আশা করিলে মনুষ্যজীবনী না লিখিয়া দেব-চরিত্রেরই সৃষ্টি করিতে হয়। মনুষ্যের জন্য মনুষ্যাদর্শ আবশ্যক। আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয়, দেবতারা মনুষ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অবতার-তত্ত্ব, এই আবশ্যকতামূলক বলিয়াই বিবেচনা করি।

চরিত্রের অংশবিশেষ উদ্ঘাটিত হইলে মনুষ্যবিশেষের মাহাত্ম্য মারা পড়ে, এ আশঙ্কাই অনেকটা ভ্রম। আবৃত করা অপেক্ষা উদ্ঘাটিত করাতেই উপকার। কারণ, তদ্দ্বারা লোকে উপযুক্ত অনুসন্ধানের অবসর পায়, তথ্যঘটিত পরীক্ষা করিয়া আপন আপন আদর্শ ও আলোক অনুসারে বিবৃত বিষয়ের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারে। এ-দেশীয় অনেক জীবন-চরিত-লেখক কিন্তু ইহা বুঝেন না। জীবনীর ঘটনাবিশেষ বা জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির কার্য্যবিশেষ সমর্থনীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় তাহা অপ্রকাশিত বা আবৃত

রাখিয়া, উপকারের আকারে, অজ্ঞাতে সে ব্যক্তির মহা অপকার করিয়া বসেন। আলোচ্য জীবনীর গ্রন্থকার, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদীয় নায়কের এ অপকার করিয়াছেন, আমরা এমন বলি না। তবে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনের সমস্ত অংশই যে তিনি পরিষ্কার বা অন্ধকারপরিশূন্য করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু তাহার দুইটী একান্ত অনিবার্য্য কারণও আছে। প্রথম কারণ, তথ্যাভাব। দ্বিতীয় কারণ, দিগম্বর মিত্রের সমসাময়িক এবং অদ্যাবধি জীবিত কোনও কোনও ব্যক্তির জীবনগত বিবরণের বিবৃতি-প্রয়োজনীয়তা। প্রথম কারণ অতিক্রম করা এ দেশে একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়টিও অতি কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, এই জীবনীলেখক দুই একটি ঘটনা, একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছেন। হয় ত, অনাবশ্যক বা অতি সামান্য বোধে ছাড়িয়া গিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অনাবশ্যক নহে, অতি সামান্যও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। জীবনীলেখক রাজা দিগম্বর মিত্রের অনেক বিশিষ্ট বন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, অথবা তাহা আদৌ আবশ্যক বোধ করেন নাই। সে ব্যক্তির নাম,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। দত্তের সহিত মিত্র মহোদয়ের সবিশেষ সদ্ভাব ছিল; তিনি সেই অভাগা কবিকে আন্তরিক স্নেহানুগ্রহ করিতেন। অথচ এই মাইকেল দত্ত ঘটিত একটি ব্যাপারে মৃত রাজার জীবনীর কোনও অংশের এক বিন্দু কিঞ্চিৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। জীবনী-লেখকের উচিত ছিল, এ অন্ধকার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। মাইকেলের নামই উল্লেখ করেন নাই। অথচ মাইকেল সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না, আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি না। মাইকেলের জীবনীকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু লিখেন, (আলোচ্য জীবনীর গ্রন্থকর্ত্তা) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়, মাইকেলের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং মাইকেলের জীবনী-সঙ্কলনে বসুজাকে আনুকূল্যও করিয়াছেন। সুতরাং মাইকেল-সম্বন্ধীয় কথা মিত্রজ-জীবনীতে অপ্রকাশ রাখিয়া আমাদের গ্রন্থকার, মাইকেল ও মিত্র, উভয়েরই প্রতি অজ্ঞাতে অবিচার করিয়াছেন; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা মিত্র-জীবনীর উল্লিখিত প্রচ্ছন্ন অংশপ্রসঙ্গে লোকের সংশয়ান্ধকার অধিকতর প্রগাঢ় হইয়াছে। অথচ, মাইকেলের প্রতি মিত্রজ মহাশয়ের (অবিবৃত) ব্যবহারে কিছুই সমর্থনীয় ছিল না, আমরা এমনও অনুমান করিতে পারি না।

যদি সময় হয়, মৃত রাজার জীবনীর এই অবিবৃত অংশ এবং অন্যান্য অংশেরও এক-আধ স্থল আমরা পরীক্ষা ও পরিষ্কার করিয়া, তাঁহার অপরাধ বা তাহার বিপরীত সাব্যস্ত করিলেও করিতে পারি।

জীবনীর উপসংহারে গ্রন্থকার, রাজার প্রকৃতি ও পুরুষকার সম্বন্ধে কিছু বিচার করিয়াছেন। সে বিচারকে সম্যক সুবিচার বলিয়া আমরা মনে করি না, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্থকার "হীরো ওয়ার্শিপ্" অর্থাৎ পুরুষকারপূজার বিরোধী নহেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রকৃত প্রতিভাশালী পুরুষ-অর্থাৎ হীরোরই অভাব। হীরোত্ব বা বীরত্ব তিনি খুঁজিয়া পান না। কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে "Star of the first magnitude" বলিয়াছিলেন বলিয়া, গ্রন্থকার কিছু গরম হইয়া তাহার পালটা গাইয়াছেন। তাঁহার মতে "first class star" অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর তারকা পৃথিবী হইতে এত অধিক দূরে যে, তাহার জ্যোতিঃ মর্ত্ত্যজগতে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব লাগে, কাযেই সে জ্যোতিঃ, দূর পথ পর্য্যটন করিয়া, অদ্যাপি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই,—পথে পথেই আছে। কৃষ্ণদাস পালের মানসাকাশে জোনাকীর ষৎসামান্য জ্যোতিঃও উজ্জ্বল নক্ষত্রালোক; কিন্তু আমাদের এই গ্রন্থকারের "গগন" ভিন্নপ্রকৃতির, গ্রন্থকার নিজেই এ কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। ইহা উত্তম।

গ্রন্থকারের আদর্শ, অবশ্য খুব উচ্চ,—উচ্চতর হইতেও উচ্চতম। আমরাও,—নাগাল পাই বা না পাই,—অত্যুচ্চেরই আকাঙ্ক্ষী। অতএব ছোট খাট "হীরো ওয়ার্শিপে" হাত দিয়া আজি হীরোত্বের হানি বা হত্যা করিতে নারাজ। তবে আমাদের এবং আমাদের এই গ্রন্থকারের অত্যুচ্চ "গগন", আপাততঃ যে দূরে, সেই দূরেই রাখিয়া, ও হীরোত্বের হাস্যরসকে বিদায় দিয়া, এ স্থলে একটি কথা ধীরভাবে আলোচ্য হইতে পারে।

যে পুরুষকার উপযুক্ত অবসর থাকিলে, একটি রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিত, এবং যদ্দ্বারা একটি বৃহৎ সম্পত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সেই কার্য্যকে সচরাচরসংঘটিত "common place" ঘটনা বলিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এক কথাতেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। self-made man অর্থাৎ "স্বনাম-ধন্য পুরুষ" তাঁহার মতে common place কি না সংসারের সচরাচর-সংঘটিত অতি সাধারণ বা ইতরঘটনা-মূলক! কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কি উহা তাই? সংসারে ত অসংখ্য লোক ঘুরিতেছে, বহু বহু

স্বাধীনতা, অধ্যবসায়, অভিমতের ঐকান্তিক স্থৈর্য্য, সাধারণ কার্য্যে নিঃস্বার্থপরতা, এক কথায় তাঁহার পুরুষকারের আমরা প্রশংসা করি, গ্রন্থকারও তাহা করেন। তিনি কিন্তু প্রধানতঃ একটি বিষয়ের জন্য অধিক প্রশংসা করেন। সে বিষয়টি তাঁহার নিজেরই কথায় এই যে, দিগম্বর মিত্র possessed a heart approaching to an English stout heart and a force of will approaching to an English force of will. পুনশ্চ ;—Digambar is the hero of our epic on account of that manly character, which meets from Europeans with an enlightened appreciation.

ইহার অর্থ এই যে, দিগম্বর মিত্রের অন্তঃকরণ ও ইচ্ছা-শক্তি ইংরাজের সরল অন্তঃকরণ এবং ইংরাজের ইচ্ছাশক্তির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল, অর্থাৎ মিত্রজা মহাশয় ইংরাজী অন্তঃকরণ প্রায় পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার তাঁহার প্রশংসা করেন। পরন্তু, দিগম্বরের যে পুরুষার্থপূর্ণ চরিত্রের ইয়ুরোপীয়েরা "তারিপ" করিতেন, সেই ইয়ুরোপীয়-অনুগৃহীত চরিত্রের জন্যই, রাজা দিগম্বর, গ্রন্থকারের এই "এপিক" অর্থাৎ মহাকাব্যের, হীরো কি—না বীর হইতে পারিয়াছেন ; নহিলে পারিতেন না।

ফলতঃ, গ্রন্থকারের এই আদর্শকে খুব উচ্চ আদর্শ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ফলিতার্থে মিত্র মহোদয় ইংরাজ হৃদয় ও ইংরাজী ইচ্ছাশক্তির অনুকারী ইংরাজও হয়েন নাই। তাহা আমরা এই গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতেই অবগত হই। পরন্তু, তাহা হইলে স্বয়ং ইংরাজরাই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, সর্ব্বথা সম্মান করিত না। পরন্তু তাহা হইলে আমরা তাঁহার যে পুরুষকারের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাও তাঁহাতে জন্মিত না। কেন না, স্বজাতির স্বাভাবিক এবং অবিকৃত প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরপ্রবৃত্তির অনুবৃত্তি ও পরানুকারী হইলে, কস্মিন্ কালেও কোনও ব্যক্তিতে পুরুষার্থ সম্ভবে না। অতএব, গ্রন্থকারের উপরি-উক্ত উক্তি আমরা একান্ত ভ্রমাত্মক বিবেচনা করি।

দিগম্বর মিত্র বাঙ্গালীর বিকৃত এবং পরানুবর্ত্তী প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু তাই বলিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালিত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই ; তাহা তাঁহার হাড়ে হাড়ে ছিল। তজ্জন্যই তিনি পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, নহিলে হইতেন না। ইংরাজতুল্য কার্য্যকুশলতার সহিত বাঙ্গালীবৎ কোমল হৃদয়ের অধিকারী তিনি ছিলেন। এ বিষয়ে শিশির কুমার ঘোষের কথাই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা করি। পত্রিকা-সম্পাদক বলেন,—"he was as

হইতে আমরা স্পষ্টই জানিলাম যে, এই বায়ুমণ্ডল বায়বীয় অণু ব্যতীত নানাবিধ কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুকণা সংমিশ্রিত। তন্মধ্যে ধূলিকণার পরিমাণই অত্যধিক। ভূপৃষ্ঠ অনুক্ষণ জীবজন্তু দ্বারা ও অন্যান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। উৎক্ষিপ্ত রেণুর মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভারী, তাহারা পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত লঘু ও সূক্ষ্ম, তাহারা বায়ু-প্রবাহসহকারে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নীত হইতেছে। এইরূপে অতি উচ্চতম বায়ুস্তর পর্য্যন্তও অতি সূক্ষ্মতম রেণুকণিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।

ধূলিকণা ব্যতীত অন্যান্য কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম অণুও বর্ত্তমান থাকে। নানাবিধ জান্তব ও ঔদ্ভিদিক ধ্বংস-ও-ক্ষয়, বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ক্রমাগতই বায়ুরাশিতে মিশিতেছে। প্রস্তর, কঙ্কর, অঙ্গার, লৌহ ও নানাবিধ খনিজ পদার্থের অণু বায়ুসাগরে ভাসমান থাকে। অনন্ত নভোমণ্ডলে উৎচূর্ণ অতি সূক্ষ্মতম রেণুর আকারে বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপ কেবল মৃত্তিকাচূর্ণ নহে; ঔদ্ভিদিক, জান্তব, ধাতব প্রভৃতি নানা স্থূল পদার্থাণু অনন্ত বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের রেণু কেবল ধূলিকণিকা নহে। তবে অধিকাংশ রেণুই, যেমন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব,—অনতি উচ্চ বায়ুস্তর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। ধূলিকণিকাই অতি সূক্ষ্মতম আকারে বায়ুপ্রবাহে অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তন্মধ্যে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে বায়ু আমাদের প্রাণ, যাহা নিশ্বাস দ্বারা পান করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি, সেই বায়ু নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হওয়া কত আবশ্যক, অথচ আমরা দেখিতেছি, কত অগণ্য প্রকারের বিজাতীয় পদার্থাণু তৎসহ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পাঠক আপনি কি ইহা হইতে মনে করিবেন যে, ইহা একটি অন্যায় ব্যাপার, অনন্ত বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে ইহা একটি অসঙ্গত দৃশ্য? আমরা কিন্তু আপনাকে তত সহজে এরূপ ভাবিতে পরামর্শ দিই না। আমরা ক্ষুদ্র মানব, বিশাল বিশ্বসংসারকে মানবের সুখ অসুখ, সুবিধা অসুবিধার মধ্য হইতে পরিদর্শন করিতে যাই বলিয়াই, এ জগৎ ব্যাপারের মধ্যে নানা অসঙ্গত ভাব দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, জগৎ-সংসার অসঙ্গত-ব্যাপারে পূর্ণ নহে।

পাঠক! যদি আপনি সুকবি হন, তাহা হইলে কত সময়েই না নভকোপরি সুনীল গগনের পানে তাকাইয়া সে অনুপম নীলিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে কবিত্বরসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকিবেন। অথচ কখনও কি ভাবিয়াছেন, ঐ সুন্দর নীলাভ আকাশ কোথা হইতে আসিল? আকাশ ত শূন্য, কিন্তু শূন্য

দেশ কিরূপে, কিসের জন্য, ঈদৃশ নয়নানন্দ অনির্ব্বচনীয় নীলবর্ণে সুশোভিত হইল। বোধ হয়, যদি আমরা এখন আপনাকে বলিয়া দিই যে, শূন্যদেশে ধূলিকণার বিদ্যমানতার জন্যই গগন সুনীল হইয়াছে, আপনি সহজে আমাদের কথা বিশ্বাস করেন কি না, সন্দেহ। অথচ প্রিয় পাঠক, দুই আর দুই চার, ইহা যেমন সত্য, তেমনি আপনার চরণবিক্ষুব্ধ ধূলিকণাই অনন্ত নভোমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোনও বিশেষ কারণে সুন্দর, অতিসুন্দর নীলাভা দ্বারা আকাশকে এরূপ কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছে। কেবল নীলাকাশ নহে, সান্ধ্য গগনের বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব্ব শোভাও এই ধূলিকণার জন্য। কেবল তাহাই নহে। অন্ধকার গৃহে বায়ুকণা বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেমন রশ্মিরেখা পথ সমুজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ অনন্ত শূন্যদেশে অসংখ্য অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম ধূলিকণিকা বিদ্যমান আছে বলিয়াই, সূর্য্যোদয় হইলে অনন্ত আকাশ আলোকিত পরিদৃষ্ট হয়। ধূলিকণা শূন্যপথে না থাকিলে, সূর্য্যোদয় হইলেও নিখিল গগন দীপ্ত দৃষ্ট হইত না। কেবল ইহাই নয়। আকাশে বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য রেণু অবস্থান না করিলে মেঘ হইত না, বৃষ্টিধারা পতিত হইত না, শিলা, তুষার, হিমানী ও কুজ্ঝটিকা পরিগঠিত হইত না। সূর্য্যকরে মহাসাগর শুষ্ক হইয়া, অনন্ত আকাশকে বাষ্প দ্বারা পূর্ণ করিলেও, রেণু অভাবে বৃষ্টি হইত না। পাঠক! ভাবুন, তাহা হইলে তৃণশস্যপূর্ণ ফল ফুলে সুশোভিত এই ধরার অবস্থা কি হইত? পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি সত্ত্বেও, ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য নদ নদী হ্রদ সাগর উপসাগর সত্ত্বেও, পরিশ্রমী কৃষক-হস্ত প্রাণপণে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিলেও, এই শস্যশালিনী পৃথিবীর কি দুর্দ্দশা ঘটিত? শস্য অভাবে জীব জন্তু আমরা মানব পর্য্যন্ত আজ কোথায় থাকিতাম? হায়! তবে কি পদদলিত ধূলিকণার নিকট আমাদের ন্যায় এরূপ উচ্চ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানব পর্য্যন্ত উদরের অন্নের জন্য, এমন কি, আপনাদের অস্তিত্বের জন্য ঋণী? হাঁ, তাই ঠিক। ধূলিকণা বাস্তবিকই এত আবশ্যক পদার্থ। বিশাল সংসারে রেণু প্রকৃতই অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বিশেষতঃ এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনা সম্বন্ধে রেণু এক অতি প্রয়োজনীয় কারণ। আমরা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে দেখাইব, এই সামান্য ধূলিকণা কিরূপে প্রকৃতি ভাণ্ডারে এত প্রয়োজনীয় গুরুতর কার্য্যের সাধন করিয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, যদি অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথ দিয়া একটি ক্ষুদ্র আলোক-রেখা প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে ঐ

আলোক-পথে যে সকল অবলম্বিত বেণু থাকিবে, তাহারা আলোকসংস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া আলোক-পথটি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। ইহাতে যেমন এক দিকে বায়ুর সহিত ধূলিকণিকার সংমিশ্রণ বুঝা যাইতেছে, সেইরূপ অপর দিকে আর একটি বিষয়ের উপলব্ধি করা যায়। যদি গৃহে ধূলিকণা না থাকে, আলোক আসিলেও, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে না। পাঠক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঘরের জানালাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, ঘরের অন্যান্য দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, যদি ঐ জানালাটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জানালার ছিদ্রপথ দিয়া গৃহমধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবে। অবশ্য জানালার ছিদ্র সূর্য্যের অভিমুখে হওয়া আবশ্যক। কিরণরেখা গৃহমধ্যে আসিতেছে কি না জানিবার জন্য আলোক-পথ অনুসরণ করিয়া যদি একখানা কাগজ কি বই কি অন্য কোনও একটা জিনিস ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের উপর আলোক দৃষ্ট হইবে, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আলোকরেখা আসিতেছে, মধ্যবর্ত্তী বায়ুতে যদি ধূলিকণা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা দৃষ্ট হইবে না। মনে করুন, বায়ুতে ধূলি নাই; সুতরাং আলোকরেখাপথ দৃষ্ট হইতেছে না। এখন যদি কোনও প্রকারে খানিকটা ধূলা উড়ান যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সরল আলোকরেখা পথ প্রত্যক্ষ হইবে। ধূলিকণার বিদ্যমানতাতেই কিরূপে আলোকবৈথাপথটি এমন উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টিগোচর হইল, আমরা তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিব।

সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে (ঈথরের কথা ছাড়িয়া দিলে) কেবল বায়ুস্তরেরই ব্যবধান আছে, আর কিছু নাই। আলোক সকল প্রকার বাষ্পের অভ্যন্তর দিয়া অবাধে আসিতে পারে। অবাধে আসিতে পারে বলিয়াই বাষ্পের মধ্য দিয়া আলোক সরল ও ঋজু ভাবে বহির্গত হয়। সুতরাং প্রতিফলিত অর্থাৎ তির্য্যক্‌গতিবিশিষ্ট হয় না। এজন্য যখন নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পস্তরের মধ্য দিয়া আলোকতরঙ্গ গমন করে, সে আলোক আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। কিন্তু প্রোক্ত অন্ধকার গৃহের ছিদ্রপথ দিয়া আলোক-রেখা আসিয়া ধূলিকণা-সংস্পৃষ্ট হইলে যখন স্বীয় পথটিকে উজ্জ্বল করে, তখন আলোক-তরঙ্গ ধূলিকণা দ্বারা ব্যাহত হয়, অর্থাৎ ধূলিকণা আলোক-রেখাটিকে প্রতিফলিত করিয়া চারি দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। সেই জন্যই আলোক-পথটি উজ্জ্বল হয়, আর আমরাও উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সেইরূপ, গগনে অসংখ্য ধূলিকণা আলোক-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করিয়া দিকদিগন্তে আলোককে পরিব্যাপ্ত করে। এই জন্য আকাশ উজ্জ্বল হয়। যদি ধূলিকণা এরূপে আলোককে প্রতিফলিত না

করিত, সূর্য্যকিরণে আকাশ আলোকপূর্ণ ও উজ্জ্বল হইত না। দিবাভাগেই সূর্য্যালোকিত উজ্জ্বল আকাশের পরিবর্ত্তে ঘোর অমানিশার ন্যায় আকাশ পরিলক্ষিত হইত। এই আঁধারময় ঘন কৃষ্ণবর্ণ আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র পাশাপাশি জ্বলন্ত পিণ্ডবৎ দেখা যাইত। ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমানের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধকর ও সমপরিব্যাপ্ত আলোকপূর্ণ না হইয়া অতি প্রখর আলোক ও ঘন অন্ধকারের দৃশ্যস্থল হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বায়ুরাশির মধ্যে অগণিত রেণু অবলম্বিত রহিয়াছে। আলোক-তরঙ্গ শূন্যপথ দিয়া আসিবার সময় ইহাদিগের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। আলোক প্রতিফলিত হইয়া আকাশকে উজ্জ্বল করে, দিগ- করে, এবং আমাদের এই পৃথিবীও উজ্জ্বল ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। আমাদের চক্ষুযন্ত্রও এইরূপ সম- াপ্ত অতি প্রখর আলোক প্রত্যক্ষ করিবার উপযুক্ত। অপ্রতি- আলোক আমাদের দৃষ্টি সহিতে পারে না। আর বলা বাহুল্য, া দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া নভোমণ্ডলকে সমভাবে উজ্জ্বল শোভিত করে বলিয়াই জগতের শোভা; নীল পীত হরিত লোহিত পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র বিকাশে ও সংমিশ্রণে প্রকৃতির মনো- সৌন্দর্য্যশ্রী।

কিন্তু আকাশ সুনীল হইল কেন? আকাশের এ সুনীলাভাও ধূলিকণারই কিন্তু ইহার নিগূঢ়ত্ব বুঝিবার সুবিধার জন্য আলোকতত্ত্বের একটু আলো- ক। আমরা জানি, সূর্য্যরশ্মি আপাততঃ শুভ্র প্রতীয়মান হইলেও ার বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সংমিশ্রণফল। এই সাত প্রকার ঙ্গ সমান আকারের নহে। লোহিত বর্ণের তরঙ্গগুলি সর্ব্বা- নীল ও বেগুনের তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আলোক- আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র আয়তনের। ইহারা ঈথর নামক এক ম, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ও জড়ধর্ম্মী পদার্থের মধ্য দিয়া অতি প্রবল তরঙ্গ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই সহস্র মাইল ধাবিত হয়) হইতেছে। এই সাত প্রকার বর্ণের অসম আকারের আলোক- চয়ের মধ্যে কোনও একটা বস্তু যে বর্ণের আলোক তরঙ্গমালা প্রতি- ফলিত করিতে পারে, সেই বস্তু সেই বর্ণের দেখায়। কারণ, বাস্তবপক্ষে বর্ণ পদার্থগত ধর্ম্ম নহে। সূর্য্যরশ্মির সপ্তবিধ বর্ণালোকের মধ্যে যে বস্তু যে বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত করে, সে বস্তুরও সেই বর্ণ হয়। যেমন গোলাপ ফুল। গোলাপ

দেখিতে লাল হইলেও প্রকৃতপক্ষে গোলাপের নিজের কোনও বর্ণ নাই। তবে গোলাপের এই বিশেষত্ব আছে যে, উহা সূর্য্যরশ্মির লোহিত বর্ণের আলোক-তরঙ্গকেই প্রতিফলিত করিতে পারে, এবং অন্য বর্ণের তরঙ্গকে প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই জন্য এই ফল হয় যে, অন্য বর্ণের আলোকতরঙ্গগুলি গোলাপ আত্মসাৎ বা শোষণ করে, এবং কেবল লোহিত আলোকতরঙ্গগুলিই প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই গোলাপ লাল পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবল গোলাপ কেন, অন্য সকলবিধ পরিদৃশ্যমান পদার্থের বর্ণ সম্বন্ধেও ইহা সত্য। যে বস্তু যে কোনও বর্ণের তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে পারে, সেই বস্তু সেই বর্ণের হইবে। আলোক-বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞান লইয়া আমরা এখন পুনঃ ধূলিকণার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আলোকতরঙ্গ সমস্ত গগনপথ দিয়া আসিবার সময় বায়ুস্তর সূক্ষ্ম রেণুকণিকা দ্বারা প্রতিফলিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলন শব্দের অর্থ এই যে, কতকগুলি তরঙ্গকে অবাধে যাইতে দেওয়া। তাহা হইলে ধূলিকণা কতকগুলি তরঙ্গকে, অর্থাৎ কোন বর্ণের আলোকতরঙ্গকে বাধা দিয়া ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু এইরূপ প্রতিফলন করিবার কালে কেবল সেই বিশেষ ধর্ম্মের বর্ণেরই বিকাশ হইবে, এন্য কোন বর্ণের তিরোধান হইবে। সুতরাং ধূলিকণা সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়া বিশেষ বর্ণের বিকাশ করে। সেই বিশেষ বর্ণ নীলবর্ণ, এবং সেই বর্ণই আকাশের বর্ণ। রেণু, অতি সূক্ষ্ম রেণুও দেখিতে তাই নীলাভ। আকাশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পূর্ণ ও ধূলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, রেণুমাত্রেই সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলিত করে না। রেণুর মধ্যে যাহারা অতি সূক্ষ্ম, তাহারাই করিতে পারে। সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে কেহ বা হরিৎ, পীত বর্ণের আলোকতরঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতিফলনে সক্ষম হয়। যাহারা তাহারা আলোক-বিশ্লেষণ করিতে অক্ষম, অর্থাৎ কেবল ফলিত করে। চুরুটের যে ধূঁয়া মুখ দিয়া বাহির করা যায়, তাহা শুভ্র কিন্তু উহার অপর প্রান্ত হইতে যে ধূম্র নিঃসৃত হয়, তাহা নীলাভ। ইহার কারণ এই যে, মুখ দিয়া যে ধূঁয়া বাহির হয়, তাহার সহিত স্থূল অণু মিশ্রিত থাকে বলিয়া, উহা শ্বেতরশ্মিই প্রতিফলিত করে, আর অপর প্রান্তের ধূম্রের

সহিত অতি সূক্ষ্ম অণু-মিশ্রিত হইয়া থাকে বলিয়াই উহা সূক্ষ্ম রেণুর ধর্ম্ম প্রকাশ করে, অর্থাৎ নীলাভ প্রতীত হয়।

নগরে ও প্রশস্ত জনপদে অপেক্ষাকৃত স্থূল রেণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়াই সহরের আকাশ তত সুনীল দৃষ্ট হয় না। এমন কি, অনেক পরিমাণে শুভ্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে কিম্বা পর্ব্বতের উপরে, যেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু ব্যতীত আর কিছুই বায়ুস্তরে মিশ্রিত থাকে না, সেখানকার আকাশ অতি সুন্দর নয়নানন্দদায়ী নীলবর্ণে মণ্ডিত। ক্রমে যত উচ্চদেশে উত্থান করা যায়, ততই সূক্ষ্ম রেণুর অভাব হয়; এই জন্য আকাশ-নীল না হইয়া কৃষ্ণবর্ণের স্তরকে উজ্জ্বল নক্ষত্রশ্রেণী সমধিক উচ্চে উঠিলে আমাদের এই সুনীল আকাশ কিরণে দীপ্ত হইতাই কাল আকাশ দেখিতে পান! শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আকাশ অপেক্ষাকৃত ঘনতর নীলবর্ণের। ইহার কারণ এই যে রেণুকণিকা সকল শীঘ্রই বাষ্পকণা দ্বারা আচ্ছাদিত ও গুরুতর হয়; সুতরাং আর নীল-রশ্মি প্রতিফলিত করিতে পারে। যে দেশে রেণুকণিকা অনেক দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়, আর বাষ্পে পরিণত হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম রেণু সূক্ষ্মই থাকে, সুতরাং হইয়া নীল-রশ্মিপ্রতিফলনের শক্তি বিবর্জ্জিত হয় না। সুতরাং আকাশ গাঢ়তর নীলবর্ণ-সমন্বিত। সান্ধ্য-গগনের লোহিত মিশ্রিত মেঘের প্রতিফলনক্রিয়ার ক্রিয়াফল। বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, কুজ্ঝটিকা, হিমানী ও তুষারের সহায়তা করে। আমরা সচরাচর মনে করি, বাষ্প বাস্তবিক তাহা নহে; বাষ্পের কোনও রূপ বর্ণ ও পদার্থ কিন্তু ধূলিকণাসংস্পর্শে ঘনীভূত ও সম্বদ্ধ হয়। একটি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা ইহার যাথার্থ্য একটি কাচ-স্থালীকে প্রথমে বায়ুশূন্য করিয়া পরে বায়ু পুনঃপ্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলে স্থালীতে তাহা রেণুশূন্য। তুলা ছাঁকনির মত বায়ু হইতে রেণু সকল ধরিয়া রাখিয়া কেবল বায়বীয় অণুকে স্থালীমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছে। যদি এই স্থালীপ্রবিষ্ট বায়ু সম্পূর্ণরূপে ধূলিকণিকাবিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে যদি উহার মধ্যে এক্ষণে খানিকটা বাষ্প (যেমন চা গরমের পাত্র হইতে) প্রবেশ করান যায়, সে বাষ্প চক্ষুর-গোচর হইবে না। খানিক

পরে কেবল এই দেখা যাইবে যে, স্থালীর আভ্যন্তরীণ-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু সংগঠিত হইয়াছে। বাষ্প শীতল হইয়াই স্থালীর গাত্রে বিন্দু বিন্দু জলরূপে বাষ্প জমাট বাঁধিয়াছে। কিন্তু স্থালীর মধ্যদেশে কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। এক্ষণে যদি খানিক পরিমাণে ধূলিপূর্ণ বায়ু অথবা এই সাধারণ বায়ু প্রবেশ করান যায়, তৎক্ষণাৎ মেঘের ন্যায় ধূমবৎ পদার্থ স্থালীমধ্যে লক্ষিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, স্থূল ধূলিকণাদিগকে আশ্রয়স্বরূপ পাইয়া, শূন্যাবলম্বিত বাষ্পকণা সকল উহাদের চতুঃপার্শ্বে সংলগ্ন ও সম্বদ্ধ হইয়া মেঘের মত ধূমের সৃষ্টি করে। শীঘ্রই দেখা যাইবে যে, ধূমবৎ পদার্থ ক্রমে বৃষ্টিধারার ন্যায় স্থালী-মধ্যে পতিত হইতেছে। এই কাচস্থালীমধ্যে যাহা ঘটিল, আকাশেও তাহাই ঘটে। সমুদ্র হ্রদ নদ নদী তড়াগ হইতে জল বাষ্প হইয়া উত্থিত হয়। শূন্যে অদৃশ্য বাষ্পকণা ধূলিকণার আশ্রয়ে ঘনীভূত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। মেঘস্থ ঘনীভূত ও সুসম্বদ্ধ বাষ্পকণা অধিক শীতল হইলে বৃষ্টি পতিত হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ব্যতিরেকে একটি বাষ্পকণাও কখনও আপনাপনি না। কেবল বৃষ্টি নহে। শিলা, তুষার ও কুজ্ঝটিকা ধূ সংগঠিত হইতে পারে না। বৃষ্টি না হইলে পৃথিবীতে শস্য না হইলে জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। অত এই সামান্য পদদলিত ধূলিকণার নিকট আমরা কিন্তু কেবল প্রাণধারণ নহে। আরও কত প্রক পরিত্রাণ পাই। আমরা দেখিলাম, বাষ্প ঘনীভূত কোনও প্রকারের একটা স্থূল আশ্রয় আবশ্যক ব গত ধূলিকণিকা। ধূলিকণিকার অভাবে অন্ত আমাদের পরীক্ষার কাচস্থালীর গাত্র। একটা স্থূল বাঁধিয়া বৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা, শিলা বা হিমানী, কে করিতে পারে না। কিন্তু যদি এইরূপ হইত যে, এই বায়ুস্তর ধূলি বা রেণুশূন্য হইত, অথচ সূর্য্য জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থাপিত করিত, তাহা হইলে কি হইত? সে চিত্র মনে করিতেও মনে আশঙ্কার উদয় হয়। বর্ষার সময় দোহারা ক খুব বড় ছাতি মাথায় দিয়া পথে গেলেও, ছত্র দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র বা শরীরকে কোনও রকমে বাঁচাইতে পারা যাইত না; সমস্তই আর্দ্র হইয়া যাইত। যত

বাষ্প-অণু ছাতি, বস্ত্র ও গাত্রে স্থূল আশ্রয় পাইয়া জমাট বাঁধিত। সুতরাং সুবৃহৎ ছত্র ব্যবহার করিলেও, সর্ব্বাঙ্গ ও সমুদয় পরিচ্ছদ জলধারায় সিক্ত হইত। গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত থাকিলে, অসম্বদ্ধ বাষ্প-অণু সকল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যা, বস্ত্র, পুস্তক, টেবিল, চেয়ার, গৃহভিত্তি, ছাদ—সমুদয় স্থূল পদার্থে বাষ্প-কণার জমাট বাঁধিবার আশ্রয় হইয়া জলে পূর্ণ হইয়া যাইত। শীতকালেও কুজ্ঝটিকা, তুষার গৃহমধ্যে সংগঠিত হইয়া গৃহের আসবাবপত্র সাজসজ্জাকে জলময় করিত। গাত্রের শীতবস্ত্র ভিজিয়া যাইত। গৃহমধ্যে থাকিয়াও বর্ষার জলের অত্যাচার হইতে নিস্তার থাকিত না, শীতবস্ত্রে আপাদমস্তক সমাচ্ছাদিত হইয়াও শীতের প্রাবল্য অনুভব করিতে হইত। এ বিষম অসুবিধার মধ্যে জীবন-যাপন কতই না বিড়ম্বনাময় ও ক্লেশকর। প্রিয় পাঠক! তাই এখন ভাবুন, ভাবে ধূলিকণা আমাদের কত উপকারী বন্ধু,—বাস্তবিক ধূলিকণার নিকট কলিত প্রখরতার দেবেচ্ছ হওয়া উচিত।

সূর্য্যালোক ধূলিকণা দ্বারা শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।
কিরণে পরি-কর্ত্ত উষ্ণপ্রধ
ধূসর শীঘ্র জলরূপে
হারিণী উচ্চত্ব প্রাপ্ত হ

সহযোগী সাহিত্য।

কি উষ্ণপ্রধান দেশের
জন্য। ও এই রেণু বা রেণুসং

সাহিত্য।

ল সুকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই চনা আবশ্যক আমরা দেখিতে ইচ্ছা করিব। সকলেরই জীবন অতি দুর্ব্বহ বিষাদভারে আদৌ সাত প্রকা কিরূপে নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত। ইহা কেবল ইংরাজী সাহিত্যের বর্ণের আলোকতর । কিন্তু । ইংলণ্ডে বায়রন্, শেলী, কিট্‌স্, বাযরণ; ফ্রান্সে চিনিষর, লীতে লিওপার্দ্দি—আমেরিকায় এড্‌গার পো; ইহাঁদের পেক্ষা বৃহৎ, আর স্বাভাবিক ও সার্থের অমর উক্তিটি প্রযুক্ত হইতে পারে,—তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র, য় ন্যায় Youth begin in gladness, in the end despondency and madness. প্রকার অতি সূক্ষ্ম তে পারে। তা রিবিউ' পত্রে চার্লস্ জনষ্টন সাহেব দুই জন কসীয় বেগে (আলোকি দিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় ইহাঁদেরও কবিজীবনের পরি-ক্রমাগত ধাবিত প্রবেশ করিল যম, আত্মপীড়া, মনস্তাপ, অপমৃত্যু বা অকালমৃত্যু। আমরা তরঙ্গনি সাহেবের প্রবন্ধ হইতে কলটসফ্ ও লারমনটফ্ নামক সেই দুই জন কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আলেক্সি কলটসফ্।

(খৃঃ ১৮০৮—১৮৪২)

রুষ কবি বায়রনের ন্যায় কলটসফ্ও একজন কৃষকের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বীয় সম্প্রদায়-

মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ লেখাপড়া জানিতেন না। উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি মনে করিতেন, ব্যবসায়ের হিসাবপত্র রাখিবার নিমিত্ত যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, তাহাই যথেষ্ট। এই জন্য দশ বর্ষ বয়সে, আঠারো মাস মাত্র বিদ্যালয়ে কাটাইয়া, আলেক্সিকে তাঁহার পিতৃব্যব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি যতই দুঃখিত হইলেন, কারণ ইতিমধ্যেই তাঁহার শৈশবহৃদয়ে বিদ্যানুরাগ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সরস্বতীর চরণতলস্থ শতদলের সৌরভ যে একবার আঘ্রাণ করিয়াছে, সে ত কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আর যাঁহার প্রাণে প্রতিভার স্বর্গীয় শিখা নিহিত রহিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। কল্‌টসফ্ সুবিধা ও অবসর পাইলেই পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। সে সুবিধাও সর্ব্বদা ঘটিত না; পিতৃনির্দ্দেশে তাঁহাকে প্রায়শঃ সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইহার উপর আবার পুস্তক ও সুপরিচালকের অভাব। সুতরাং জীবনে তাঁহার রীতিমত শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

কল্‌টসফের বিদ্যাশিক্ষা।

এই সময়ে কল্‌টসফের পিতৃবন্ধু এক বণিকের পুত্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইল। বণিক কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া তাহারই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ভূত প্রেতের কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং উহাতে কল্‌টসফের বুদ্ধির পরিপোষক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি যাহা সহকবি আলেক্সি তাহাতে তাঁহার কবি-হৃদয় প্রসারিত হইয়া উঠিল। তিনি সহজ ও সুমধুর ছন্দে রচনা করিতে দীক্ষিত হইলেন।

কবি-হৃদয়ের শিক্ষা।

কল্‌টসফ্ চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি একটি ছত্রও পদ্যের প্রণয়ন করেন নাই; কোনও কবিতা-গ্রন্থ পড়েন নাই। এক দিবস তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে বাজারে গিয়া দৈবক্রমে রুসীয় কবি মিত্রিয়েফের গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মিত্রিয়েফের কাব্য মধুর গীতি পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজে কবিতা স্ত্রীলোক মন দিলেন। প্রথম প্রথম তিনি অতি আয়াসে, অনেক ত্রুটিতে পদ্য তবে দুই একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মনোনীত হইলেও, উহাদের গঠনপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কবিতা ছন্দের অন্তর্গত। ইহাতে অনায়াসে ক্ষিপ্রতা লাভ করিতে হইলে বহুল সাধনার প্রয়োজন। লোকে গাঁথিবারও নিয়ম আছে; তিনি তখনও সে নিয়ম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সংসার-সমরে তাঁহার তেমন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। তাঁহার হৃদয় তখনও কোনও প্রকার গভীর সুখদুঃখে তরঙ্গিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনে কাব্যোপযোগী বিষয়েরও অভাব। এই অবস্থায় কল্‌টসফ্, সেবিব্রিস্কি নামক একজন কৃতবিদ্য বন্ধু লাভ করিয়া, তাঁহার সাহায্য ও উপদেশে, আপনার বাঞ্ছিত পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন।

কবিজনোচিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। জন্মস্থান বেরোনেজের সন্নিহিত শস্যশ্যামল প্রান্তরে তিনি পশুপাল চরাইয়া বেড়াইতেন। এইরূপে উহাদিগকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, বিক্রয়ার্থ বাজারের অভিমুখে ছুটিতেন।

কল্‌টসফ্ সাংসারিক কবি।

পিতৃপরায়ণ যুবক পিতার আজ্ঞাপালনে কখনও অবহেলা করিতেন না। প্রকৃতির যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভা তাঁহার কবিতাসমূহে প্রতিফলিত দেখিতে পাই, ভাবী কবির হৃদয়ে এইখানেই তাহার বীজ নিহিত হয়। প্রথম বয়সে এইরূপ রুসিয়ার জনসাধা-

রণের সহিত সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যতে তাহাদের অন্তরের কথাগুলি নিজের ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া, তাহাদের ভালবাসা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে কবির বিংশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাঁহার জীবনের প্রধান দুর্ঘটনার কাল সমুপস্থিত হইল। কলটসফ্ দুন্তশানাম্নী পিতৃপরিবারভুক্তা এক পরিচারিকার অন্তর ও বহিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দুন্তশারও হৃদয় অবিচলিত রহিল না। কিন্তু কবির পিতা গোপন-পরিণয়ের আশঙ্কা করিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুন্তশা ও তাহার মাতাকে সরাইয়া দিলেন। কলটসফ্ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য; শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর দ্বারস্থ হইলেন; কিন্তু মরিলেন না। রোগমুক্ত হইয়া দুন্তশার সন্ধানে দিগ্বিদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে শুনিলেন, দুন্তশা, তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতে, এক সৈনিকের সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। কবির-প্রতিভা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বতন কবিদিগের পথ ছাড়িয়া দিয়া, নূতন ছন্দে, নূতন সুরে আপনার হৃদয়ের অনন্ত বিষাদগীতি গাহিতে লাগিলেন।

কবির প্রেম ও তাহার পরিণাম।

রুষ, রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ অথবা মস্কাউ নগরীতে যাইয়া তথাকার বিদ্বৎসমাজে যাইবার নিমিত্ত চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহাকে মস্কাউ নগরীতে প্রেরণ করিলেন। এক বন্ধুর সাহায্যে কবি তত্রস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। এই পরিচয়ের

প্রথম প্রকাশ।

রচনা সাধারণসমক্ষে প্রথম প্রচারিত হয়।

বিপদের উপর বিপৎপাত হইতে লাগিল। ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হওয়াতে কলটসফ্ গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কবির পরম বন্ধু সেরিব্রস্কি তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বন্ধুর মৃত্যু সম্বন্ধে কলটসফ্ নিজেই লিখিয়াছেন—"No grief of mine was ever so bitter." কবির সুখ দুঃখের সহচর কেহ রহিল না। এই সময়ে তাঁহার এক সহোদরাও কোনও কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত পরিশেষে বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কলটসফ্ জীবন-যুদ্ধে চিরদিন শক্তিশালী হৃদয়ের প্রফুল্লতা নষ্ট হইতে দিলেন না। 'জীবন-ভার' নামক কবিতায় তাঁহার এই সময়ের মনোভাব অতি পরিস্ফুট বলিয়া, আমরা উহার আদ্যন্ত অনুবাদ দিলাম।

বার-মেঘ আইল নামিয়া,
পাগলের মত বহিল বায়ু;
কটিকা-তাড়িত শ্রান্তি-শাসিত
দুঃখ-গুহা মাঝে পশিনু, হায়।
বিভীষিকা-ময় এ জরা-জীবন,
চিরদিন তরে ঘুচেছে আশ,
টুটে গেছে মোর, প্রভাত-স্বপন,
ভাঙিয়া প'ড়েছে প্রেমের বাস।
দলে দলে শোক আসিছে ঘেরিয়া,
যুঝিবারে নাহি শকতি আর;
তবু বার বার ডাকিছে জগৎ,
চেয়ে আছি লয়ে বাসনা-ভার।

গেছে সুখ-নিশি স্বভাব-চপল,
আর কিবে তা'র পা'ব না দেখা?
উষা না আসিতে পোহা'ল যামিনী,
অভাগারে কোথা ফেলিয়া একা।
সাহসে আবার পাখা প্রসারিয়া
চল, চল সেই নিঝর-ধারে,
হয়-ত আবার মিলিবে সেথায়
মৃত সুখ গিরি-গহন-পারে।
অথবা নীরবে বসি এই কূলে,
তুষারের ঢেউ লাগিছে যথা,
সুখ-প্রেম-হারা, তবুও সাহসে,
বীর সম বহ জীবন-ব্যথা।

এই সময়কার এক পত্রের উপসংহারভাগে কল্‌টসফ লিখিয়াছিলেন,—"আমি সাহস হারাই নাই। যত দিন আমার শরীরে বিন্দুমাত্র সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন হারাইব না।—যখন এই দেহ জীর্ণ হইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে, তখনই এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কিন্তু কবির তেজোগর্ব্ব কেবল হৃদয়গত।

পিতাপুত্রে কলহ।

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল; তাঁহার দৈহিক সামর্থ্যের শেষ হইয়া আসিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেণ্টপিটর্সবর্গে গমন করিয়া, কল্‌টসফ্ জীবনের শেষভাগ সেইখানেই অবস্থান পূর্ব্বক সাহিত্যচর্চ্চায় নিয়োজিত করিবার মানস করিলেন। পিতাকে লিখিলেন, তিনি যেন সমুদায় সম্পত্তির বিভাগ করিয়া দিয়া, অর্থসাহায্যের দ্বারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। পিতা সম্মত হইলেন না। তিনি প্রবাসী কবিকে জানাইলেন,—"তুমি রাজধানীতে বাস করিবার মানস করিয়াছ, উত্তম; আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে পারিলাম না।" কল্‌টসফ্‌কে অগত্যা ফিরিয়া আসিতে হইল। পিতা-পুত্রে আর তেমন সদ্ভাব রহিল না। কবির পিতা মনে করিয়াছিলেন, কবির অসংখ্য বন্ধু বান্ধবদিগের সাহায্যে তিনি তাঁহার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিবেন। কল্‌টসফের কাব্যারাধনায় তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইবে। সে সব কিছুই হইল না। কবির উপর বিরক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার ব্যাঘাত উৎপাদন তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। কাহার আরও একটা কারণ ছিল। কল্‌টসফ তাঁহাকে এক ধনশালী বণিকের দুহিতাকে বিবাহ করিতে বলেন। ইতিমধ্যে এক যুবতীকে তাঁহার হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না।

এইরূপ নানা কারণে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া কল্‌টসফ্ রাজধানী হইতে অব্যবহিত পরেই সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। রোগ-শয্যায় তাঁহার শান্তি ছিল না। সংসারে সকলেই তাঁহার বিরোধী। এক খানা পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বন্ধু হে! আমি যদি হইলে নিশ্চয়ই এতদিনে কাঁদিয়া ফেলিতাম।" অবশেষে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর কবি এই নিদারুণ জীবন-ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

কবির মৃত্যু।

মাইকেল্ লারমণ্টফ্।

(খৃঃ ১৮১৪—১৮৪১)

জনষ্টন্ সাহেব লারমণ্টফের পূর্ব্ব-জীবনের কোনও প্রসঙ্গ করেন নাই। তবে, কল্‌টসফের ন্যায় তিনিও যে চিরদিন অশান্তি ও অতৃপ্তি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। তাঁহারও মৃত্যু-কাহিনী নিতান্ত ভীষণ ও শোকাবহ। আমরা তাঁহার সেই শেষ জীবনের কয়েকটি কথা বিবৃত করিতেছি।

লারমণ্টফের মানস-পীড়ার প্রকৃতি কল্‌টসফের মত নহে। কল্‌টসফ ঘটনাচক্রের নিষ্পেষণে শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট, কিন্তু লারমণ্টফের ব্যাধি অনেকাংশে তাঁহার অসংযত ও দুশ্চিন্তা-প্রপীড়িত হৃদয় হইতে উৎপন্ন। সহরে বাস করিয়া যে সভ্য সমাজে মিশিবার নিমিত্ত কৃষাণ-কবি চিরজীবন আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন, সৈনিক-কবি তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া, আপনাকে নিতান্ত দীন ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। তিনি রুশিয়ার উত্তরাংশের জলবায়ুকেই তাঁহার এই বিষাদের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; প্রকৃত হেতু যে তাঁহার নিজেরই অশান্ত আত্মার ভিতর লুকায়িত ছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

কৃষাণ-কবি ও সৈনিক-কবি।

লারমণ্টফ্ লাইফ্‌গার্ড সৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজনিন্দা-অপরাধে অপর দলভুক্ত হইয়া ককেসসের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রেরিত হইলেন। দক্ষিণ রসিয়ার নীল নির্ম্মল আকাশতলে পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইয়া কবি ও ককেসস্। আসিল, তুষারভূষিত, দিগন্তবিস্তৃত সেই গিরিপুঞ্জের সান্নিধ্যে তাঁহার কল্পনা তেজোময়ী হইয়া উঠিল। বিষাদ-বাদের অবতার, তাঁহার আদর্শ নায়ক পেচোরিন্‌কে তিনি পূর্ব্বে যে ভাবে আঁকিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সুসংস্কৃত করিয়া, নূতন গ্রন্থে, নূতন প্রণালীতে চরিত্রটি চিত্রিত করিলেন। এখন আর ছদ্মবেশে তিনি নিজেই কাব্যের নায়ক নহেন; হৃদয়ের শক্তি সহিত তিনি এখন চরিত্রাঙ্কণে কলা-কৌশলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সৈনিক-কবিকে শীঘ্রই আবার সেণ্টপিটর্সবর্গে ফিরিয়া আসিতে হইল। তখন তাঁহার লেখনী হইতে আবার সেই তীব্র বিষাদ ও বিরাগ-বিষ উদ্গীরিত হইতে লাগিল।

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া লারমণ্টফ্ একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিঞ্চিৎ আঘাতপ্রাপ্ত হন। অধিকন্তু সৈনিক-নিয়মভঙ্গদোষে তাঁহার বিচার হইল। তিনি আবার সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি হায়েনের সেই প্রসিদ্ধ গীতিকবিতাটির অনুবাদ করেন, যাহাতে উত্তরদেশীয় তুষারভাবাক্রান্ত মহীরুহ, সূর্য্যালোকপ্রভাসিত দক্ষিণাংশবাসী বৃক্ষটির কথা ভাবিতেছে। যাহা হউক, ককেসসের শীতল ছায়ায় কবির মানসিক তাপ আবার প্রশমিত হইয়া আসিল।

উৎসর্গপত্র।

"Demon" নামক কাব্যের উৎসর্গ-পত্র এইরূপ;—

"হে ককেসস্! হে ভীমকান্তি নগাধিরাজ। আমার এই আলস্যপ্রসূত কাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করিলাম। তুমি ইহাকে সন্তান-স্বরূপে আশীর্ব্বাদ কর; তোমার তুষার-শুভ্র শিখর-ছায়া ইহার উপর বিস্তারিত কর। আমার আশৈশব চিন্তারাশি অদৃষ্টবশে তোমারই স্নেহবন্ধনে-সম্বদ্ধ। যেখানে তোমার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, সেই উত্তরপ্রদেশে থাকিয়াও আমি তোমারই হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করিতাম। সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র আমি একান্ত তোমারই ছিলাম।

"শৈশবে, শঙ্কিত-পদে আমি তোমার শুভ্রশিবস্নাণশোভিত সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখরে অধিরোহণ করিতাম। যেখানে পবনদেব তাঁহার স্বাধীন পক্ষপুট প্রসারিত করেন; ঈগলেরা বিশ্রামাভিলাষে ধাবমান হয়; আমিও মনে মনে আপনাকে তথায় উত্তোলিত করিয়া কল্পনাবশে তাহাদেরই একজন বিমানচারী সহচর হইয়া পড়িতাম।

"তা'র পর বিষাদে, বেদনায় কত বৎসর চলিয়া গেল; আবার আসিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত হইলাম। আজন্মের-সেই সুহৃদকে তুমি আবার সাদরে, সোল্লাসে আলিঙ্গন করিলে। সেই আলিঙ্গন আমার বিষাদে বিস্মৃতি ঢালিয়া দিল; আর বন্ধুর ন্যায় বন্ধুর বিলাপগীতি প্রতিধ্বনিত করিল।

"আজ আবার, হে পৃথিবী-প্রতি! এই নিশীথ উপত্যকাতলে দাঁড়াইয়া, আমার সমস্ত চিন্তা ও সঙ্গীত তোমারই করে সমর্পণ করিতেছি।"

তখন চার্কেসদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছিল। এই সময়কার একখানি ছন্দোবদ্ধ পত্রে তিনি এই যুদ্ধের বড় হৃদয়বিদারক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৮৪১ সাল লারমণ্টফের জীবনের শেষ বৎসর। এই বর্ষের প্রারম্ভে তিনি "সংবাদ" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি যেন তাঁহারই জীবনের অচিরভাবী পরিণাম ঘোষণা করিতেছে। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা অনুবাদের অনুবাদ, সুতরাং ইহাতে কবির-প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে। আমরা "সংবাদের" অনুবাদ প্রদান

করিলাস। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে নিশ্চিত মরণার্থ যাইবার পূর্ব্বে এক সৈনিক তাহার সহচরকে বলিতেছে;—

তব সাথে, সখা, মিলিতে আবার
তবু, তবু, সখা, প্রিয়জন কেহ;—
কি বাসনা জাগে পরাণে মোর,—
নামে কিবা কাজ?—সুধায় যদি,
শুন, সবে বলে আজি অভাগার
বলো, বলো, তারে এসেছি দেখিয়া
এসেছে ছিঁড়িয়া জীবন-ডোর।
সমর-শয়নে টুটিত-হৃদি।

যা'বে-তুমি কাল স্বদেশে ফিরিয়া,
বলো, সে করেছে বীরের মতন
দু'টি কথা ক'য়ে দিতেছি তাই;—
স্বদেশের কাজে হাসি-মুখে দান;
অথবা মিছা এ আশার স্বপন,
আর বোলো, এক দূর যুবতি
মোর কথা কেবা শুনিবে, ভাই?
ছিল সুখে তা'র ভরিয়া প্রাণ।

এই বৎসরকার লিখিত কবিতাগুলি প্রায়শঃ মৃত্যুকামনায় পরিপূর্ণ। আমরা আরও একটা অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহা সৈনিক কবির প্রায় শেষ কবিতা;—

জীবনে আমার নাহি কোন সাধ,
নিশ্বাস-ভরে হিয়া দুরু দুরু
অতীতের লাগি বেদনা নাই;
কাঁপিয়া উঠিবে পড়িবে তা'য়।
আজিকে ছিঁড়িয়া যতেক বাঁধন
দিবানিশি এক মধুর সুরব
বিস্মৃতি-ঘোরে ঘুমা'তে চাই।
প্রেম-সঙ্গীতে জুড়া'বে প্রাণ;
নহে সে শীতল সমাধি-শয়ন,
চির-পল্লবে ছায়া ঘন বট-
শোণিতের স্রোত বহে না তা'য়;
মর্ম্মর রবে তুলিবে তান।

এই সময়ে লাব্‌মণ্টফ অসুস্থতানিবন্ধন, চিকিৎসকের পরামর্শে, ছুটী লইয়া পাতিগরস্কের সৈনিক-আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। বাইওভেজ্ নাম্নী এক মহিলার প্রণয় লইয়া তাঁহার সহিত মেজর মার্টিনফ্ নামক আর এক সৈনিকের কতকটা ঈর্ষ্যার ভাব চলিতেছিল। কবি মার্টিনফকে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যক্তিগত কুৎসা রটাইয়া তাহাকে বাইওভেজের নিকট হীন ও অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। কলহটা ক্রমশঃ বিলক্ষণ পাকিয়া উঠিল। একটা ডুয়েল নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। বন্ধুগণের সহস্র আয়াস সত্ত্বেও উভয়ে এক দিন মিলিত হইলেন। লাব্‌মণ্টফ্ সপ্তবিংশতিমাত্র বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রকোষ্টে একটি সুবর্ণহার দৃষ্ট হইল। গুলির আঘাতে হারটি ছিন্ন এবং রক্তে কলুষিত হইয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট হইতে পূর্ব্বদিবস উহা চাহিয়া লইয়াছিলেন। হায়! স্বর্গীয় প্রতিভার এই কি পরিণাম!

প্রতিভার পরিণাম।

লেডী ডফরিণ।

লর্ড ডফরিণ বহুদিন ধরিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মত পাকা রাজনৈতিক ও কূটবুদ্ধি ব্যক্তি সাধারণতঃ বড় দেখা যায় না। তাঁহার ক্ষমতাও আমরা ভুলি নাই, আর সেই সেণ্ট এন্‌ড্রুস্ ডিনারের রঞ্জনীর স্মৃতিও বড় শীঘ্র হৃদয় হইতে অপনীত হইবে না। যাক। সম্প্রতি তাঁহার মৃতা জননীর কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে—লর্ড তাঁহার সম্পাদন করিয়াছেন, এবং দীর্ঘ ভূমিকায় জননীর অনেক কথা বলিয়াছেন।

জননী।

সুপ্রসিদ্ধ নাটকার সেরিডেন লেডী ডফরিণের পূর্ব্বপুরুষ,—পিতামহ কাজেই সুসাবী লিনলী তাঁহার পিতামহী। কুমারী লিনলীর সহিত সেরিডেনের সেই প্রেমাভিনয় পরিণয়

সকলেই জানেন। ডফরিণ জননী তবে বংশানুক্রমে কবিত্বের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা মধুর। তাঁহার "Irish Emigrant" পাঠ করিয়া কত হতভাগ্য আইরিস্ অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহা এই :—

আজিও সেখানে আমি বসি', প্রিয়তমে!
যেখানে বসিয়াছিনু আমরা দুজন,
সুদূর অতীতে সেই বসন্ত প্রভাতে,
প্রথম কবিনু যবে আত্মসমর্পণ।

হরিৎ সুন্দর শস্যে কে ঢেলেছে ভরি'
চাতক-মধুরস্বরে গাহি'ছে উপরে,
পল্লবিম্বসম ছিল ওষ্ঠাধর তব
প্রেমের আলোক তব নয়নে ভরে'।

লর্ড ডফরিণ তাঁহার জননীর কথায় বলিয়াছেন—তাঁহার আকারে লাবণ্য এবং দৃষ্টি-আকর্ষক মাধুরীর অভাব ছিল না। তাঁহার আকৃতি স্বর্গীয়, তাহা সৌন্দর্য্যের সম্যক্ স্ফুরণ এবং লালিত্যের পূর্ণতম আদর্শ ছিল। তাঁহার হস্ত পদ ক্ষুদ্র ছিল—লর্ডের শারীরিক। মনে আছে, অনেক ভাস্কর সেই হস্তের আদর্শ লইবার আদেশ চাহিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর নির্ম্মল এবং মধুর ছিল। তিনি সুন্দর গাহিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত অনেক গীতের সুর তাঁহার নিজ কৃত। গীতে তাঁহার ক্ষমতা আবার এমন ছিল যে, বজনীতে যদি তিনি কোনও গীতিনাট্যাভিনয় শুনিতে যাইতেন, তবে প্রভাতে তাহার সমস্ত প্রধান প্রধান গীতগুলি ঠিক সুরে গাহিতে পারিতেন। তিনি কখনও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তথাপি চেহারা এবং দৃশ্য, দুইই আঁকিতে পারিতেন।

লেডী সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হয়েন। তখন সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার জন্য ইংলণ্ডের ধনীসমাজে তাঁহার প্রভাব সামান্য নহে। অনেক বড় বড় লর্ড তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পাছে বিবাহ করিলে সন্তানের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়, সেই ভয়ে তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন না।

সন্তানের প্রতি স্নেহ।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। লর্ড ঘিফোর্ড তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইলেন, কিন্তু লেডী ডফরিণ বলিলেন যে, লর্ডের আশা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। চিরজীবন দারুণ হতাশা বহিয়া লর্ড ঘিফোর্ড মৃত্যুশয্যায় উপনীত হইলেন। ফল্গুর স্রোতের ন্যায় যে বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বহিতেছিল, তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। যখন মরণের তীরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার সেই জলরাশির স্পর্শ অনুভব করা যায়, তখন হৃদয়ের প্রিয়তম আশাকে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিতে ইচ্ছা হয় না। লর্ড ঘিফোর্ড মৃত্যুশয্যায় যে কথা বলিলেন। তখন আর 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' ভাল নহে বুঝিয়া লেডী তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাহার কয় দিবস পরেই লর্ডের মৃত্যু হইল।

অতিরিক্ত লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে যাহা করে, লর্ড ডফরিণ তাহা করেন নাই। তিনি তদীয় জননীর সন্তানের প্রতি লিখিত কয়টি কবিতাও পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার একটি এইরূপ :—

তোমারি সে ক্রীড়াময় দৃষ্টি সুমধুর,
সেই কেশরাশি। সেই মৃদুহাস ভায়।
পবিত্র নদীর মত ভ্রূযুগ তব,
কত মধুময় চিন্তা লিখিত তাহায়।
সেই পূর্ণ অর্দ্ধোত্থিত নয়ন পল্লব,

স্বপন আবেশে ভরা সুনীল নয়ন,
বিশ্বাসে, প্রেমেতে ভরা দৃষ্টিতে যাহার
ভয় বা মিথ্যার ছায়া হয় নি পতন।
স্বরগের বারি-ভরা সরসী যেমন
স্বরগের ছায়া ধরে হৃদয়ে আপন।

সেই সন্তান যে জননীর বিশেষ প্রশংসা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু লর্ড ডফরিণ বলিয়াছেন যে, সন্তান বলিয়া তিনি জননীর এত প্রশংসা করেন নাই; তিনি জগতে পুরুষ এবং রমণীমণ্ডলীকে বেশ জানেন, এবং তাহা জানিয়াই এই প্রশংসা করিয়াছেন।

হাইন ও তাঁহার ভগিনী।

কোনও লোকের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে হইলে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং যাঁহাদিগের নিকট তিনি নিতান্ত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই সেই সকল কথা বলিবার যোগ্যতম পাত্র। সন্তানের জীবনের প্রত্যেক সামান্য ঘটনা জননীর মত আর কেহই স্মরণে মুদ্রিত করিয়া রাখেন না; কিন্তু সাধারণতঃ এই হইয়া থাকে যে, যখন কোনও প্রসিদ্ধ লোকের জীবনচরিত রচিত হয়, তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণও অনেকে কালের তরঙ্গাঘাতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন, এবং সেই মধ্যাহ্নতাপ-দগ্ধ-সংসারে চিরপ্রবাহিত স্নেহপ্রস্রবণ জননী তখন সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যক্ষেত্রে কার্য্যাবসানে চিরশান্তির ক্রোড়ে সংসারের শোক, তাপ, সুখ সকলের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তখন সেই স্তন্যে পরিণত হস্তের স্পর্শ ও সেই চিরনীরব মধুময় কণ্ঠস্বরের জন্য হৃদয় বৃথা ব্যাকুল হইয়া উঠে। জননীর পরেই ভ্রাতা ও ভগিনী, তাঁহারাও ভ্রাতার জীবনে অন্যের অলক্ষিত অনেক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

জননী ও ভগিনী।

হাইনের মধুময় কবিতার যাঁহারা আদর করেন, তাঁহারা তৎসূত্রে তাঁহার ভগিনী "লচেন"কে অবশ্যই জানেন। তাঁহার প্রকৃত নাম চ. এমডেন্। তাঁহার বয়স নবতি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ডাক্তার এডলফ কোহাট্ তাঁহাকে দেখিতে হ্যামবার্গে গিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই বৃদ্ধার একটি বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিলাম।

ডাক্তার কোহাট্ বলেন যে, সেই ক্ষীণ, কার্য্যতৎপর, জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, বৃদ্ধত্বজয়িনী রমণীকে দেখিলে, প্রথমে দর্শকের বোধই হয় না যে, তিনি নবতি বৎসরের বৃদ্ধা। প্রথমে তিনিও কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন তিনি কোমল ও কাতর স্বরে ভ্রাতার কথা বলিতে লাগিলেন, এবং অনেক লেখক হাইনের সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত অসম্ভব কথা বলিয়া থাকেন, তীব্র রোষবৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি সেই দূর-অতীতের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন-বটে। এখনও কালের তরঙ্গমালা দেহতট হইতে হাইনের সেই সঙ্গীতে প্রসঙ্গীকৃত সৌন্দর্য্য ও ব্যবহারের রেখা মুছিয়া লইতে পারে নাই।

এমডেন্।

হাইন অপেক্ষা লচেন এক বৎসরের কনিষ্ঠা—কাজেই উভয়ে একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। শৈশবের ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখ, সংসারের আপদ, বিপদ সম্পদ, সুখের শুভ্রহাস্য, দুঃখের কাতর অশ্রুজল উভয়ে একত্র ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার ভগিনী প্রথম তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে লচেনের শিক্ষক একটি গল্প বলিয়া, সকল ছাত্রকে তাহা গৃহ হইতে লিখিয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। লচেন তাহাতে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে হাইন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সকল শুনিয়া বলিলেন যে, গল্পাংশভাগ শুনিলে তিনি একটি গল্প লিখিয়া দিতে পারেন। লচেন গল্প বলিলে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে হাইন গল্প লিখিয়া আনিলেন। লচেন আপনার রচনা বলিয়া সেটি শিক্ষককে দিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ পাইল। শিক্ষক গল্পটির বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার জননীর নিকট হাইনের প্রশংসা করেন।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

হাইন তাঁহার ভগিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার কবিতায় তিনি উভয়ের শৈশবের কথা গাহিয়াছেন; সে গীতি কি মধুর! তাহার পর তাঁহার কবিতায় তিনি ভগিনীর বিষয়ে গীত গাহিয়াছেন, এবং অনেকগুলি তাঁহারি নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের

শৈশবের সেই বিমল স্নেহ কখন পড়িল হয় নাই। জগতের কর্ত্তব্যস্রোতে উভয়কে শতমুখে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু সে স্নেহসূত্র কখনও ছিন্ন হয় নাই। হাইন আপনিও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ ভ্রাতারা ভগিনীকে যেরূপ ভালবাসে, তিনি ভগিনীকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ভালবাসা।

এমডেন তখন কোহাটকে হাইনের পত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। সেই একশত বাইশখানি পত্র আজও তাঁহার নিকট আছে। সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ঐ পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল। হাইনকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হ্যামবার্গের গৃহদাহে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তবে উত্তরগুলি দেখিয়া সেগুলি কি ছিল, তাহা বুঝা যায়। হাইন লিখিয়াছেন, "আমরা পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ। আমরা দুইজনই কেবল বুদ্ধিমান, আর সবাই পাগল।" তাঁহার অনেক কবিতা এবং অন্য রচনা তিনি প্রকাশের পূর্ব্বে সভ্যমহলে জন্য ভগিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন।

পত্র-ব্যবহার।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "Reisebilder" প্রকাশের পর লচেন একবার দেশভ্রমণার্থ বাহির হন। জর্ম্মেনীর সর্ব্বত্র ভ্রাতার প্রশংসা শ্রবণ করেন, এবং হাইনের ভগিনী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হয়েন।

মাথাপাগলা ভ্রাতার জন্য ভগিনীকে সময় সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। তিনি একবার তাঁহার গৃহে ভ্রাতার সম্মানার্থ একটি ভোজ দিয়াছিলেন। কবির দর্শনপ্রার্থী অনেক বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইয়াছিল—সকলেই কবির দর্শনপ্রার্থী। হাইন সে দিন ভালরূপ ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ভগিনীর একটি শিশু কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সহিত নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। তাহার পর লচেন যখন সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন কবি অদৃশ্য হইলেন। পরদিবস ভগিনী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে তিনি বলিলেন, "ভোমার উচিত ছিল, আমার গলার শিকল ছিঁড়িয়া লোক-সমক্ষে আমাকে হাজির করা এবং লোককে বলা যে—এই হেন্‌রিচ হাইন—কবিতালেখা ছাড়া এ আর কিছুই করিতে পারে না।"

প্রতিভার পাগ্‌লামী।

হ্যাম্‌বার্গের সহর-দাহের দিবস লচেন ভ্রাতার রচনাগুলি উদ্ধার করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। সেগুলি তাঁহার মাতৃগৃহে রক্ষিত ছিল। লচেন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেগুলি লইয়া বাহিরে আসিলেন—তখন কতকগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ভস্মে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি তিনি বাহিতে লাগিলেন—কিন্তু পরে ঐগুলি হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং তিনিও অজ্ঞান হইয়া পড়েন—একজন বন্ধু তাঁহাকে উদ্ধার করেন। হাইন-আনয়ন সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন।

রচনা-উদ্ধার।

হাইন ভগিনীকে তাঁহার বিবাহের সংবাদ দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের দম্পতিকলহ হইত। সেই মৃত্যুশয্যা হইতে তিনি ভগিনীকে পত্র লিখিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার ভগিনীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লচেন সেই বৎসর শরৎকালে প্যারিসে গমন করেন। গৃহদ্বারে কবির পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, এবং ভগিনী তখনই ভ্রাতার শয্যা-পার্শ্বে উপনীত হইলেন। ভ্রাতা ভগিনীর সেই সাক্ষাতে উভয়ের হৃদয়ে যে আনন্দ উচ্ছলিত হইয়াছিল, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত হয়। তিনি সর্ব্বদা ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন, এবং সমস্ত দিন জর্ম্মণ ভাষায় দূর অতীতের কথাবার্ত্তা কহিতেন—সেই শৈশব, সেই বাল্য।

শেষ সাক্ষাৎ।

বর্ষশেষে পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া লণ্ডনে হ্যাম্‌বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উৎসবের বিচ্ছেদদৃশ্য বড় অশ্রুজলসিক্ত। লণ্ডনে আবার ফিরিয়া আসিবেন প্রতিজ্ঞা করেন—কিন্তু আর সাক্ষাৎ হইল না। পর বৎসর জুলাই মাসে হাইনের মৃত্যু হয়।

হাইনের সম্মানার্থ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। ডুসেলডরফের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাইনের জন্মস্থানে উহা স্থাপন করিতে অনুমতি দিবেন না,—এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে দেখা গেল, অনেক লেখকেরও ঐ মত। এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, মেনজেই উহা সংস্থাপিত হইবে।

যাঁহার মধুর গীতমালা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, সর্ব্বদেশে মানবগণের মন মোহিত করিতেছে, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন মানব-হৃদয়ে অক্ষয়। তবে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের জন্য যাহা কিছু হয় তাও আবশ্যক। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে সকল শোক দুঃখ কৃতজ্ঞতা বাষ্প বিসর্জ্জনেই ধৌত হইয়া যায়। বিপ্রদের স্মৃতিচিহ্ন, রাজেন্দ্রলালের স্মৃতিচিহ্ন, বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহ্ন এখন অতীতের অসম্পূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে পড়িয়াছে—সে আশা ত নাই—বঙ্কিম-চন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নের কি হইল?

জীবনচরিত।

কেমিলি-ফ্লেমেরিয়ন।

জ্যোতিষ হিন্দুর বড় প্রিয় বিদ্যা। গগনে গতিশীল গ্রহগণের গমনাগমন হইতে নাকি অনেক ঘটনা সূচিত হইয়া থাকে। মুশিক্ষিতেরা সমবে সেই সকল দেখিতে পাইলে ভবিষ্যৎও নাকি তাঁহাদিগের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। অন্ধকার ঘটনাচক্র স্নিগ্ধ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। কিন্তু গণনাতীত কালের কুজ্ঝটিকায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সেই সকল অমর কীর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। কোথায় সে জ্ঞানপিপাসু প্রাচীন হিন্দু, আর কোথায় সে সকল সমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বিদ্যালোচনা! উৎসাহ, আলোচনা এখন সাগরপারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

জ্যোতিষ।

সে মাসের "ম্যাক্‌লুর্স ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার সাবার্ড জ্যোতিষী ফ্লেমেরিয়নের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই বিবরণ হইতে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিলাম।

জ্যোতিষী কেবল জ্যোতিষ লইয়াই থাকেন না। আকাশের সহিত তাঁহার আরও সম্বন্ধ আছে। তিনি বেলুনারোহণে পারদর্শী। তিনি দ্বাদশবার পৃথিবীর পাপপঙ্কিল ভূমি ত্যাগ করিয়া অনন্তবিস্তৃত নীল নভোমণ্ডল বিহগবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিস হইতে বেজলোনে গিয়াছিলেন।

বেলুনবাজ।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহের আট দিবস পরে তিনি পত্নীসহ একবার বেলুনে উঠিয়াছিলেন। এরূপ ভ্রমণ নূতন বটে। তিনি বলেন, জ্যোতিষী এবং তদীয় পত্নীর পক্ষে, পক্ষীর মত আকাশভ্রমণ অপেক্ষা স্বাভাবিক আর কি আছে?

তিনি এই বিদ্যালোচনায় বিশেষ মনোযোগী। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় দশ সহস্র পুস্তক আছে। তিনি সে সকল পাঠ করেন। তিনি চিরদিন জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার ইচ্ছুক। পঁচিশ বৎসরেরও অধিক হইল, তিনি জ্যোতিষচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন আলোচনার ফলে তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, জগতে মানবের বোধাতীত বা জ্ঞানাতীত আরও অনেক প্রাকৃতিক শক্তি বিদ্যমান। কথাটা সাধারণ রকমে বড়

নূতন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার "Lumen" নামক পুস্তকে এই সকল আলোচনা আছে।

দৈনিক কার্য্য।

শ্রীমতী ক্লেমেন্টিয়ন তাঁহার কার্য্যের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :—

তিনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং নিয়মপ্রিয়। প্রভাতে আটটা বাজিতে পনের মিনিটের সময় তিনি প্রভাতি-আহার-গ্রহণ করেন। আটটা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন। দ্বিপ্রহরের সময় ধীরে ধীরে আহার আরম্ভ করেন। একটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। প্যারিসের সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ ভিন্ন আরও বহু লোক তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী, কারণ, জনারণ্য প্যারিসে তাঁহার পরিচিতের সংখ্যা খুব অধিক। জ্যোতিষবিষয়ক প্রশ্ন লইয়া জগতের নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র পত্র আসে। দুইটা হইতে সেই সকলের জবাব দেওয়া হয়, তিনি বলিয়া যান, আর তাঁহার পত্নী লিখিয়া যান। তিনটা বাজিলে তিনি বাহিরে যান। তিনি একখানি পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, তাহার ও অন্য অনেক সভাসমিতির কার্য্য করিয়া, সাড়ে সাতটার সময় ফিরিয়া আসেন। তখন আহার করেন। আহারান্তে পাঠ করেন; তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নশীল। রাত্রি দশটার সময় তিনি শয়ন করেন। তিনি কেবল জ্যোতিষ লইয়া থাকেন না। সকল আবশ্যক বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, কিছুই অবহেলা করেন না। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ। গ্রীষ্মকালে তিনি তারকারাজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকেন।

মে হইতে নভেম্বর, এই সাত মাস তিনি তারকাজগৎ লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। তখন তিনি জুভিসে গমন করেন। সেখানে কার্য্যপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র, কারণ আকাশ মেঘশূন্য থাকিলে হয় ত কখনও কখনও ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কবিন্দুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। তবে সর্ব্বত্রই তিনি নিয়মপ্রিয়।

জ্যোতিষী ধূমপান করেন না। ধূমোদ্গারী চুরুট মুখে থাকিলে [illegible] লক্ষ্য করিবার অসুবিধা হয়। তাহা ভিন্ন সময়ও অনেকটা নষ্ট হয়। তিনি কুক্কুর ভালবাসেন, কিন্তু কুক্কুর দেখিলে বড় ভীত হয়েন। তাঁহার বোধ হয় যে, কোনও পূর্ব্ব জন্মে কখনও তাঁহাকে উন্মাদ কুক্কুরের দংশনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবজন্তু বিশেষতঃ কুক্কুর ভালবাসেন। প্রকৃতির সকল দ্রব্যই তাঁহার বড় ভাল লাগে, বসন্তে যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উছলিয়া উঠে, তখন মুক্ত বাতায়নপথে তরুগুলির নবমুকুল দেখিতে তাঁহার বড় আনন্দ হয়। জ্যোতিষী তবে প্রকৃতিপ্রিয়।

সমাজনীতি।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার গার্হস্থ্য-জীবন।

নব্য সভ্যতার রঙ্গভূমি আমেরিকায় ও য়ুরোপের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবভূমি ইংলণ্ডে, অনেক বিষয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আমেরিকা উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলের দেশ, ইংলণ্ড প্রাচীনকাল হইতে সংযত কর্ম্মের দেশ। আমেরিকা কেবল অদ্ভুত ভালবাসে—অদ্ভুত ইংলণ্ডের চক্ষে বিষ।

মে মাসের "ফোরম" পত্রে মিষ্টার প্রাইস কোলিয়ার ইংরাজের ও আমেরিকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক একজন আমেরিক। প্রবন্ধের উপসংহারভাগ এইরূপ :—

ইংরাজের গৃহ দেখিলেই মনে হয় যে, গৃহটি ঠিক অধিবাসীর উপযোগী; আমেরিকের গৃহ দেখিলেই মনে হয় যে, অধিবাসী স্বয়ং গৃহের উপযোগী। আবার ইংলণ্ডে গৃহের বন্দো-

বস্তু পুরুষের সুখোপযোগী; এবং আমেরিকার গৃহের বন্দোবস্ত স্ত্রীলোকের সুখোপযোগী; ইংলণ্ডে পুরুষ অধিক স্বার্থপর, তাই সেখানে গার্হস্থ্য সুখও অধিক।

ইংরাজ ও আমেরিক।

আমেরিক অপেক্ষা ইংরাজ আপনার গৃহে অধিক সুখী, তাই ইংরাজ অপেক্ষাকৃত অধিক বেলা হইলে গৃহত্যাগ করে, এবং অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল প্রত্যাগমন করে। একজন সর্ব্বদা গৃহে যাইতে উৎসুক, অন্য সর্ব্বদা গৃহের বাহিরে কার্য্যে যাইতে ইচ্ছুক। ইংরাজ গৃহে গিয়া গার্হস্থ্য-সুখভোগের প্রয়াসী—আমেরিক কর্ম্মের ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে আপনার সকল বাসনা কামনা নিমজ্জিত করিবার অভিলাষী।

আমেরিকার পুরুষ বা রমণীগণ ইংলণ্ডে আসিয়াই মনে করে যে, ইংরাজের প্রাণপ্রিয় পবিত্র জন্মভূমি পুরুষের দেশ। আর ইংলণ্ডের পুরুষ বা রমণী আমেরিকায় যাইয়াই মনে করে যে, সাম্য ও স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খল স্রোতোবিধৌত আমেরিকা রমণীর দেশ। বোধ হয়, সেই জন্যই আমেরিকায় স্বামীরা ভাল, আর ইংলণ্ডে স্ত্রীরা ভাল। তবে মোটের উপর ইংলণ্ডের গার্হস্থ্য জীবনে সুখ অধিক।

স্বামী-স্ত্রী।

যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা প্রবল—অর্থ যেখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সোপান,—যেখানে সফলতা পূজিত ও বিফলতা ঘৃণিত, সেখানে পুরুষগণের বিশেষরূপ যত্ন ও শিক্ষালাভ করা উচিত। কেবল অসাধারণ ক্ষমতাবান্ লোকেরাই অন্যান্য কর্ম্মে সফলযত্ন হইয়াও সাংসারিক সুখলাভে বিফলমানস হইয়া থাকে। ইংরাজ-রমণীরা ইহা অবগত আছেন। তাঁহারা বুঝেন যে, পুরুষদিগের সম্মান এবং যশ হইলেই তাঁহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেন। ইংরাজ-রমণীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কুরুচি ও সপ্রতিভ ব্যবহার সকলেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডে ইংরাজের কর্ম্মক্ষমতা ও অন্যত্র ইংরাজের প্রভাব ও সাহস, ইংরাজ-রমণীর কর্ম্মের সুশৃঙ্খলাস্থাপনে সহায়।

ইংলণ্ডে পুরুষ।

ইংলণ্ডে পুরুষদিগের সম্ভব কম কাজ করাই গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্য। গৃহ সেখানে রমণীর ক্রীড়াস্থল নহে। পরন্তু তাহা পুরুষের বিশ্রামাগার। সেখানে বিশ্রাম করিয়া তাহারা পরিশ্রমশক্তি লাভ করে। সেই জন্য ইংলণ্ডে গৃহস্থালীর সুচারু বন্দোবস্ত দৃষ্ট হয়।

আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং সময় সময় বন্ধুবান্ধবদিগের আদর অভ্যর্থনার জন্য গৃহের বিশেষ আবশ্যক। সেই জন্যই মানবগণ যত্ন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—তাহাদিগের উপার্জ্জন ভিন্ন গৃহ চলে না। রমণীগণ সেই উপার্জ্জিত অর্থ হইতে গৃহে যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন।

আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে লোকেরা আমোদ প্রমোদ এবং বাজে কাজে অধিক সময় ব্যয়িত করে, সন্দেহ নাই। এই সকল বাজে কাজের জন্য সময় আবশ্যক, আবার মিতব্যয়িতা ভিন্ন সময় আসিবে কোথা হইতে? ইংলণ্ডের লোক প্রায়ই একটা না একটা হুজুগ লইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে বাজে কাজ।

ইংলণ্ডে সোসিয়ালিসম্।

ধীর অথচ নিশ্চিতপদবিক্ষেপে ইংলণ্ডীয় সমাজে সোসিয়ালিসম্ আপনার প্রবল প্রতাপ সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। এখন অনেক বড় বড় রাজনৈতিক, নৈতিক সামাজিক নেতৃগণ সোসিয়ালিসম্-সাগরে সংজ্ঞাহীন সন্তরণরত।

সোসিয়ালিসম্।

সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যে লেখক ও ধর্ম্মপ্রচারকেরও না কি অভাব নাই। ইংলণ্ডীয় সমাজে সোসিয়ালিসম্ এখন একটি আবশ্যক অথচ অমীমাংসিত প্রশ্ন। অর্থের বিভাগই এখন প্রধান কথা। রাজনৈতিকের পক্ষে এ সমস্যা সরল বা সহজসাধ্য নহে।

"ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রিকায় মিষ্টার রবার্ট ওয়ালেস্ (রাজনৈতিক) দলের পরিণাম শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সোসিয়ালিসম্ সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলে কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, একটা সামাজিক বিপ্লবকারী কলহ বড় দূরবর্ত্তী নহে। গভর্মেণ্টের উচিত, সেই জন্য প্রস্তুত থাকা। হাতে ক্ষমতা পাইলে সাধারণ জনগণ যে, সমাজ একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চাহিবে, ইহা ত আর অসম্ভব নহে। এখন বোধও সেইরূপ হইতেছে। সোসিয়ালিসমের সেবক সংখ্যা কম নহে এবং এখন ক্রমেই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও ইহা ভাল বলিতেছেন। খুব সম্ভবতঃ অল্প কাল মধ্যেই ইহার বহুসংখ্যক সেবক হইয়া দাঁড়াইবে।

সোসিয়ালিসম্-ভীতি।

সোসিয়ালিসম্ কি, ইহা লইয়া এখন অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। অনেকে সাধারণ ভাবে ইহাতে যাহা বুঝে, তাহাতে এখন প্রায় সাড়ে পনের আনা লোক সোসিয়ালিসম্ সেবক। লেখক ইহার সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার অর্থ ব্যক্তিগত মূলধনের, অর্থাৎ মহাজনের বিনাশ। গভর্মেণ্ট সমস্ত মূলধন লইয়া মহাজন হউন—গভর্মেণ্টই একমাত্র কৃষক, কারখানা-ওয়ালা, ভাণ্ডার-রক্ষক হউন। দেশের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করুন। সকলে গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি করুক। ইহাতে যদিও সকলেরই যে অভাব ঘুচিবে, তাহা নহে; তবে এই হইবে যে, নিতান্ত হীন উপায় ভিন্ন কেহ তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা ভাল অবস্থাপন্ন হইতে পারিবে না।

সোসিয়ালিসম্ কি?

উল্লিখিত শেষ কারণে অনেকে সোসিয়ালিষ্ট হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, যেন ইহা নিতান্ত ন্যায়ানুমোদিত। এই সামান্য কথায় একটা খুব বড় আশা ভরসা স্থাপনের সুযোগ হয়। যাঁহারা সোসিয়ালিসমের প্রচারক, তাঁহারা সাহসী, গোঁড়া এবং অটল; কাজেই তাঁহাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে বটে।

লেখকের মত যে, সোসিয়ালিসমের সাফল্যের পথে এক বিষম বাধা বর্ত্তমান। প্রথমেই ব্যক্তিগত মূলধনের উচ্ছেদসাধন আবশ্যক। এখন যে সকল কারখানা বা খনির আইন হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সোসিয়ালিসম নহে। তাহার মূলমন্ত্র মহাজনের উচ্ছেদ। তাহা সহজসাধ্য সাধন নহে।

কর্ত্তব্য।

গভর্মেণ্টের দাস হইয়া সর্ব্ববিষয়ে কার্য্য করিতে কে সম্মত হইবে? লোকে অর্দ্ধাশনে আপনার স্বাধীন কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিবে, তথাপি দাস হইয়া পূর্ণাশনলাভ প্রার্থনা করিবে না। কে আপনার নিজত্ব হারাইয়া গভর্মেণ্টের হস্তে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবে?

উদারনৈতিক দলের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, স্পষ্টভাবে সাধারণের সমক্ষে স্বীকার করা যে, তাঁহারা সোসিয়ালিসমের পক্ষপাতী নহেন। আর যদি উদারনৈতিক মহাজনেরা আপনাতে বিশ্বাস করেন, এবং সেই বহুকালশ্রুত "সাধারণে বিশ্বাস" এই মতের পরিপোষক হয়েন, তবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য,—একটি সোসিয়ালিসমের বিরুদ্ধ মত প্রচার করা।

সোসিয়ালিসম্ এখনও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—ইহার মীমাংসা হইলেই এখন পাশ্চাত্য সমাজের ও পৃথিবীর মঙ্গল।

প্রাচীন-বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম।

উপন্যাসশ্রেণীর গ্রন্থ পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। নায়ক নায়িকার কথা লিখিতে হইলে রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিতে হইত। বীরত্ব, সতীত্ব ও সাধুত্ব লইয়া কাব্য লিখিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির মধ্যে যে সব উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহারই মধ্য হইতে কোনও একটি বাছিয়া লইতে হইত। এখন অনিবার খগেন্দ্র নগেন্দ্র অমলা বিমলার সৃষ্টি হইতেছে, সেকালে কিন্তু নিয়মিত কয়েকটি প্রসঙ্গ ব্যতীত একপদ অগ্রসর হইবার রীতি ছিল না; সকলই ধর্ম্মের নামে লিখিতে হইত। সাহিত্য ধর্ম্মপ্রচারের একরূপ যন্ত্রবিশেষ ছিল, ধর্ম্মের নামে মধ্যে মধ্যে অধর্ম্মের কথা কাব্যে না থাকিত, এমন নয়; তাই এই ধর্ম্মরাজ্যে বিদ্যাসুন্দরের উদয় হইয়াছে; কিন্তু উহাও অন্নদামঙ্গলের একাংশভুক্ত হইয়া ধর্ম্মের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছে—গৃহস্থের বধূগণও তাহা পড়িতেন, কেহ আপত্তি করিতেন না। তাই বলিয়া ভারতচন্দ্রকে অমান্য করিও না, তিনিও ধর্ম্মের পাণ্ডা; হইতে পারে, তারকেশ্বরের শ্রীমান মোহান্ত বেরূপ পাণ্ডা, ইনিও সেইরূপ। কিন্তু সামান্য মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপ হইতে ইহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র; কারণ, তাহা আধ্যাত্মিক ও ব্যাখ্যা-যোগ্য।

পাণ্ডারা সাহিত্যসংসার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। এখন কত আয়েসী ওসমানী উৎপন্ন হইয়া সাহিত্যকে নূতন সাজে-সজ্জিত করিতেছে, এখনকার কল্পনা আকাশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিতেছে; কিন্তু তখনকার দেশের রুচি ঐরূপ ব্যাপারে কখনও স্বীকৃত হইত না। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্যতীত প্রতিভার দিগন্ত-উজ্জ্বলকারী শক্তির বিকাশ দেখিলেও তাহারা প্রণত হইত না। প্রাচীন শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ রচিত না হইলে কবিতা, প্রতিভা মিথ্যা হইয়া যাইত। কল্পনা না ছিল, এমন নহে; কল্পনা অবারিত পক্ষে দ্যুলোকে, ভূলোকে বিহার করিত; কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত হইতে উপাখ্যানটি গ্রহণ করা চাই। ধর্ম্মের সঙ্গে একটু সংস্রব থাকিলে পর্ব্বতশিখাগ্রে পদ্মের বিকাশ হইতে পশ্চিমদিক্‌বিভাগে ভানুর উদয় পর্য্যন্ত সকল কথাই বিশ্বাস করিতে লোক প্রস্তুত হইত। কবিগণ হনুমানের কক্ষতলে সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেন, ইছাই ঘোষের কর্ত্তিত মস্তক যুক্ত করাইতে পারিতেন, শত বর্ষের ছিন্ন কন্থার ন্যায় লক্ষ্মীন্দরের গলিত শবে পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা

করিতে পারিতেন। সেই কথা শুনিয়া কাহারও চক্ষে দরদর ধারা বহিত, কেহ আত্মহারা ও বিমোহিত হইয়া কবির চরণে জীবন বিকাইতে যাইত। মঙ্গলচণ্ডী কি শনিঠাকুরের কথা যে পুস্তকে আছে, তাহা পড়িবার কালে ভক্তগণ প্রতিপত্রে প্রণাম রাখিয়া অগ্রসর হইতেন। বেহুলার ক্রন্দনে, পদ্মার সান্ত্বনা-বাক্যে কি ঢেকুর পালা শুনিয়া হো হো স্বরে করুণ অশ্রুপাত করিতেন। ইহার এক কথা মিথ্যা বলিয়া বক্তার ত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। উদাহরণ, আমার ঠাকুরমাকে এক দিন দুর্গেশনন্দিনীর গল্পের সার শুনাইয়াছিলাম, প্রথম প্রশ্নই এই "গল্প সত্য কি না?" আমি বলিলাম, "তোমার শনির পাঁচালির সদাগরের কন্যা যে বোয়ালীর পেট হইতে অলঙ্কার পরিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা কি সত্য?" এই প্রশ্ন শুনিয়া, পাছে আমি শনির বিরাগভাজন হই, এই জন্য তিনি ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ শ্রোতাদিগের স্কন্ধে গন্ধমাদনের মত গুরুভার চাপাইয়া দেওয়াও সহজ। অথচ একটা তৃণের ভারবহনেই তাহারা অস্বীকৃত।

বঙ্গে এই জন্য মৌলিক গল্পের সৃষ্টি হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রাচীনশাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান ব্যতীত চাঁদ সদাগরের কথা, লাউসেনের কথা, বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের কিছু নাড়া চাড়া হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই কবিগণের মনগড়া গল্প বলিয়া বোধ হয় না। চাঁদ সদাগরের প্রসঙ্গ বঙ্গদেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, নানা দেশ হইতে এই একই বিষয়ের নানা গীতি পাওয়া যাইতেছে। কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশীনারায়ণ দেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, বলরাম দাস প্রভৃতি অনেক মনসা-উপাখ্যান-রচকের নাম ও রচনার অংশ আমরা পাইয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দ ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের নিকট এজন্য ঋণী, তাহার প্রমাণ আছে। ইহারা শুধু পরস্বলুণ্ঠনকারী, পরচয়িত কুসুমদামে মালা গাঁথিয়া মালী। বটতলার ছাপা এবং পয়ার ছন্দ ও দীর্ঘছন্দ হেতু এই সব গীত নগণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু যে কোনও পাঠক ইংরেজী পড়িয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রতি নাসাকুঞ্চন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা অনুরোধ করি, গণেশবন্দনা মার্জ্জনা করিয়া, পয়ার ও দীর্ঘ ছন্দ সহ করিয়া, বটতলার ছাপা পড়িতে সোলেমানের চস্‌মা ধারণ করিয়া এক বার অগ্রসর হউন। নিশ্চয় বলিতে পারি, মেঘনাদ কি বৃত্রসংহারে যে তৃপ্তি হয় নাই, উহা পড়িয়া তাহা হইবে। হৃদয়-তন্ত্রীর সঙ্গে যে ভাবের গোপনে মিলন আছে,

বাঙ্গালীর মন প্রাণ যে সুরে বাঁধা, সেই সুর-ঐ সব পুস্তকে স্পর্শ করিবে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দবৃষ্টি হইবে। মেঘনাদ কি বৃত্রসংহারে বিমানের ন্যায় উন্নত, শরদভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ ও খনির-গর্ভশায়ী চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় কবিত্বরাশি পত্রে পত্রে আছে, স্বীকার করি—কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের খাঁটি চিত্র ঐ সব বড় বড় কাব্যে নাই; তাই এই সব কীর্ত্তির স্তাবকগণের সঙ্গে আমরা উহাদের স্থায়িত্ব বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নহি।

এই খাঁটি বাঙ্গলা কবিতা বাঙ্গালীর নিকট এত প্রিয় কেন? পদ্মপুরাণ, চণ্ডীকাব্য, বিদ্যাসুন্দর এক একখানা স্থায়ী কাব্য। কিন্তু মেঘনাদবধ কি বৃত্রসংহার সে শ্রেণীর কাব্য নহে। কে বড়, কে ছোট, কোনটি মল্লিকা, কোনটি গোলাপ, তাহা বলিতে পারি না, এবং তারতম্যে মূল্যনিরূপণ করিতেও আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। কিন্তু উহারা দুই ভিন্নজাতীয় কাব্য; যেমন ইংরেজ বাঙ্গালী ভিন্নজাতীয়, ইহারাও তেমনই ভিন্নজাতীয়।

পূর্ব্ব কালের কাব্যগুলি এক হস্তের রচনা নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহু কবির চেষ্টায় এক একটি বিষয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—শেষ কবি ভাগ্যবান, তিনিই সমস্ত যশের ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণচয়িত সুগন্ধ কুন্দ যুথী জাতি কুসুমরাশি দ্বারা তিনি মালা গাঁথিয়া জাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার হস্তে আমরা সেই উপহার পাইয়া, যাঁহারা কাঁটা সহিয়া ক্ষেতকীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কীটের আঘাত সহিয়া রজনীগন্ধ, মালতী, বা মনোলোভা অপরাজিতা তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—আমরা মাধবাচার্য্যকে ভুলিয়া কবিকঙ্কণকে ভক্তি করিতেছি; কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কাশীদাসকে প্রশংসা করিতেছি, কানা হরি দত্তকে (১) ভুলিয়া নারায়ণ দেবকে সাধুবাদ করিতেছি, কৃষ্ণরামকে ভুলিয়া ভারতচন্দ্রের কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছি। এই বহু কবির চেষ্টার গুণে এক একখানা পুস্তক এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। একই কাব্য-কুসুম বহু যুগের সমবেত-চেষ্টায় বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার কাব্যগুলি এক কবিরই রচনা;—বিষয়ের বাহুল্যে আমরা এখন লাভবান, কিন্তু ভাবের গাঢ়তায় ক্ষতিগ্রস্ত। রামায়ণ মহাভারতাদিও এক কবির রচনা নহে, যুগে যুগে সৌন্দর্য্য প্রক্ষিপ্ত হইয়া কাব্যের প্রথম কঙ্কাল হইতে সজীব মহাকাব্য গঠিত হইয়াছে, ইহাই এখনকার পণ্ডিতদিগের

(১) "প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।"—বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

মত। শ্রেষ্ঠ কবি প্রাচীন জগতের সমস্ত ধন মন্ত্রবলে হরণ করিয়া স্বীয় কাব্যে তাহা দেখাইয়া থাকেন, তাই উহা এত আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

বঙ্গসাহিত্যে ঘনরামের এক স্বতন্ত্র স্থান। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবির নিকট তাঁহার বিষয়ের উপকরণ পান নাই, জন-প্রসিদ্ধ লাউসেনের বৃত্তান্তটি অবশ্য তিনি গঠন করেন নাই। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ব্যতীত কাব্য আদরণীয় হইত না,—তিনিও দুর্গার মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির সম্বন্ধে একটি বিশেষ রীতি দেখা যায়, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে কবিকঙ্কণের চণ্ডী অনেক বৃহৎ। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অনেক বড়। পরমেশ্বর কবীন্দ্রের মহাভারত হইতে কাশীদাসের মহাভারতও অনেক বড়। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচিত কাব্যকে নবভাবে গঠিত করিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ একটু আকার বাড়াইয়াছেন—প্রথম কবিই যদি অত্যন্ত বৃহৎ কাব্য লিখিবার প্রয়াস পাইতেন, তবে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতেন না। ঘনরাম এক বিরাট গ্রন্থ লিখিতে দাঁড়াইয়াছেন,—এ বিষয়ে তিনি কোনও মহাজন-পদ-চিহ্নিত পথে গমন করেন নাই। তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একজন কেইডমন কি দান্তে পথ না দেখাইয়া গেলে সহসা একজন মিল্টন হইতে পারেন কি না, সন্দেহের বিষয়। ঘনরাম তাঁহার নিজের প্রতিভায় অতিরিক্ত বিশ্বাসপরায়ণ। তিনি পত্রে পত্রে নব নব চরিত্রের বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নব নব ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা একবারে এত বড় কাব্যের বিষয় আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও উদ্ভাবনীশক্তি বহু বর্ষ ব্যয় করিয়াও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকে একখানা সুপাঠ্য কাব্যরূপে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। লাউসেন কত বড় বীর! মৃতের দেহে জীবনসঞ্চার করিতেছেন, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের বিক্রম ও মহিমা দেখাইয়াছেন, অজেয় ঢেকুর জয় করিয়াছেন, ইহা ছাড়া নৈতিক কত যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছেন ও জয় লাভ করিয়াছেন, কত রূপসীর কটাক্ষ ও বিমুগ্ধকর তন্ত্র মন্ত্র বিফল করিয়া দুর্গা স্মরণ করিয়া রজনীযাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই বীরের বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা তাঁহার কিছুমাত্র বীরত্ব দেখি না। কবি সর্ব্বত্রই দৈবশক্তির অবতারণা করিয়া এত বড় বীর লাউসেনকে খর্ব্ব করিয়াছেন। দেবী আসিয়া তাঁহার যুদ্ধগুলি জয় করিতেছেন, তাঁহার শরীরের মশক পর্য্যন্ত খেদাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিভা কি বীরত্বের কিছুমাত্র প্রভাব আমরা দেখিতে পাই না। করি

এই ভাবে তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রটিকে মাটি করিয়াছেন। এত বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াও কবি কিছুমাত্র বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা এক মত্ত হস্তীর ন্যায় প্রফুল্ল পঙ্কজবন লক্ষ্য করিয়া শুধু পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে মাত্র। কাব্যে বর্ণিত চরিত্র গুলির কষ্টে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। দেবী আসিয়া তাহা নিবারণ করিবেন, জানি। পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখও তজ্জন্য লঘুজ্ঞান হয়। ঘনরামের ভগবতীরও কিছু মাত্র মর্য্যাদা নাই। তিনি লাউসেনের আরাধ্যা দেবী হইয়া রূপসী যুবতী বেশে তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, প্রতিবারেই ভগবতী আসিয়া তিনি যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন, সেই সব কার্য্যের তুলনায় উপস্থিত বিপদ অতি সামান্য, তাহা অবহেলায় দমন করিতে পারিবেন, নিজের ভেরী এইরূপে নিজে বাজাইয়া তাঁহার উপাসকগণের নিকট বড় হইতেছেন, যখনই কোনও ভক্ত তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তখনই তিনি কলম ধরিয়া স্বর্গমর্ত্যপাতাল খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছেন, কে স্মরণ করিল, তাহা কোনও রূপেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। ঘনরামবর্ণিতা দেবী একটি বুদ্ধিশূন্যা নির্লজ্জা ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণা রমণী।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের আর এক মহৎ দোষ, একরূপ ঘটনার পুনঃপুনঃ একই ভাবের বর্ণনা। কতবারই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের দম্ভ ও মালসাট বর্ণিত হইল, কিন্তু সব স্থলেই এক ছন্দ, এক কথা; কিছুমাত্র অভিনবত্ব নাই, পড়িতে পড়িতে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

ঘনরামের বিপুল গ্রন্থে সৌন্দর্য্যের প্রভা না আছে, এমন নয়। উহা তাঁহার পরিচায়ক কীর্ত্তি। কিন্তু কবি সুচারুভাবে গল্পটি সম্বন্ধ করিতে পারেন নাই। উহার উজ্জ্বলতা মেঘান্তরে ঈষৎ-মুক্ত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় হঠাৎ প্রকাশ হয়; বহুদূর কবির সঙ্গে কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইতে যাইতে পাঠক হয় ত একটা ক্ষুদ্র কুন্দ কি মালতী ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ান,—এইমাত্র লাভ। এই কাব্য যাঁহারা আগাগোড়া পড়িতে পারিবেন, তাঁহাদের ধৈর্য্য অসামান্য, তাঁহারা প্রশংসনীয় পাঠক। কিন্তু আদ্যন্ত না পড়িলে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা জানা অসম্ভব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রতিশোধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভরা ভাদ্রে চূর্ণীনদী কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়াছে। তীরের বাঁশঝাড়গুলি, লতা-সমাচ্ছন্ন আগাছার সারি প্রায় আগ্রীব ডুবিয়া গিয়াছে। নদীর খর স্রোত তাহাদের শাখায় প্রশাখায় প্রহত হইয়া স্থানে স্থানে ঈষৎমাত্র বাঁকিয়া চলিয়াছে। নদীকূলে কোমল তৃণ শোভা আর বড় দেখা যায় না—প্রায় সর্ব্বত্র নিবিড় হরিৎ ধান্যক্ষেত্র।

নদীর ধারে দেবীপুর নামে ক্ষুদ্র পল্লী তিনদিকে বন্যাজলে বেষ্টিত। সরোবরবক্ষঃস্থ কুবলয়কুঞ্জে জলচর পক্ষীর নীড়ের মত, তালনারিকেলবনখচিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি জলে ভাসিতেছে। তাহার বাঁধা ঘাটে নৌকা বাঁধা এবং ঘাটের উপর শিবমন্দির-সম্মুখস্থ অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সমাগম দেখিয়া মনে হইতেছিল, আজ বুঝি কোন পর্ব্বদিন।

বাস্তবিক কিন্তু কোন পর্ব্বদিন নহে। কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা সরলা আঠার বছর বয়সে সবে প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে, তাই আজ দেবীপুরের এ জীবন্ত ভাব। সরলা আর কখন গ্রামের বাহির হয় নাই। ছেলে বেলায় মার সঙ্গে দুই চারি বার গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, আবছায়ার মত মনে পড়িতেছে। সম্প্রতি মাতৃহীনা হওয়ায় সে অভিভাবিকা মাত্র শূন্য হইয়াছে,—এক শ্বশুরালয় ছাড়া ত্রিকুলে আর আশ্রয়স্থান ছিল না। মাতার ত্যক্ত ব্রহ্মোত্তর জমীগুলি এবং ভদ্রাসন অবলম্বন করিয়া, দেবীপুরে বাস করিতে গ্রামবাসীরা সরলাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়সে সেখানে একাকিনী বাস করিতে তাহার সাহস হইল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইদানীং গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাটীর অঙ্গনে ঢিল পাটকেল আসিয়া পড়িত, এবং সরলার শয়ন-সঙ্গিনী আকালের মাও নাকি দুই দিন তিন-চারি জন লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

অতএব কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, সরলা এই ভাদ্র মাসেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে, স্থির করিল। সে অনেক দূর—নৌকাপথে আড়াই দিনের পথ। নয় বছর বয়সে সরলার বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কপালে কখন স্বামী-সম্ভাষণ ঘটে নাই। এই নয় বছরের ভিতর স্বামী মহাশয় আরও দ্বাদশটি ছোট

বড় কুলীনদুহিতার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, ভর্ত্তার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সরলা সুতরাং তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল না। যাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া মাতা কন্যার নারীজন্ম সফল হইল ভাবিয়াছিলেন, এই নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় তিনি কি চরণে ঠাঁই দিবেন না? সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় সরলা আশৈশবের বাসভূমি ছাড়িয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিল।

আকাশের মা অনেক দিনের মানুষ, সরলার মাতামহীর সমবয়স্কা। সরলারি মাতাকে সে মানুষ করিয়াছিল। এজন্য সরলা তাকে আয়ি বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, "সলি, ভাদ্দর মাসে কুকুর বিড়েলের বাড়ী ছেড়ে যেতে নেই, আর একটা মাস কোন রকমে থেকে যাও।" সরলা বলিল, "আয়ি কুকুর বিড়েলকেও আহা করার লোক আছে—কিন্তু আমার কে আছে বল্? শেষে কি এখান থেকে একটা অখ্যাত নিয়ে বেরুব।" বুড়ী এই যুক্তিতে নিরুত্তর হইল। অতঃপর পাড়া প্রতিবেশিনীরা ভাদ্র মাসের দোহাই দিয়া সরলারি যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিলে আকাশের মা বলিত—"বাবা ঠাকুর স্বপন দিয়েছেন, সোয়ামির কাছে যেতে দিন ক্ষণ দেখতে নেই।"

সরলার মা ধান্য সাড়ি দিয়া এবং কিছু কিছু মহাজনী করিয়া গ্রামের "ছোট লোক" গুলিকে বাধ্য করিয়াছিলেন, ইহাতে পল্লীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের ভদ্র ও অভদ্র সমাজে ব্রাহ্মণবিধবার ধনশালিনী বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। আজি কালিকার দিনে ইহাতে ইনকম ট্যাক্সের বিভীষিকা ছাড়া অন্য ভয় বড় থাকে না, কিন্তু সে কালে যারা আয়-ব্যয় সংগ্রহ করিয়া রেজাইত লোকে তাহাদিগকে ডাকাইত বলিত। অতএব সরলার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক্ ঠাক্ হইলে, গ্রামস্থ বাগদী জাতীয় চারি জন লোক লাঠি সড়কী লইয়া আপনা হইতে নৌকায় গিয়া উঠিল। সরলাকে বুঝাইল, "দিদি ঠাকরুণ গো, ছেরক কাল তোমাদের খেয়ে মানুষ, পথে বদিই তুমি কোন আপদে বিপদে পড়, আমাদের নেমকহারাম নাম কিছুতেই ঘোচবে না।" আকাশের মা বহুকাল পূর্ব্বে পুত্রহীনা হইয়াছিল—ভববন্ধন আর বড় কিছু ছিল না। সেও সরলার সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবীপুর ছাড়িয়া যাইতে সরলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। আপনার বলিতে সেখানে কেহ আর ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি সেই মাটি ভিটা টুকুর সঙ্গে কত স্নেহ মায়া জড়িত! ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতা আমাদের স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে

শোণিতসম্পর্কের গণ্ডী-মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়, কোথা হইতে প্রেম আসিয়া ধীরে ধীরে বলে, এই বৃক্ষলতা পশু পক্ষী, প্রতিবেশীর এই শিশু পুত্র কন্যা—এ সব তোমার নিজের। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহ এবং অনন্ত উদার আকাশের মত স্থাবর জঙ্গম সবই যে তোমার নিতান্ত আপনার, ইহাতে সন্দেহ করিও না।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সরলা নৌকায় গিয়া উঠিল। সদ্য মাতৃশোক আজ আবার নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিয়াছিল—যে কিছুর সঙ্গে মাতার মধুর স্মৃতি জড়িত, সকলেরই কাছে আজ চিরবিদায় লইতে হইয়াছে। প্রতিবেশিনীরা অনেকেই উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছিল। সরলা কখন গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে জানে না—চোখের জল মুছিতে মুছিতে ধীর পদে সে যখন নৌকায় গিয়া উঠিল, তীরের লোকেদের মনে হইল, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গ্রাম ছাড়িয়া অনিচ্ছায় চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীস্রোতে ছুটিয়া চলিল। জ্ঞান হইয়া অবধি সরলা কখন দেবীপুরের বাহির হয় নাই, মনটা ভাল না থাকিলেও মুক্তপ্রকৃতির প্রাবৃটোৎসব দেখিতে দেখিতে সে আত্মবিস্মৃত হইতেছিল। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম, কত উদ্যান, কত দেবালয় দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, নৌকার ভিতর পর্দ্দার মধ্যে বসিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সরলা এক মনে সকলই দেখিতেছিল।

এইরূপে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। আকালের মা ততক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া পর্দ্দার বাহিরে শয়ন করিয়াছিল। প্রথমতঃ অনেকক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া নৌকারোহীরা ভাবিয়াছিল, বুড়ীর মন কেমন করিতেছে; কিন্তু ক্রমে তাহা গভীর নাসিকাগর্জ্জনে পরিণত হইয়া আসিল। অতএব বুড়ী যখন উঠিয়া বসিল, এবং সরলা কাঁদিতেছে কি না দেখিবার জন্য পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল, সরলা তখন স্থির দৃষ্টিতে একটা কিছু দেখিতেছে। এইখানে চূর্ণীনদী কতকটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে—দুই প্রবাহের বক্ষঃস্থলে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর নিবিড় বটচ্ছায়া এক অতি জীর্ণ শিবমন্দির প্রমুখ ইষ্টকালয়কে আশ্রয় দিয়াছে। প্রকাণ্ড বটগাছের শাখা প্রশাখা মাঝে মাঝে ভূমিশায়ী হইয়া আছে—কচিৎ একটা জটা অথবা একটা শাখা নদী-স্রোতে প্রহত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। সরলা দেখিতে পাইল, বটগাছের নিবিড় ছায়ামধ্যে দুইখানা দীর্ঘ পানসী কাণ্ডসংলগ্ন হইয়া আছে।

এইখানে নদীর দুই ধারে বন অতি নিবিড়। এবং নদী দ্বিধাভিন্ন হইলেও স্রোতের বেগ অতি তীব্র। মাঝিরা নৌকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, বটচ্ছায়ায় লুক্কায়িত পানসীযুগল তাহারা কেহ দেখিতে পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পানসী দুই খানা দেখিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিয়া বটে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিবলে সে আকালের মাকে আশঙ্কার কথা কিছু জানিতে দিল না। নদীতীরের বনদেশ হইতে কদম্ব কেতকীর ঘ্রাণ আসিতেছিল—আকালের মা নিকটে আসিবামাত্র সরলা সেই দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিল। ইহাতে বুড়ী সহজেই ভাবিল, গোটাকতক কেয়া ফুল আহরণ করিতে পারিলে "সলিকে" খুসী করিতে পারা যাইবে। অতএব সে বাগ্দী চারি জনের ভিতর এক জনকে ডাকিয়া বলিল, "বদন, তোর দিদিঠাকুরুণের জন্যে গোটা চারেক কেয়ার ফুল তুলে আন্ না ভাই, নাত্জামাইকে ভেট দেবে। নৌকো বাঁধ। কি বলিস্ দিদিমা!"

এখন নৌকা "দ্বীপ" বেষ্টন শেষ করিয়া উভয় স্রোতের সন্ধিস্থলে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। খরপ্রবাহে নৌকা স্থির রাখিতে মাঝিমাল্লা এবং সর্দারেরা সকলেই ব্যস্ত। আকালের মার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। তাহাতে বুড়ী তাহার সহজকর্কশ কণ্ঠ আরও চড়াইয়া দিয়া বদনকে ডাকিতে লাগিল, কেন না, নিজে সে ভাল শুনিতে পায় না।

এদিকে স্থিরবুদ্ধি হইলেও সরলা ক্রমে মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। লুকান পানসী দেখিয়া অবধি তাহার মনে হইতেছিল, আজ রাত্রিটা ভালোয় ভালোয় যাবে না। আকালের মাকে ভারি ভীত বলিয়া সরলার বরাবর জানা ছিল। তাহার কাছে পানসীর কথা গোপন না করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছে—সর্দারদিগকে সতর্ক না করিয়া দিলে অবশ্যম্ভাবী বিপদে প্রতীকারের কোনই যে উপায় হইবে না, ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য বুড়ী চীৎকারের উপর চীৎকার করিলেও সরলা তাহাকে নিষেধ করে নাই।

বদন যখন আসিল, নৌকা তখন নদীখাতে আসিয়া পড়িয়াছে। উভয় তীরে বনজঙ্গলের আর তেমন বাড়াবাড়ি নাই। আকালের মার পুষ্পাহরণ-সম্পর্কীয় অনুরোধ শেষ হইতে না হইতে বদন দিদিঠাকুরাণীর কাছে পানসীর

খবর শুনিল। সে ব্যস্ত হইয়া আর তিন জনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। ইহাতে আকালের মা প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে ক্ষুব্ধ হইল। নৌকা বাঁধিয়া কেহ ফুল তুলিতে না যাওয়ায় তাহার মনে হইল, সকলে তাহাকে তাচ্ছীল্য করিতেছে। অতএব বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই, মনের এই ভাব সে গজগজ করিতে করিতে প্রকাশও করিতেছিল। সরলা হাসিয়া বলিল, "আমি, রাগ করিস্ নে। বেলা নেই, পথঘাট ভাল নয়, নৌকা বেঁধে দেরি করলে সন্ধ্যের আগে কোন গাঁয়ে পৌঁছন যাবে না। কাল ফুল তুলে তোর পাকা চুলে গুঁজে দেব।" ইহাতে বুড়ীর রাগ ভাল হইয়া গেল। সব কথা শুনিতে না পাইলেও "ওঃ তা হবে" বলিয়া সে সরলার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা গল্প যুড়িয়া দিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মাঝিমাল্লা এবং সর্দ্দারদের ভিতর কেহই আর কখন এ পথে আসে নাই। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা অনুভূত হইলে তাহাদের পরস্পরের ভিতর একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা আশ্রয়স্থান পাওয়া চাই—নহিলে ডাকাইতের দলের মুখে সেই সাতজন লোক কতক্ষণ দাঁড়াইবে? বাগ্দী চারি জন বুঝিল, সেই "দ্বীপ" বিশে ডাকাতের একটা আস্তানা। কেন না, নদীয়া জেলায় অন্য দলপতি তখন ছিল না। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া চলিল। নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

যুগল নক্ষত্র।—বিখ্যাত সার জন হর্শেল আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেকগুলি যুগল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্শেলের পর আজ পর্য্যন্ত এইরূপ যুগল নক্ষত্র বিস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুগল নক্ষত্র, অর্থাৎ দুইটি নক্ষত্র, আয়তনে প্রায় সমান, পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ নক্ষত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা লইয়া বহু দিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। লাপ্লাস্ দেখাইয়াছিলেন, কোনও বর্ত্তুলাকার তরল পদার্থ বেগে আবর্ত্তন করিতে থাকিলে তাহার মধ্যভাগ (অর্থাৎ নিরক্ষ রেখার সন্নিহিত স্থল) ক্রমশঃ স্ফীত হয় ও মেরুস্থল ক্রমে চাপিয়া যায়। এই কারণে আমাদের পৃথিবীরও নিরক্ষদেশ স্ফীত ও মেরুপ্রদেশ চাপা। বেগবৃদ্ধিসহকারে সেই স্ফীতভাগ উত্তাং হইয়া গিয়া একটি অঙ্গুরীর আকারে অন্তঃস্থ ভাগকে বেষ্টন করে। শনিগ্রহে এইরূপ অঙ্গুরীর অস্তিত্ব দেখা যায়। কালক্রমে সেই অঙ্গুরী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি জর্জ্জ ডারুইন গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই যে এইরূপ অঙ্গুরীর উৎপত্তি হইবে, এমন নহে। বৃহৎ

গোলাকার তরল পদার্থ আবর্ত্তন করিতে করিতে তাহার মধ্যভাগ ক্রমে সরু হইয়া যায়। কতকটা ডমেল অথবা ডমরুর আকারে দাঁড়াইয়া যায়। মধ্যভাগ আরও ক্ষীণ হইয়া শেষে একবারে ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তখন একটা বর্ত্তুল হইতে দুইটি বর্ত্তুলের উৎপত্তি হয়। ডারুইন্ বলেন, এইরূপে যুগল নক্ষত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। অন্তরীক্ষে নীহারিকা (ইংরাজিতে নেবুলা) নামক যে বাষ্পময় পদার্থ ভাল দূরবীক্ষণে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির আকার ডমরুর মত। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, এই নীহারিকারূপ বাষ্পময় মণ্ডলী হইতে সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং নীহারিকায় ডমরু আকৃতি অনেকটা ডারুইনের অনুমানের পক্ষে আছে বলিতে হইবে।

মঙ্গলগ্রহ। কিছু দিন হইল, যখন মঙ্গলগ্রহ আমাদের খুব নিকটে আসিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তখন মঙ্গলে জীবাধিবাস সম্বন্ধে নানা লোকে নানাবিধ কল্পনা জল্পনা আরম্ভ করেন। অনেকে বলিয়াছিলেন, মঙ্গলের মানুষে বড় বড় আলো জ্বালিয়া আমাদের নিকট সঙ্কেত পাঠাইতেছে। সে যাহাই হউক, মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। চন্দ্রে বায়ু নাই, মঙ্গলে বায়ু আছে। মঙ্গলে মহাদেশ ও মহাসমুদ্র বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মেরুপ্রদেশ সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন দেখা যায়। শীতকালে এই তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশের পরিধি খুব বাড়িয়া যায়, আবার গ্রীষ্মকালে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। মঙ্গলের উত্তরার্দ্ধে মোটের উপর ৩৮৯ দিন শীতের ও ৩০৬ দিন গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাব। মঙ্গলের রক্তবর্ণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, পৃথিবীতে উদ্ভিদের বর্ণ হরিৎ, কিন্তু মঙ্গলে উদ্ভিদের বোধ হয় রক্তবর্ণ। এই অনুমান যুক্তিযুক্ত না হইতেও পারে। মঙ্গলে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা বলা যায় না। তবে পৃথিবীর মানুষের অপেক্ষাও উন্নত জীব না থাকিতে পারে, এমন বলা যায় না।

বৃহস্পতির উপগ্রহ। এতদিন বৃহস্পতির চারি চন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, সম্প্রতি পঞ্চমচন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিকারিং সাহেব বৃহস্পতির চন্দ্রগুলির নিয়ত আকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনুমান করেন, বৃহস্পতির চন্দ্র আমাদের চন্দ্রের মত জমাট এক খণ্ড পদার্থ নহে,—এক একটি চন্দ্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সমবায়ীভূত সমষ্টিমাত্র।

ভবিষ্যতের কয়লা। এক হিসাবে খনিজ পাথর কয়লা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়লা ফুরাইলে, সুতরাং কলকারখানা বন্ধ হইলে, মনুষ্যজাতির ভাগ্যে কি ঘটিবে, ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লার উৎপত্তি নাই, অথচ খরচ যথেষ্ট; সুতরাং কিছু দিনেই যে সমুদয় কয়লা ফুরাইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হইতে সেই কয়লাহীন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বড় বড় ম্যাজগর্ভ দর্পণের দ্বারা সূর্য্যকিরণ সংগ্রহ ও একত্র করিয়া, তদুৎপন্ন তীব্র তেজের দ্বারা কল বানাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ ব্যয়, সে পরিমাণ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। একটা উপায় আছে। আজ কাল তাড়িত শক্তির প্রয়োগে সমুদয় সাংসারিক ব্যাপার চালান যাইতে পারে। তাড়িতে সঙ্কেত ও শব্দ বহন করে, তাপ দেয়, আলো দেয়; গাড়ী টানে, জল তুলে, ময়দা পিষে। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, কলিকাতায় তাড়িত উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা দিল্লীতে কাজ করা যায়। তাড়িতের উৎপাদনেও কোনও বহস্ত নাই। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইলে ঐ তারে যত ইচ্ছা তাড়িত প্রবাহ উৎপাদন করা চলে, তারটা ঘুরাইতে যা কষ্ট। অল্প কাজে মানুষে ঘুরায়, বেশী কাজে এঞ্জিনে ঘুরাইতে হয়। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের নিম্নে ঢাকা পাতিয়া সেই জলের ধাক্কায় চিরকাল বিপুলবেগে কল ঘুরান ও তার ঘুরান চলিতে পারে। এবং তাহাতে যে প্রভূত তাড়িত শক্তি জন্মিবে, তাহা পরিচালিত

করিয়া সমুদয় ইউরোপের সমুদয় গৃহস্থের সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ইউরোপ, আমেরিকার মুখ চাহিয়া ভরসা বাঁধিয়া থাকিতে চাহিবেন কি না স্বতন্ত্র কথা। যদি কোন রাজনৈতিক বিধা না থাকে, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা হয়, তাহা হইলে নায়াগ্রার যে শক্তির নিয়ত অপচয় মাত্র হইতেছে, তদ্দ্বারা ইউরোপের চিরকাল স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম্ম চলিতে পারে, কয়লা ফুরাইবে বলিয়া ভাবিতে হয় না। সম্প্রতি নায়াগ্রার জলপ্রপাত হইতে তাড়িত উৎপাদনের জন্য যে সকল কোম্পানি সংগঠিত হইয়াছে, তাহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ও শতায় দূর দিগন্তে তাড়িত শক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতেছে; পরিদর্শকগণ এতদ্দ্বারা ঘরে রোশনাই করিবেন, নগরের রাস্তা আলোকিত করিবেন, ছাত বাঁধিবেন, আগুন জ্বালিবেন, জল তুলিবেন, পাখা টানিবেন, গাড়ী চালাইবেন, কল চালাইবেন, ইত্যাদি। ফলে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে, এখন বলা যায় না।

ভবিষ্যতের আলো।—আজ কাল সচরাচর কাষ্ঠ, কয়লা, তেল, বাতি পোড়াইয়া আলোক উৎপাদনই রীতি। কিন্তু এই দহনকার্য্যে যে শক্তির ব্যয় হয়, তাহার এক আনা ভাগও আলো হয় না। পোনের আনার অধিক তাপ উৎপাদনে যায়। সে তাপটা কোনও কাজেই লাগে না। তাপ ব্যতীত শুদ্ধ আলোক উৎপাদন ভবিষ্যতের সমস্যা। জোনাকী পোকা কেবল আলো উৎপাদন করে, তাহার আলোর সঙ্গে তাপ নাই। জগদ্ব্যাপী ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ হইতে আলো জন্মে। কিন্তু আমরা সেই ছোট ঢেউ উৎপাদন করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে বড় বড় ঢেউ উৎপাদন করিয়া ফেলি। পাঁচটা ছোট ঢেউএর সঙ্গে পঞ্চাশটা বড় ঢেউ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। এই বড় ঢেউগুলা কোনও কাজে লাগে না। ইহাদের মধ্যে আবার যে গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাতে তাপ জন্মে; কিন্তু যেগুলি অপেক্ষাকৃত বড় (এবং ইহাদের সংখ্যাই বেশী) তাহার দ্বারা তাপও জন্মে না। নিরর্থক শ্রম ভালও লাগে না, উচিতও নহে। তাই শুদ্ধ আলোক, অর্থাৎ ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ উৎপাদনের জন্য পণ্ডিতেরা সম্প্রতি আড়ে হাতে লাগিয়াছেন। যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে দু দশ বৎসরের মধ্যে উপায় একটা আবিষ্কৃত হইবে, ভরসা হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। শ্রাবণ। প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের "রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম"। "পুরাকল্প" শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের একটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা; লেখক এই প্রবন্ধে মৈত্রিক কালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করিবেন। এরূপ প্রবন্ধ একটু বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "হরিদাস ঠাকুর" বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত। "বুদ্ধোৎসব" শ্রীযুক্ত নকুড় চন্দ্র বিশ্বাসের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। লেখক বলেন,—"বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির যেরূপ দুর্গোৎসব, * * * বৌদ্ধদিগেরও সেইরূপ বুদ্ধোৎসব। বুদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। এই উৎসব উক্ত দিবস অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিব্বতের * * * ধর্ম্মই বল, সমাজনীতিই বল, যাহা কিছু সমস্তেরই আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তিব্বতীয়েরা যে বঙ্গদেশের প্রতিমাপূজার অনুরূপ বুদ্ধোৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে।" তাহার পর লেখক বুদ্ধপ্রতিমাগঠন ও পূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।

ভারতী। শ্রাবণ। "আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি" শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচনা। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর "কোল জাতির আমোদ-প্রমোদ" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট আমোদ পাইয়াছি। লেখিকার সরল বর্ণনা ও আড়ম্বর-শূন্য প্রাঞ্জল রচনা, তৃপ্তিকর। তাঁহার বর্ণিত বিষয় কৌতূহলের উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। "হত্যারহস্য" একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প,—লেখকের নাম নাই। "বিষম সমস্যা" আর একটি লেখকের নামহীন রচনা। "মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, এই এক বিষম সমস্যা লইয়া আজ কাল সমস্ত সভ্যসমাজে এক তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; তাহা লইয়া অনবরত তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদ চলিতেছে, অনেক যুক্তি অযুক্তি বর্ষিত হইতেছে।" বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক, তাহাদের সংখ্যাটি বাড়াইয়াছেন; "ফুল ও অলি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা। "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি অতিবিস্তৃত সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ধর্ম্মানুরাগীদের পক্ষে প্রীতিকর হইলেও হইতে পারে,—পড়িতে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবে কি না, সন্দেহ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়ের "বোম্বাই সহরে পার্সি" একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ। "বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃত একটি "বিড়ম্বনা"। আমাদের দেশের প্রথিতযশা লেখকেরা কেন যে এরূপ অন্তঃসারশূন্য, অকিঞ্চিৎকর, অক্ষরসর্ব্বস্ব রচনা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভারতীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহার আর একটি উদাহরণ আছে,—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা—"নূতন যৌবন"। অনেকের অনেক রকম খেয়াল থাকে; সে জন্য কাহাকেও অপরাধী করা যায় না। কিন্তু সহিতো খেয়ালের বাড়াবাড়ি দেখিলে সত্য সত্যই বিরক্ত ও ব্যথিত হইতে হয়। ইহা বঙ্গদেশের আবহাওয়ার দোষ বলিতে হইবে। শ্রীমতী সরলা দেবীর "লানকবানের উদ্ধার" এখনও লিখিতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" বেশ হইয়াছে।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রাবণের "সাহিত্য" প্রকাশের পর নব্যভারত আমাদের হস্তগত হয়, সুতরাং গত মাসে আমরা নব্যভারতের উল্লেখ করিতে পারি নাই। "নূরহরা" শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর একটি অতিবিস্তৃত চরিত্রসমালোচনা। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের কৃত "অমিয়নিমাই-চরিতের" সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক সমালোচনা-প্রণালীর যেরূপ সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন, মূল গ্রন্থের সেরূপ আলোচনা করেন নাই। "অমিয়নিমাইচরিত" এ শ্রেণীর একমাত্র গ্রন্থ নহে। শিশির বাবুর নিমাইচরিত স্বশ্রেণীর গ্রন্থাবলীর সংখ্যা কিসে বা কিরূপ নিজস্বে বড়, সমালোচকের নিকট আমরা তাহা জানিবার আশা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাহার আভাসও পাওয়া গেল না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লিপিচাতুর্য্য সুন্দর। অনবরত একঘেয়ে রচনা পড়িয়া যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, ঠাকুরদাস বাবুর রচনা-প্রণালী নিশ্চয়ই তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান করিবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "রঙ্গিরচন্দ্র" পাঠযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, তাঁহার "বর্ত্তমান বঙ্গভাষা" লইয়া আবার দেখা দিয়াছেন। কিন্তু "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদক, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ঘরের কাটারী লইয়া তাঁহারই ঘাড়ে কোপ দিয়াছেন, সেটা ঠাহর আছে কি? বিদ্যানিধি মহাশয় নিজে ব্যাকরণ হাতে করিয়া দেশ শুদ্ধ লোকের লেখা বাতিল ও নাকচ করেন, কিন্তু নিজে লিখিবার সময় ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করেন, ইহাই হিতবাদীর অভিযোগ। অত্যন্ত আশ্চর্য্য বটে।

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত ডাক্তার এস্, বি, মিত্রের "পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি" একটি শিক্ষাপ্রদ সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক বোধ হয় নূতন বাঙ্গলা লিখিতেছেন,—

রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়,—কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের গৌরবে ও বুঝাইবার গুণে প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ হইয়াছে। "কেন কাঁদ?" স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতা। লেখকের নাম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে বলিতেছেন, ইনি বৃত্র-সংহার-রচয়িতা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতাটি পড়িয়া ত আমাদের তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যিনি মাইকেলের লোকান্তরগমনে লিখিয়াছিলেন,—

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি হিরণ্ময় জ্যোতি যাব,"

তিনি বঙ্কিম বাবুর স্বর্গারোহণে

"বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে আহা কি মধুরতর।"

লিখিয়া ছাপাইতে পাঠাইবেন, ইহা বিশ্বাস করা দুরূহ। বোধ হয়, ইনি আমাদের সেই পুরাতন "খাঁটি" হেম নহেন,—কোনও নরারিষ্কৃত "কেমিকেল" হইবেন। কেন না, আজ কাল যে সকল নূতন লেখক কবিতায় মকস্ করিতেছেন, তাঁহারাও "কেন কাঁদ"র অপেক্ষা ভাল কবিতা লেখেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "বাকুচিরিয়া" একটি সুপাঠ্য, সুন্দর, শিক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "বাঙ্গলা উপন্যাসের বিশেষত্ব" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর রচনা। গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতভেদ সত্ত্বেও স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত বটে। কোনও জাতির সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ফরতা দিতে হইলে, বৈদেশিক সমালোচকের পক্ষে আর একটু উদার ও সংযত হওয়া ভাল। অত্যুক্তিদোষে এরূপ প্রবন্ধের অত্যন্ত গৌরব-হানি হয়। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষের "অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা" একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ। আমরা পাঠকগণকে, বিশেষতঃ আমাদের আসামী ভ্রাতৃগণকে প্রবন্ধটি মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতে বলি। লেখক উপসংহারে বলিতেছেন,—"হিন্দুরাজত্বকালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে আহম-প্রাধান্য-যুগে ৺ শঙ্করদেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি গত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত করিয়া অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। ভাষাভেদ যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে পারিবেন; ঐক্য-বলসংস্থাপনের চেষ্টায়, সে জন্য, আজ কাল জাতীয় মহাসমিতিতে পরস্পর চিত্ত-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় এক ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় না থাকায়, ইংরাজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "এক অপরিজ্ঞাত কবি" শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কৃত কবিবর বিহারীলালের কবিত্বসমালোচনা। প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও মৌলিক। এরূপ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সুলিখিত প্রবন্ধ বাঙ্গলা মাসিকে প্রায় দেখা যায় না।

সাধনা। শ্রাবণ। "ডেপুটী-তত্ত্ব" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি রহস্যময় নক্‌শা। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় "মহাকবি কৃত্তিবাস" প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। "মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন কর্ত্তৃক লিখিত বৃদ্ধ

চরিতের এক অংশ। "ব্রাহ্ম ও প্রবাসী" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ সন্দর্ভ। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতা" এখনও চলিতেছে। "সাহিত্যের গৌরব" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়িবার ও ভাবিবার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "বঙ্কিমপ্রসঙ্গে" স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাগুলি সামান্য বটে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। আমরা দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিম বাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলার সাজ সজ্জা এবং কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নল দেখিয়া আমার 'বিষবৃক্ষের' হুঁকার কথা মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ মাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না। ইংরেজী ভাষাটা ভারি Insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমার বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলিতে, লিখিতে পারি নাই। প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালে বঙ্কিম বাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে। কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, এখনকার ছেলেরা দেখিতে পাই, গুরুজনদিগকে আগেকার মত প্রণাম করে না। নিজের বাড়ীর বধ দেখিবার জন্য তাঁহার অপরাহ্ণে কাঁঠালপাড়ায় যাওয়ার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিম বাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম,—নব্য-যুবকদের প্রতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। শ্যামাতা রাখাল বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওঁকে আর বেহাইকে জল খাওয়াও।' এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পৌঁছিলেন—বঙ্কিম বাবুর কাঁঠালপাড়া যাওয়া হইল না। * * * আর এক দিন চন্দ্রশেখর (মুখোপাধ্যায়) বাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিম বাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ওঁকে চেন না?—উনি ত্রিস্রোতেন!' মনে হইতেছে, এই দিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর হইতে বঙ্কিম বাবুর একটি প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে মিলনের আনন্দ এবং হাস্য এখনও আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় পড়?' উ—Fourth year, Presidency College. বঙ্কিম বাবু—রাখালের সঙ্গে আলাপ নেই?—উ—না। বঙ্কিম বাবু—সে কি হে,—এক ক্লাসে পড়, আলাপ নেই? সঞ্জীব বাবু বলিলেন, 'তা জান না বুঝি? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটা ঘোর বেয়াদবি। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্যশিক্ষিতের সঙ্গে এক জন সেকেলে লোকের এক স্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, তাঁর নামটি কি?—নব্য বাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি আবার প্রশ্ন, 'মশায়ের পিতার নাম?' বাবুটি চটে-লাল, বুড়োকে মারেন আর কি। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া, বাড়ীর অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটিকে সুধাইল, 'বাবু বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগি কেন?' ভারি হাসি পড়িয়া গেল। এক দিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় 'আনন্দমঠের' সুপরিচিত 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিসটিকে আধ-সংস্কৃত আধবাঙ্গলায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত।

লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ-কুপিত স্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব।' * * * * আমি বলিলাম, আমার ইচ্ছা আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি? বঙ্কিম-বাবু হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নহে। জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ, তিনি জানেন, আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ সকল বলিলে, লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দু ধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে, লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম, ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি। নীতি-শিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখি নি, বলা যায় না।' বঙ্কিম বাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম, 'শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?' উত্তর—'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েচে।' একটু পরে বলিলেন, 'চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ, আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা।' আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, স্ত্রীচরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশী। পুরুষও কয়টি অতি সুন্দর আছে। অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিম বাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, অমরনাথ আর প্রতাপ, একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী; কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন, পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, অনেকে কপালকুণ্ডলাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে। উত্তর—হাঁ, কাব্যাংশে খুব উঁচু বটে।' তার পর নিজেই বলিলেন, "প্রথম তিন খানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশ-নন্দিনী লেখার আগে আইভানহো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্ষপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।' চন্দ্রশেখরের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোনও কাব্যে দেখা যায় না। সেই 'অগাধ জলে সাঁতারের' মত সুন্দর অপূর্ব্ব দৃশ্য বড় দুর্লভ। আমার কথা স্বীকার করিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'অগাধ জলে সাঁতারের মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" "বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ। একজন সুইডেনদেশীয় ভদ্রলোক হিন্দুর একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন, এবং তজ্জন্য আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া, কলি-

কাশীর দেশীয়দের সঙ্গে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলেন, তাঁহার শব সমাধিস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তদনুসারে মৃতকে নিমতলার শ্মশানে দাহ করা হইয়াছিল। পবিত্র হিন্দুর শ্মশানে পতিত ম্লেচ্ছের দাহ হইতে দেখিয়া হিন্দুচূড়ামণি-সম্পাদকেরা হিন্দুধর্ম্মের "সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। রবীন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই উদার হিন্দুধর্ম্মের এই সঙ্কীর্ণ অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত একটা সংযত সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় পূর্ণ; রচনা-প্রণালী সজীব ও সুন্দর, আন্তরিকতাপূর্ণ, এবং সহজেই পাঠকের হৃদয়ে প্রভাববিস্তারে সক্ষম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদের উদার পূর্ব্বপুরুষগণ, এবং তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সন্ততিধারা আমরা, এ দুইয়ের মধ্যে কাহারা হিন্দু? তাঁহারা, না আমরা? হিন্দুত্ব মনুষ্যত্বে,—না লোকাচারের কাপুরুষ শাসনে?

জন্মভূমি। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "কাশীরামদাস" প্রবন্ধে স্বর্গীয় ভূদেবগোপাল বিদ্যাবাগীশের প্রতি ইতরজনোচিত ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাবাগীশ, কাশীরামের কাব্য বিকলাঙ্গ বলিয়া যে অপবাদ করিয়াছেন, লেখক ভদ্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। একজন ভদ্র লেখকের পক্ষে, মৃতের প্রতি এরূপ ব্যবহার ঘৃণাজনক, লজ্জাকর। যিনি এক কালে বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে" লিখিবার একটু স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে, মৃতের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, অন্ততঃ তাহা জানা উচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও অনাবশ্যক রাগাড়ম্বর আমাদের ভাল লাগে নাই,—এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে "কাশীরামের" সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রফুল্ল বাবু এটুকু সহ্য করিতে পারেন নাই। এবার আবার সেই কথার উপলক্ষ করিয়া অনর্থক দুটি পাতা লিখিয়া পাঠক-দের সময় নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু, এবারও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার কাঠরসিকতা ও মৃতের প্রতি প্রযুক্ত অভদ্র ভাষা পড়িয়া সময় নষ্ট না করিলেও, বঙ্গীয় পাঠকের বা কোনও সম্পাদকের বিন্দুমাত্র পাপ হইবে না। ইহাতে কেবল তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের গৌরবহানি হয় মাত্র। "সন্ধ্যা" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা। লেখক এই কবিতায়, জগৎ বর্ত্তমানে যাহা আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, এই দুই বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মন্দের ও ভবিষ্যতে ভালর তালিকা। "মিনতি" শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি কবিতা। ইহার এক চরণে—'থেকে থেকে কেন বাজো বীণায় মার তান?" সরস্বতীর প্রতি তদীয় উনমুক্ত বরপুত্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া, আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিখযুদ্ধের ইতিহাস ও মহারাজ দলিপ সিংহ। শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখিলে সহজেই বুঝা যায়, লেখক নূতন ব্রতী। কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ-প্রবণতা প্রশংসনীয়। শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিপ সিংহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য। একজন নূতন লেখক, ভারতীয় ইতিহাসের সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য এমন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং প্রথম উদ্যমেই এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বাস্তবিক আশা-প্রদ। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ভাষা ও ঘটনাবিন্যাসের সংস্কার করিয়া, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন।

বেদান্তরত্নাকর।

শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ প্রণীত।

যদি কেহ সহজে জন্মান্তরাদির অস্তিত্ব জানিতে চাহেন, তবে বেদান্ত-রত্নাকর ক্রয় করুন। বঙ্গেশ্বর ছোট লাট প্রভৃতি অনেকে এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ১৲ এক টাকা; ডাকমাশুল৵০ চারি আনা। ২৪নং বাগ্ কান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনী।

বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত। ইতিপূর্ব্বে "জন্মভূমিতে" এই জীবনীর আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন প্রকাণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উপস্থিত পত্র লিখিয়া গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে এক টাকাতেই গ্রন্থ পাইবেন। ইহার মূল্য কিন্তু ১৷৹ পাঁচ সিকা।

শ্রীহরিদাস সেন।

১০ নং রামচাঁদ নস্কর লেন, কলিকাতা।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

জীবনচরিত।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

যন্ত্রস্থ।

এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের অনেক চিঠিপত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এই পুস্তকের চিত্র প্রস্তুত করিতেছেন। প্রায় ১২।১৩ খানি সুন্দর লিথো-চিত্র থাকিবে। বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, প্রণীত

বনফুল ॥৹, প্রেমহার ॥৹, এবং বিবিধ প্রবন্ধ ॥৹, এই তিন খানি পুস্তক এক টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ডাক মাসুল লাগিবে না।

সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরি। ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ম্যানেজার।

কুন্তলীনের

বার্ষিক পুরস্কার।

নগদ একশত টাকা।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ৪০৲
দ্বিতীয় স্থানীয় গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ২৫৲
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ... ... ২৫৲
দ্বিতীয় স্থানীয় কবিতার জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ... ... ১৫৲

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত বোধ করিলে, আমরা পাঁচ টাকা বা ততোধিক মূল্যের আরও অতিরিক্ত পুরস্কার দিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলি—

কি গল্প, কি কবিতা, উভয়েতেই কুন্তলীনের উল্লেখ থাকা চাই। গল্পটি সুপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হইবে—প্রত্যক্ষভাবে কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনবিশেষ হইলে চলিবে না। অথচ তাহাতে কুন্তলীনের কথা থাকিবে। কবিতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

রচনা আগামী শ্রাবণ মাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংবাদপত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাকারীদের নাম প্রকাশিত হইবে।

একজনের যত ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এক ব্যক্তি একটির অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব। রচনাকারী সে বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পরীক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে, এবং তাঁহারা যাহা স্থির করিবেন, তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

এইরূপ পুরস্কার, পূজার পূর্ব্বে একবার ও বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে, একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। সবিশেষ বিবরণ পত্র জ্ঞাতব্য।

কুন্তলীন পঞ্জিকা।

বিনামূল্যে বিতরিত।

বর্জিত কাগজে রঙ্গীন কালিতে সুন্দররূপে মুদ্রিত। কাছে থাকিলে তারিখ ভিন্ন দেখিতে আর বটতলার পাঁজা খুলিতে হইবে না। যাঁহারা এই সুদৃশ্য সুন্দর পঞ্জিকা খানি গৃহে রাখিতে চান, তাঁহারা কুন্তলীন আফিস হইতে বিনা মূল্যে লইয়া যাইতে পারেন। মফঃস্বলবাসীরা অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক

এইচ, বসু।—ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার।
২৬নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

৫ম ভাগ। ১৩০১; ১লা আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্-এ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্-এ, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীশশিচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। একটি পুরাতন বিষয়	৩৭১	৭। সহযোগী সাহিত্য ...	৪১৭—৪২৮
২। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম	৩৯০	ভ্রমণবৃত্তান্ত	৪১৭
৩। এলিফেণ্টা কেভস্	৪০০	সমাজনীতি	৪২৫
৪। অপরাধনিদান	৪০৪	রহস্য	৪২৮
৫। বৈজ্ঞানিক লাবসংগ্রহ	৪১১	৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৪২৮
৬। প্রতিশোধ (উপন্যাস) ...	৪১৪	৯। সমালোচনা	৪৩৫

কলিকাতা;
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।— এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজা সন্নিকট। এখনও অনেক গ্রাহক মূল্য পাঠান নাই। বলা বাহুল্য যে, এ সময়ে আমাদের টাকার অত্যন্ত আবশ্যক। গ্রাহক মহাশয়েরা যত শীঘ্র সম্ভব, পঞ্চম বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, আর পত্র লিখিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন। সিমলা ডাকঘর, কলিকাতা। — শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি। কার্য্যাধ্যক্ষ।

জমীবিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

বৈদ্যনাথ দেওঘর-টাউনের অনতিদূরে মাঠের মধ্যে, ঘর বাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করণোপযোগী অতি স্বাস্থ্যকর জায়গা। দৈর্ঘ্য ১৬৬ হাত ও প্রস্থ ৬৮ হাত। মূল্য এক শত টাকা। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

বৈদ্যনাথ, দেওঘর। ই, আই, রেলওয়ে। — শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর। (অথবা) শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ মল্লিক।

উচ্ছ্বাস।

নূতন প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ।

পলাশির যুদ্ধ, রৈবতক প্রভৃতির প্রণেতা কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন-কৃত ভূমিকা সহিত।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা বুক-এজেন্সী।

আমরা মফঃস্বলবাসী সাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা বুক-এজেন্সী নামে একটি এজেন্সী খুলিয়াছি, যাঁহারা কলেজ বা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে অতি সহজে সুলভ মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিতে পারিবেন। আমরা পুস্তক বিক্রয় করিবার ভারও লইয়া থাকি। অতি সামান্য মাত্র কমিশন্ লইয়া থাকি। সকলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

২২ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। — ম্যানেজার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ভূতপূর্ব্ব "সাহিত্য"-কার্য্যাধ্যক্ষ।

একটি পুরাতন বিষয়। (দর্শন)

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পুরাণো হইলেও চিরকাল নূতন থাকে। সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়ের গৌরববিবেচনায় পাঠকের ধৈর্য্যভিক্ষায় অধিকার আছে।

মনুষ্যের আত্মা সেই পুরাতন বিষয়। এবং এই পুরাতনের নূতনত্ব শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে না।

আত্মা আছে কি না, আত্মা অবিনাশী কি না, ইহা লইয়া চিরাচরিত পদ্ধতিক্রমে যথেচ্ছপরিমাণে বিতণ্ডা করা যাইতে পারে। আত্মার ধ্বংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতণ্ডার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'আত্মা' অর্থে আমরা কি বুঝি, সেটা পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, রাম অর্থে ভার্গব রাম কি রঘুপতি রাম, রামা হাড়ি চাঁপরাসী অথবা রামগিরি পর্ব্বত, সেটা উভয় পক্ষে স্থির করিয়া না লইলে, বড়ই বিড়ম্বনা ও শ্রমবাহুল্য উপস্থিত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মা কি বুঝায়, স্থির করা কিছু দুষ্কর। কেহ না, পাঁচ জনে পাঁচ রকম বুঝেন, এবং এক জনেও যে সর্ব্বদা এক রকমই বুঝেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকের জ্ঞানে, বোধ করি সাধারণের জ্ঞানে, আত্মা এক রকম বায়বীয় পদার্থ, এক রকম সূক্ষ্ম বায়ু অথবা ঈথর। পুরাণ-প্রথিত সত্যবানের মৃত্যু হইলে যমরাজ আসিয়া সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটা সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সাবিত্রীর তর্জ্জনে তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। সেই পদার্থটা সত্যবানের আত্মা কি না, স্পষ্ট বুঝা যায় না। এইরূপ সাকার অথবা বায়বীয় আত্মার নিকট আমরা উল্লেখ মাত্রে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের উল্লেখ দেখা যায়। বোধ করি ইহাও ঠিক্ আত্মা নহে। দর্শনশাস্ত্রোক্ত আত্মাকে শরীরী বুঝিবার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই।

"মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" আত্মার অন্যান্য লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া, গীতোক্ত এই উক্তিটিকে প্রাচীন ও আধুনাতন

হিন্দু শাস্ত্রের ও হিন্দু-ধর্ম্মের মজ্জাগত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উক্তির ভিতরে কয়েকটি স্থূল কথা পাওয়া যায়। প্রথম, দেহব্যতিরিক্ত ও দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে, যাহা লইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব; দ্বিতীয়, দেহের ধ্বংসে (অথবা মরণরূপ বিকারে) সেই পদার্থ দেহ হইতে পৃথক্ হয়; তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্য দেহে আশ্রয় করিতে পারে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্মা; এবং এই আত্মার সম্বন্ধেই পূর্ব্বদেহের সহিত নর-দেহের সম্বন্ধ। ফল কথা, আত্মা রহিয়া যায়; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনতুল্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব, ও দেহান্তরাশ্রয় (পুনর্জন্মগ্রহণ), আত্মার এই তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য দেহও ধারণ করিতে পারে; সুতরাং মনুষ্যেতর জীবেও আত্মা বর্ত্তমান।

আত্মার নাশ নাই; তবে ইহা পুনর্জন্মগ্রহণ অথবা দেহাশ্রয় হইতে কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কখন সমর্থ। তাহাকে নাশ বলা যায় না; তবে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ ইত্যাদি অভিধান দেওয়া যাইতে পারে। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর কখন স্বর্গনরকভোগ, কখন দেহান্তরগ্রহণ, এই দুই রকম কথাই শুনা যায়। এই উভয়ে কিরূপ সঙ্গতি আছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর ন্যায় খৃষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা আত্মার দেহান্তরাশ্রয় বা পুনর্জন্মগ্রহণটা বোধ করি স্বীকার করেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবকে আত্মার অধিকারী করিতে চাহেন না। ডারুইন্ শিষ্যেরা এই স্থানে বোধ করি, মাথা নাড়িবেন।

ইহাদের মতে আত্মা মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় ভাবে কোনও না কোনও রূপে শেষবিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখভাগী হইতে পারে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ শুনিলে ইহারা চটিয়া উঠেন, এবং তাহাকে ধ্বংসেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যাহাই হউক, হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ের মধ্যে মোটা কথা কয়েকটাতে মিল আছে; দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা আছে; সেটা দেহান্তেও রহে; এবং তাহার অন্য পরিচয় না জানি, এতটুকু তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুখদুঃখভোগটা তাহারই নিজস্ব অধিকার।

উল্লিখিত হিন্দু শব্দে সাধারণ হিন্দু, এবং সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকার বুঝিয়াছি। হিন্দু দার্শনিক এই হিন্দুপদবাচ্য নহেন। আমার বিবেচনায়, হিন্দুদর্শনকার ও সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকার, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। যে সকল শাস্ত্রকার অকুণ্ঠিতভাবে সাংখ্য ও বেদান্তের দোহাই দিয়াছেন, তাঁহারা সাংখ্যের ও বেদান্তের অভ্যন্তরে কত দূর প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ আছে।

উক্ত দ্বিবিধ মত ব্যতীত আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আরও নানাবিধ মত বর্ত্তমান নাই, এমন নহে। বাষ্পীয় আত্মার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এমনও শুনা যায়, সুষুপ্তিকালে আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়; স্বপ্নাবস্থায় অপরের আত্মা আসিয়া দেখা দেয়, আঁধারে বা নির্জ্জনে থাকিলে মৃতের আত্মা আসিয়া ভয় দেখায়। হাঁই তুলিলে আত্মা মুখকোটরের নির্গমপথ পাইয়া হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা মাছির রূপ ধারণ করিয়া মুখে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকগণের আত্মা টেবিল উল্টাইতে বড় ভালবাসে। থিয়সফিসম্প্রদায়ের অনেকের সহিত ভাল ভাল আত্মার ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব আছে। এইরূপ আত্মা যাঁহাদের, তাঁহারা মহাত্মা। এতাদৃশ আত্মার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই।

আত্মার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন। বিচারে যুক্তিমার্গই আমাদের আশ্রয়। সম্প্রদায়বিশেষের নিকট একটা শাস্ত্রবহির্ভূত নূতনতরো যুক্তির পন্থা শুনিতে পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার একবার উল্লেখ আবশ্যক।

ইহারা এইরূপ বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছু নাই, এ বড় ভীষণ কল্পনা। দেহ ফুরাইলেই সব ফুরাইল মনে করিলে, দুঃখের দুঃসহতা ও মরণের বিভীষিকা আরও দুঃসহ ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের পক্ষে সান্ত্বনা আর কিছুই থাকে না। অতএব যে বলে, দেহ ছাড়া আত্মা নাই, সে মনুষ্যজাতির শত্রু। আবার আত্মা অস্বীকার করিলে পাপের নিবেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। এক রকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাঁকি দেওয়া চলে, সেখানে পাপপুণ্য লইয়া হাঙ্গামা বড় চলে না। সুতরাং যে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে পামর ও পাপিষ্ঠ। মরিয়া গেলে সব ফুরাইবে, মন কি তাহা চায়? তোমার অন্তরাত্মা কি বলে?

এইরূপ বিচারপ্রণালী যুক্তির অপলাপ মাত্র। মৃত্যুর পর সব ফুরাইবে, স্বীকার করিতে ইচ্ছা না হইতে পারে; এবং সেরূপ স্বীকারে অসুবিধা বা মন্দ ফল ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার আমার ইচ্ছা দ্বারা জাগতিক

ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া ঘোরতর দুঃসাহসের পরিচয়। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তোমার বাড়ী আজ কলাহারে নিমন্ত্রণ হউক, এবং এই নিমন্ত্রণব্যাপারটা না ঘটিলে চাই কি জগদ্‌যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। তথাপি তোমার যে সেরূপ সুবুদ্ধি ঘটিবেই, এমন নিশ্চয় কোথায়? হায়, তাহা হইলে সংসার কি সুখের হইত!

দুর্ভাগ্যক্রমে সংসার তেমন সুখের নয়, এবং সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ ইচ্ছা-যুক্তির প্রয়োগে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা সর্ব্বথা আবশ্যক নহে। যাঁহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ যুক্তি অবলম্বন করিলেই পারেন। বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ—। এই শেষোক্ত আশুফলপ্রদ বিচার-প্রণালীও যে সময়ক্রমে যুক্তিবিশেষে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। যেহেতু, হিন্দুস্থানে অদ্যাপি পাঁচ কোটী মুসলমান।

আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিব, যাহা সুস্থ মানবপ্রকৃতি, প্রকৃতপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ ও সঙ্গত বিচারপদ্ধতি এই। একটা সত্য প্রতিপন্ন করিতে হইলে পূর্ব্বে প্রতিপাদিত আর একটা সত্যের আশ্রয় লইতে হয়। এই দ্বিতীয় প্রমাণ করিতে হইলে তৃতীয়ের আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটা এমন মূল সত্যে পৌঁছিতে হয়, যেখানে মনুষ্যের বিচারশক্তি প্রতিহত হইয়া যায়; সেই মূলসত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার আর অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলে চলে না, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও কাহারও আপত্তি দেখা যায় না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম স্বতঃসিদ্ধ অন্যপ্রমাণ-রহিত সত্যে ঠেকিতে হয়। তবে স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা যত কম হয়, বিচারের পক্ষে ততই ভাল, এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণ ততই তৃপ্তিলাভ করে। ফল কথা, যদি একটা কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে কোন একটা তথ্য নিরূপিত ও প্রতিপন্ন হয়, তবে দুইটা স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইবার দরকারও নাই, মানিলেও তৃপ্তি হয় না।

উদাহরণ, ইউক্লিড-সঙ্কলিত জ্যামিতি শাস্ত্রে। সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণোপরিস্থ বর্গক্ষেত্র যে বাহুদ্বয়োপরিস্থ বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান হইবে, এ কথা সকলের বুদ্ধিতে আসে না। ইহার প্রমাণ দরকার। পূর্ব্বগত প্রতিজ্ঞার সাহায্যে

এই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হয়। এইরূপে প্রতিজ্ঞাপরম্পরা ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত এমন দুই একটি প্রতিজ্ঞায় ঠেকিতে হয়, যাহার প্রমাণ দরকার করে না; কেন না, সকলেই মানিয়া লয়, কাহারও আপত্তি নাই। সেইগুলি ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ। সেইগুলি মানিয়া লইলে আর সবই প্রমাণ হইতে পাবে, এবং সেইগুলিরই প্রমাণাভাব এবং প্রমাণেরও অনাবশ্যকতা। তবে এমন যদি একটিমাত্র মূল তথ্য থাকে, যেটিকে মানিতে কাহারও আপত্তি নাই, এবং মানিলে ইউক্লিডের বারটি স্বতঃসিদ্ধ তাহা হইতে আসিয়া পড়ে, তবে সেইটাকেই তখন স্বতঃসিদ্ধ এবং মূল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সেইরূপ মূল সত্যের আবিষ্কারে মনুষ্য-বুদ্ধির সর্ব্বদাই অব্যাহত অধিকার রহিয়াছে।

ইউক্লিডের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও কতকগুলি সংজ্ঞা লইয়া উপপত্তি আরম্ভ হইয়াছে। স্বতঃসিদ্ধগুলি এক রকম সাধারণের আবিষ্কৃত; সংজ্ঞাগুলি ইউক্লিডের নিজের। দুই বস্তু প্রত্যেকে তৃতীয় বস্তুর সমান হইলে তাহারা পরস্পর সমান, ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ, ইউক্লিড্ এবং অন্য সকলেই তাহা মানিয়া লয়েন। বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মযুক্ত ক্ষেত্রের নাম বৃত্ত, ইহা একটি সংজ্ঞা। এটি ইউক্লিডের নিজ দত্ত। সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রকে বৃত্ত আখ্যা দিতে ইউক্লিড্ প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তিনি যখন বৃত্ত শব্দের প্রয়োগ করিবেন, লোকে যেন সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রই বুঝে, এই অভিলাষ জানাইয়াছেন। অবশ্য তোমার ইচ্ছা হইলে সেইরূপ ক্ষেত্রকে বৃত্ত না বলিয়া উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন্,—এই আখ্যা দিতে পার; তাঁহাতে কিছু যায় আসে না; বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষে মিলিয়া বরাবর এক অর্থে এক শব্দ ব্যবহার করিলেই হইল। উভয়ের এই মনের মিলটুকু না থাকিলে একের অভিপ্রায় অন্যকে বুঝান যায় না। বিশেষ, ভাষার সাহায্যে। সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে এই প্রভেদ দাঁড়াইল যে, স্বতঃসিদ্ধটা তোমার মানিয়া লইতে আপত্তি নাই, এবং দৈনন্দিন কার্য্যে বস্তুতঃই মানিয়া থাক; আর সংজ্ঞাটা আমার প্রার্থনামতে গ্রাহ্য করিয়া লও। সংজ্ঞা কোন প্রাকৃত সত্য নহে, উহা কেবল ভাষার কায়দা ও বুঝাইবার সময় শ্রমসংক্ষেপের উপায়।

সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের বিভেদ লইয়া এই গণ্ডগোল তুলিবার একটু দরকার আছে। অনেক সময় অনেক কথা বলিয়া ফেলা যায়, সেটা সংজ্ঞা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা সহজে বুঝা যায় না। একটি উদাহরণ দিব। সমগ্র পদার্থ অংশের অপেক্ষা বড়; ইউক্লিডে এইরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ দেখা যায়। বোধ

করি, ইহা একটি সংজ্ঞা মাত্র। কেন না, অংশ শব্দের সংজ্ঞা অথবা সচরাচর গৃহীত অর্থ ই এই, যাহা সমগ্র পদার্থের হইতে ছোট। 'সমগ্র' 'অংশ' ও 'বড়' এই তিনটি শব্দের সংজ্ঞা হইতেই এই বাক্যটি আসিয়া পড়ে; ইহাকে আর স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিতে হয় না। ইংরাজি straight line এবং বাঙ্গলা 'সরল রেখা' উভয়ই সংজ্ঞাক্রমে একার্থবোধক; সুতরাং সরলরেখা মাত্রেই straight line, এটা একটা নূতন স্বতঃসিদ্ধ বা মূল সত্য হইল না; ইহা সেই সংজ্ঞা-নিহিত তত্ত্বই হইল। তেমনই, হাত পা শরীরের অংশ; এ কথা স্বতঃসিদ্ধ নহে; শরীর অর্থেই আমরা হাত-পা-সম্বলিত পদার্থবিশেষ বুঝি, সুতরাং এটা শরীরের সংজ্ঞাতেই নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক, অনেক সময়ে নিজের আবিষ্কৃত ও নির্ব্বিবাদে সর্ব্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞাকে সর্ব্বজনের আবিষ্কৃত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, এইটাই এ স্থলে বক্তব্য।

জ্ঞান বড় শ্রেষ্ঠ জিনিষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের উপার্জ্জিত জ্ঞানই আবার অনেক সময়ে বুদ্ধিকে অন্ধীভূত রাখিয়া দেয়। আমরা যে সকল লম্বা লম্বা বাক্য সকল সময়ে প্রয়োগ করি, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য, কতটুকু হাতগড়া, সকল সময়ে তলাইয়া দেখি না। দার্শনিক বিচারে এই অসাবধানতা বড় প্রবল শত্রু।

সম্মুখে গাছ দেখিতেছি; সুতরাং 'ঐখানে গাছ রহিয়াছে', এ কথা পুরা সাহসের সহিত বলা যায় না। কেন না মরীচিকা, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন, মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকারে, অনেক সময় গাছের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; অথচ সেখানে গাছ নাই। তবে 'আমি গাছ দেখিতেছি', এ কথা সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই বোধ করি সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। স্বপ্নই হউক, আর বিকারই হউক, আমার যে ঐরূপ বোধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা; ঐ বোধটুকু বা জ্ঞানটুকু সত্য, উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এবং বোধ হয়, এই বোধ বা অনুভূতি বা জ্ঞানকে সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। ঐখানে গাছ আছে, ইহা সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু আমার ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা ঠিক।

গাছ দেখিতেছি, ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটু গোল আছে। এত বড় কথাটা জোর করিয়া বলিতে পারি কি না বিচার্য্য। একটা কিছু বিশেষ রকম জ্ঞান জন্মিতেছে, এবং সেই জ্ঞানটির আমি নাম দিয়াছি 'গাছ

দেখা', এই পর্য্যন্ত ঠিক। জ্ঞান একটা জন্মিতেছে, এইটুকু স্বতঃসিদ্ধ; গাছ দেখাটা তাহার, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের সংজ্ঞা। একটা জ্ঞান জন্মিতেছে এবং সেই জ্ঞানের একটা বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দ্বারা এই জ্ঞানকে অন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লইতে পারি; এই পর্য্যন্ত আমার বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জ্ঞানের সংজ্ঞাটা আমার ইচ্ছা ও সুবিধার উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জ্ঞানই যে জন্মিতেছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, ইহার প্রমাণ নাই; স্বীকার করিতে চাও, ত এই মূল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর পাঁচটা কথা তুলিয়া তোমার সহিত কথাবার্ত্তা বিচার তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে এইখানে নিরস্ত হইতে হইবে। যুক্তি অবলম্বনে শেষ সীমায় একটা মূল সত্যে পৌঁছিতে হইবেই; আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব, সেই মূল সত্য। ইহা উল্টাইলে আর কিছু থাকিবে না, অথচ সকলেই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

তবেই স্বীকার্য্য, সম্প্রতি একটা বিশেষলক্ষণনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আমি বলি 'গাছ দেখিতেছি'। সেইরূপ আরও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাযুক্ত বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে। যথা, ঐ গাছ দেখিতেছি, ঐ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ঐ শব্দ শুনিতেছি, এই গরম লাগিতেছে, এই চলিতেছি, নড়িতেছি, ইত্যাদি। অপিচ, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষুধা শীত অনুভব করিতেছি। এইরূপ কতকগুলা বিবিধ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহা প্রথমতঃ স্বীকার্য্য।

আরও কিছু স্বীকার্য্য রহিয়াছে। কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের অনুভূতিও জন্মিতেছে। অথবা এমন আর একটা অনুভূতি জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা সেই সমুদায়ের সম্বন্ধানুভব।

এই সম্বন্ধও যে ঠিক এক রকমই অনুভব করি, তাহা নহে। অনুভবের ভেদানুসারে এই সম্বন্ধেরও বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া থাকি।

এই বিবিধ জ্ঞানসমূহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি, তাহার একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা সাদৃশ্য। আর একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা ভেদ। সাদৃশ্য ও ভেদ অনুসারে সমুদয় জ্ঞানগুলিকে সাজাইবার ও চিনিয়া লইবারও শক্তি

আমাতে বর্ত্তমান, এ কথাটিও স্বীকার্য্য। এই সাদৃশ্য ও ভেদ অনুসারে কতকগুলি জ্ঞানের সংজ্ঞা দেখা, কতকগুলির সংজ্ঞা শোনা, কতকগুলির সংজ্ঞা ঘ্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ। আবার দেখার মধ্যেও আবার ঐ অনুসারে লাল দেখা, নীল দেখা, ছোট দেখা, বড় দেখা, গোল দেখা, চেপ্‌টা দেখা ইত্যাদি আছে। এইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও অনুভূতির পক্ষেও। এইখানে এই কুকুর দেখিতেছি, ঐখানে ওই গোরু দেখিতেছি, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞানের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে, তাহার সংজ্ঞা দর্শন; এবং একটা ভেদ আছে, যাহার দরুণ একটার কুকুর, আর একটার গোরু, একটার এই, আর একটার ওই। ফলে আমার পাঁচটা পাঁচ রকম জ্ঞান ও অনুভূতি যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধ ও ভেদ সম্বন্ধ নিরূপণরূপ আর একটা জ্ঞান বা অনুভূতিও আছে।

না থাকিলে কি হইত? যদি সকল জ্ঞানই আমি একাকার দেখিতাম, যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছুই না বুঝিতাম, তাহা হইলে কি হইত। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইচ্ছা, প্রীতি সব একাকার হইয়া, নীল-পীত হরিত শ্বেত কৃষ্ণ আলো আঁধার, সব এক হইয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব দাঁড়াইত। মনে কর, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ভয় নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, ঘ্রাণ নাই, স্পর্শ নাই, শ্রবণ নাই; কেবল আঁধার আর আঁধার আর আঁধার, অথবা আলো আর আলো আর আলো (সুতরাং আলোও নাই, আঁধারও নাই); এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে তফাত করা আমাদের অনুভবে আইসে না। অর্থাৎ, সকল জ্ঞান ও সকল অনুভূতি একাকার হইলে আমার জ্ঞানরাশি হয় ত থাকিত ও আসিও হয় ত থাকিতাম; কিন্তু আমার বা আমার জ্ঞানের অস্তিত্বনিরূপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু থাকিত, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধির, সুতরাং বিচারপ্রণালীর অতীত। ফলে, ঐরূপ অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব, একই রকম কথা।

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক অনুভূতিই অপর অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে বিসদৃশ। একটাকে আর দ্বিতীয় বার পাওয়া যায় না। কোন মিল নাই; সুতরাং কাহাকেও চিনিয়া লইবার উপায় নাই, কাহারও অস্তিত্ব ঠাহর করিবার যো নাই। সংজ্ঞামাত্র অসম্ভব, পরিচয়মাত্র অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এরূপ ক্ষেত্রেও অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বে ভেদ করিবার শক্তি আমাদের থাকিত না।

এইখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। পথ এমনই পিচ্ছিল যে, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। 'গাছ দেখিতেছি' বলিলে একটা বিশেষ লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, জ্ঞানের বাহিরে একটা তাহার কারণভূত পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন করে না। আর এই টুকু প্রমাণ করে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপই এক একটা জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যাহার যাহার সহিত সাদৃশ্য রেখিয়া ও মিলাইয়া এই বর্ত্তমান জ্ঞানটাকেও তৎসদৃশ ঠাহর করিতেছি ও সেই সেই জ্ঞানকে ও বর্ত্তমান জ্ঞানকে সজাতীয় অনুভব করিয়া একটা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত স্থির করিয়া 'গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দিতেছি। আর একটু উঠা যাউক। 'গাছ দেখিতেছি' বলিলে যেমন জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের বাহিরে গাছ নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানে বা অনুভবে অনুভবে সাদৃশ্য দেখিতেছি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আমারই সেই সাদৃশ্য সংজ্ঞ অনুভব ও ভেদ সংজ্ঞ অনুভবেরই অস্তিত্ব প্রমাণ হইল, বস্তুতঃই যে আমার অনুভূতি ছাড়াইয়া জ্ঞানে জ্ঞানে মিল আছে, ও অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল না। সেটা আমি বোধ করি ও ধরিয়া লই; এবং সেইরূপ ধরিয়া লওয়াতেই আমার নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া আমার অনুভূতি ছাড়িয়া, তাহার বাহিরে এমনইতর একটা কিছু আছে, এইরূপ বলিলে, এইরূপ কল্পনা করিলে আমার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই আছে, এ কথা জোর করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই।

কত দূরে দাঁড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য-ভেদ-সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা প্রতীতি আছে। এই পর্য্যন্তের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য, অন্যথা বিচার চলে না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক অস্তিত্ব স্বীকারের সম্প্রতি দরকার নাই। এই যে সাদৃশ্য ও ভেদ সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, ইহা লইয়াই, অথবা ইহার অপর সংজ্ঞাই, জ্ঞানের প্রবাহ বা চৈতন্যের ধারা। এই প্রতীতি আছে, তাই যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহা আছে, এই প্রতীতি না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জানিতাম না, অর্থাৎ চৈতন্য থাকিত না। গাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে পারে,—অথবা থাকিতে না পারে; কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ চৈতন্য থাকে না। যতক্ষণ চৈতন্য থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ততক্ষণ

বর্ত্তমান জ্ঞানকে আর পাঁচটা জ্ঞানের সদৃশ অথবা বিসদৃশ বলিয়া বুঝিয়া লই; জ্ঞানসমূহের একটা ধারাবাহিকতা অনুভব করি। এবং আমি বলিতে চাহি যে, এই পরস্পর-কিয়দংশে-সদৃশ ও কিয়দংশে-বিসদৃশ—রূপে—প্রতীত এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম অথবা অভিধান, অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।

এই অর্থে আমি আছি ও আমার আত্মা আছে। ইহা স্বীকার্য্য। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্য কোন অর্থে আত্মা আছে কি না, ক্রমে দেখা যাইবে। এবং এই অর্থযুক্ত আত্মা ছাড়িয়া আর কিছু কোথাও আছে কি না, তাহাও দেখা যাইবে। মূল যে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ-প্রমাণাতীত সত্য স্বীকার করিয়া লওয়া গেল, তাহার অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক কি না, অথবা এই কয়েকটি মূল স্বতঃসিদ্ধের সহিত কতকগুলি হাতগড়া সংজ্ঞা যোগ করিলেই বিশ্বজগতের প্রহেলিকাটা এক-রকম বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহাও ক্রমে দেখা যাইবে।

সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির কথা বলিয়াছি। এই সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি নানাবিধ ও নানাকার। যেমন দৃষ্টিজ্ঞান ও আকৃতিজ্ঞান। বর্ণজ্ঞানের ভিতর আবার নীলজ্ঞান, পীতজ্ঞান ইত্যাদি। আকৃতির মধ্যে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত, বর্ত্তুল ইত্যাদি। এই সাদা কুকুরটা ও এই সাদা-গোরুটা, এই দুই জ্ঞানের মধ্যে সহস্র বিভেদ-সত্ত্বেও একটা সাদৃশ্য বুঝি, উভয়েই শাদা, উভয়েরই চারি চারি পা ও দুই দুই—কাণ ইত্যাদি। কুকুর ও গোরু দুইই যেমন আমার ভিতরে, আমারই অংশ, সেইরূপ উহাদের বর্ণ, উহাদের আকৃতি, উহাদের সমুদয় লক্ষণই আমার ভিতরে, ও আমারই অংশ।

জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটা বড় রহস্যময় সম্বাদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। এই সম্মুখে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আবার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি পৃথক্ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা, এবং এই কুকুর দেখায় ও ওই কুকুর দেখায় অন্য কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা মাত্র পার্থক্য অনুভব করিতেছি; সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ। জ্ঞান দুইটা প্রায় অনুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ জন্মিতেছে, এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক; তাই দেশ, স্থান, বা অবস্থিতি তাহার সংজ্ঞা। তাই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে,

দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধে, দূরে, সমীপে, ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বিভিন্ন জ্ঞানের একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; যেমন বর্ণবুদ্ধি, শ্রুতিবুদ্ধি, ঘ্রাণবুদ্ধি আমার অন্তর্গত, এই দেশবুদ্ধিও সেই হিসাবে আমার অন্তর্গত।

দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর সম্মুখে দেখিতেছি, কল্য সেই কুকুর সেই স্থানে দেখিয়াছিলাম। এস্থলেও এই দুইটা কুকুরদর্শনরূপ জ্ঞানের মধ্যে অন্য কোন বিভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা বিভেদ দেখিতেছি, সেই বিভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক। সেই সংজ্ঞা কালগত বিভেদ। প্রথম জ্ঞানটা আর যে জ্ঞানের সহকারে আসিয়াছিল, দ্বিতীয়টা ঠিক্ সেই সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই। প্রথম কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রামকে দেখিয়াছিলাম, হরিকে দেখিয়াছিলাম, নবীনকে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার কিন্তু গদাধর ও বনমালীকে দেখিতেছি। এই যে বিভেদ, ইহাই কালগত বিভেদ। দেশবুদ্ধির ন্যায় কালবুদ্ধিও আমার চৈতন্যের উপাধি, আমার আত্মার উপাদান বা অংশ। এবং এই কালবুদ্ধির বিশেষরূপ সূক্ষ্মতার অপর নাম স্মৃতি।

পাঁচ রকম বোধ আছে, পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। যথা বর্ণবোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ঘ্রাণবোধ। তেমনি দেশবোধ ও কালবোধ। শেষ দুইটিকে অন্যান্য বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া একটা বিকট রহস্যের সৃজন করিবার সম্যক কারণ দেখি না।

হাত পা মাথা বক্ষ উদর ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর। হাতও শরীর নহে, পাও শরীর নহে, একতঃ তাহারা সমগ্র শরীরের অংশমাত্র; তবে সকলকে জড়াইয়া সকলের সমষ্টিতে শরীর। হাত পা হইতে পৃথক্, মাথা উদর হইতে পৃথক্, শ্বাসযন্ত্র হৃৎপিণ্ড হইতে পৃথক্; অথচ উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অন্যের কাজ বন্ধ হয়, একটায় আঘাত লাগিলে অনেক সময়ে অন্যে আঘাত পায়। এইরূপ পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত অবয়ব-সমষ্টিকে শরীর বলা যায়। সেইরূপ দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ দেশ কাল ভয় ক্ষুধা লালসা প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জড়াইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহাই আমি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা এমন সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যাহাতে একটার সহিত আর একটার মিল আছে, একটা হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন হইয়াছে। সাপ দেখিলাম, ভয় পাইলাম, পলায়নপর হইলাম, এস্থলে এই তিনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ যে, দৃষ্টি হইতে ভীতি ও ভীতি হইতে পলায়নচেষ্টার উৎপত্তি। বিশেষতঃ, স্মৃতি-

সংজ্ঞাযুক্ত চৈতন্যের একটা অঙ্গ পঞ্চাশটা অনুভূতিকে এরূপ ঘনিষ্ট বন্ধনে জড়াইয়া রাখে যে, একটাকে ছাড়িয়া আর একটার উৎপত্তি হয় না। এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতির সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই, এইরূপ সম্বন্ধের বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও অনুভূতির ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও অনুভূতিগুলি যে প্রবাহ মধ্যে এক একটি ঊর্ম্মি বা ফণিকামাত্র। সংহতি বা যোগাকর্ষণে আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণা সমষ্টীকৃত করিয়া যেমন জলস্রোত, পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে গ্রথিত ও আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য-কণা সমষ্টীকৃত করিয়া তেমনই আত্মার প্রবাহ। এইরূপেই আত্মার উৎপত্তি, ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে কি না, জানি না।

এইখানে একটা উৎকট প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। আমরা সচরাচর ভাষায় সুখ আমার, দুঃখ আমার, জ্ঞান আমার, স্মৃতি আমার, ইচ্ছা আমার ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়া এমন একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, যাহা সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা হইতে ভিন্ন; অথচ জ্ঞান স্মৃতি ইচ্ছা সুখ দুঃখ যাহার সম্পত্তি মাত্র। সাধারণ হিসাবে এই যে একটা কিছু, ইহারই নাম আত্মা। অর্থাৎ মনুষ্যে আত্মা বলিয়া যে পদার্থ আছে, সেই জ্ঞাতা, সেই ইচ্ছাপ্রাপ্তী, সেই ভোগী; জ্ঞান, ইচ্ছা, ভোগ, তাহারই ক্রিয়া, অথবা আভরণ, অথবা অলঙ্কার-স্বরূপ। উভয় মতে প্রভেদ, কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। উপরে আমরা আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আত্মার সহিত অনুভূতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের মত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমষ্টি করিয়াই দেহ। কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারে আত্মার সহিত অনুভূতি, জ্ঞান, চেষ্টা, প্রভৃতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত বসনভূষণ অলঙ্কারের মত। বসনভূষণ অলঙ্কার সমুদয় ত্যাগ করিলেও যেমন দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াও আত্মা বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

এক কথায় প্রশ্নটি এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, ভোগ থাকিলেই ভোগী থাকিবে। এই জ্ঞাতা ও এই ভোগী যে, সেই আত্মা। শুধু জ্ঞানসমষ্টি বা ভোগসমষ্টিকে আত্মা বলিলে, চলিবে না; জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই।

জ্ঞান আছে, সুতরাং জ্ঞাতা আছে। প্রশ্নটা বড়ই দুরূহ। কিন্তু রাম নামে যেমন ভূত আপনার বিভীষিকাময়ী কায়া সঙ্কুচিত করিয়া লীন ও অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ যুক্তির মন্ত্রপূত দণ্ডস্পর্শে এই প্রশ্নের উৎকটতা লয় পায়।

জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, কে বলিল? আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার বা ধারণা বা কল্পনা আছে বটে; কিন্তু সেই সংস্কার ও কল্পনার সত্যতাকেই যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন তাহার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে? যাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে সত্য অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গোড়ায় ধরিলে চলিবে না।

ফলে আমরা যে একটা ভোক্তার ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব সচরাচর মানিয়া লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা, আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের দৈনন্দিন কারবার চালাইবার জন্য, আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের জন্য, আমাদেরই একটা কল্পনা মাত্র। ভাষায় যত শব্দ বর্ত্তমান আছে, সকলেরই জন্য একটা পৃথক্ অস্তিত্ব নির্ম্মাণ করিতে হইলে যুক্তির চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। আকাশকুসুম কল্পনাতেই আছে।

'আমি গাছ দেখিতেছি'—না বলিয়া যদি দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য ও সত্যনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা বলিতে হয়, 'আমার এমন একটা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বে পূর্ব্বেও জন্মিয়াছিল বলিয়া, আমার অনুভূতি ও স্মৃতি সাক্ষ্য দিতেছে, এবং যাহাকে আমি 'গাছ দেখা'—এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি'; তাহা হইলে দার্শনিকত্ব বজায় থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রা তুমুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে সঙ্কেতে ও ইসারায় আমাকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে, সেখানে সঙ্কেতটা প্রয়োগের ব্যবহারের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছে কি না, এই খুঁটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শত্রু সম্মুখীন হইলে ভোঁতা তরবারিও ব্যবহার করিতে হয়।

তবে দার্শনিক, শত্রুসংহার যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ধারালো হাতিয়ার নির্ম্মাণই যাঁহার ব্যবসায়, তিনি ইস্পাত লইয়া ও শাণ লইয়া খুঁটিনাটি করিতে ছাড়িবেন না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের বিশুদ্ধি পরীক্ষার অবকাশ পায় না। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষকের হস্তে পরীক্ষাকালে বিশুদ্ধ জলেরও এমন শোচনীয় পরিণাম হয়, যাহাতে তাহার আর জলত্ব থাকে না। আমরা সংসারযাত্রায় অবলীলাক্রমে 'আমি' 'আমরা' প্রভৃতি উত্তমপুরুষ-বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাই, দার্শনিক সম্মুখে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'অহো উত্তমপুরুষ, এত অহং অহং অহঙ্কার ত্যাগ কর; এত বাক্‌চাতুরী প্রগল্‌ভতা আমার সমক্ষে নহে।' তবে নৈয়ায়িকের বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রশংসার্হ হয় না।

ফলে আমরা সর্ব্বদা যে 'আমি' 'আমি' করিয়া থাকি, সে আমাদের বাক্-

চাতুরীমাত্র ; বিকাশিত অবস্থায় জ্ঞানসমষ্টিরই একটা জিম্‌নাষ্টিক্, ব্যায়াম বা প্রকাণ্ড কারিগরি মাত্র।

এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলে, পাঠকবর্গ বোধ করি, পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু আরও দুই একটা কথা আছে।

'আমি' শব্দের অর্থ কি উপরে বলিলাম। এই অর্থ বাহাল রাখিয়া 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করিলে পাঠক ক্ষুব্ধ হইবেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানসমুদয়ের সাদৃশ্য ও ভেদ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এইটুকু দেখিতে না পাইলে আমার 'আমিত্ব জ্ঞান' বা আত্মার অহঙ্কার জন্মিত না। তবে এই দর্শনশক্তি যে সকলেরই সমান পরিমাণে আছে, এমন নহে। নিউটনের যেমন ছিল, আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের তাহা নাই ; আবার সাধারণ সুস্থ মানুষের যেমন আছে, একজন বাতুলের বা একটা ইতর জীবের তেমন নাই। কতকটা সকলেরই আছে, অথবা কতকটা যাহার আছে, সেই 'আমি-জ্ঞান'-বিশিষ্ট চেতন জীব। এই সাদৃশ্য ও ভেদবুদ্ধির মাত্রা ও পরিমাণ লইয়া জ্ঞানের ও অহঙ্কারের ও আত্মার বিকাশ। এই মূল কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

বর্ণভেদ, শব্দভেদ, স্বাদভেদ প্রভৃতি ছাড়া আর দুইটা প্রকাণ্ড ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, দেশভেদ ও কালভেদ। আমার আত্মার অন্তর্গত যে সকল খণ্ডে, আমার জ্ঞানসমষ্টির মধ্যে যে কয়েকটি খণ্ডজ্ঞানে, দেশভেদের উপলব্ধি করি, সেই খণ্ডগুলি জড়াইয়া আমার সুবিধামত একটা প্রকাণ্ড বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে একটা প্রকাণ্ড সংজ্ঞা দিয়াছি। এবং সেই প্রকাণ্ড বস্তুটাকে কোন মতে আমার আত্মার অবশিষ্টাংশ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া আলাহিদা ভাবে অনুভূতির বিষয় করিয়া লইয়াছি। এই প্রকাণ্ড বস্তুর প্রকাণ্ড সংজ্ঞা বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ।

আত্মার এই অংশটা ছাড়িয়া সুখ দুঃখ, ভয় প্রীতি, ইচ্ছা চেষ্টা, বুদ্ধি ভাবনা ইত্যাদি লইয়া যে অংশটা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সংজ্ঞা দিয়াছি মনোজগৎ বা অন্তর্জগৎ।

এই মনোজগতের খণ্ডগুলির মধ্যে কালগত ভেদ দেখা যায়, তবে ইহাদের দেশগত ভেদ বুঝিতে পারি না। সুতরাং এই লক্ষণ বা পরিচয় দ্বারা জড়জগৎ ও মনোজগতের সংজ্ঞা দিতে পারা যায়।

এই বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসমূহে আমরা দেশভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকি, এই দেশভেদ লইয়া অবস্থিতি, আকৃতি, আয়তন, দূরতা। কালভেদে অবস্থিতি-

ভেদ, আকৃতিভেদ, দূরত্বভেদ লইয়া 'গতি'। বাহ্যজগতের একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অংশের নাম আমার জড় শরীর। এই জড় শরীরের সহিত অবশিষ্ট জড় জগতের সম্বন্ধ ও স্পর্শে 'শক্তি'। শরীর হইতে বাহিরে অথবা বাহির হইতে শরীরে শক্তিসমাগমে, অন্তর্জ্জগতে স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ ও দর্শন। এবং এই স্বাদ ঘ্রাণ স্পর্শ শ্রবণ দর্শন হইতে অন্তর্জ্জগতের অন্তর্গত অন্যান্য মনোবৃত্তি। শক্তির সহিত অবস্থিতি বা দূরতার সম্বন্ধে 'বল'। গতির কালগত ভেদে 'বেগ'। বেগের কালগত ভেদের সহিত বলের সম্বন্ধে জড় পদার্থের পরিমাণ, ইংরাজিতে যাহাকে 'mass' বা quantity of matter বলে। গতি এবং স্থিতি দ্বারা জড় জগতের খণ্ডগুলির সম্বন্ধনির্ণয় জড় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিষয়। এইগুলি সংজ্ঞামাত্র। ইহাদের যাথার্থ্যের প্রমাণ আনিবার দরকার নাই। *

বাহ্যজগৎ কতকগুলি খণ্ডজ্ঞানের সমষ্টি। সেই খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে নানাবিধ সাদৃশ্য সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই অনুভব হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি। সাদৃশ্য নানাবিধ, সম্বন্ধ নানাবিধ। 'ক' ও 'খ' উভয়ে একটা সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে 'গ'; 'চ' ও 'ছ' উভয়ের মধ্যে আর একটি সম্বন্ধ আছে 'জ'; আবার 'গ' ও 'জ' এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে সেটা 'হ'। এইরূপে সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ মিলাইয়া একটা নূতন সম্বন্ধ অনুভব করি; আবার তাহার সহিত আর একটা সম্বন্ধ মিলাইয়া আর একটা সম্বন্ধ অনুভব করি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ অনুভবেই আত্মার বিকাশ বা অভিব্যক্তি; ইহাতেই জ্ঞানের ও চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের সংক্ষেপে সংজ্ঞা দিই। সেই সংজ্ঞাগুলি 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। আমি সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি বলিয়াই প্রাকৃতিক নিয়মের আমা হইতে উৎপত্তি। এই অনুভব না থাকিলে, প্রাকৃতিক নিয়ম হইত না, অথবা প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম না। এই অনুভূতি যত তীক্ষ্ণ ও প্রবল হয়, ততই বাহ্য প্রকৃতিকে নিয়মানুগত দেখি। ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বর্ত্তমান আছে, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; প্রকৃতিতে নিয়ম আমি দেখিতে পাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। এবং ইহাও স্বীকার্য্য, সম্প্রতি আমার চৈতন্যের যে অবস্থা, তাহাতে আমি প্রকৃতির খানিকটা নিয়মানুগত দেখি, আর খানিকটা অনিয়ত খাপ্-ছাড়া বোধ হয়। যে অবস্থায় নিয়মবন্ধের ভাগ বাড়িয়া আইসে, ও খাপ্-ছাড়ার ভাগ

* 'গতি' 'বেগ' 'বল' 'শক্তি' প্রভৃতি শব্দগুলি আধুনিক পদার্থবিদ্যা বা জড় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুযায়ী অর্থে ব্যবহৃত হইল।

কমিয়া আইসে, সে অবস্থাকে আত্মার উন্নতি বা অভিব্যক্তি বলা যায়। স্থানান্তরে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

এইরূপ সাদৃশ্য অনুভবে বা নিয়ম স্বীকারে একটা লাভ আছে, দেখা যায়। যখন এই সাদৃশ্য অনুভবেই আত্মবোধ বা অহংকার, তখন এই সাদৃশ্যানুভূতির সূক্ষ্মতায় আত্মবিকাশ বুঝিতে হইবে। আমার মনের একটা কাজ অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের আদানপ্রদান। অন্তর্জগৎ বাহ্যজগৎ হইতে আপন পুষ্টিসাধন করিতেছে, আবার সময়ে সময়ে বাহ্যজগতের আক্রমণে পরাহত ও ক্ষীণ হইতেছে। উভয় জগতের আদানপ্রদান কার্য্যটার নাম মানসিক শ্রম। প্রকৃতিতে যতই নিয়মের আবিষ্কার করা যায়, যতই সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতে প্রশস্ততর নিয়মে আসা যায়, মানসিক শ্রমের ততই সংক্ষেপসাধন হয়। এবং এই মানসিক শ্রমসংক্ষেপেই বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের লেনা-দেনা শৃঙ্খলার সহিত ঘটিয়া থাকে। বক্তার বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যেমন প্রচলিত লিপিবিন্যাস পোষায় না, আরও সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক short hand চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়; সেইরূপ প্রকৃতির বড় বড় জটিল সম্বন্ধগুলি যত সংক্ষিপ্ত অথচ প্রশস্ত সংজ্ঞার ভিতর ফেলিতে পারা যায়, ততই জীবনের চেষ্টা ফলবতী হইয়া থাকে। ফলে মানসিক শ্রমসংক্ষেপের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতিতে নিয়মের আবিষ্কার।

এই পর্য্যন্ত যে সকল জটিল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহার একবার সংক্ষেপে আলোচনা আবশ্যক। আমরা দুইটি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি, (১) জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতির অস্তিত্ব; (২) তাহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্যবোধের ও ভেদবোধের অস্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞানের বাহিরে এইরূপ কোন সাদৃশ্য বা ভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; দরকারও নাই। এই সাদৃশ্যবোধ ও ভেদবোধ দ্বারা অনুভূতিগুলিকে একটা বিশেষ প্রণালীমতে সাজাইয়া লই; এবং এইরূপে সজ্জিত সমষ্টিকে আত্মা অভিধান দিই। যাহাকে আত্মা বলি, তাহার প্রধান পরিচয়ই এই যে, সে অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত খণ্ডজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ চিনিয়া লইতে পারে, ও আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে। আত্মার এই সংজ্ঞা। অন্যান্য ভেদের মধ্যে দুইটা বিভেদের একটু বিশেষত্ব আছে—দেশভেদ ও কালভেদ। এই দেশগত ভেদ ও কালগত ভেদ অনুসারে আত্মা সমুদয় অনুভূতিগুলিকে সাজাইয়া নিরীক্ষণ করে। এবং যে অংশে দেশগত ভেদ

দেখিতে পায়, তাহাকে বাহ্যজগৎ বা বহিঃপ্রকৃতি বা জড় প্রকৃতি নাম দিয়া, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্তর্জগৎ অভিধান দিয়া, উভয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে। বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের কতকগুলি সম্বন্ধ দেখা যায়। তাহাদের অনুভূতির সংজ্ঞা রূপ রস শব্দাদি। অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার একটা বিশেষ পদ্ধতির সহিত চালাইলে জীবনরক্ষা সুকর হয়। মানসিক শ্রমসংক্ষেপ সেই পদ্ধতি। এবং বাহ্যজগতে নিয়মের আবিষ্কারে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপ। সেইজন্য আমরা বাহ্যজগৎ নিয়মানুযায়ী করিয়া লই।

আত্মা অবিনাশী কি ধ্বংসশীল, এক্ষণে কতকটা বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ এই বাক্যটার অর্থগ্রহের চেষ্টা করা যাক্।—আত্মার ধ্বংস আছে বলিলে বুঝায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আত্মত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ, সেই ক্ষণের পূর্ব্বে আত্মা ছিল, তাহার পর আত্মা থাকে না। সেইরূপ, আত্মার ধ্বংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বে দেহ ছিল, তদাশ্রয়ে আত্মা ছিল, সেই ক্ষণের পরে দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মা থাকিয়া যায়। যাঁহারা আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন ও যাঁহারা করেন না, এই উভয় পক্ষই কালরূপ একটা অস্বেতর সত্তা মানিয়া লয়েন; কালনামে একটা সত্তা অনাদি ও অনন্ত; আত্মা এক পক্ষের মতে তাহার কিয়দংশ, অন্যপক্ষের মতে তাহার সমগ্র ভাগ, ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যে অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কাল তাহার একটা বিভূতি বা উপাধি মাত্র। পাঁচটা ভেদবুদ্ধি লইয়া আত্মা; কালবুদ্ধি তন্মধ্যে একটা। আত্মা আপনার অন্তর্গত অনুভূতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই রকমে সজ্জিত করিয়া নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লয়; কাল সেই দুইএর মধ্যে অন্যতর সজ্জা। কাল আত্মার আত্মনিরীক্ষণের একটা প্রণালীমাত্র। কালবুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞানগুলি এক রকমে পরস্পর জড়াইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইত না, সুতরাং আত্মারও অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে, আত্মা ছাড়িয়া কাল নাই, আত্মার ধ্বংস হইবে অমুক সময়ে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন সময়ে, এরূপ বাক্যের অর্থ হয় না।

আত্মার অস্তিত্ব এই অর্থে স্বীকার্য্য; কিন্তু আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

যাঁহারা জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোগাতিরিক্ত ভোক্তা, এইরূপ কোন একটা অর্থে আত্মা শব্দের ব্যবহার করেন, এবং জ্ঞান আছে ও ভোগ আছে,

সুতরাং জ্ঞাতা ও ভোক্তা নিশ্চয়ই থাকিবে, এইরূপে সেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী কতকটা বিপর্য্যস্ত। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা আমাদের অনুমান বা কল্পনামাত্র, তাহা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তবে যদি কেহ গায়ের জোরে বলেন, জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত ও জ্ঞাতা ও ভোক্তা একটা কিছু স্বতন্ত্র বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের সেই উক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু প্রমাণ নাই। সেরূপ একটা কিছু থাকিতে পারে; তবে আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি নামধেয় দুইটা জ্ঞানাতীত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; তবে পুরুষের সহিত যখন প্রকৃতির একরূপ সাক্ষাৎকার, মিলন বা সংযোগ ঘটে, তখনই জ্ঞান অনুভূতি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। তখনই প্রকৃতি পুরুষের নিকট রূপরসগন্ধাদি লইয়া বাহ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় কয়েকটি গভীর চিন্তাপূর্ণ মনোহর প্রবন্ধে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে ঋণবদ্ধ করিয়াছেন। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র ধীরে ধীরে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত মহিমাময় তত্ত্বের নিকট ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, ও তাঁহাদের সংযোগে জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে দুইটি স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মূল সৎপদার্থ একটি; তবে একটিরই দুইটা মূর্ত্তি। একটি বক্র রেখার যেমন একপার্শ্ব কুব্জ ও অপর পার্শ্ব ন্যুব্জ, সেইরূপ সেই একমাত্র জ্ঞানাতীত বা অজ্ঞেয় সৎপদার্থের একটা পার্শ্ব অন্তর্জগৎ, অন্য পার্শ্ব জড়জগৎ। একদিক্ পুরুষ, অন্যদিক্ প্রকৃতি। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বোধ করি এই সংবাদের আধুনিক নেতা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী, এবং এইরূপ দ্বৈতবাদের প্রচারক। সাংখ্যমতের সহিত ইহার প্রভেদ আছে সত্য, এবং সে প্রভেদও নিতান্ত সামান্য নহে, স্বীকার করি। তবে সাংখ্যদর্শন যেমন পুরুষ হইতে প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, ইঁহারাও তেমনি অন্তর্জগৎ হইতে জড়জগতের স্বাধীনতা মানিয়া থাকেন। কোন্ মত সমীচীন, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। জ্ঞানাতীত পুরুষ এবং প্রকৃতি, অথবা জ্ঞানাতীত অন্তর্জগৎ ও জড়জগৎ স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া জাগতিক ব্যাপারের সুন্দর ব্যাখ্যা না হইতে পারে, এমন নহে। আপত্তি এই, যদি

একটা স্বতঃসিদ্ধ লইয়া চলে, তবে দুইটার প্রয়োজন কি? যদি একটা সত্তা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডটা কোন রকমে গড়িতে পারা যায়, তবে দুইটার আবশ্যক কি? মানবজাতির স্বীকৃত যুক্তিপ্রণালী এইরূপ ব্যবহারের বিরোধী।

হিন্দু মধ্যে বৈদান্তিক এবং পাশ্চাত্যগণ মধ্যে বার্কলি প্রভৃতি একটামাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগৎব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইটাই বোধ করি তাঁহাদের মতে 'আত্মা'। অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের মতে তাহা চিৎপদার্থ; mind stuff। এই প্রবন্ধে তাহা জ্ঞান বা অনুভূতি; ইহাকে চিৎপদার্থ বল, ক্ষতি নাই। এই চিৎপদার্থের সমষ্টিতে আত্মা। জড়জগৎ, সাংখ্যমতে যাহা প্রকৃতি, তাহা আত্মারই একটা অংশমাত্র। প্রকৃতিতে যে রূপরসাদি, সে আত্মারই একটা কারিগরি; প্রকৃতিতে যে নিয়মের প্রচার, তাহা আত্মারই খেলা। দুইটা ধরিলে যেমন সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয়, একটাতেও ঠিক্ সেইরূপই হয়। তবে একটা ছাড়িয়া দুইটা ধরিব কেন? হইতে পারে ইহা নাস্তিবাদ *; নামে অথবা দুর্নামে ভয় পাইবার প্রয়োজন দেখি না। সাংখ্যমতে দুই পদার্থ বিদ্যমান; প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য। উভয়ের সম্মিলনবশে জ্ঞানের উৎপত্তি, রূপরসাদির উৎপত্তি, জগতের সৃষ্টি বা উদ্ভব। জ্ঞান রূপরসাদি, বা জগৎ স্বতঃপরীক্ষিত; ইহাকে বুঝিবার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, নতুবা ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞানাতীত, জ্ঞানের সীমার অতিক্রান্ত। প্রকৃতি ও পুরুষ, অথবা অজ্ঞেয় জড় ও অজ্ঞেয় আত্মা বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে, জ্ঞানই সত্য পদার্থ; বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন, বিভক্ত, দেশ, কালে সজ্জিত, জ্ঞানই সত্য পদার্থ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সেই জ্ঞানের দুইটা ভাগ বা দুইটা নজার সংজ্ঞা বা অভিধান মাত্র। এক ভাগের অভিধান আত্মা, অন্য ভাগের অভিধান জড়। জ্ঞানাতীত আত্মা ও জ্ঞানাতীত জড় জ্ঞানেরই খেলা, বা কল্পনা বা সৃষ্টি। আত্মার ধ্বংস আছে কি নাই, জড়ের ধ্বংস আছে কি নাই, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

* বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাধনায় তাঁহার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীর উপসংহারে, মৎকর্ত্তৃক স্থানান্তরে প্রকাশিত এই মতকে নাস্তিবাদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সাধনা; চৈত্র।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম।

চৈতন্যের পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল; চৈতন্যভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে। সেই গীতে চণ্ডীর উপাখ্যান, বোধ হয়, অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তিত ছিল। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই, সে সম্বন্ধে অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মাধবাচার্য্য বিরচিত চণ্ডীর প্রতি সাহিত্যজগতের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধ অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীর উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে।

আমরা মাধবাচার্য্যের ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল নির্ণয় করিয়া, কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মুকুন্দের জন্মভূমি দামুন্যা ও মাধবের জন্মভূমি সপ্তগ্রাম, নিকটবর্ত্তী স্থান। উভয় কাব্যেরই বিষয় এক। ফুল্লরার বারমাস্যা হইতে খুল্লনার ছেলিরক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ণিত তাবৎ ঘটনাই প্রায় একরূপ। স্থানে স্থানে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়, এক বর্ণনার সঙ্গে অপরের বর্ণনার আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং, এক কবি যে অপরের নিকট ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুকুন্দের চণ্ডীরচনার সম্বন্ধে যত তর্ক কি মতভেদ থাকুক না কেন, তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে বলা যাইতে পারে, উভয় কাব্যই প্রায় সমসাময়িক। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী; আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীও মুকুন্দের চণ্ডীর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। আভ্যন্তরীণ প্রমাণই আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি। হস্তের কঙ্কণ দেখিতে যেমন আরশীর প্রয়োজন নাই, তেমনই এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্যও আমাদের অন্য কোনরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন করা অনাবশ্যক। মাধবের চণ্ডীর সুন্দর অংশগুলি, মুকুন্দ দ্বিগুণ সুন্দর করিয়া স্বীয় কাব্যে পরিগ্রহ করিয়াছেন। অনেক স্থলে শব্দে শব্দে মিলে, ছত্রে ছত্রে মিলে। কিন্তু মুকুন্দের পুস্তকে এমন অনেক অপূর্ব্ব সুন্দর স্থল আছে, যাহা মাধব স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুস্তকে সে সকলের কিছুমাত্র আভাষ নাই। অনুকৃত কাব্যের সুন্দর অংশগুলি অনুকরণকারী ছাড়ে না, চোর কি রত্নের থলিয়া হস্তে পাইয়া ছাড়িয়া যায়? দ্বিতীয়তঃ, মাধবের চণ্ডী সংক্ষিপ্ত, মুকুন্দের চণ্ডী বিস্তারিত; মাধবের চণ্ডী সুন্দর, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কবিকঙ্কণ সকলই হরণ করিয়াছেন; তাঁহার

চণ্ডীর নিকট দাঁড় করাইলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই যদি মুকুন্দের পুস্তক পড়িয়া মাধব স্বীয় কাব্য লিখিয়া নিজের অপারগতা অনুভব করিয়া স্বগ্রন্থ লজ্জায় ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, তাহারও নিকট বলিতে সাহসী হইতেন না। বিশেষ, উভয়ের বাড়ী সন্নিকটবর্ত্তী। পুস্তক দুইখানা পড়িলে স্বতঃই প্রতীতি জন্মিবে যে, একখানা ভিত্তি, অপরখানা অট্টালিকা; এক জন অপরের স্কন্ধে পা থুইয়া স্বর্গের নক্ষত্র আহরণ করিতেছেন, অপর ভার বহিতেছেন মাত্র। যে স্থলে সভ্যতার রেখা প্রবেশ করিতে কালবিলম্ব হয়, সেই সব স্থলে প্রাচীন জিনিষ বেশি যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, তাই চট্টগ্রামের জঙ্গল হইতে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী এত কাল পরে পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে। (১) যদি কবিকঙ্কণ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, তবে তদ্দেশবাসীগণ তাঁহাকে ফেলিয়া কখনই মাধবাচার্য্যকে গ্রহণ করিত না। বস্তুতঃ, দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী রচিত হইবার অন্যূন ১৩।১৪ বৎসর পরে মুকুন্দরামের চণ্ডী সমাপ্ত হয়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে একটি "আত্মবিবরণ" আছে। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য"। সুতরাং পুস্তক সমাপ্ত করিয়া 'আত্মবিবরণ' লিখিয়াছেন। সেই বিবরণের আর এক স্থলে আছে,—"আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান, তার দোষ ক্ষমা কর, কর অবধান।" পুস্তক রচনান্তে উহা গায়কের দ্বারা গীত হইয়াছিল, তাহারা শুদ্ধ ভাবে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারে নাই, এইজন্য তিনি লজ্জিত হইয়া দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। পুস্তকসমাপ্তি ও চণ্ডীর পালা গান হইবার পরে, কোনও সময়ে কবি স্বীয় আত্মবিবরণটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই 'আত্মবিবরণে' কবি সময়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধব গায় শারদা-চরিত।" ইহা ১৫০১ শক, অর্থাৎ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে, উহা পুস্তকরচনার ২।১ বৎসর পরে লিখিত হইলে, ১৫৭৭। ৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীকাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায়।

এখন কবিকঙ্কণচণ্ডীর সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ইহা একটু দুরূহ কার্য্য। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও তৎপরে কবির নিবাসভূমি দামু-

(১) কয়েক বৎসর হইল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে কোনও গ্রামবাসী অম্বিকা বাবু (২) আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু জানিবার উপায় নাই, কিন্তু উভয়ই ভ্রমসংকুল বলিয়া বোধ হইতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা," কোনও হস্তলিখিত পুস্তকে পান নাই বলিয়া, প্রথমে উহা একবারে অগ্রাহ্য করিয়া, শেষে কি ভাবিয়া উহার অর্থ ১৪৯৯ শক (১৫৭৯ খৃঃ অব্দ) করিয়া, তাহার সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সময় মানসিংহের রাজত্বের ১২। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া পড়ে। কবির লিখিত ভূমিকায় 'মানসিংহ' নামের উল্লেখ জন্য একটা কৈফিয়ৎ চাই, তজ্জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পুস্তকরচনার আরম্ভকাল, ইহার ১২। ১৩ বৎসর পরে পুস্তক সমাপ্ত হয়, তখন মানসিংহ বাঙ্গলায় নবাব ছিলেন, সেই সময় ভূমিকা লিখিত হয়। কিন্তু এ দিকে তিনি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় বলিয়া গিয়াছেন যে, মানসিংহের সময় কবি অত্যাচারপীড়িত হইয়া, দামুন্যা ত্যাগ করিয়া আরড়ায় আগমন করেন, তৎপরে চণ্ডীকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন;—অপর পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই তিনি ঐ কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন? সুতরাং, ইহা নিতান্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইয়াছে। অম্বিকা বাবু দামুন্যায় কবির স্বহস্তলিখিত কাব্য দেখিয়া অনেক নূতন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বলেন, মানসিংহের সময় চণ্ডীকাব্য রচিত হয় নাই, কারণ, সে সময় বাঙ্গলায় কোনও অত্যাচারের কথা ইতিহাসে নাই। তাঁহার মতে জাহাঙ্গীর কুলির সাময়িক অত্যাচারই কবির বর্ণিত বিষয়। কিন্তু তখন আর রঘুনাথ দেব আরড়ার রাজা ছিলেন না, অথচ রাজা রঘুনাথের আদেশে যে কবি চণ্ডী রচনা করেন, তাহা প্রতি পত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই দুই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে গিয়া অম্বিকা বাবু কল্পনা করিলেন যে, মানসিংহের কথা যে কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভ্রম,—উহা জাহাঙ্গীর কুলির রাজত্বকাল; সে কালে ঐরূপ ভ্রম হওয়া কোনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময় রঘুনাথ দেব বোধ হয়, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার আদেশে কবি চণ্ডীকাব্যরচনায় নিযুক্ত হন।

ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক; কবিকঙ্কণ যখন আরড়ায় আসেন, তখন বাঁকুড়া রায় (রঘুনাথের পিতা) জীবিত ছিলেন, তিনি কবিকঙ্কণকে শিশু রাজকুমার-

(২) অনুসন্ধান (১২৯৯ সাল ২য় শে সাঘ ও ৩০শে ফাল্গুন) দেখুন।

দিগের ও রঘুনাথদেবের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন; এ সময়ে যদি রঘুনাথ এত দূর বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকেন যে, রাজকার্য্য হইতে তাঁহার অবসর লওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে এরূপ শিশুটির জন্য বাঁকুড়া রায়ের কবিকঙ্কণকে নিযুক্ত করা অবশ্যই সম্ভব! অপিচ, এইমত পরিগ্রহ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কবিকঙ্কণ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর অত্যাচারে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া আরড়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বাঁকুড়া দেব ও তৎপুত্র রঘুনাথ দেব, উভয়ই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিত্ব কি মার্কিন্ কংগ্রেসের সভাপতিত্বের মত, আরড়ার রাজাদিগেরও ৫। ৭ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজ-পদপ্রাপ্তি স্বীকার না করিলে, এই অদ্ভুত মতের কখনই পোষকতা করা যায় না। কবিকঙ্কণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজদরবারের কথা কি জানিবেন, জাহাঙ্গীর কুলির স্থলে মানসিংহ লিখিয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ কল্পনা-গড়া কথা। আর স্বীকার করিলাম যেন কবিকঙ্কণ এ বিষয় ভুল করিয়াছেন, যেন বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায় পিতাপুত্রে উভয়েই একত্রে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন ৩০ বৎসর রাজকার্য্য করিবার পর অসমর্থ রঘুনাথের শিক্ষার জন্য যথার্থই বাঁকুড়াদেব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় আরড়ায় কোন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, কবিকঙ্কণ কি তাহার একবারও উল্লেখ করিতেন না? অম্বিকা বাবু হয় ত বলিবেন যে, "রঘুনাথ দেবের সঙ্গে আর সেই সময়ের রাজার সঙ্গে কলহ ছিল।" কল্পনার পথ অবারিত। কিন্তু তৎবংশীয়েরা তবে এখন পর্য্যন্তও কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত চণ্ডী পূজা করিয়া থাকে কেন?

যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অম্বিকা বাবু, উভয়েরই মত ভ্রমপূর্ণ; এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহারা উভয়েই "শাক রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ছত্রটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার উহা সমর্থন করিতে যাইয়াও দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা ঐ ছত্র উপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহি, বটতলা যে কোনও হস্তলিখিত পুস্তক হইতেই উহা গ্রহণ করিয়া থাকুক, উহা পরবর্ত্তী গায়কদিগের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ঐরূপ রচনা জাল করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ২।৪ বৎসর পরে রচিত হইলে যে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, কি কোনও দ্রব্য বাসি হইয়া যায়, এ কথা তাহাদের মনেও উদিত হইত না। আমাদের দেশীয় লেখকগণ কোনও পুস্তক প্রাচীন করিতে ইচ্ছুক হইলে, একেবারে ব্যাস কি পরাশরের দোহাই দিতেন। কোনও গল্প প্রস্তুত করিতে

হইলে, বিক্রমাদিত্য কি কালিদাসের উপর তাহা চাপাইতেন। ২।৪ বর্ষের জন্য কি ২। ৪ শত বৎসরের জন্যও তাঁহারা সময়সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত হইতেন না।

সন তারিখের প্রতি যদি তাঁহারা মনোযোগী থাকিতেন, কি আধুনিক প্রত্ন তত্ত্ববিৎগণের ন্যায় তাহা রচিবার কৌশল অবগত থাকিতেন, তবে আমাদের দেশের বড় বড় ঘটনাগুলি, যাহা মহা আখ্যায়িকাসমূহে বর্ণিত আছে, সেগুলি বিদেশীয় লেখকদিগের গবেষণার মহিমায় আজ কাল আধ্যাত্মিক বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত না। ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ) আমরা অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক নহি; ইহা গ্রহণ করিলে কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে সত্যগুলি নিকটবর্ত্তী হয়—দূরবর্ত্তী হয় না, তাহাই আমরা দেখাইতেছি।

বটতলার পুস্তকে আছে,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ;
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ইইল রাজা আমদ সরিফ।"

অক্ষয় বাবুর চণ্ডীতে—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ;
রাজা মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিফ।"

কিন্তু এ দুইটি প্রকৃত পাঠ নহে। কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুস্তক হইতে নীলমণি বাবু যাহা উদ্ধৃত করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়াছেন, তাহা এইরূপ;—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাৎ প্রায় মামুদ সরিফ।"

এইরূপ পাঠ কবির স্বহস্তলিখিত বলিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং অম্বিকা বাবু, উভয়েই গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ দুঃখের বিষয়, কেহই তাহার প্রকৃত অর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। বটতলা ও অক্ষয়-বাবুর চণ্ডীর পাঠ আমাদিগের নিকট প্রশস্ত বোধ হয় না। কারণ, মানসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারাও যদি ঐরূপ অত্যাচার হইত, তবে তজ্জন্য অবশ্যই তিনি আংশিক দায়ী। গৃহ-তাড়িত কবি উক্ত রাজার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেন কি

না, সন্দেহ। বিশেষ, কবির আশ্রয়দাতা রাজার বাটীতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুস্তক আছে, তাহার পাঠ অমান্য করিবার আমাদের কোনও কারণ নাই; ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অম্বিকা বাবু, উভয়েই ঐ পাঠেরই সমর্থন করিয়াছেন। সেই পাঠ অবলম্বন করিলেই কথা অতি সহজ হয়।

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মামুদ সরিপ।"

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, প্রথম পদে মানসিংহকে কবি ধন্যবাদ দিতেছেন, ও 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' প্রভৃতি মনোহর অভিধানে বিশেষিত করিতেছেন; দ্বিতীয় পদের রাজাকে তিনি অধর্ম্মী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন,—সুতরাং এক ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ বিরুদ্ধ উক্তি কখনই সম্ভবপর নহে। আমাদের মতে, কবি গ্রন্থারম্ভের ১২। ১৩ বৎসর পরে উহা সমাপ্ত করিয়া, গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ লিখিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থের প্রথমে লিখিত হয় নাই। তাহা হইলে, দামুন্যায় কবির স্বহস্তলিখিত পুস্তকে উহা প্রথমেই লিখিত থাকিত। "এই গীতি হইল যেমতে" এ কথা দ্বারাও দেখা যায়, কবি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া 'গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ' লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন এই "গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ" লিখেন, তখন মানসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি যখন দামুন্যা ত্যাগ করিয়া আসেন ও চণ্ডী তাঁহাকে গীতি রচনা করিতে আদেশ করেন, তখন অন্য নবাব বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। তাই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, গ্রন্থ কিরূপে হইল, তিনি তাহা বলিতেছেন, "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও গৌড় বঙ্গ উৎকলের প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন, কিন্তু অধর্ম্মী (যবন) রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অশেষবিধ অত্যাচার করিতেছিল, আমরা সেই সময় পলাইয়া আসিতেছিলাম, তখন 'পথে চণ্ডী দিলা দরশন'।" এই গীতিরচনার আদেশ, কবি ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে পাইয়াছিলেন। পদ দ্বারাও তাহাই দেখা যায়, "শকে রস, রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা, কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"

ইতিহাসেও জানা যাইতেছে যে, এই সময় হুসেন-কুলি খাঁ ও তৎপরে মজফর খাঁর সময় বঙ্গদেশে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। মোগল পাঠানের যুদ্ধ ও জায়গিরদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশে এই সময়ে ভয়ানক অশান্তি বিরাজ

করিতেছিল, এই অশান্তি নিবারণ করিতেই সর্ব্বশেষে মানসিংহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আর যে দিকে আমরা দেখিয়াছি, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী সমাপ্ত করিয়াছিলেন;—মুকুন্দ, মাধবের গীতি দামুন্যা হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলেন, কিংবা ঐ পুস্তক ১৫৭৭ খৃঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পরে রচিত হইলে, আরড়ার রাজভবনে প্রথম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যরচনায় ১০।১২ বৎসর ব্যয়িত হইতে পারে না, অম্বিকা বাবু এই আপত্তি করিয়াছেন; ইহা অন্যায় আপত্তি। কবিকঙ্কণচণ্ডী বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও স্থায়ী সামগ্রী। এমন লেখক আছেন, যাঁহারা বিশিদত্তগুণে কথায় কথায় মুক্তা ছড়াইয়া যান, যাঁহাদের হুকুমে কলম চলে ও পদ মিলে। কবিকঙ্কণ ঐরূপ ক্ষণস্থায়ী কাব্য রচনা করেন নাই। "ডিভাইনা কমেডিয়া" লিখিতে ড্যান্টের ৭ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল; "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখিতে মিল্টনের পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী সামগ্রী প্রকৃতিও ধীরে ধীরে রচনা করিয়া থাকেন; যে ফুল এক দিনে ফোটে, তাহা এক দিনে শুকাইয়া যায়।

১৫৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি আরড়ার পথে দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহার কিছু পরে পুস্তক আরম্ভ করিয়া ১৫৮৯ কি ইহারও কিঞ্চিৎ পরে পুস্তক রচনা শেষ করিয়াছিলেন।

কবি হইতে নবম পুরুষ এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার সন্তানাদি আছে কি না, অম্বিকা বাবু বলেন নাই। না থাকিলেও ১০ পুরুষের সময় পাওয়া যাইতেছে। অম্বিকা বাবুই বলিয়াছেন, ইহাদের ৪।৫ পুরুষের সংবাদ পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই ৭০।৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন;—সুতরাং এই বংশীয়েরা দীর্ঘজীবী। ৩৫ বৎসর কবিয়া ধরিলে ৩৫০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং, কবির জন্মকাল ১৫৪৪ খৃঃ অব্দ কি তৎসন্নিহিত সময়। ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে চণ্ডী রচনা আরম্ভ করিলে, উহা তাঁহার ৩৪ বর্ষ বয়সে প্রারব্ধ হইয়াছিল;—আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য, এই অনুমানের ৪। ৫ বৎসর এদিক সেদিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

"সমাপ্ত হইলে গীত, জগজ্জন প্রায় প্রীত" ইত্যাদি একবার লিখিয়া পুনর্ব্বার "শকে রস রসবেদ শশাঙ্ক গণিতা" দ্বারা দ্বিতীয় সমাপ্তি-পত্রের অবতারণা করা সম্ভবপর নহে,—অম্বিকা বাবু লিখিয়াছেন,—উহা বটতলার চণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া উড়াইয়া দেওয়ার জন্য। তিনি নিজেই বলেন, কবি "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" শেষে লিখিয়াছেন,

গ্রন্থসমাপ্তির পরে ভূমিকাস্বরূপ "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" অবতারণা করিয়া সন তারিখ উল্লেখ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। শেষের লেখকগণ গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি পূর্ব্বে সংলগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু সনের অংশ পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের সময় সাধ্যানুসারে সিদ্ধান্ত করিলাম।

মাধবাচার্য্যের বাড়ী ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ সপ্তগ্রাম,—তিনি পরাশর নামক কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র, গানের দল করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। মাধবাচার্য্য নিত্যানন্দের একজন পরিকর ছিলেন। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ভৎপ্রভু গদাধর দাসের তিরোধান উপলক্ষে যে উৎসব করিয়াছিলেন ও পঞ্চবিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে সন্তোষ দত্ত যে উৎসব করিয়াছিলেন, তাহার উভয়েই ইনি উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডী ব্যতীত তাঁহার রচিত "ভগবৎসার"ও একখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ। হরপ্রসাদ বাবু সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় জানাইয়াছেন। ইহার অনেক কথাই তাঁহার চণ্ডীকাব্যের প্রথমে "আত্মবিবরণে" আমরা পাইয়াছি। পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যের বিষয় বিস্তারিত লিখিয়াছি। তাঁহার কাব্য কঙ্কালবৎ। কবিকঙ্কণ তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। কয়েকখানা কাষ্ঠের ন্যায় উপকরণ পড়িয়াছিল, কবিকঙ্কণ তাহা লতা পল্লব পুষ্পে সজ্জিত করিয়াছেন। দুএকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইব। মাধবের ফুল্লরা কৃষকরমণী,—অশিক্ষিতা, অবিনীতা ও নির্লজ্জা। ভগবতীর সঙ্গে তাহার যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তাহার উপর আমাদের শ্রদ্ধা হয় না; দেবীর লজ্জাহীন প্রত্যুত্তরও আমাদিগের বড় বিরক্তিকর বোধ হয়; জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, পসারা মস্তকে লইয়া যে ফুল্লরা পথে ঘাটে মাংস বিক্রয় করে, তাহার মুখে কি আমি সাধু কথা ও সংস্কৃত ভাষা শুনিতে উৎসুক? তাহা নহে। কিন্তু লজ্জা ও বিনয় রমণীর অলঙ্কার, ধনী কি কাঙ্গাল, কাহারও তাহা একচেটিয়া নহে। মাংসের চুপড়ি মাথায় করিয়া গৃহস্থবধূ তাহা দেখাইতে পারে। গহনার চুপড়ি-স্কন্ধে করিয়াও ধনীর রমণী তাহা না দেখাইতে পারেন।

মুকুন্দ, মাধবের ফুল্লরাকে একবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। ফুল্লরা, দেবীকে দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রন্ধনের ত্বরা ভুলিয়া গেল, সে ঈর্ষ্যাতুরা হইল। কে না হয়? কিন্তু মুখে মধুর ভাষা বলিয়া ও বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া আদর করিল, তাঁহাকে কিরূপে তাড়াইবে, ফুল্লরার সেই চিন্তা হইল, কিন্তু ঈর্ষ্যার কথা সে গোপন রাখিল;—নারীর স্বামীর প্রতি গাঢ় প্রেম থাকিলে সে ঈর্ষ্যার কথা বুক ফটিয়া গেলেও অপরের নিকট বলিতে পারে না,—ফুল্লরা কত ব্যস্ত হইয়া

দেবীকে পুরাণ শুনাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছে। দেবী তাহা শুনিলেন না, পতিভক্তি শিখাইতে অসমর্থ হইয়া ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় গৃহের দারিদ্র্য বর্ণিত করিলেন। গৃহমধ্যস্থিত ভেরাণ্ডার থাম দেখাইলেন, কিছুতেই দেবী গৃহত্যাগে সম্মত হইলেন না। নির্লজ্জা মুখরার ন্যায় ফুল্লরা তাঁহাকে কোনও কটু বাক্য না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কালকেতুর নিকট গমন করিল। কিন্তু মাধবাচার্য্যের ফুল্লরা দেবীকে দর্শনমাত্রেই গালি দিতে আরম্ভ করিল, একবার শুধু বার মাসের দুঃখ বর্ণনা করিয়া দেবীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তার পরই অতি কুরুচিপূর্ণ ভৎর্সনা আরম্ভ করিল। দেবী আবার ততোধিক নির্লজ্জা, তিনি বলিলেন, "তোর স্বামী আমাকে পালঙ্কে বসাইয়া সুখী করিবে, আর তুই হাটে ঘাটে স্বেদসিক্ত দেহে মাংস বিক্রয় করিয়া বেড়াইবি।" তিনি কালকেতুর আরাধ্যা মাতা, পরক্ষণেই কালকেতু আসিলে তাহাকে 'পুত্র' সম্বোধন করিতেছেন; তাঁহার মুখে ঐরূপ কথা নিতান্তই ঘৃণাজনক। কবিকঙ্কণের ভগবতী শুধু একটি কথা ঐরূপ বলিয়াছিলেন, "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।" কেমন সুন্দর কথা! সত্য সত্যই কালকেতু স্বীয় ধনুকের গুণে সুবর্ণগোধিকাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সত্য কথা বলিয়া দেবী লজ্জার সীমা অতিক্রম করেন নাই, অথচ ফুল্লরার আশঙ্কা দ্বিগুণ করিতেছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ঐরূপ কৌশল আদ্যোপান্ত।

কি উপকরণ কবিকঙ্কণ কি ভাবে গঠন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়ে অনুকরণকারী বলিয়া তাঁহার গৌরবকে লঘুজ্ঞান করা হয় না; অপূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা হয়। মাধবাচার্য্য যে অস্থিপঞ্জর রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রতিভাশালী কবিকঙ্কণ মন্ত্রবলে তাহাতে মাধবাচার্য্যের জীবনীসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্যের কাব্য পাঠ করা আবশ্যক। কবিকঙ্কণকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা কাব্য একবার পড়িবেন।

মাধবাচার্য্যের রচনা সর্ব্বত্রই সুন্দর, সরল ও সতেজ। কোনও অসাধারণ শক্তির বিকাশ আমরা তাহাতে দেখি না সত্য, কিন্তু বর্ণিত উপাখ্যান বেশ সুন্দর ও চিত্ত-আকর্ষক হইয়াছে। ফুল্লরার বারমাস্যা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"ফুল্লরা বলে রামা বদি দেও মন বার মাসের যত দুঃখ ফুল্লরা পায় মনে
বার মাসের বর্ত্ত দুঃখ করি নিবেদন। ভাবিতে চিন্তিতে তাহা পাঁজর বিঁধে ঘুণে।

মাধবীতে জন্ম মোর শুনহ যুবতী।
যত দুঃখে ব্যাধ ঘরে করিছে বসতি।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু যায় বনবাসে।
মৃগ না পাইলে বনে থাকি উপবাসে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শুন যত মোর দুঃখ,
কহিতে সে সব কথা বিদরে বুক।
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে,
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে ভূমিপরে,
সবিনয় বাক্য মোর শুনলো সুন্দরী,
কোন সুখের লাগি হইবা ব্যাধের নারী।
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি,
ক্ষুধায় আকুল হয়ে লোটাই আমি ক্ষিতি,
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারিদিকে চাই
হেন সাধ করে মনে, অন্য বনে যাই।
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষে ঝিমানি
মাথা থুইতে স্থানি নাই ঘরে আটু পাণি।
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চাহি কোণে,
মাঘের পড় রাখে বঞ্চি দুই জনে।
ভাদ্র মাসেতে কন্যা বিদ্যুৎ বহার,
হেন কালে যাই আমি সাথেতে পসার,
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার,
বিষাদ ভাবিয়া মরি অর্কের কুমার।
আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়,
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তাভয়।
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত,
অন্নের কারণে প্রভু সদাই চিন্তিত।" ইত্যাদি

মাধবাচার্য্যের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি পদ আমরা পাইয়াছি, তাহা বেশ সুমিষ্ট, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

বাইরারে ওহে শ্যাম কেবা দিবে বাধা,
দৈবে মরিব আমি অভাগিনী রাধা।
সঙ্গে করি নিয়া যাও হয়্যা যাব দাসী,
ঘর প্রবেশিতে নারি, না শুনিলে বাঁশি।
মথুরার নাগরীরা নানা রস জানে,
গেলে না আসিবে শ্যাম হেন লয় মনে।

(২)

জয় রাধা ঠাকুরাণী, প্রেমবিলাসিনী রাই
ও অঙ্গ বয়ান কত ছাঁদে,
রূপ হেরি মৃগ পাখী বিনাইয়া কাঁদে,
ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ বহে,
কোটী চাঁদ জিনিয়া রাধা মুখ শোভা করে।
কাঁচা কাঞ্চন তনু কতই পরিপাটি
শোভিত কেশের খোঁপা তাতে সোনার কাটী।
আবৃত শ্রীমুখ খানি কি কব তোমায়,
নীলগিরি পাছে যেন চাঁদ চলি যায়।
অলি লুকায়্যি লাজে, পিক নাহি নাদে,
অঙ্গের সৌরভে অলি গগন কুহরিছে।
ও বঁধু কিনাইবে জীবন ধন মোর
যুগে যুগে না ছাড়িব চরণখানি তোর।
জাতি দিলাম যৌবন দিলাম আর দিব কি।
যাবে আছে রাধা প্রাণ তারে বলি দিব।
আজু মোর মন্দিরে আওত কানু কালা
কি করব চাঁদ পবন আলি কোকিলা,
কি করব আর মোরে কাম পঞ্চবাণ
আসি মোর দেহ গেহে করি সুসন্ধান;
ফেটল-কমল নয়ান আজু প্রসন্ন বিধি
আনিয়া মিলাইল পরম গুণনিধি,
হাসি হাসি কহে কান,
যুড়ায়ে রাধার প্রাণ
ছাড়ে রাধা লোক ভয় মান
দ্বিজ মাধবে বুঝে, দেখ নয়ন কমলে
রাধা কৃষ্ণ নিকুঞ্জ পয়ান।

(৩)

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে নাহি জুয়ায়।
তুয়া পন্থ নিরক্ষিতে, বহিযাছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়।
নূপুর কিঙ্কিণী, কেয়ুর কুণ্ডল মণি
পরি ধনী করিল গমন।
প্রিয় সখি কলে ধরি; নীল নিচোল পরি
দেখ গিয়া ঐ চাঁদ বদন।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

এলিফেণ্টা কেভ্‌স্‌। (১ম)

বম্বের সমুদ্রতীরে গিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, কতকগুলি পাহাড় জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। ইহার ভিতর কতকগুলি নিতান্ত ছোট, অপরগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। দুই একটিতে গোলা-গুলি রাখিবার জন্য ইংরেজেরা ম্যাগাজিন্‌ (Magazine) প্রস্তুত করিয়াছেন। এলিফেণ্টা (১) এই পার্ব্বত্য দ্বীপসমষ্টির মধ্যে অন্যতম।

এলিফেণ্টা বম্বে হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি গজমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্ত্তি হইতেই পোর্টুগিজেরা দ্বীপের নামকরণ করেন। মূর্ত্তিটি কিন্তু এক্ষণে এখানে নাই—বম্বে ভিক্টোরিয়া উদ্যানে নীত হইয়াছে। এলিফেণ্টা দ্বীপটি নিতান্ত ক্ষুদ্র—ইহার পরিধি ৫ মাইলের অধিক হইবে না। এখানে লোকের বসবাস বড় নাই। যে দুই এক ঘর আছে, তাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনওরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কেভ্‌সের জন্যই এলিফেণ্টা বিখ্যাত। দেশ বিদেশ হইতে বিস্তর লোক এই কেভ্‌গুলি দেখিতে আইসেন। প্রিন্স্‌ অফ্‌ ওয়েল্‌স্‌ ভারতবর্ষে আসিয়া এই চমৎকার কেভ্‌গুলি না দেখিয়া স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। স্থানীয় লোকেরা এলিফেণ্টা দ্বীপকে ঘারাপুরী বা "উৎখাতনগর" বলিয়া থাকে।

বাঙ্গালীর ভাগ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সুযোগ সচরাচর বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু কোনও সুযোগে যদি একবার বাহির হওয়া গেল, আর শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বল্প আয়াসে যদি কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনও উপায় থাকে, তাহা প্রাণান্তেও ছাড়িয়া আসা যায় না। যখন এত দূর আসিয়াছি, তখন এলিফেণ্টা দেখিতেই হইবে।

যাহা হউক, আমরা ছোট দেখিয়া এক খানি ষ্টীমার ভাড়া করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া, এপলো বন্দরে গিয়া আমাদের ষ্টীমারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টা দুই পরে ষ্টীমার প্রস্তুত হইল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিলাম; ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। তখন বেলা ১টা।

(১) "কেভ্‌" এই শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না পাওয়াতে, ইংরাজি কথাটিই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। "কেভ"কে পর্ব্বতগুহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, গুহা কিম্বা গহ্বর স্বভাবজাত—কেভের ন্যায় মনুষ্যনির্ম্মিত নহে।

একেবারে এলিফেণ্টায় না গিয়া, আমরা প্রথমে "প্রংস্ লাইট্ হাউস্" (Prong's Light-house) দেখিতে গেলাম। বম্বের উপকূলে যতগুলি লাইট্-হাউস্ আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণের ব্যয় ৬০,০০০ পাউণ্ড। লাইট্-হাউস্‌টি ১১ তালা ও ১৬৮ ফুট উচ্চ; জলমধ্যে অবস্থিত একটি পাহাড়ের উপর ইহা সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত—প্রথম পাথর দিয়া গাঁথা, তার পর আগা-গোড়া-লৌহময়। সকলের উপর তলায় প্রকাণ্ড একটি কেরোসিন্ ল্যাম্প রহিয়াছে। রিফ্লেক্টরের (Reflector) সাহায্যে এই আলোর ঔজ্জ্বল্য এতদূর বর্দ্ধিত করা হয় যে, ১৮ মাইল দূর হইতেও ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

"প্রংস লাইট হাউস্" দেখিয়া এলিফেণ্টার দিকে রওনা হওয়া গেল। পথিমধ্যে দেখিলাম, কতকগুলি সি-গল্ (Sea-gull) সমুদ্রবক্ষে পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে। সি-গল্ রাজহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; দেখিতেও কতকটা সেইরূপ, কেবল আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। পাখিগুলি সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিতেছে, নামিতেছে; যেন তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আমাদের ষ্টীমারের দশাও ঐরূপ—ক্ষুদ্রকায় "এঞ্জন" ভয়ানক দুলিতেছে। বেচারা আরোহীদের আজ "দোলযাত্রা"—মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই। অবিশ্রান্ত দোলনে আমাদের একজন সঙ্গীর বমন হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও কিছু হয় নাই। ৩৷৷০ টার সময় আমরা এলিফেণ্টায় পৌঁছিলাম।

কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিয়া কেভ্‌সে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে প্রত্যেক দর্শককে দু আনা মূল্য দিয়া এক এক খানি টিকেট কিনিতে হয়। এইরূপে যাহা আয় হয়, স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত রক্ষীবর্গের বেতনাদিতে তাহা ব্যয়িত হয়। একজন পেনসন্‌প্রাপ্ত ইয়ুরোপীয়ান সৈনিক রক্ষিবর্গের মধ্যে প্রধান।

একটি ছোট রকমের পাহাড় খুঁদিয়া, এই কেভ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কেভে সর্ব্ব সমেত ৫টি প্রকোষ্ঠ। মধ্যে একটি বড় হল ও চারিপার্শ্বে ৪টি ছোট কুঠারী। হলটি ৬০ হাত লম্বা, প্রশস্তও প্রায় ঐরূপই হইবে। কুঠারিগুলি দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত ও প্রস্থে ১১ হাত। ২৬টি বড় ও ১৬টি ছোট থাম ছাদের ভার বহন করিতেছে। প্রায় সকল থামই স্থানে স্থানে ভগ্ন, কদাচিৎ দুএকটি ভাল অবস্থায় আছে। কোনটিরই ছাদ ও মেজে সমভল নহে; সুতরাং সব থামগুলি সমান উচ্চ নয়। থামগুলির উচ্চতা ১৬ হইতে ১৮ ফুট।

হলে তিনটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেয়ালের গায়ে খোঁদা রহিয়াছে। মধ্যেরটি "ত্রিমূর্ত্তি"—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তিন মুখ একত্র পাশাপাশি স্থাপিত। ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও বামে "অর্দ্ধনারীশ্বর"—অর্দ্ধ-স্ত্রী অর্দ্ধ-পুরুষরূপী শিবদুর্গার একীভূত যুগলমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ৫।৬ হাতের কম উচ্চ হইবে না। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণুর অন্যান্য ছোট ছোট মূর্ত্তি, ঐরাবতসহ ইন্দ্রের মূর্ত্তি, নন্দী ও মহাদেবের বাহন বৃষের মূর্ত্তি, ইত্যাদি বিস্তর রহিয়াছে।

পাশের ৪টি কুঠারিতে হরপার্ব্বতীর বিবাহদৃশ্য, মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তি, হরপার্ব্বতীর মস্তকে দেবগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবৃষ্টি, গণপতির প্রতিমূর্ত্তি, দশানন কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস ও দুটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। এই বড় কেভ্ ছাড়া এলিফেণ্টা দ্বীপে আরও চারিটি ছোট ছোট কেভ্ আছে। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

প্রত্যেক থাম, দেয়ালের গাত্রসংলগ্ন প্রত্যেক মূর্ত্তি, সমস্তই সেই পাহাড় খুঁদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড হল ও তৎপার্শ্বস্থ চারি বৃহদায়তন কক্ষ নানাবিধ নক্সা-কাটা থাম ও অসংখ্য মূর্ত্তি কঠিন প্রস্তর কর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত করা কত যে সময়, অর্থ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অধিচ, যে সময় এই কেভ্গুলি নির্ম্মিত হয়, সে সময় এখনকার মত খননকার্য্যোপযোগী তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাদিও বড় ছিল না। নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও কিরূপে এরূপ মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আর শুধু যে এরূপ একটি কেভ্ই ভারতবর্ষে আছে, তাহা নয়। এলিফেণ্টা কেভ্সের ন্যায়—এমন কি, ইহা হইতে অনেক বড় বহুসংখ্যক কেভ্ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা ইলোরা, লেনা, কারলি, আর্জ্জাণ্টা (২) ইত্যাদি। ইলোরা কেভ্সের নাম কে না শুনিয়াছেন? কি কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য, কি বিস্তৃতি—সর্ব্ব বিষয়েই ইলোরা কেভস্ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সমধিক বিখ্যাত। আমার ভাগ্যে ইলোরা দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই (৩)। কিন্তু কারলি ও লেনা কেভস্ আমি দেখিয়াছি। এই দুই কেভ্সের বিষয় বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। কি উদ্দেশ্যে কোন সময়ে কাহার দ্বারা এই

(২) কেভগুলির অধিকাংশই বম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত।

(৩) ইলোরা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিতা পথ অতি সুদীর্ঘ, তেমনি কষ্টদায়ক।

সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পরস্পর হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত এই কেভ্-সমূহ যে একই ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহা নিঃসংশয়িতচিত্তে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দস্যুর হস্ত হইতে ধনরত্নাদির রক্ষার্থ, অথবা শত্রুহস্ত হইতে আত্মগোপন দ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত, দুর্গরূপে এই পার্ব্বত্য ভবনগুলি নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এক একটি কেভ্ যেরূপ প্রকাণ্ড, তাহাতে রাজা রাজড়ারা এখানে কোনও কালে বাস করিতেন, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কোনও কোনও কেভে মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ ধরণের—অর্থাৎ মুখাবয়ব মঙ্গোলিয়ানদের মুখাবয়বের ন্যায় চেপ্টা। কতকগুলি কেভ্ ভারতের বৌদ্ধ রাজগণ দ্বারা নির্ম্মিত,—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কেভগুলির নির্ম্মাণকালসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, এলিফেণ্টা কেভস্ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে শিবভক্ত কোনও হিন্দু নৃপতির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এলিফেণ্টা দ্বীপ বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুদের নিকট তীর্থ বলিয়া বহুকাল অবধি সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। এখনও প্রতিদিন দলে দলে হিন্দুযাত্রী এখানে আসিয়া পূজা দেয় ও মানসাদি করিয়া থাকে। শুনা যায়, নৃশংস পর্টুগিজেরা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এই কেভ্গুলিকে কুসংস্কারের দুর্গ এবং আশ্রয়স্থান বিবেচনায় ইহাদের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বড় কেভের প্রবেশদ্বারে একটি কামান স্থাপিত করিয়া কেভের ভিতরে ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করা হয়; গোলার আঘাতে কতকগুলি থাম ভাঙ্গিয়া পড়ে, কতক আংশিক ভগ্ন হয়। মূর্ত্তিগুলিরও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। উদার এবং সুসভ্য বৃটিশ্ গভর্মেণ্ট এই কেভগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিয়া বম্বে অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। এপলো বন্দরে (Apollo Bunder) সারি সারি গ্যাসল্যাম্প জ্বলিয়া উঠিল। সমুদ্রের মধ্যে অর্ণবপোতসমূহেও আলো জ্বলিতেছিল। তখনকার দৃশ্য বড়ই মনোহর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই আলো—বন্দরের আলো, সমুদ্রবক্ষঃস্থিত বহুসংখ্যক জাহাজের আলো, লাইট-হাউসের আলো—চতু-

দিকই আলোকময়। অন্ধকারে অন্য কোনও বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল আমাদের ষ্টীমার বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে সেই মণ্ডলাকার আলোকমালা, আর মাথার উপরে নির্ম্মল আকাশে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি। জলস্পর্শ-শীতল নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল; অপার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয় তখন পরিপূর্ণ। জনৈক পার্সি যুবক (ষ্টীমারের ইঞ্জিনিয়ার) আমাদের অনুরোধে বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। আমাদের একটি সঙ্গী গান ধরিলেন। নিস্তব্ধ সমুদ্রবক্ষে গান ও বাদ্য উভয়ই কর্ণে মধু বর্ষিতে লাগিল। এ দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিব না। স্বপ্নদৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ন্যায় ইহার সুখস্মৃতি চিরদিন গত জীবনের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে।

অপরাধনিদান।

১। শীতাতপের বিভিন্নতায় য়ুরোপে অপরাধসংখ্যার বিভিন্নতা হয়, এবং এই জন্য ঋতুভেদেও অপরাধসংখ্যা বিভিন্ন হয়।

২। স্ত্রী-পুরুষভেদেও অপরাধের সংখ্যা ভিন্ন হয়।

৩। দারিদ্র্য অপরাধের নগণ্য কারণ।

শীতাতপের প্রভাব সমাজশাসনে হ্রাস করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মাধিক্য হইলেও, ভারতবর্ষে অপরাধের সংখ্যা সামান্য। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক অধিক; কারণ অষ্ট্রেলিয়ায় বিলাতী সমাজের রীতি নীতি প্রচলিত। চিনাহুদের নিকট হইতে একজন উড়িয়া কলিকাতায় চাকরি করিতে আসিলে সে স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না। কলিকাতাতেও উড়িয়ার সমাজ আছে; সে সেই সমাজের দ্বারা শাসিত হয়। সমাজ তাহার প্রত্যেক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করে, অপরাধ পাইলে শাসন করে। কিন্তু য়ুরোপে গ্রামে যেটুকু শাসন দেখা যায়, সহরে তাহার একাংশও দেখা যায় না। এ জন্য গ্রাম অপেক্ষা সহরে অপরাধের সংখ্যা অধিক হয়। ব্যবসায়ভেদেও অপরাধের সংখ্যার ইতরবিশেষ হয়। কৃষিজীবিগণ অপেক্ষাকৃত নিরীহ; যাহারা কলকারখানায় কর্ম্ম করে, তাহাদের মধ্যে অপরাধসংখ্যা অধিক হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিল্পশ্রমজীবী—সেখানে অপরাধীদের মধ্যে শতকরা চৌষট্টি জন শিল্পশ্রমজীবী। কৃষিজীবীর অবসর অনেক। সে গৃহকার্য্যে, সন্তানের লালনপালনে

অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে পারে, এ জন্য তাহার কোমল প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচালন হয়; শ্রমজীবীর অবসর সামান্য, সে-ঐ সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় পায় না। য়ুরোপে ব্যভিচার কত প্রবল, এই তালিকাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। শীতাতপে ব্যভিচারের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করা যায় না। কৃষিজীবী অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ব্যভিচার অধিক। তাই এ তালিকাটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। বৎসরে যতগুলি সন্তান জন্মে, তাহার মধ্যে শতকরা কত জন ব্যভিচারসম্ভূত, এই তালিকায় দেখান হইল:—

১। লণ্ডন	৩·৭	৭। মিলান	৩৪·৯
২। বার্লিন	১৪·৯৫	৮। ষ্টকহলম	৪০·৭
৩। সেণ্টপিটার্সবার্গ ...	১৮·৮	৯। প্রেগ	৪৬·৭
৪। টুরিন	১৮·৯	১০। লম্বার্গ	৫১·০
৫। মাড্রিড	২১·৮	১১। বিয়েনা	৫১·৭
৬। পারিস	২৬·৩৫		

কৃষিজীবীর অবসর অধিক থাকাতে, সে অল্প আমোদজনক কার্য্যে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়া অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। শ্রমজীবীর অবসর সামান্য—এ জন্য অল্প সময়ে তীব্র আমোদে তাহার সাধ মিটাইয়া লইতে হয়—ফলে শ্রমজীবীর মধ্যে সুরাপানাদি দোষের আধিক্য দৃষ্টিগোচর। এ জন্য অপরাধের সংখ্যাও অনেক। ক্রোধে যেমন মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, গ্রীষ্মে ও মাদকসেবনে মস্তিষ্ক তেমনি উত্তেজিত হয়। উষ্ণ মস্তিষ্কে শান্তভাবে সকল কথার সম্যক্ আলোচনা করা যাইতে পারে না। এ জন্য গ্রীষ্মপ্রধান ও সুরাপায়ী দেশে নরহত্যা অপরাধের সংখ্যা এত অধিক। চৌর্য্যাদি অপরাধ শান্ত সমালোচনাসাপেক্ষ। শীতপ্রধান দেশে এ জন্য চৌর্য্যাদির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা অধিক, গ্রামের সংখ্যা অধিক, এবং সমাজশাসন কঠোর, এই ত্রিবিধ কারণে ভারতবর্ষে অপরাধের সংখ্যা এত অল্প। কিন্তু এ অল্পতা অধিক দিন থাকিবে, বোধ হয় না। সমাজ যতদিন অল্পপরিসর থাকে, ততদিন প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যের উপর সকলের তীব্র দৃষ্টি থাকে। কিন্তু সমাজের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, শাসনের কঠোরতার তত হ্রাস হইয়া আসে। দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজে বা ব্রাহ্মসমাজে অপরাধের অল্পতার কারণ, সমাজের অল্পপরিসরতা। হিন্দু সমাজের আয়তন যত বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুর স্বেচ্ছাচারিতা তত বাড়িতেছে।

ভূমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অপরিমেয়। এজন্য শস্যের দর বৃদ্ধি হইলেও খাজনার হার বৃদ্ধি হইয়া কৃষিকার্য্যের আয় আশানুরূপ হইতেছে না। যাহারা পূর্ব্বে অন্য কার্য্য করিত, তাহারাও বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আয় আরও কমিয়াছে, এখন বাধ্য হইয়া লোককে কলকারখানায় কার্য্য করিতে হইতেছে। ক্রমে কলকারখানা আরও বাড়িবে। মহকুমা, রেলওয়ে ষ্টেশন, কল-কারখানা ও বাণিজ্যের হাট বা বন্দর নিত্য-নূতন স্থাপিত হইয়া দেশে সহরের সংখ্যা বাড়িতেছে, ক্রমে আরও বাড়িবে। শেষে একদিন আসিবে যে, যে ভারত আজ অপরাধতুলনায় পৃথিবীতে স্বর্গের সমান, সেই ভারতবর্ষ নরকের ন্যায় পাপপূর্ণ হইবে। ভারতে যত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজ সৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের শাসন কঠোরতর হইবে, ধনাগমতৃষ্ণা যত সংযত হইবে, নারীগণকে যত গৃহকার্য্য ও সন্তানপালনে আবদ্ধ রাখা যাইবে, ততই ভারতের বর্ত্তমান পবিত্রতা রক্ষা পাইবে। সমাজের ভিতরে সমাজ ভারতের জাতিভেদ। জাতিভেদের নিয়ম যত কঠোর হইবে, ততই অপরাধসংখ্যা অল্প হইবে। কিন্তু আদর্শ ও অবস্থানের পরিবর্ত্তন এত হইয়াছে যে, সংযম বা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম বা জাতিভেদ রক্ষা করিবার আশা আর নাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজসৃষ্টির আশা আছে। এই সকল ধর্ম্মসমাজে নীতির পবিত্রতারক্ষার প্রয়াস যদি অধিক হয়, তবেই মঙ্গল; নতুবা প্রভূত অমঙ্গল ঘটিবে।

অপরাধকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধনাপরাধ ও প্রাণাপরাধ; অর্থাৎ বিত্ত সম্বন্ধে অপরাধ চৌর্য্যাদি, আর প্রাণ সম্বন্ধে অপরাধ আঘাত ইত্যাদি। গ্রীষ্মের প্রতাপ দ্বিতীয় প্রকার অপরাধের উপর অধিক, শীতের প্রতাপ প্রথম প্রকার অপরাধের উপর অধিক। ইতালী স্পেন প্রভৃতি দেশে যত নরহত্যা হয়, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে তত হয় না। আবার ইংলণ্ডে ফ্রান্সে চুরি ডাকাতি যত হয়, স্পেন ইতালীতে তত হয় না। অথচ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালী অপেক্ষা অধিক ধনশালী। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। এক বৎসরে এক লক্ষ লোকের মধ্যে কত জনের কোন অপরাধে বিচার হইয়াছিল,—

	নরহত্যা	চৌর্য্য
ইতালি	১৫·৪০	২২১
স্পেন	১১·৯১	৭৪
অষ্ট্রিয়া	৪·০১	

বিক্টোরিয়া (অষ্ট্রেলিয়া)	৩·২	...	৩৯৪·৫
বেল্‌জিয়ম্	৩·০২	...	১৪৩
ফ্রান্স	২·৭৩	...	১২১
গ্রেটব্রিটেন	২·৩৫	...	২৫৮·৫
ভারতবর্ষ	১·৩১	...	৬৪·৬

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে লোকে বাধ্য হইয়া আপন গৃহে সময়াতিপাত করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ অধিক হয়, এজন্য শীতপ্রধান দেশে শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সহরে, গ্রামে, কারাগারের মধ্যেও শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সর্ব্বপ্রকারের অপরাধসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আত্মহত্যা যত অধিক হয়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে কখনও তত হয় না। গ্রীষ্মে পাচকশক্তির হ্রাস হয়, শরীর অসুস্থ হয়, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাই গ্রীষ্ম অপরাধের নিদান। অসুস্থতা যে অপরাধের একটি প্রধান কারণ, তাহা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। (১) জল বায়ু (২) সমাজপ্রণালী ও ব্যবসায়, এবং শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি, অপরাধের বিভিন্ন নিদান। যেখানে গ্রীষ্ম প্রধান, যেখানে সমাজশাসন শিথিল, যেখানে শিল্পজীবির সংখ্যা অধিক, সেখানে অপরাধ অধিক। স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষে প্রাণাপরাধ অধিক করিয়া থাকে, কিন্তু চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী স্ত্রীলোকের সংখ্যা সামান্য নহে। যেখানে স্ত্রীলোকে চুরি না করে, সেখানেও স্ত্রীলোকে চোরকে সন্ধান দেয়, বা উৎসাহিত করে। বলের অভাবে স্ত্রীলোকে নরহত্যা করে না, এবং সন্তানপালনে প্রবৃত্ত থাকাতে নৃশংস অপরাধ তাহারা ঘৃণা করে। কিন্তু শিল্পকার্য্যে বা কলকারখানায় যে সকল স্ত্রীলোক কায করে, অনুশীলনের অভাবে তাহাদের নারীপ্রকৃতির কোমলতার হ্রাস হইয়া যায়। তাহারা নৃশংস অপরাধে পরাঙ্মুখ নহে। বয়সানুসারে অপরাধের অনুপাত কিরূপ, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃপুরুষের নিকট লোক অপরাধপ্রবণতা কিরূপ লাভ করিয়া থাকে, চন্দ্রশেখর বাবু এ সব কথার আলোচনা করেন নাই।

ক্লে সাহেব বলেন, যাহারা শেষে কারাগারে আশ্রয় লাভ করে, তাহাদের এক শত জনের মধ্যে

৫৮	জন	১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে
১৪	„	১৫ ও ১৬ বৎসরের মধ্যে
৮	„	১৭ ও ১৯ „ „
২০	„	২০ বৎসরের মধ্যে

অপরাধ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ২০ বৎসরের পরে অপরাধপ্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়া ত্রিশ বৎসরে চরমসীমা লাভ করে। তাহার পর কমিতে থাকে। ইংলণ্ডের কয়েকটি দেশের তালিকা দেখা হইয়াছে যে, কয়েদীদের মধ্যে বয়সভেদে সংখ্যা এইরূপ :—

			পুরুষ		স্ত্রীলোক
১২ বৎসরের নীচে	...	১	... ০·২	...	০·০
১২ হইতে	১৬ ...	২·৮	... ৩·১	...	১·১
১৬ হইতে	২১ ...	১৬·১	... ১৭·৫	...	১০·৭
২১ হইতে	৩০ ...	৩০·২	... ২৮·৪	...	৩১·৪
৩০ হইতে	৪০ ...	২৪·৩	... ২৩·৯	...	২৮·৬
৪০ হইতে	৫০ ...	১৪·৭	... ১৪·২	...	১৭·৫
৫০ হইতে	৬০ ...	৬·৪	... ৬·৪	...	৬·৮
৬০ এর উপর	...	৫·৪	... ৬·২	...	৩·৮

অসৎপ্রবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিলম্বে উত্তেজিত হয়, এবং পূর্ব্বেই নিস্তেজ হইয়া থাকে। পুরুষের ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিষম সময়। এই সময়ে অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য, অতি সাবধানে তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন। স্ত্রীলোকের ২১ হইতে ৩০ বৎসর, পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়।

পূর্ব্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি সন্তানে উত্তরাধিকার করে। উইস্‌ম্যান্ ও গ্যাল্‌টন্ বলেন, পিতার স্বোপার্জ্জিত প্রকৃতি সন্তান পায় না, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি সন্তান পাইয়া থাকে। এ কথা কত দূর সত্য, এখনও স্থির হয় নাই। রোমানিজ্ এ মতের প্রতিবাদ করিতেন। এ কথা সত্য হইলে, চোরের সন্তানের চোর হওয়া নিশ্চিত নহে। আলস্য, বিলাসপ্রিয়তা বা অভিমান, অনুকরণপ্রিয়তা এবং দৃঢ়তার অভাব, অনেক ধনাপরাধের কারণ। অপরাধীদিগকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাল হইবার ইচ্ছা তাহাদের অধিক দিন থাকে না;—কয়েক দিন থাকিয়া আবার উবিয়া যায়। ভাল খাইব বা ভাল পরিব, এ ইচ্ছাটি বেশ আছে। কিন্তু রীতিমত পরিশ্রম করিবার জন্য যে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার আবশ্যক, তাহা নাই। একবার উদ্যম করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া অনেক দিন আলস্যে কাটাইতে, তাহারা ভালবাসে। সে উদ্যমের সময় তাহারা যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতা দেখায়, তাহার পর আবার কিছুই থাকে না। ধারাবাহিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

সাধনার ফল। বাল্যে এই শিক্ষা না হইলে, পরে আর হয় না। এই শিক্ষার অভাবে এবং অনুকরণপ্রিয়তার আধিক্যবশতঃ, চোরের সন্তান চোর হয়। বালকের অনুকরণপ্রিয়তা বানর অপেক্ষা অল্প নহে। অপরাধীর গৃহে ভাল আদর্শের অভাবে সন্তানও অপরাধপরায়ণ হয়। আগাছা যেমন ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, অসৎপ্রবৃত্তি তেমনি স্বাভাবিক। পুরুষানুক্রমে শিশু তাহা অধিকার করে। সরল শিশু, শান্ত শিশু, নির্দ্দোষ শিশু, এ সব মাতামহীর উপকথা। প্রত্যেক শিশু জন্মগত অপরাধী। অজ্ঞানতা সরলতারূপে, দুর্ব্বলতা শান্ত ভাবে, এবং সুবিধার অভাব বা শাসনের ভয় নির্দ্দোষিতারূপে প্রতীয়মান হয়। অথবা তখনও বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। সুদৃঢ়শাসনে সাবধানে শিশুকে পালন করিতে হয়, এক একটি অসৎপ্রবৃত্তির অঙ্কুর দেখিলে, তখনই তাহা পাথর-চাপা দিয়া চাপিয়া ফেলিতে হয়, যেন আলো বা বাতাস না লাগে। পুরুষানুক্রমে যে পরিবারে এইরূপে শিশু লালিত পালিত হইয়াছে, সেই পরিবার শিষ্ট ও সুশীল হয়। এইরূপ শিক্ষার অভাবে অপরাধীর সন্তান অপরাধী হয়। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ে ঘটে না। বিদ্যালয়ে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অনুশীলন হয়, পরিবারে পিতামাতার নিকট কেবল শিশু এইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। উদ্যমবিহীন, অধ্যবসায়শূন্য, অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ অপরাধীর সন্তানের এ শিক্ষা দুর্লভ।

মানসিক দুর্ব্বলতার ন্যায় শারীরিক অসুস্থতা সন্তান উত্তরাধিকার করে। শারীরিক অসুস্থতা অপরাধের কারণ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জার্ম্মেণী দেশে ১৭১৪ জন কয়েদীকে পরীক্ষা করিয়া সিচার্ড সাহেব দেখিয়াছিলেন,—

শতকরা ১৬ জন মাতালের সন্তান
" ৬ জন পাগলের বংশে জন্মিয়াছে।
" ৪ জন আত্মহত্যাপরায়ণ বংশে জন্মিয়াছে।
" ১ জন অপস্মারগ্রস্ত পরিবারে জন্মিয়াছে।

অর্থাৎ, শতকরা ২৭ জনের পরিবারে কোনও-না-কোনও প্রকার শারীরিক বিকার ছিল—শারীরিক বিকার সিকিরও অধিক অপরাধের কারণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ডাক্তার কোরী বলেন, ফ্রান্সের সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা অপরাধ করে; তাহাদের অনেকে শারীরিক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত। ডাক্তার বার্জ্জিলিও বলেন, ইটালীর অপরাধীদিগের শতকরা ৩২ জন পিতা মাতার নিকট অপরাধপরায়ণতা উত্তরাধিকার করে। কারাগারে কয়েদীদিগকে যেরূপ যত্ন ও সাবধানে প্রতিপালন করা হয়, গৃহে অনেকের ভাগ্যে সেরূপ যত্ন ঘটে না।

তথাপি সাধারণ মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা কারাগারের মৃত্যুসংখ্যা দেড় গুণেরও অধিক। অপরাধীদিগের শারীরিক বিকার ইহার একমাত্র কারণ। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যত জনের নর-হত্যা-অপরাধে বিচার হইয়াছে, দেখা গিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩২ জন উন্মাদ। যে ২৯৯ জনের প্রতি দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদেব মধ্যে ১৪৫ জনকে অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেককে মানসিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত বলিয়া সামান্য দণ্ড দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ, শতকরা ৮২ জন নরঘাতককে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত দেখা গিয়াছে। মডেস্‌লি বলেন, পাগল না হইলে কেহ নর-হত্যা করে না।

ইংলণ্ডে শতকরা দশ জন লোকে আদৌ লিখিতে পড়িতে জানে না। কিন্তু জেলের কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন আদৌ লেখাপড়া জানে না। এবং শতকরা ৭০। ৭২ জন অতি সামান্য লেখাপড়া জানে। ইহাতে বুঝা যায় যে, অপরাধীদের অনেকে পিতা মাতার নিকট বা বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষা পায় নাই। অথবা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও, শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু, তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, অপরাধীদের অধিকাংশের কল্পনা, স্মৃতি ও বুদ্ধিশক্তি অতি সামান্য। এই মানসিক দুর্ব্বলতা, সন্তান পিতামাতার নিকট লাভ করে।

অপরাধ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, এ প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাউক :—

১। শীত গ্রীষ্ম ও ঋতুভেদে এবং স্ত্রী ও পুরুষভেদে অপরাধের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

২। ব্যবসায়, বয়স ও অবস্থানভেদে অপরাধের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

৩। কলকারখানা, সমৃদ্ধি ও জনতার শ্রীবৃদ্ধিতে অপরাধের বৃদ্ধি হয়।

৪। সামাজিক শাসন বিচারালয়ের শাসন অপেক্ষা অপরাধনিবারণে অধিক সক্ষম।

৫। উপযুক্ত শিক্ষার প্রচার হইলে অপরাধেব হ্রাস হয়।

কোনও দিন পৃথিবী অপরাধশূন্য হইবে না। অপরাধপ্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। শিক্ষার গুণে, সামাজিক শাসনে ও রাজদণ্ডে, অপরাধসংখ্যার হ্রাস করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

বুধগ্রহ।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় জ্যোতিষী স্কিয়াপেরিলি (Schiaparelli) মঙ্গলগ্রহের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন। অল্প দিন হইল, তিনি আবার বুধগ্রহ (Mercury) সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পর্য্যবেক্ষণ-কুশলতার অসামান্য উদাহরণ দিয়া, জ্যোতিষীমণ্ডলীকে আরো বিস্মিত করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষীদিগের কূটযুক্তি, স্কিয়াপেরিলির আবিষ্কার অসত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে না পারিলে, ইহা একটি বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া, আবিষ্কারকের নাম যে জগতে চিরস্মরণীয় রাখিবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে, বুধই সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থিত এবং ইহার ব্যাসার্দ্ধ কেবলমাত্র ১৫০০ মাইল বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, বুধের আকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার ভারপরিমাণ বড় অল্প নয়, সমগ্র গ্রহটি পাবদ দ্বারা গঠিত হইলে যে ভাব হয়, বুধের প্রকৃত গুরুত্ব অবিকল তাহাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন ও সূর্য্যের সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত, উদয়াস্তকাল ভিন্ন অন্য সময়ে, বুধগ্রহের পর্য্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে যত্নবান্ হন নাই।

অবশ্যপ্রয়াসে, স্থূলযন্ত্রাদির সাহায্যে বুধমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাতে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ স্থায়ী চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যের সান্নিধ্য প্রযুক্ত, আমাদের চন্দ্রের ন্যায়, ইহারও ক্ষয় বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্কিয়াপেরেলির আবিষ্কারের পূর্ব্বে, জ্যোতিষীগণ, বুধসম্বন্ধে এই সামান্য তত্ত্ব ভিন্ন, আর কিছুই জানিতেন না; এবং জানিবার চেষ্টাও করেন নাই। স্কিয়াপেরেলি গত সাত বৎসর অবিশ্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও গণনাদি দ্বারা দেখিয়াছেন,—বুধগ্রহ, পৃথিবীর ন্যায় ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় অক্ষরেখার পূর্ণ আবর্ত্তন করে না; সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিবার কালে, ইহারও একবারমাত্র অক্ষাবর্ত্তন হয়, এবং এজন্য, চন্দ্রের যেমন একার্দ্ধ চিরকালই পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে, বুধেরও সেই প্রকার একার্দ্ধমাত্র সূর্য্যকিরণে আলোকিত থাকে, এবং অপরার্দ্ধ, চিরকালের জন্য ঘোরতমসাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। মঙ্গলগ্রহে যে প্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, বুধের সর্ব্বাংশে সেই প্রকার অসংখ্য চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এই সকল চিহ্নের পরস্পর সংযোগস্থল, স্থূলতর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, মঙ্গলের ন্যায় ইহাতেও এগুলি, নদ নদী ও সঙ্কীর্ণ সমুদ্রের চিহ্ন বলিয়া, জ্যোতিষীগণ অনুমান করিয়াছেন। বুধে বায়ুর অস্তিত্ব বহুকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্কিয়াপেরেলি এখন রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectrascope) সাহায্যে, ইহাতে জলীয় বাষ্পের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন, এবং পর্য্যবেক্ষণকালে কয়েক বার স্পষ্ট মেঘ পর্য্যন্তও দেখিয়াছেন। বুধ-মণ্ডলস্থ চিহ্ন সকলের আকস্মিক অস্পষ্টতা, সম্ভবতঃ, আকাশে ভাসমান মেঘ দ্বারাই হইয়া থাকে, অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন। স্কিয়াপেরেলি বলেন, বুধের উত্তরমেরুপ্রদেশে আকাশ সর্ব্বদাই ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে, এবং ইহার ফলেই উত্তর-মেরু, অপর মেরু অপেক্ষা স্থূলতর বলিয়া বোধ হয়।

স্কিয়াপেরেলি, বুধগ্রহের অদ্ভুত গতির পরিচয় সাধারণে প্রচারিত করিলে, অনেকেই এই নবাবিষ্কার অমূলক বলিয়া, উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থান হেতু, সৌরাকর্ষণজনিত জলবায়ুর ঘর্ষণপ্রভাবে বুধ-গ্রহের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি হওয়া বড় অসম্ভব

নয় বুঝিয়া, আধুনিক খ্যাতনামা জ্যোতিষীমাত্রেই, আবিষ্কারকের কথা সম্পূর্ণ সত্য-মূলক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

বুধ-মণ্ডলস্থ নানা পদার্থ ও ইহার গতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘকালব্যাপী নানা আলোচনা শেষ হইলে, ইহাতে জীব থাকিতে পারে কি না,—এই প্রশ্নটি লইয়া, কিছু দিন তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এবং আধুনিক জ্যোতিষীগণের মধ্যে অনেকেই এই আন্দোলনে যোগ দান করিয়াছিলেন। নানা প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া, বায়ু জল ইত্যাদি জীবের বাসোপযোগী সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব দেখাইয়া, এক দল জ্যোতিষী বুধকে জীববাসের অনুকূল ঠাহরাইয়া, বুধকেও পৃথিবীর ন্যায়, জীবের আবাসভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, আর এক শ্রেণীর জ্যোতিষী, বুধের একার্দ্ধ সকল সময়েই আতপ-তাপিত এবং অপরার্দ্ধ চিরান্ধকারাচ্ছন্ন ও তাপাভাবে চিরতুষারাবৃত, এইরূপ অনুমান করিয়া, ইহাতে অন্ততঃ আমাদের পরিজ্ঞাত কোন জীবই বাস করিতে পারে না বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষীগণ যাহাই বলুন, আজীবন নিদাঘমার্ত্তণ্ডতাপিত দেশে বাস করিয়া, এবং চিরকাল অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিয়া, বুধ-গ্রহবাসী দুর্ভাগ্য প্রাণীদের জীবন, আমাদের হিসাবে যে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও একঘেয়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বুধের কোনও অংশেই, পৃথিবীর ন্যায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না; এমন কি, সূর্য্যের উদয়াস্ত অতি সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ আছে। বুধের কক্ষ-পথের বক্রাধিক্য প্রযুক্ত, ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তস্থ ২৪° অংশ-পরিমিত স্থানে কেবল সময় সময় উদয়াস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সঙ্কীর্ণ স্থানের এক প্রান্তস্থ অধিবাসীগণ, ২৪°-অংশ-পরিমিত উচ্চে সূর্য্যদেবকে ধীরে ধীরে উঠিতে দেখিয়া থাকে, এবং দেড় মাস পরে একবার মাত্র সূর্য্যাস্ত প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু ইহার অপরপ্রান্তস্থ অধিবাসীগণ, এই সামান্য সৌভাগ্যটিও উপভোগ করিবার অবসর পায় না, প্রতি বৎসরে কয়েক দিনের জন্য দূরবর্ত্তী শৈল-শিখরে তরুণ তপনের স্থির ও প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেখিয়াই ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়।

তৈলবাষ্প।

তৈলবাষ্পের প্রকৃতি না জানায়, আমরা অনেক সময় মহা ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের দেশে অগ্নির উপদ্রবে, গ্রাম নগরী একবারে ভস্মীভূত হইবার, ইহাই একটি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল এ দেশে নয়, সভ্যতাভিমানী ও আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের লীলাভূমি আমেরিকা ও য়ুরোপের অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নগর, এই একই কারণে, অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে; এবং এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা ইনস্যুরেন্স্ কোম্পানিদের যে কত অর্থনাশ হইতেছে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। আমেরিকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ ফায়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সভাপতি এটকিন্সন্ সাহেব, সম্প্রতি কোম্পানির ক্ষতির কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যবিবরণীতে, তৈলবাষ্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা, ক্ষতির সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং যদি এই অজ্ঞতা অচিরাৎ বিদূরিত না হয় ও জনসাধারণে যদি এই বিষয়ে পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কার্য্য শীঘ্রই অচল হইয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ যত দূর কল্পনা করি, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৈল-বাষ্প তত অনিষ্টোৎপাদক নয়। আমরা ইহার প্রকৃতি না জানায়, এবং ইহাতে যে অত্যল্প অনিষ্টকারিতা আছে, তাহা নিবারণ করিবার উপযোগী উপায় অবলম্বন না করিয়া, অযথা উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করিতে

গিয়া, একটি অল্পদোষযুক্ত পদার্থকে, মহানিষ্টের মূলকারণ করিয়া তুলি। তৈলবাষ্প যে অত্যন্ত দাহগুণসম্পন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে, কেরোসিন স্পিরিট ইথরাদি দাহগুণসম্পন্ন অপর পদার্থ অপেক্ষা, অধিক অনিষ্টকারী বলিতে পারি না। সাধারণতঃ তৈলসিক্ত পদার্থ বা তৈলপূর্ণ পাত্র উত্তপ্ত হইলে তৈলবাষ্প উৎপন্ন হয়, ইহা কিঞ্চিৎ উত্তাপ পাইলেই প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত তৈল অগ্নিময় করিয়া তোলে। অধিকাংশ-স্থলে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয় জানিয়া, এই প্রকার অবস্থায়, অনেকেই প্রজ্বলিত পদার্থে জল নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিপ্রশমনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু জলসেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া, দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, নিকটস্থ পদার্থ সকল অগ্নিময় করিয়া মহা বিপদের সূত্র-পাত করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই প্রজ্বলিত তৈলবাষ্পে জলসংযোগ করাই, বিপৎ-পাতের একমাত্র কারণ। জল দ্বারা তৈলজ অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া যদি নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টসংঘটনের কোনই কারণ থাকে না। হঠাৎ তৈল জ্বলিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইলে, আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সাধারণতঃ সকলেই তাড়া-তাড়ি প্রজ্বলিত বাষ্পে জলসেক করেন, এবং জলসেকের পর অগ্নি বর্দ্ধিত তেজে জ্বলিতে দেখিয়া, তাঁহাদের অগ্নিনির্ব্বাণের প্রয়াসই যে তেজবৃদ্ধির কারণ, তাহা কেহ মনে করেন না। অপর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হন। আমেরিকার কয়েকটি বৃহৎ কারখানায়, ঠিক পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রজ্বলিত তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড নির্ব্বাপিত করিতে গিয়া, মহা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, বহু লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে রন্ধনশালা অগ্নি-উৎপত্তির একটি প্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিকাংশ স্থলেই তাপাধিক্যপ্রযুক্ত কটাহস্থ তৈলবাষ্প প্রজ্বলিত হইয়া, অনর্থোৎপাদন করে, এবং অনেক সময়েই অগ্নিনির্ব্বাণার্থে জল নিক্ষেপ করা হয় বলিয়া, অগ্নি আরও প্রদীপ্ত হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

প্রজ্বলিত তৈল জলযুক্ত হইলে অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত হয় কেন,—এই প্রশ্নের মীমাংসা বিষয়ে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলেন, উত্তপ্ত তৈলে সংস্পৃষ্ট হইলে, জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় ও ইহা অন্যান্য বাষ্পের সহিত মিলিয়া ভারের অল্পতা নিবন্ধন, সবেগে উপরে উঠিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত তৈলবাষ্পও ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া চারি পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত করে।

অঙ্গুলি-তত্ত্ব।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক যন্ত্রাদির, কালসহকারে কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধানে ফিজ্‌নার (Pfitzner) নামক জনৈক য়ুরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদ্ অনেক দিন অবধি নিযুক্ত আছেন, এবং সম্প্রতি তাঁহার নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল, সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। ফিজ্‌নার সাহেব বহুশতাব্দী পূর্ব্বের নরকঙ্কাল সকল উদ্ধার করিয়া, অধুনাতন কালের কঙ্কালের সহিত তুলনা করিয়া, অস্থিগঠন বা অস্থিস্থাপনের মূল বিষয়ের বিশেষ কোনও উপলব্ধি করেন নাই; কিন্তু পদের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবিষ্কৃত করিয়াছেন। অনেকেই অবগত আছেন, সাধারণতঃ আমাদের হস্তপদের অঙ্গুলি সকলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলীচতুষ্টয়ে দুইটি করিয়া গ্রন্থি দেখা যায়, এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া গ্রন্থি থাকে; অর্থাৎ, অঙ্গুষ্ঠ চারিটি কেবল দুই খণ্ড পৃথক্ অস্থির সমষ্টিমাত্র, এবং অপর অঙ্গুলিগুলি প্রায়ই তিন খানি অস্থিসংযোগে গঠিত। কিন্তু আজকাল অনেক স্থলেই পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে, অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় কেবলমাত্র দুইটি করিয়া যোড় দৃষ্ট হইতেছে। এই সামান্য পরিবর্ত্তনের প্রতি এ

পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই; ফিজ্‌নার ইহার আবিষ্কার করিয়া, এটিকে জীবদেহ-পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সাহেব বহুযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনটি আজও পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; অস্থি পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পূর্ব্বে তিন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, এবং কোনও কারণে প্রথম দুই অংশ সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফিজ্‌নার গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, জীবিত মনুষ্যের মধ্যে শতকরা ৩৬ জনের পদ, উক্ত প্রকার বিকৃতাঙ্গুলীযুক্ত দেখা যায়, এবং ইহার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক।

ফিজ্‌নারের এই আবিষ্কার সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইলে, অনেকেই এটিকে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বলিতে স্বীকৃত হন নাই; আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের সহিত পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দিবসের অধিকাংশ সময় পাদুকা ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, জুতার চাপে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অস্থি জমাট হইয়া যায় বলিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের এই যুক্তি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, ক্রোড়স্থ শিশু ও এক হইতে সাত বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাগণের মধ্যে, এবং পাদুকাব্যবহারে অনভ্যস্ত অর্দ্ধ-অসভ্য জাতির মধ্যেও ঠিক পূর্ব্বোক্ত হারে বিকৃতাঙ্গুলি প্রত্যক্ষ করিয়া, ফিজ্‌নার উল্লিখিত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নয় দেখিয়া, ইহা কোনও জাতিগত অভ্যাস বা ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া, আবিষ্কারক বিবেচনা করেন না। তিনি বলেন, মনুষ্য অস্থির গঠনাদি স্বভাবতঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং এই বিকৃতাঙ্গুলি, সেই অবনতির সূচনামাত্র; কালসহকারে এই প্রকার নানা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে, ভবিষ্যতে নরদেহ এ প্রকার বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইবে যে, অধুনাতন কালের নরদেহ, সেই সুদূর ভবিষ্যতের মানব শরীরের সহিত তুলিত করিলে, ইহা একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় জীবকঙ্কাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফিজ্‌নার এ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিকৃতাঙ্গুলি মানব দেহের পরিবর্ত্তনের বাস্তবিকই প্রারম্ভ, অথবা ইহাই অবনতির শেষ ও চরমসীমা,—তাহার কোনও মীমাংসা করেন নাই। সাহেব আজও উপস্থিত বিষয়টির গবেষণায় বিরত হন নাই। অঙ্গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, জীবিতদেহেও গ্রন্থিপরীক্ষা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার দেখিয়া, তিনি নানা অসভ্য ও নবাভ্যুদিত জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নানাবিধ প্রমাণের সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। যাহা হউক, ফিজ্‌নারের ভবিষ্যৎ বাণী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, এখন পাঠক তাহা বিবেচনা করুন।

প্রতিশোধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাহার দিনে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি সে সম্ভোগ করিত, সভ্যতর দেশে স্বতঃপূজিত প্রতিভাশালীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কথা। বাস্তবিক নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তা বলে বিশ্বনাথ দস্যু ব্যবসায়কেও লোকমনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কৃত লোকহিত এখনও বাঙ্গলার গৃহে গৃহে উল্লাসে কথিত হইয়া থাকে।

অথচ এই বিংশ ডাকাত বঙ্গসমাজের অতি নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এ দেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিত, তখনকার "মানসুরে"ও ডাকাতের দল তাহার প্রমাণ। এই ঘোর অরাজকতা, আমাদের বোধ হয়, দুইটি কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথম নিম্নশ্রেণীর অতিদারিদ্র্য, দ্বিতীয় তাহাদের উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার। এ অবস্থায় যে কোন সমাজে কাপুরুষতা এবং দারুণ প্রতিহিংসার ভাব অত্যাচারিতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলায় ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এমনও শুনা গিয়াছে, একটিমাত্র রৌপ্যচক্রের লোভে "মানসুরে" ব্রাহ্মণ-তনয়কে হত্যা করিয়া দেখিয়াছে, তাহার "গেঁটে"র সে ধন একটি ডবল পয়সা মাত্র, টাকা নহে; এবং তার পর সেই নিহত যজ্ঞোপবীতধারীর বুকে ডবল পয়সাটি রাখিয়া, ক্ষুণ্ণমনে সে চলিয়া গিয়াছে। এই গল্পের মূলে যদি সত্য থাকে, তবে তাহা সমাজ এবং মনুষ্যত্বের কতটা অধঃপাত সূচনা করে, ভাবিলে জ্ঞান থাকে না।

বাঙ্গলায় মানুষের সহিত মানুষের যখন এই অহিনকুল সম্বন্ধ, তখন বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিল। সে এক দিকে ডাকাইতির কাপুরুষতা, এবং নিরর্থক অত্যাচার সংযমিত করিয়া দিল, অন্যত্র সে সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা—ধনবান এবং তাঁহাদের আশ্রয়ছায়ায় বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল—তাঁহাদের যমস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসুরের দল প্রায় অন্তর্হিত হইল। ডাকাইতেরা স্ত্রীলোক, বালক এবং গরিব লোকেদের প্রতি বীরোচিত ক্ষমা এবং দয়া প্রকাশ করিতে শিখিল। এ দিকে দেশের ধন-কুবেরগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের অগাধ ধনের একাংশ বিশ্বনাথ বাবুর অবশ্য প্রাপ্য। সহজে না দিলে, সে বলে লইবে। সেই জন্য বিশ্বনাথের চিঠি পাইয়া যাহারা তাহার দাবি অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত, বাঙ্গলা মুল্লুকে এমন প্রতাপশালী ব্যক্তি সে কালে দুই চারি জনের বেশী ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের অনুচরগণের মধ্যে মেঘা এবং বৈদ্যনাথের নামই সুপরিচিত। ইহাদের প্রত্যেকে এক একটা দিক্‌পাল বিশেষ, অর্থাৎ দিক রক্ষা করাই তাহাদের মুখ্য কাজ ছিল। সম্প্রতি আমরা বৈদ্যনাথের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। নদীয়া জেলার যে দিক্‌টার চিত্র এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে অঙ্কিত হইতেছে, প্রধানতঃ তাহা বিশ্বনাথের ধর্ম্মপুত্র বৈদ্যনাথের অধিকারভুক্ত।

সেই বটচ্ছায়াসংলগ্ন জীর্ণ ইষ্টকালয়ে বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিত —ঘটনার দিনও ছিল। পূর্ব্ব রাত্রে একটা বড় রকমের ডাকাইতি করিয়া সে সদলে শেষরাত্রে প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধানে চূর্ণীনদীতীরস্থ নিবিড় বনে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে মুখের কালীচূণ এবং সিন্দূররাগ ধোয়া মোছার পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া ডাকাইত মহাশয়দিগকে দিকে দিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে। নিতান্ত ভালমানুষটি সাজিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনপথে বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় বৈদ্যনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা কোনরূপে নিবৃত্তি করিয়া সে নিদ্রা দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে এক খানা সওয়ারি নৌকা তাহার দ্বীপ বেষ্টন করিয়া যায়। গবাক্ষপথে বৈদ্যনাথ দেখিল, নৌকায় ৫।৭ জন মানুষ, সকলেই দাঁড় বা লগী লইয়া শশব্যস্ত। নৌকার ভিতরকার পর্দ্দাটা একটু একটু দেখা যাইতেছিল। কাজেই বৈদ্যনাথ বুঝিল, দিব্য একটা শীকার আপনা হইতে সিংহের গুহামুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সে সময়ে বৈদ্যনাথ ছাড়া সেখানে দলের আর কেহ ছিল না। কথা ছিল, সে রাত্রে সে সেই আড্ডানায় বিশ্রাম করিবে, এবং পর দিন দলের লোক সেখানে আসিয়া জুটিলে সকলকে লইয়া দলপতির উদ্দেশে কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইবে। অতএব বৈদ্যনাথ শুধু স্থির নেত্রে নৌকার লোকগুলাকে দেখিতে লাগিল। জালে পড়িয়া সিংহ যেমন পলায়নপর মুখের শীকারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করে, গোপসন্তান বৈদ্যনাথ তেমনি চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীখাতে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন গোয়েন্দা আসিয়া বৈদ্যনাথের নিদ্রাভঙ্গ করিল। সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবীপুরের যে ধনশালিনী ব্রাহ্মণ বিধবার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, আজ তাহার কন্যা মাতার ত্যক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাপথে শ্বশুরালয়ে চলিয়াছে। ইহাও গোয়েন্দা জানাইল যে, তাহার গন্তব্য স্থান প্রায় তিন দিনের পথ—চূর্ণী এবং গঙ্গাসঙ্গমের খুব কাছাকাছি।

বৈদ্যনাথ গোয়েন্দাটাকে খুব একচোট কড়কাইয়া লইল। কেন সে ঠিক্ সময়ে খবর দেয় নাই,—তা হলে কি এমন শীকার হাতছাড়া হয়? এই অনুযোগ যে শব্দালঙ্কারপরিহিত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এ কালের কোন অভিধানে তাহার উল্লেখ নাই। অতএব এ পক্ষ লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়কে তাহা পাঠরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর ফেলিবেন না। গোয়েন্দা বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া সর্দ্দারকে বুঝাইল যে, সকল দোষ সেই ব্রাহ্মণবালিকার।

"সে বড় সেয়ানা মেয়ে মানুষ, ধর্ম্মাবতার, যাওয়ার কথা কারু কাছে ভাঙ্গে নি। হঠাৎ আমি শোন্‌লাম। যেমন শোনা, তেমনি আসা। কিন্তু এত করেও মনিবের মন পাইনে।"

গোয়েন্দা আত্মনিবেদন করিতে করিতে কাঁদ-কাঁদ হইয়াছিল, কাজেই বৈদ্যনাথ যখন মুরুব্বিআনা করিয়া বলিল, "আচ্ছা এক ছিলিম গাঁজা সাজ দেখি," তখন সে সহজেই ভাবিল, তাহার কসুর মাফ হইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে সর্দ্দারের হুকুম তামিল করিয়া গোয়েন্দা অতঃপর বলিয়া উঠিল, "হুজুর, বারদিগর বান্দা এমন কসুর আর করবে না।" বৈদ্যনাথ কোনও উত্তর দিল না। সে কি একটা ভাবিতেছিল।

বিশ্বনাথের আদেশমত পর দিন বৈদ্যনাথের সদলবলে তাহার অনুসরণ করিবার কথা এবং সেই বন্দোবস্তই ঠিক্‌ঠাক্ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে সওয়ারি পাল্কীখানা একেবারে হাতছাড়া হয়। বিশেষ দেবীপুরের ব্রাহ্মণবিধবার বিস্তর অর্থ ছিল, বৈদ্যনাথ জানিত। দুই একবার লোভপরবশ হইয়া তাহার গৃহলুণ্ঠনের উদ্যোগও করিয়াছিল, কিন্তু দলপতির ভয়ে পারিয়া উঠে নাই। বিশ্বনাথের কাছে একবার এই কথা উঠিলে, সে বলিয়াছিল, "যদি বাপের ব্যাটা হোস্, মরদের সঙ্গে লড়ে টাকা আন্। অনাথা বিধবার টাকার উপর ফের লোভ কর্‌বি ত তুই আমার ত্যজ্য পুত্তুর।" কিন্তু উপস্থিত লোভ সংবরণ করা বৈদ্যনাথের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, অতি গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, ধর্ম্মবাপ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

চীন।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সেনাধ্যক্ষ পারিয়ন লিখিয়াছেন যে, চীনদেশে সহসা এক জন নেপোলিয়ন বা বিসমার্কের অভ্যুদয় আশ্চর্য্য নহে, এবং তাহা হইলে চীন জগতের ইতিহাসে ঘোরতর পরিবর্ত্তনসাধনে সক্ষম হইবে। চীনের জনসংখ্যা সমস্ত য়ুরোপের জনসংখ্যার অপেক্ষা প্রায় দশ কোটী অধিক; সেখানে সেনাগণ মরণভীতিশূন্য, নির্ভীকহৃদয়; তাহাদের অস্ত্রাদি অত্যন্ত সুন্দর এবং ইংরাজ ও

চীন।

জর্ম্মান সেনাপতিগণ তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে যত্নবান; সেপাদকার নৌবলও প্রতি বৎসর অধিকবলশালী হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই চীন যুদ্ধে বা আত্মরক্ষায় একটি প্রধানতম বল হইয়া দাঁড়াইবে। লর্ড উলসলিও এই মতের পৃষ্ঠপোষক। সত্য বটে, বহু শতাব্দী হইতে চাইনিসগণ যুদ্ধাদির কোনও চিহ্ন দেখায় নাই, এবং নিতান্ত শান্তভাবাপন্ন জাতির মত বাস করিতেছে, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইতিমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের কোনও কারণ ঘটে নাই।

যদিও এ পর্য্যন্ত চীন সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি চীন সম্বন্ধে এখনও আমাদিগের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস অনেক। কারণ ঐ সকল পুস্তকরচয়িতাগণ অনেকেই চীন দেশের ভাষা জানেন না, এবং সেখানকার কার্য্যাদি তদ্দেশীয় ভাবে দর্শন না করিয়া য়ুরোপীয় কুসংস্কার ও মতামতের বর্জ্জিন চশমার মধ্য দিয়া সে সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাইনিসদিগের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু চীনে পরিবারই জাতীয়তার মূল, এবং সেই প্রায় চল্লিশ কোটী লোক আপনাদিগকে একপরিবারস্থ বলিয়া মনে করে—সম্রাট সেই পরিবারের পিতৃতুল্য। আবার আমরা এই ভাবিয়া থাকি যে, চাইনিসদিগের সভ্যতা স্থির নিশ্চল, তাহার উন্নতি নাই। পরন্তু আমরা যদি এক জন চাইনিস গ্রন্থকারের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি, তবে রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং নৈতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে চাইনিস সভ্যতার স্থির ভাবের কারণ অন্য প্রকার, তিন বা চার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আদর্শানুযায়ী উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই এই নিশ্চলতা।

অজ্ঞতার কারণ।

প্যারিসে চাইনিস প্রতিনিধির কর্ম্মচারী, জেনারল চেঙ-কি-টঙ সম্প্রতি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি "চাইনিস কর্ত্তৃক চিত্রিত চাইনিস" (The Chinese Painted by Themselves) নামক পুস্তক রচনা করেন, এবং এখন ফরাসী ভাষায় "আমার স্বদেশ" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তক হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

গ্রন্থকার বলেন যে, প্রত্যেক চাইনিস পরিবার রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরস্পরের মঙ্গল-সাধনেচ্ছু। সমাজনীতি ও রাজনীতি অভিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ, এবং এই সকলের মধ্যে অন্য দেশের ন্যায় দলাদলির হাঙ্গাম নাই। মহাত্মা কন্‌ফুচে কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে আজও শাসনকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, এবং সেখানে সেই মানবের উৎকৃষ্টতম আদর্শ আপনার ও অন্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ। নয়টি বিভাগের কর্ত্তা নয় জন রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রধানতঃ রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্থানীয় কার্য্যের জন্য আঠারটি প্রদেশে আঠার জন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত আছেন। ইহা ভিন্ন এক শত বিরাশি কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য তত জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন। চীনে পার্লামেণ্ট নাই; কারণ একটা সভা কেমন করিয়া শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তাহা দর্শনপ্রিয় চাইনিসগণ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের এগার শতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত টাউ-চা-ইয়াঙ্ চীনের নিজস্ব সম্পত্তি। সেরূপ ব্যাপার পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার সভ্যসংখ্যা ছাপ্পান্ন; এবং তাহা ভিন্ন কার্য্য-তত্ত্বাবধানের জন্য বার জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন। এই সভ্যেরা শাসনসংক্রান্ত, আইন-সংক্রান্ত এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের কর্ত্তা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাঁরা জনসাধারণের মনোনীত নহেন, সেখানকার একাডেমির তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্য হইতে সম্রাট ইহাঁদিগকে মনোনীত করেন। পরীক্ষা সহজ নহে, এবং আবেদনকারীদিগের মধ্যে

রাজনীতি ও সমাজনীতি।

যাঁহাদিগের চরিত্র উন্নত ও নীতিপ্রবণ, তাঁহারাই এই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের হস্তে যে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাহা তুলনায় অত্যন্ত অসাধারণ, অসীম; কিন্তু তাঁহাদিগের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি এবং পক্ষপাতশূন্যতাও অসাধারণ। তাঁহারা সাধারণ এবং সম্রাট, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। সাধারণের অভিযোগে তাঁহারা মনোযোগ দেন, তাঁহারাই দুর্ভাগ্যদিগের আশা ও ভরসাস্থল, এবং তাঁহারাই ক্ষমতাবান দুষ্কর্ম্মপরায়ণের এবং অক্ষম কর্ম্মচারীর ভীতির কারণ।

পিতৃভক্তি ও পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি সম্মানই চীনে সামাজিক বন্ধনের প্রধান সূত্র। সেখানে পরিবারের প্রতি ভালবাসা লোকের প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। যে কেবল আপনার জন্য জীবন ধারণ করে, সে সেখানে সত্যসত্যই অদ্ভুত জীব বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের কার্য্যের জন্য দায়ী, এক জনের সম্মানে সকলের সম্মান, এক জনের অপরাধে সকলের শাস্তি। কারণ, চাইনিসদিগের বিশ্বাস যে, পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষার অভাব বলিয়াই লোকে কুকার্য্যে রত হয়। এই জন্য সেখানে অপরাধসংখ্যা নিতান্ত অল্প। হুনকতি প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা ২০০০০০০, সেখানে ৩৪ বৎসরে একটি মাত্র খুন হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী ২৫০০০০০০ অধিবাসীর বাসস্থান চিলাই প্রদেশের রাজধানী চিলাইয়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মোট ১২টি মৃত্যুদণ্ড প্রচারিত হইয়াছিল—এইখানে বলা আবশ্যক, কেহ তিন বার চুরি করিলে চীনে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। শিশুহত্যা বা অবৈধপ্রণয়জাত শিশু চীনে বড় নাই।

সমাজবন্ধন।

চীনের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও অধিক, তথাপি তথায় শাসনাদি সমস্ত কার্য্যের জন্য মোটের উপর ৩০০০০ লোকের প্রয়োজন মাত্র। গণনাতীত কাল হইতে চীনে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত। সেখানে সকল প্রধান কার্য্য পরিবারের প্রধানদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক সহর এবং পল্লীগ্রামে এক একটি বিদ্যালয় থাকা চাই—গভর্মেণ্ট কেবল পাঠের প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। অশিক্ষিত লোক চীনে বড় নাই। কিন্তু সাধারণের নীতিশিক্ষা গৃহেই হইয়া থাকে। সাধারণ শিক্ষাতালিকা এইরূপ,—সম্রাটের প্রতি ভক্তি, পিতামাতার প্রতি সম্মান, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে একতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে সদ্ভাব, বন্ধুত্বের দৃঢ়তা। অল্প বয়সে বালকবালিকাদিগের বিবাহ হয়। চীনে গার্হস্থ্যশাসনক্ষম হওয়াই রমণীর ইপ্সিত বাসনা। রমণীরাই সন্তানগণের শিক্ষার প্রধান কার্য্যকারী, তাঁহারা পরিবারের সুখের জন্যই জীবনযাপন করেন, এবং পতি ভাল হইলে তাঁহার অপেক্ষা আর কেহই অধিক সুখী নহে।

স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি।

চীন ফ্রান্সের প্রায় বাইশ গুণ হইবে। সেখানকার সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ কৃষিকার্য্য। য়ুরোপে যেমন এক একটা বড় বড় কারখানায় বহুসংখ্যক লোক কার্য্যে রত, চীনে তাহা নাই। তাই সেখানে গ্রন্থকারের মতে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে কলহও নাই। ধর্ম্মসংগ্রাম কখনও চীনের ইতিহাসপৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই। সেখানকার লোক সেরূপ প্রকৃতির নহে। বুদ্ধ, কনফুচে ও লেওটাস, এই তিন মহাত্মার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণগৌরবে বর্ত্তমান। ইহা ভিন্ন খৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও ইহুদীদিগের প্রতিও কিছু মাত্র অত্যাচার নাই। সত্য বটে, সময় সময় দুই এক জন খৃষ্টিয়ান উৎপীড়িত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কারণ রাজনীতি। তাহারা দেশের সকল আইনাদি অবহেলা করে, তাই এই শাস্তিবিধান। ইহুদীরা খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে চীনে বাস করিতেছে, এবং কর্ম্মক্ষম হইলে রাজকর্ম্মচারীও হইয়া থাকে।

বাণিজ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি।

চীনে মুদ্রাবিভ্রাট নাই; এবং Speculation গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিবারিত, কাজেই সহসা

কাহারও অধঃপতন হয় না। লোকে কেবল চাষবাস ও খালকাটায় টাকা দিয়া ব্যবসা করে। এখন চীনে খালের সংখ্যা করা কঠিন ব্যাপার। খৃষ্টের জন্মের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খালকাটা চলিয়া আসিতেছে। চীনের ব্যবসায়ীগণ খুব সচ্চরিত্র ও অন্যায়ের বিরোধী। এ সম্বন্ধে এক জন ধবাসীর কথা গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিতেছেন। তিনি বলেন যে, একবার একটি গৃহনির্ম্মাণের জন্য এক জন চাইনিস কন্‌ট্রাক্টরের সহিত তাঁহার কন্‌ট্রাক্ট হয়; তিনি অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম দেন। কিন্তু সহসা তাঁহাকে বদলি হইতে হইল—চাইনিস স্বেচ্ছায় তাঁহার টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল।

জগতে প্রকৃত ইতিহাসহীন দেশের সংখ্যা অল্প নহে—যদি এইরূপ পুস্তকের রচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাহা প্রকৃতই সুখের বিষয়।

মরক্কো।

আর্ল অফ্ মিথ "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি" পত্রে লিখিতেছেন, "আমি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু মরক্কোর মত অসভ্য দেশ আর দেখি নাই। সেখানে আইনের পরিবর্ত্তে অবিচার রাজত্ব করে।" মৃত সম্রাট বিনা কারণে তাঁহার সিংহাসনারোহণে সাহায্যকারীকে চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাসে রাখিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। সামান্য সৈনিকেরাও অপরাধী ধরিলে পুরস্কার পায় বলিয়া বিনাপরাধে লোক ধরিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করে। অন্যের দুর্দ্দশায় সেখানে লোকের সুখ। আমরা নিম্নে সেখানকার কারাগারের অবস্থা ও অত্যাচার বর্ণিত করিব।

কারাগার না নরক?

সেখানে অপরাধের তারতম্য জ্ঞান নাই, সকলেই সেই এক কর্দ্দমাক্ত নরকতুল্য গৃহে একত্র বাস করে; শীতগ্রীষ্মে সেই একই অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থা। তাহাদের মধ্যে অনেকে অমানুষ অপরাধে অপরাধী; কাহারও বা অপরাধ অর্থ। এইরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার কামনায় পিশাচ রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে বিনাপরাধে এই নরকে নিক্ষেপ করে। কারাবাসীদিগের গলদেশে একপ্রকার লৌহনির্ম্মিত কলার (collar) থাকে, হয় ত সন্ধ্যার সময় এই কলারে শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া সকল কারাবাসীকে একত্র বন্ধন করা হয়। এক জন দাঁড়াইলে সকলকে দাঁড়াইতে হয়, এক জন বসিলে সকলকে বসিতে হয়, এবং এক জন শয়ন করিলে সকলকে শয়ন করিতে হয়। কি ভীষণ দৃশ্য। ইহা ভিন্ন অপরিষ্কার পয়ঃপ্রণালীগুলি যে কি নারকীয় দুর্গন্ধ বিস্তার করে, তাহা বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নহে। কারাগারের তত্ত্বাবধান নাই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, রোগীর কোনও প্রকার শুশ্রূষার সম্ভাবনা নাই। অনেকে ধর্ম্মার্থে কারাবাসীদিগের আহারীয়ের জন্য টাকা জমা দিয়া গিয়াছেন, যদি কোনও হতভাগ্য কারাবাসী দারিদ্র্যবশতঃ আপনার আহারীয় ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে সেই টাকা হইতে তাহাকে প্রত্যহ এক একখানি ক্ষুদ্র রুটি দেওয়া হয়। তাহাতে কেবল অনাহারযন্ত্রণা আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য জীবন দীর্ঘ করে।

শাস্তির যন্ত্রণা।

মরক্কোর অপরাধীর শাস্তি ভীষণতম। এনজিবার বিদ্রোহের সর্দ্দারদিগের শাস্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ধৃত ব্যক্তিদিগের দক্ষিণ হস্তে প্রতি গাঁইটে তীক্ষ্ণধার খুর দিয়া হাড় পর্য্যন্ত মাংস কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করিবার জন্য হস্ত পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া ক্ষতস্থানে লবণ ঘসা হইয়াছিল। তাহার পরে করতলে তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া বলপূর্ব্বক অঙ্গুলিগুলি সঙ্কুচিত করিয়া কাঁচা গোচর্ম্ম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চামড়া শুকাইয়া যত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, ততই যন্ত্রণা

বাড়িতে লাগিল। অনেকে যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, অনেকে উন্মত্ত হইয়াছিল, এবং যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের বাহু পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল। মানব এত দূর নিষ্ঠুরও হইতে পারে?

অনেকের মতে খৃষ্টীয়ান জাতিরাই এই অত্যাচারের জন্য দায়ী। য়ুরোপ ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ঈর্ষ্যা, সন্দেহ এবং ভয় না থাকিলে যদি সদ্ভাব থাকিত, তবে মরক্কোর মত বর্ব্বর অত্যাচারী রাজত্ব নিশ্চয়ই ধরণীর বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত।

কাশ্মীরে প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি।

ন্যাশান্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি সভায় শ্রীমতী লোগান "কাশ্মীরে প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা "ইণ্ডিয়ান স্যাগাজিন" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য বড় নাই, এবং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর প্রতি লেখিকার ঘৃণাও সপ্রকাশ। তিনি যথাসম্ভব এই ভাব অপ্রকাশ রাখিয়াছেন, তথাপি সে নাসিকা-সঙ্কুচন স্থানে স্থানে স্বইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

কাশ্মীরের রাজস্বের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলকে পাঠাইয়াছিলেন, বিবি ছিলেন তাঁহার সহচরী।

আকবরের সময় হইতে কাশ্মীরের হস্তান্তরের সামান্য ইতিহাস দিয়া শ্রীমতী লোগান বলিতেছেন যে, বড় দুঃখের বিষয়, ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য কাশ্মীর বিক্রীত হইয়াছিল। কাশ্মীরের—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সেখানকার উর্ব্বর ভূমি—যেখানে উভয় মহাদেশের বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে,—সেখানকার প্রায় অব্যবহৃত লৌহ, স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ ও কয়লার খনি দেখিয়া, তাঁহার দুঃখ হইয়াছিল। বিক্রীত না হইলে আজ কাশ্মীর কৃষ্ণ ইংরাজ সৈনিকের কৃষ্ণাবাস হইতে পারিত, আর দেশীয়দিগকে হিংস্র জন্তুর মত দূর করিয়া দিয়া, বা বন্দুক এবং পদাঘাত, এই দুই মহান অস্ত্র ব্যবহার করিয়া তাহাদিগের "নেটিব" জন্ম সার্থক করাইয়া দিয়া, এখানে ইংরাজের একটি উপাদেয় উপনিবেশ উজ্জ্বলভাবে বৃটিশসিংহের অসীম, অপ্রতিহত, অসাধারণ ক্ষমতা চিরদিন লীহা-যকৃৎ-দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবাসীর নিকট ব্যক্ত করিত। হায় এই কাশ্মীর বিক্রীত হইয়াছিল!

কাশ্মীর কি হইতে পারিত।

লেখিকা বলেন, পথের কষ্ট যথেষ্ট। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ট্রেণ যে কি জিনিস, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে এক ঘণ্টা সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। তাহার পর রাউলপিণ্ডী হইতে সে কষ্ট ব্যক্ত করা যায় না। এখনও পথের কাছে বড় বড় পাথর দেখা যায়, বরফের নদী বাহন হইয়া কোন্ দূরদেশ হইতে তাহাদিগকে বহিয়া আনিয়াছে! পথপার্শ্বে ফেনিল উচ্ছ্বাসে, অসীম আবেগে আকুল ঝিলাম নদী ছুটিতেছে। আরও উপরে তাহার পুরাতন প্রবাহের পরিত্যক্ত পথ আজও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে সেতুগুলি কি ভয়াবহ! কোথাও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে হয়; এক স্থানে অশ্বচালক বলিল যে, দুই মাস পূর্ব্বে তিন জন আরোহী সহিত একখানি এক্কা সেই সেতুর উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সহস্র ফিট নিম্নে গভীর গর্জ্জনে গর্ব্বাকুলগতি নদী ছুটিতেছে, হতভাগ্যদের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পথে।

কিছু দূর গিয়া বহমোলা হইতে অশ্বারোহণ আরম্ভ; সেখানে উত্তাপ অসাধারণ, অসহ্য।

এখান হইতে উত্থান। সেই বন্ধুর ভূমির যে দিকে চাও, ঘনবিন্যস্ত ফারবৃক্ষশ্রেণী শাখায় শাখায় বদ্ধ হইয়া কোথাও কোথাও পথ হইতে সূর্য্যকর যত্নে অপসৃত করিয়াছে। বেলা প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে হইল; সহসা ফার-তরুমালা সীমাবেখার আসিয়া দাঁড়াইল, আর সম্মুখে সেই সুরপুরের কল্পনাতীত কমনীয় ছবি,—সেই লোকবিশ্রুত ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পণ্ডিতমণ্ডলী যাহাই বলুন, লেখিকার মতে ইহাই সেই চিরাভিলষিতদর্শন ইডেন উদ্যান। সম্মুখে নদীর তরঙ্গভঙ্গের মত প্রান্তর সমভাবে কতদূর বিস্তৃত। নিম্নস্থান ঘনশ্যামতৃণমণ্ডিত এবং প্রত্যেক উচ্চস্থান সকল বর্ণের কুসুমে মণ্ডিত,—সেই কুসুমবসনে কোথাও একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও নাই। সেই শ্যাম ভূমির উপর গলিতরজতধারার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ সুন্দর স্রোতস্বতী-সমূহ। চারি ধারে দেবদারুর বেষ্টন, সর্ব্বোচ্চে সেই গণনাতীত কালের মহিমাময় গিরি-সম্রাটের শ্বেত তুষারমণ্ডিত স্থির শির, কালের তরঙ্গমালা বৃথা তাহার শিলাময় সমুচ্চ শরীরে আপনার প্রভাবচিহ্ন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অসম্ভব।

ইহার পরেই শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে হয়—শ্রীনগর এখান হইতে ত্রিশ মাইল। প্রথম দশ মাইলের দৃশ্য বড় সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। এই শিলাখণ্ডের উন্নত মস্তকের নিম্নে সূর্য্য-রশ্মির প্রবেশাধিকার নাই, আবার এই পথের উপর সূর্য্যকর পূর্ণমহিমায় পথিকের উপর পতিত। কিন্তু হায়, এই স্বপ্নরাজ্য,—এই মায়াপুরী শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। দুই ধারে কেবল বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। কাশ্মীরে প্রজারা রাজস্ব মুদ্রায় না দিয়া শস্যে দিয়া থাকে। তাহার পর, কেবল জলাভূমি ও জলস্রোত। পথপার্শ্বে পল্লীগ্রাম গুলি ধূলিময়, এখনও শত শতাব্দীর অতীত অসভ্য আবর্জ্জনাময় দৃশ্য। এক স্থানে এক শত জন্তু সাঁতার দিতেছিল—জলস্রোত খুব বিস্তৃত। পথে উত্তাপ অসহ্য। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আবার ঝিলামতীরে উপনীত হইতে হয়, এখানে ঝিলাম খুব বিস্তৃত। সেখান হইতে নৌকা-যোগে শ্রীনগর যাইতে হয়। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ—সেই টীন-মণ্ডিতচূড় মন্দির, আর তাহার উপর তুষারনিবারণের জন্য একটা ছাতার মত জিনিষ, সেই আস্ত আস্ত বৃক্ষ দিয়া নির্ম্মিত সাতটি সেতু—এই একঘেয়ে দৃশ্য। আর একটা জিনিসের উল্লেখ করিতে হয়। সেগুলি "নৌগৃহ"। নৌকার উপর চাটাইনির্ম্মিত অন্ধকারময় একটা ঘর; তাহার মধ্যে চাটাই দিয়া বিভক্ত। এক দিকে নৌচালকের পরিবার ও এক দিকে যিনি ভাড়া লয়েন,—তিনি, বাস করেন। আসবাব কিছু মাত্র নাই এবং আলোকের আবশ্যক হইলে চাটাইয়ের একাংশ সরাইতে হয়। সেই মুক্ত পথ দিয়া অনেক সময় রমণীর বস্ত্রপরিবর্ত্তন বা পুরুষের ক্ষৌরকার্য্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে কাশ্মীরিদের সঙ্কোচ নাই।

অগ্রগতি।

এখন কথা হইল, লেখিকা প্রথমে কি দেখিতে যাইবেন। সকলেই বলিল, প্রথমে ডাল হ্রদ দেখা উচিত। নাম শুনিয়া বড় আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল না; যাহা হউক, নৌকারোহণে যাত্রা করা হইল। আর কোনও পরিশ্রম নাই—বাহকেরা বাহিয়া চলিল। কাশ্মীরে জলপথের অভাব নাই—যেখানে অভাব হইয়াছে সেখানেই খাল কাটা হইয়াছে। ঐ শুন। সেতুর নিম্ন দিয়া যাইবার সময় মাঝিরা সমস্বরে কি চীৎকার করিতেছে।

ডাল হ্রদ।

তাহার পর সেই হ্রদ। তাহার বর্ণনা অসম্ভব। হ্রদ দেখিলেই কাশ্মীরযাত্রা সার্থক বলিয়া মনে হয়। সেই বহুদূরবিস্তৃত স্বচ্ছ জলরাশি, স্থির স্রোতোহীন হ্রদবক্ষ,—নীল নভোমণ্ডল, বহুদূরস্থিত শৈলমালা ও জলতটে [illegible]—সেখানে তেমনই রহিয়াছে! দলে দলে উজ্জ্বলকায় মৎস্য খেলিতেছে [illegible] মিতেছে, কোথাও জলতল জলজ লতাদিতে পূর্ণ, আর উপরে ছোট ছোট [illegible] ফুল

ও হরিদ্রাবর্ণ ফুল। তাহার পর বৃহৎ পত্রের মধ্যে শ্বেত শতদল হ্রদের বিমল বিশুদ্ধ হাস্যের মত প্রস্ফুটিত। সে সৌন্দর্য্য না দেখিলে কেহ অনুভব করিতে পারিবে না। সমস্ত হ্রদের অর্দ্ধেক কেবল জল, আর অবশিষ্টাংশ ছোট ছোট দ্বীপে পূর্ণ—কোথাও একটি গো ও গোবৎস, কোথাও বা মরালমরালীরা মনোরম শয্যায় শয়ান। কোনটির উপর আবাদ হইতেছে। কাশ্মীরিরা দ্বীপ প্রস্তুত করে। ঘন জলজলতাদি একত্র বাঁধিয়া তাহার শিকড় কাটিয়া দ্বীপ প্রস্তুত করিলেই হইল,—তাহার পর একটা খোঁটা পুতিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই চলিতে পারে। যখন তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে, তখন সেটি দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আবাদ সহিত অপর একটি দ্বীপের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেই চলে।

অল্প জলে উইলো জন্মিয়াছে, ঐ ছোট ছেলেরা কর্দ্দমের মধ্যে খেলা করিতেছে, হংসগুলি সলিলের আনন্দে সাঁতার দিতেছে। সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িল—চারি ধারে শৈলমালা তাহার বিদায়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সরমে রক্তাভ। দূরে শ্বেত গিরিচূড়ার উপর সেই স্বর্ণাভ বর্ণ যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটি দ্বীপে গিয়া নৌকা লাগিল। সেই দৃশ্য মধ্যে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বৃটিশ রমণী কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোনও কৌতুক-প্রিয় মুসলমানসুন্দরীর সন্তোষার্থ এই দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই একটি গ্রীষ্মাবাস ও তিনটি বৃক্ষ বক্ষে লইয়া দ্বীপ হাসিত, আর সুন্দরী তাঁহার প্রিয়তমের সহিত এই দৃশ্য দেখিতেন। এখনও গ্রীষ্মাবাসের ভিত্তির ভগ্নাবশেষ আছে,—আর বৃক্ষ তিনটিও বর্ত্তমান। কালের করাল করের কঠোর কীর্ত্তি! যদি ঐ জড় প্রস্তরখণ্ড কথা কহিতে পারিত, তবে হয় ত এই দ্বীপ কত অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা (!) বিস্মৃতপ্রেম ও ঘৃণার (!) কথা কহিত। সূর্য্য অস্তাচলে বিরামশয়নে,—নলিনী প্রভাতের স্বপ্নে মুদিতনয়ন, হংসকুল ফিরিয়া যাইতেছে। কাজেই সেই নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরতলে নৌকা বাহিয়া বিবিকে আবার আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

তাহার পর সহর-দর্শন। প্রধান বক্তব্য বিষয়, সেই সাতটি সেতু স্তূপাকার বৃক্ষকাণ্ডের গ্রাম, দেখিয়া বোধ হয়, এক দিন দৈত্যশিশুরা খেলার ছলে উভয়তীরে কতকগুলি স্রোতে আনীত বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর খানকয়েক কাষ্ঠ ফেলিয়া গিয়াছে। নদীর তীর-ভূমি ত্রিতল বা চতুস্তল গৃহে পরিপূর্ণ,—কাষ্ঠনির্ম্মিত, কারুকার্য্যসুশোভিত, মলিন, জীর্ণ গৃহ। নদীবক্ষ হইতে দেখিতে সুন্দর। সহরে নামিলে সৌন্দর্য্য আর মনে থাকে না। বারাণসী বা নেপল্‌স্ বা লণ্ডন ও প্যারিসের সহরপ্রান্তেও এত দুর্গন্ধ ও ময়লা নাই। যদি ঝিলামনদী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সকল আবর্জ্জনা বহন না করিত, তবে না জানি আরও কি হইত! ছোট ছোট রাস্তা,—হস্ত প্রসারিত করিলে উভয় পার্শ্বের গৃহ স্পর্শ করা যায়। রাস্তার পাথর এমন অযত্নরক্ষিত যে, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার যো নাই। আর দুই ধারে নর্দ্দামা ও ছোট ছোট দোকান,—বোধ হয় একটা দোকানে দশ টাকার জিনিস আছে। মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসা জন বার ধনী সওদাগরের এক-চেটিয়া। রাস্তায় এত কুক্কুর যে, ভয় হয়, একটা না একটা পদতলে পতিত হইবে। লেখিকা আপনাআপনি ভাবিলেন, এই সকল হতভাগা "নেটীব" এক দিনে মরিয়া যায় না কেন! —শীতের তীব্রতা তাহাদিগের চিকিৎ[illegible] গ্রীষ্মের মুক্ত বায়ুতে পরিশ্রম তাহাদিগের ধাত্রী, আর অল্পমূল্য খাদ্য ঔষধ আ[illegible]

সহর।

সহরে অনে[illegible]ন্দির দেখা যায়। ভারতবর্ষে সচরাচর যেরূপ গম্বুজ দেখা যায়, তাহা[illegible]কম গম্বুজ, আবার কোনও কোনটায় কাষ্ঠের ছাতার মত একটা জিনি[illegible]র জন্য ইহা ব্যবহৃত। মন্দিরগুলা টিনে মোড়া, হয় ত তাহা

কেরোসিন তৈলের বাক্সের টিন, প্রথমে খুব উজ্জ্বল ছিল, কিছু দিন পরে কেমন যেন বিষাদ-মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শীলতাবিহীন চতুর্দ্দশবৎসরবয়স্ক বালক ও প্রায় একাদশবৎসরবয়স্কা

মন্দির ও মানব।

বালিকারা উলঙ্গ হইয়া মরাল-দলের মত নদীতে সাঁতার দিতেছে;—ঘাটগুলি জনপূর্ণ। ইডেন উদ্যানের সেই নগ্নতারও অভাব নাই। যখন কোনও য়ুরোপীয় পুরুষ বা রমণী নৌকারোহণে যাইতেছেন, তখন বালিকারা জলমধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, নৌকা চলিয়া গেলেই তাহাদের তরল হাস্য দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু কাশ্মীরের চিরপ্রসিদ্ধ সুন্দরীগণ কোথায়? এত দূর আসিয়া এই স্বপ্নরাজ্যে অপ্সরঃসদৃশী সুন্দরীদের সন্দর্শনাশায় সত্যসত্যই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া ওঠে। কিন্তু যাঁহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই, তাঁহারা সুন্দরী নহেন, হয় ত জেনানার জীবন্ত যাতনাময় পাপ আবরণ, প্রকৃত সুন্দরীদিগকে বায়ু, সূর্য্যালোক ও মানব দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছে। সময় সময় গতিশীল নৌকামধ্য হইতে দুই একটি সুন্দর মুখ, দীপ্ত কৃষ্ণতার দীর্ঘ নেত্র, সুন্দর নয়নপল্লব, সুগঠিত নাসিকা, রক্তাভ গণ্ডস্থল ও লোহিত অধরোষ্ঠের ক্ষণস্থায়ী ছবি নয়নপথে পতিত হয়, কিন্তু হায়, সেই বিজড়িত বেণী, সেই এক অপরিষ্কার পশমী পোষাক। আসল কথা, কাশ্মীরিরা বড় দরিদ্র, এবং দারিদ্র্য ও সৌন্দর্য্য পরস্পরবিরোধী।

কাশ্মীরে রমণীদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়; এমন কি, দশ বৎসরের বালিকারাও ধান ভানিতেছে। তাহারা হাস্যপ্রফুল্লমুখ, ফটোগ্রাফ তোলাইতে বড় আমোদ পায়, আর তার পর হাতে একটি পয়সা দিলে সে আনন্দ দেখে কে! হয় কোলে, নয় পিঠে, নয় পার্শ্বে একটি শিশু,—পঁচিশ বৎসরেই তাহাদিগকে বৃদ্ধা দেখায়। জেনানার এখানে কঠোর প্রতাপ। এক জন বঙ্গরমণী বলিলেন যে, তিনি কলিকাতার মত এখানেও স্বাধীনভাবে থাকিতেন, কিন্তু লোকে তাঁহার স্বামীকে এত নিন্দা করিতে লাগিল যে, তিনি জেনানার নিভৃত অন্তরে আশ্রয় লইয়াছেন। কাশ্মীরে সন্তানবতী হওয়াই রমণীর সর্ব্বপ্রধান সুখ, আর তাহার অভাব সর্ব্বাস্তিক যাতনা। পিত্রালয় ও স্বামীর আলয় ভিন্ন তাহারা আর কোথাও যায় না। আর লণ্ডনে এই সভা, সমিতি, বক্তৃতা, তর্ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা, ধাত্রীগিরী,—এই সকল কার্য্যে রমণীদের হাঁপ ছাড়িবার সময় থাকে না। কবে লণ্ডনের রমণীরা ভাবিবেন, আর কাজ জড়াইবার আবশ্যক নাই। তাহারা যদি নিতান্ত অলস হয়, ইংরাজরমণীরা অতি-রিক্ত কার্য্যতৎপর।

অক্টোবর মাসে বড় লাট কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন রাজস্বের অবস্থা মন্দ হইলেও তাঁহার অভ্যর্থনায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে রাজার আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, তাহা হয়

লর্ড ল্যান্সডাউন।

নাই। তবে তাঁহার আগমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল; রাস্তায় জল, গৃহে জল, সকলেই হতাশ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন সূর্য্য প্রভাতেই পূর্ণমহিমায় প্রকাশ পাইল। শ্বেত শৈলশিখর সেই তপনকিরণে সমুজ্জ্বল, আর বৃক্ষলতা নবপত্রে সুশোভিত। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় লাটের নৌকা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নদীর তীর লোকে পরিপূর্ণ, নানা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত বৃহৎনৌকা লাটগাড়ী, লাট ও মহারাজাকে বহন করিয়া বৃহৎ জলচরের মত আসিতেছিল। সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। এক দিন লাটসাহেবের একটি সমিতিতে লেখিকা উপস্থিত ছিলেন, লাডকের বাদ্যকরদিগের ও নানা বীভৎস-মুখস-পরিহিত নৃত্যকারীদিগের নৃত্যই সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

রাজভ্রাতা অমরসিংহের সহিত লেখিকা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথমে কথাবার্ত্তার বিষয় লইয়া বিপদ উপস্থিত হইল। পরে যখন জানিলেন যে, তিনি ফটোগ্রাফি জানেন, তখন

দানাকথা হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা কথোপকথনে ব্যস্ত, তখন লেখিকার পাঁচ বৎসর-

রাজভ্রাতা।

বয়স্কা বালিকা প্রাসাদপ্রাঙ্গণে আসিয়া মাছতকে দিয়া গজারোহণ করিয়াছে। রাজা তাহাকে কয়েকটি খেলানা দিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে ধন্যবাদপত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন। কাশ্মীরের লোকে সকলেই এমন প্রফুল্ল।

আজও প্রতি বৎসর তিনখানি করিয়া কাশ্মীরি শাল ইংলণ্ডের রাণীকে প্রেরিত হইয়া

শাল।

থাকে। অতি পুরাকালীন কেসানের তন্তুতে তাহা প্রস্তুত হয়—তন্তুর গায় ময়লা কাগজের উপর লেখা থাকে, কোন্ সূতার পর কোন্ সূতা ব্যবহার করিতে হইবে। ভাল একখানি শাল প্রস্তুত করিতে তিন বৎসর সময়ও লাগে। সেখানে শালের মূল্য ১০ টাকা হইতে ১৬০০০ টাকা পর্য্যন্ত। কাশ্মীরে কার্পেটও হয়। ধাতব দ্রব্য ভাল, কিন্তু তাহার কারুকার্য্যের আদর্শ সেই পুরাতন একঘেয়ে রকমের।

কাশ্মীরে ফল যথেষ্ট—দ্রাক্ষাক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, তাহা হইতে মদ্যও হয়। আর একটা কথা আছে, কাশ্মীরে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে লেখিকা বড় কিছু বলেন নাই। শেষে বলিয়াছেন যে, ফিরিবার সময় নৌকার কষ্টের পর পথে আর বড় কষ্ট হয় নাই। কারণ, লাট সাহেবের শুভাগমনের সময় সমস্ত পথ ঘাট ভাল করা হইয়াছিল।

সমাজনীতি।

মহিলাসমাজ।

বর্ত্তমান সময়ে মহিলাদিগের বিষয়ক তর্কে এখন য়ুরোপীয় সমাজ পূর্ণ—সে প্রবাহ এখন এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত যে, দূর বঙ্গদেশেও এখন তাহার দুই একটি তরঙ্গাঘাত দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল তর্ক যে আমাদিগের পক্ষে উপকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, আমরা এখন নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সমাজ কি আকারে গঠিত হইবে, তাহাই এখন বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। "হিউম্যানিটেরিয়ান" পত্রিকায় লেডী ভাষলেট গ্রেভিন "গৃহপ্রিয় রমণী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; আমরা পাঠকদিগের কৌতূহল-নিবারণের জন্য এখানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম।

লেখিকা বলেন, গৃহপ্রিয় রমণী এখন অতীতের মধ্যে পড়িয়াছেন। বাস্তবিক গার্হস্থ্য-জীবনও একরূপ শেষ হইয়াছে। কোনও উত্তেজক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত-থাকাই এখন রমণী-

গার্হস্থ্য জীবন।

দিগের বাসনা,—তাহা তরুণীদিগের পক্ষে ভীষণ ফলপ্রদ, তরুণীহৃদয় সেই বাসনাবিষে বিষাক্ত। এখনকার রমণীদিগের আর সে গৃহ-প্রিয়তা নাই, আবার এখনকার রমণীরা রমণীর ধর্ম্ম ও সামাজিকবন্ধনের মূল বিবাহেও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন! ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন রমণীরা পুরুষের চরিত্র ও সমাজসংস্কারে সারথি বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু লেখিকা বলেন যে, বাস্তবিক চরিত্র-হীন, এবং পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবাপন্ন পুরুষকে বিবাহ করিতেই এখন রমণীর আনন্দ।

লেখিকা বলেন, অনিচ্ছাপ্রবৃত্ত জননীত্ব একটা কথার কথা। প্রকৃতপক্ষে এখন রমণীরা জননীত্ব ঘৃণা করেন, ইহা অপেক্ষা ভীষণ আর কি হইতে পারে? ইহার অর্থ,—এখন রমণীর

জননীজীবন।

রমণীত্ব, হৃদয়ের চিরপ্রসিদ্ধ কোমলতর বৃত্তির বিকাশ নাই। ধ্বংস-প্রবৃত্তিই ইহার আর এক নাম। সত্য হইলে বাস্তবিক এ-অবস্থা ভীষণ হইতেও ভীষণতর।

বলিয়াছি, সত্য হইলে বাস্তবিক এ অবস্থা ভীষণ হইতেও ভীষণতম। এখন কর্ত্তব্য কি? লেখিকা বলেন, যদি সত্যসত্যই রমণীরা পবিত্রতা ও সম্মান ভালবাসেন, যদি তাঁহারা পুরুষের ভাগ্যগঠনকারিণী হইতে চাহেন, তবে উচ্চতর আদর্শের আবশ্যক। হীন অর্থপূজা পরিত্যাগ না করিলে কিছু করিতে পারিবেন না। ধনী অপেক্ষা মহৎহৃদয় ও পবিত্রতাপরায়ণের পূজা করাই শ্রেয়ঃ, বিবাহেও পার্থিব সামান্য বাবুয়ানী অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্যই রমণীর লক্ষ্য হওয়া অভিপ্রেত। রমণীর সমবেত চেষ্টায় সমাজ হইতে হীনতার অন্ধকার দূর হউক, এবং গৃহ পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র হইয়া চিরদীপ্ত সুখস্বচ্ছন্দের ক্রীড়াভূমি হউক। এই হীনতার স্থানে প্রেমের সমতা, ন্যায়ের সমতা, এবং রমণীর স্বভাবজ কোমলতা মানবসমাজকে উন্নততর করিয়া তুলুক।

কর্ত্তব্য কি?

রহস্য।

বিদ্রূপ।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক এডওয়ার্ড এসকু সথার্ণের কার্য্যবিবরণীর সুলভ সংস্করণ সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। সথার্ণ তাঁহার কার্য্যগত রসিকতার (practical joking) জন্যই প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে দুই একটি নমুনা দিতেছি।

ডাক-বিভাগের সহিত পরিহাসপ্রিয়তা সথার্ণ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার খাসের উপর নানাপ্রকার অদ্ভুত কথা ছাপান থাকিত। আর একটি প্রিয় রসিকতা এই ছিল যে, তিনি অতি দূরে কোথাও এক বন্ধুর ঠিকানায় একখানি পত্র দিতেন—ঠিকানা পেন্‌সিলে লিখিত হইত। বন্ধুকে লিখিয়া দিতেন, তিনি যেন ঐ ঠিকানা মুছিয়া আর একজন বন্ধুর ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানেও পূর্ব্ববৎ বন্দোবস্ত ছিল—এইরূপে দশ বার স্থান ঘুরিয়া পত্র আবার তাঁহার হাতে পড়িত। তখন তিনি পেন্‌সিলের লিখিত ঠিকানা মুছিয়া কালি দিয়া লণ্ডনে একজন লোকের নামে ঠিকানা লিখিয়া দিতেন, এবং নানা স্থানের মোহরাঙ্কিতকলেবর খামের মধ্যে এক মাস পূর্ব্বের তারিখ দিয়া একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতেন। কোথায় এক মাস পূর্ব্বে অভিলষিত আহার, আর কোথায় এক মাস পরে এই পত্রপ্রাপ্তি। লণ্ডনে একজন ভদ্রলোকের ঠিকানা লিখিত পত্রখানি ব্রাসেল্‌স্, গ্লাস্‌গো, ডবলিন্, ব্রাইটন্, কর্ক প্রভৃতি দশ বার স্থানে গেল কেমন করিয়া? পত্র পাইয়াই পত্রগ্রাহক এক দরখাস্ত ঝাড়িবেন, এবং অনুসন্ধানের সময় ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পোষ্টমাষ্টারগণ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে, ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ বোধ হইত।

ডাক-বিভাগে।

তাঁহার বন্ধু মিউইয়র্কের মিষ্টার ফ্লোরেন্সের সহিত তিনি অনেক কার্য্যগত রসিকতার অবতারণা করিতেন। কখন বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন যে, ফ্লোরেন্স্ নানাজাতীয় কুক্কুর কিনিতে চাহেন; আর দলে দলে কুক্কুর বিক্রেতারা তাঁহাকে বিরক্ত করিত। কখন বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফ্লোরেন্সের গৃহে শববাহীদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। এক দিন মিষ্টার ফ্লোরেন্স কয়েকটি বন্ধুকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যখন আহার ও আনন্দ চলিতেছে, তখন এক জন অতিথি আহারগৃহ হইতে উঠিয়া কি কার্য্যবশতঃ অন্য কক্ষে গেলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, এক জন বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী,—দেখা না করিয়া সে কিছুতেই যাইবে না। মিষ্টার ফ্লোরেন্স গিয়া দেখিলেন, দ্বারে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে। সে নিতান্ত বৃদ্ধ ও

বন্ধুর অতিথি।

খণ্ড। তিনি তাহাকে কক্ষমধ্যে আসিতে বলিলেন। আগন্তুক বৃদ্ধ বলিল যে, আমেরিকায় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এবং তাহার পরিবারবর্গের এক জনও ইহসংসারে নাই; সে এখন ইংলণ্ডে গিয়া মরিবে, এই তাহার ইচ্ছা। সে কতকগুলি দ্রব্য বেচিতে আসিয়াছে, এবং যদি তিনি ঐগুলি লইয়া তাহাকে তিন শত ডলার দেন, তবে সে দেশে যাইতে পারে। জিনিষগুলি খুব ভাল দেখিয়া গৃহস্বামী দ্রব্যগুলি আগন্তুকের প্রার্থিত মূল্যে কিনিলেন। তাহার পর আহারগৃহে ফিরিয়া আসিয়া চাকরকে বলিলেন, ভিখারীকে বিদায় করিয়া দাও; চাকর বলিল, সে চলিয়া গিয়াছে।

দুই এক জন বন্ধু বলিলেন, হয় ত আগন্তুক জুয়াচোর, এবং সে কিছু চুরি করিল কি না দেখা উচিত। তখন গৃহস্বামীর মনে হইল, জিনিসগুলা ঠিক তাঁহার জিনিসের মত। ছুটিয়া তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন—হরি! হরি! সে তাঁহার জিনিস তাঁহারই নিকট বেচিয়া গিয়াছে। তখনই শোরগোল পড়িয়া গেল, এবং পুলিসে সংবাদ পাঠান হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক জন ভৃত্য বলিল, সে বৃদ্ধকে উপরে উঠিতে দেখিয়াছে। পুলিস ছুটিয়া উপরে গেল। বৃদ্ধ তখন একটি কক্ষে নিশ্চিন্ত মনে কতকগুলি ফটোগ্রাফ্ দেখিতে ব্যস্ত। সে প্রথমে পুলিসকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, পরে ধৃত হইয়া তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিল।

গৃহস্বামী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চোর বেটাকে এখানে,—এই আহারগৃহে ধরিয়া লইয়া আইস।"

ভিক্ষুক গৃহে প্রবেশ করিলে সকলেই তাহার দিকে চাহিল। সথার্ণের চক্ষুর সেই বিশেষ ভাব কখনও লুকান যাইত না—সকলে অবাক হইল, চোর স্বয়ং সথার্ণ। সথার্ণও অতিথিদের এক জন; নিমন্ত্রণে আসিবার সময় কতকগুলি পোষাক লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং কক্ষান্তরে গিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া এই কীর্ত্তি করিয়াছেন।

একদিন সথার্ণ, তাঁহার বন্ধু টুলে এবং আর একজন বন্ধুর একটা নির্দ্দিষ্ট হোটেলে আসিবার কথা ছিল। সথার্ণ সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষে একজন খিট্‌খিটে-চেহারা বৃদ্ধ বসিয়া সেই হোটেলের প্রসিদ্ধ ষ্টিক্ খাইতেছিল, সম্মুখে এক বোতল মদ্য। সথার্ণের মাথায় কি খেয়াল চাপিল, তিনি দ্রুতগতি যাইয়া বৃদ্ধের পৃষ্ঠে সজোরে একটা ধাক্কা মারিলেন—হতভাগা টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া গেল, এবং মদের বোতল গড়াইয়া পড়িল। হস্ত বিস্তার করিয়া সথার্ণ নিতান্ত আহ্লাদিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কেমন আছ? ক' বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তুমি এখানে কোথেকে? বাড়ীর সব ভাল ত?" বৃদ্ধ চটিয়া লাল,—সে বলিল, "এ রকম উপহাসের মানেটা কি? তুমি কে হে? আমি—"

হতভাগা বৃদ্ধ।

নিতান্ত দুঃখিত ভাব প্রকাশ করিয়া সথার্ণ বলিলেন, "মহাশয়, আমি দেখিতেছি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু, কিন্তু এখন দেখিতেছি—একজন অপরিচিতকে সম্বোধন করিয়াছি,—সম্বোধন কেন,—মারিয়া বসিয়াছি। বাস্তবিক আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব!"

বৃদ্ধ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, এবং তিনি তাহার ভগ্ন-বোতল-মদ্যের দাম দিতে চাহিলেও তাহা লইল না; একটা ভুল এমন হইয়াই থাকে বলিয়া আবার আহারীয় আনাইয়া আহার করিতে লাগিল। সথার্ণ বাহিরে আসিলেন। এমন সময় তৃতীয় বন্ধু আসিয়া তাঁহার বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, সথার্ণ বলিলেন, "কিছু আবশ্যক নাই। থাক্, আমার রহস্যের লোকে বড় প্রশংসা করে, আপনি একটাতে সহকারী হইবেন?" এ প্রলোভন অভি-

রুম করা অসম্ভব। বন্ধু সম্মত হইলেন। সখার্ণ বলিলেন, "ঐ ঘরে একজন বৃদ্ধ বসিয়া আহার করিতেছে; আপনি সজোরে তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিবেন, 'আছ কেমন?' পরে যেন ভুল হইয়াছে—এমনই ভাব দেখাইয়া, খুব ক্ষমা চাহিবেন।"

বন্ধু কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে সখার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হইল?" বন্ধু বলিলেন, "তার মদের বোতলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বুড়া ভয়ানক চটিয়া উঠিয়াছিল, যা' হোক, মদের দাম দিয়া তাকে ঠাণ্ডা করিয়াছি। সে আবার খাইতে বসিয়াছে।"

এই সময় টুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সখার্ন বলিলেন, "তার কোনও দরকার নাই;—এখন তুমি যদি আমাকে একটা বাজি জিতাইয়া দাও।" টুলে বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?" তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে এক জন খিট্‌খিটে ইংরাজের মত লোক বসিয়া খাইতেছে—আমি বলি যে, আমি বলিলে তুমি অনায়াসে গিয়া নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তার পিঠে ধাক্কা দিয়া তাকে তার মদের বোতল আর খাবারের উপর ফেলিতে পারিবে। ইনি বলেন, তুমি তাহা পারিবে না। এই নিয়ে বাজি।" টুলে বলিলেন, "কি দায়! এ আর পারব না? তার পর খানিকটা ক্ষমা চাহিলেই হবে;—এই চল্লুম।" টুলে চলে গেলেন, অল্পক্ষণ পরেই কক্ষমধ্য হইতে গোলমালের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ঝগড়া, চেঁচামেচিতে গৃহ পূর্ণ হইল, বৃদ্ধ রাগান্ধ হইয়া হোটেলওয়ালাকে তলব দিল। পথে হোটেলওয়ালাকে ধরিয়া সখার্ন বলিলেন, "দেখ, প্রসিদ্ধ খিষ্টার টুলে ঐ ঘরে গিয়াছেন, এবং বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় করিয়া তোমার পুরাতন খদ্দেরকে উপহাস করিয়াছেন।" সে চলিয়া গেল। সখার্ন বিলম্ব না করিয়া রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া আসিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী।—ভাদ্র। "শিণ্টো মত" শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের একটি ক্ষুদ্র রচনা। প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের উপযোগী। "শিণ্টো মত" জাপানে প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "হরিদাস ঠাকুর" এখনও চলিতেছে। এবারকার তত্ত্ববোধিনীতে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বড় অভাব।

ভারতী।—ভাদ্র। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" এই সংখ্যায় শেষ হইল বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়ের "তারা বাই" একটি ঐতিহাসিক রচনা। প্রবন্ধটিতে বিশেষত্ব কিছু নাই। "বজেট্—১৮৯৪।৯৫" একটি রাজনৈতিক আলোচনা। লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয় বেশ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। "নিবৃত্তি" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি কবিতা। লেখক যে শব্দগুলি দ্বারা কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহাদের অর্থ অবগত আছি, সে জন্য অভিধান খুলিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু এই চিরপরিচিত শব্দগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি এমন একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সমগ্রটির অর্থবোধ করা দুরূহ,—এমন কি,—অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "বদরিকাশ্রমে" তাঁহার ধারাবাহিক ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "অপেক্ষা" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি কবিতা। "চক্র" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উপন্যাস;—এবার দুই পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সমাপ্ত না হইলে কিছু বলা যায় না। "চক্রের" ভাষা সুন্দর। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের "জয় নীলবসনা"—

ইত্যাদি গানের স্বরলিপি দিয়াছেন। গিরীশ বাবুর এত ভাল গান থাকিতে, স্বরলিপিকার এই অর্থশূন্য অসম্বন্ধ গানটি বাছিয়া লইলেন কেন? এই সংখ্যায় "হত্যারহস্য" সমাপ্ত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়।

সাধনা।—ভাদ্র। "ভারতবর্ষে—বারাণসী" ফরাসী ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত; এখনও চলিতেছে। প্রবন্ধটি মনোরম, সুখপাঠ্য। এস্থলে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—"এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দেখা আবশ্যক। কারণ, এই বারাণসী নগরী হিন্দুদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার একটি অতীব প্রাচীন কেন্দ্রস্থল। পূর্ব্বকালে; এখানকার ব্রাহ্মণেরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; তখন বহুদূর হইতে লোক সকল ইহাঁদের প্রকটিত মতবাদ শিক্ষা করিতে আসিত। যে জ্যোতির্বিদ্যা অনন্তের ধ্যানে নিযুক্ত, এখানে সেই জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ আদর ছিল। আজ প্রাতে একটা পুরাতন মান মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রহেলিকাময় বিবিধ যন্ত্রে পরিপূর্ণ—এবং উহাদের গাত্রে অসংখ্য রহস্যময় লেখা বিদ্যমান। এই সমস্ত যখন দেখিলাম, তখন যেন আমার আত্মা সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালে উপনীত হইল—যে সময়ে এই নগরী য়ুরোপীয়দিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, এবং যে সময়ে এখানে এই পুরাতন প্রাচ্য বিজ্ঞানের অনুশীলন বিলক্ষণ চলিতেছিল—কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের অয়ন-গতি গণনা করিতেছিলেন ও মেরুদেশের চতুর্দ্দিকস্থ ভাবকাবলীর আবর্ত্তন পরিমাণ করিতেছিলেন। এখন সংস্কৃত এখানে পণ্ডিতী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুইডেনের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এখনও যেরূপ ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ এখানকার পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন। বেনারসে এখনও বেদ পুরাণ উপনিষদ্ মহাকাব্য প্রভৃতির পুরাতন শ্লোক সকলের ভাষ্য ও টীকা প্রকটিত হইয়া থাকে। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ য়ুরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত। ইংরাজেরা বেনারসকে ভারতবর্ষের অক্সফোর্ড বলিয়া থাকেন। এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, মনে হয় যেন উহা অক্সফোর্ড হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এই সকল ছুঁচালো খিলান, এই সকল খাঁজওয়ালা চতুষ্কোণ চূড়া—এই সকল তোরণ—এই সকল কুলাঙ্গী—এই সকল সরু সরু লম্বা থাম দেখিলে মনে হয়, যেন 'ওরিয়েল' কিম্বা 'ম্যাগ্ ড্যালেনে' প্রবেশ করিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ,—অক্সফোর্ড বিদ্যামন্দিরের গ্রেনাইট প্রস্তরে বৃষ্টি ও কালপ্রভাবে স্থানে স্থানে চাকলা উঠিয়া গিয়াছে—ম্লান আকাশের বিষণ্ণভাব যেন তাহাতে মুদ্রিত হইয়া আছে। পক্ষান্তরে, বেনারসের বিদ্যামন্দিরের প্রস্তর আলোককিরণে দীপ্যমান; অনতিতপ্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বিলাসময় প্রভাব যেন উহার সর্ব্বাংশে অনুপ্রবিষ্ট। উত্তরদেশের বিচিত্রতাশূন্য অসীম প্রান্তর ও কম্পিতকায় সুদূর উদ্ভিজ্জের সহিত এখানকার সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত তালজাতীয় বৃক্ষের যে প্রভেদ, এই উভয় মন্দিরের মধ্যেও সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ছুঁচালো খিলানওয়ালা ঘরের মধ্যে তিন চারি দল ছাত্র, অধ্যাপকের চারিদিকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া আছে। অক্সফোর্ডের পাঠশালা এখানকার পাঠশালার সদৃশ বটে, কিন্তু সেখানে যেরূপ সাহস-দীপ্ত উজ্জ্বল মুখ সকল দেখা যায়, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য মুখ মৃদুমধুর, অপৌরুষিক—অতীব কোমল ও দেহ পাৎলা পাৎলা—আল্‌গা চাদরে আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়। গণিতের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। ছাত্রেরা শোভনভাবে শরীর ঈষৎ হেলাইয়া, মাটির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ওষ্ঠসমীপে উঠাইয়া আমাকে অভিবাদন করিল। বীজগণিতের সঙ্কেত-লিপিতে পরিপূর্ণ একটা কালো রঙ্গের চিত্রের সম্মুখে ছেলেরা আসনপীঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে—জরির ফুলওয়ালা মখমলের টুপি তাহাদের মাথায়। ইহাদের ডিম্বাকৃতি-

মুখ, দীর্ঘ নেত্রপল্লব, শ্যামবর্ণ, সুবঙ্কিম ওষ্ঠ—এই সমস্ত মুখশ্রীতে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও রমণীয় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। আর একটু দূরে, বড় বড় ছেলেরা দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। অধ্যাপকের টেবিলে দুইখানা গ্রন্থ রহিয়াছে। আমি গ্রন্থের নাম পড়িয়া দেখিলাম, ম্যান্‌সেলের দর্শন—স্পেন্‌সরের সামাজিক স্থিতিতত্ত্ব।" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বরলিপির" গানটি অতি সুমধুর। "অপমানের প্রতিকার" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ। "স্তবগান" শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতা। লেখকের কল্পনা যেমন ওজস্বিনী, রচনা তদনুরূপ হয় নাই। "ঘাতপ্রতিঘাত" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি নক্‌সা। আমাদের ভাল বোধ হইল না। "বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দার্শনিক প্রবন্ধ,—অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযুক্ত। "অবসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। ইতিপূর্ব্বে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্র বাবুর "বিনি পয়সার ভোজের" ধরণে লিখিত,—কিন্তু রচনাটি সেরূপ সফল হয় নাই। "প্রাচীন জ্যোতিষ" শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ;—এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।—শ্রাবণ; প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি নূতন প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" হইতে একখানি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইবে শুনিয়া আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পর্ব্বতের মূষিকপ্রসব দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিকের নিকটস্থ হওয়া দূরের কথা, সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যা একখানি চতুর্থ শ্রেণীর পত্রের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছে। এ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি? বিগত ১০ই ভাদ্র তারিখে এই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অথচ পত্রিকায় মুদ্রিত আছে, "শ্রাবণ, ১৩০১।" ১৩০১ সালে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু শ্রাবণ মাসে নহে। "শ্রাবণ" না লিখিয়া "ভাদ্র" লিখিলে এমন কি ক্ষতি হইত? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালার অনেক বড়লোক যোগ দিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস্, সি-আই-ই, যে সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহার সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে পত্রের সম্পাদক,—তথায় এরূপ ব্যবহার শোভা পায় না। মিথ্যা যতই সামান্য হউক, তাহা সর্ব্বথা অপার্হ। এই সংখ্যায় "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" নামক সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে একবার আল্‌বার্ট হলে প্রকাশ্য সভায় পঠিত হইয়াছিল। বোধ হইতেছে, সভায় পঠিত হইবার পূর্ব্বে, ইহা পুস্তিকাকারেও আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, আমরা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হইতে "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" পুস্তিকা কিনিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি,—আমাদের পূর্ব্বশ্রুত ও পূর্ব্বপঠিত সেই প্রবন্ধটি "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়" পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে;—কিন্তু এই পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে যে ইহা আরও দুই অবতারে দুই আকারে ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশে প্রকটিত হইয়াছিল,—পত্রিকার কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। একি ব্যাপার? অনেক সময়ে লেখকগণের দোষে সম্পাদকগণকে এরূপ বিপদে পড়িতে হয় সত্য, কিন্তু এস্থলে যিনিই লেখক, তিনিই সম্পাদক। সম্পাদক জানিয়া শুনিয়া একবার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত নিজের প্রবন্ধটি, স্বীকার না করিয়া কেমন করিয়া পত্রস্থ করিলেন? সম্পাদককে একজন সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক বলিয়া জানি,—তাঁহাকে এইরূপে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চক্ষে ধূলা দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যিনি সম্পাদক হইয়া নিজে এমন কাজ করিতে পারেন,

তাঁহাকে আর কি বলিব? সাহিত্য-পরিষদের "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন," নিয়মাবলীতে এ কথা লিখিত আছে। তাঁহারাই বা কিরূপ তত্ত্বাবধান করিতেছেন? এরূপ সাহিত্যসভা এ দেশে নূতন। সুতরাং সভার কার্য্যনির্ব্বাহকগণের সমুচিত সাবধানতা আবশ্যক। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে,—সম্মুখস্থ পত্রিকা খানি দেখিয়া মনে হইতেছে,—সাহিত্য-পরিষদের সাবধানতা দূরে থাক, দায়িত্ববোধও বড় অল্প। যদি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহকগণের দায়িত্ববোধ থাকিত, তাহা হইলে 'বিশমোল্লার এত গলদ' হইত না। গোটের উপর, পত্রিকা খানি বিফলতা ও অক্ষমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত।

সমীরণ।—একাদশ সংখ্যা। এই সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমেই স্বর্গীয় কবি "বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত কবিতা।" কিন্তু "প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!" ইত্যাদি গানটি অনেকের মুখস্থ আছে,—বহু পূর্ব্বে উহা "কল্পনায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক কিরূপে উক্ত গানটিকে "অপ্রকাশিত" বিশেষণে বিশেষিত করিলেন,—তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বর্ত্তমান সম্পাদকের যত্নে সমীরণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এ সময়ে এরূপ অসাবধানতা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এই সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে,—"জীনৎমহল।" প্রবন্ধটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য। ইহার রচনাপ্রণালীর প্রশংসা করা যায় না,—কিন্তু বিষয়গৌরবে প্রবন্ধটি আদৃত হইবার যোগ্য। "কবিকুঞ্জে"র "অলকদাস" শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর একটি কবিতা;—কিন্তু ইহাতে এই সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠার লাঘব হইয়াছে মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।—শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের "বৌদ্ধ রমণী" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই।

পূর্ণিমা।—ভাদ্র। এ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের "হিমাচল—গহনাহ্রদ" উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই "ঘোনা" হ্রদের বিভ্রাটের কথা অবগত আছেন। লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে "ঘোনা" বা "গহনা"র ভৌগোলিক সংস্থান ও তত্রত্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বেশ চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—"যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার নাম গহনা। গহনা অতি ক্ষুদ্র পল্লী, অতি স্বল্পসংখ্যক কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থান। এই গিরিকন্দরবাসী ন-গণ্য গ্রাম সহসা মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া অক্ষয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে গহনায় কি হইতেছে জানিবার জন্য গঙ্গাতীরবাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত, জানাইবার জন্য ইংরেজরাজ তথা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছেন, তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নিযোজিত হইয়াছেন, কেন এরূপ হইল নির্ণয় করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, আর কখন কি হয় তাহার আলোকালেখ্য অঙ্কনোদ্দেশে একদল ফোটাগ্রাফার মোতায়েন হইয়াছে। গহনা কোথায় এক কথায় বলা সুকঠিন। * * * ভাগীরথীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান হরিদ্বার হইতে ন্যূনাধিক একশত ক্রোশ উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গবিশেষে। এই শৃঙ্গবরের লৌকিক নাম বান্দরপুচ্ছ। বান্দরপুচ্ছ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা মন্দাকিনীকে বক্রপথানুবর্ত্তিনী হইতে বাধ্য করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথ কিন্তু সুরধুনীকে একাকিনী আসিতে হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী কত যে আসিয়া সুরতরঙ্গিণীর পূতবারিতে নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। অধিকন্তু হরিদ্বার হইতে ত্রিশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে দেবপ্রয়াগ নামক পবিত্র তীর্থস্থানে বাম দিক হইতে প্রসন্নসলিলা অলকনন্দা আসিয়া জাহ্নবীজীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। অলকনন্দারও অতুল গৌরব। যে যে স্থানে এক একটি পবিত্র নদীর অলকনন্দার সহিত সংযোগ

হইযাছে, সেই সেই স্থান এক একটি প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপ পাঁচটি প্রয়াগে অলকনন্দার তীরভূমি সুশোভিত ও গরিত্রীকৃত হইযাছে। এই প্রয়াগপঞ্চের নাম যথাক্রমে বিষ্ণুপ্রযাগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রযাগ ও (পূর্ব্বোল্লিখিত) দেবপ্রযাগ, পাঁচটি প্রয়াগ আছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে পাঁচটির অধিক নদী অলকনন্দায় আসিয়া মিশে নাই। বস্তুতঃ বামে ও দক্ষিণে ছোট বড় কতই যে নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে নগেন্দ্রকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া, শিলাস্তূপে নৃত্য করিতে করিতে, অলকনন্দাকে সাদর আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয। ইহাদের অন্যতমের নাম "বিরহী" গঙ্গা। এই ক্ষীণা স্রোতস্বতী ত্রিশূল নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইযা পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত, ও বিরহী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নিম্নে অলকনন্দায় সংমিলিত। ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ২০ মাইল এবং যে ভূখণ্ড হইতে বৃষ্টিধারা আসিযা ইহাকে পরিপোষণ করে তাহার বিস্তার অন্যূন ৯ মাইল, অর্থাৎ প্রায় দ্বিশত বর্গ মাইল ভূমির বৃষ্টিজল বিরহী গঙ্গার নিকট হইতে অলকনন্দা করস্বরূপ গ্রহণ করিযা থাকেন। বিরহীগঙ্গা-দোহিত এই ভূখণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে পর্ব্বত প্রাকার, পশ্চিমে অলকনন্দা, পূর্ব্ব সীমায ত্রিশূল শৃঙ্গ এবং উত্তরে প্রায় তত্তুল্য উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণ সীমা তত উচ্চ নয়। পূর্ব্ব ও উত্তরের পর্ব্বত বেষ্টের উপবিভাগ চির-হিমানীমণ্ডিত;—গ্রীষ্ম ঋতুতে নিম্নাংশের বরফ কিঞ্চিৎ গলিয়া যায়,—শীতসমাগমে আবার সে টুকু পূর্ব্ববৎ হইয়া দাঁড়ায। বিরহী গঙ্গার উভয়তটস্থ পর্ব্বতাঙ্গের ঢাল অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও স্থানে প্রাচীরবৎ লম্বভাবে অবস্থিত। এই সকল স্থানে স্রোতস্বিনী অতি গম্ভীর অথচ অপ্রশস্ত শিলাময সংকীর্ণ পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতে নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত। এই প্রকার গিরিসঙ্কটকে ইংরাজী ভাষায় Gorge বলে। * * * অলকনন্দা ও বিরহী গঙ্গার সঙ্গম স্থান হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বে শেষোক্ত নদীর উত্তর তটে এই ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম পশ্চিমোত্তরপ্রদেশীয রাজপুরুষদিগের শৈত্যাবাস নাইনীতাল হইতে প্রায ৭০ ক্রোশ উত্তরে ও হরিদ্বার হইতে ৮০ ক্রোশ। উত্তরাঞ্চল-পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ইহা হইতে অধিক দূরে নয়। * * * গহনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি সুগভীর ও অতিসংকীর্ণ গিরিসঙ্কট বা Gorge ছিল। ইহারই উত্তরে ময়স্থান নামক এক উচ্চ পর্ব্বতচূড়া করাল বেশে দণ্ডায়মান। কত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণা বিরহী গঙ্গা ময়স্থানের গর্ব্বিত চরণপ্রান্তে কাতরকণ্ঠে বিনীত নিবেদন করিয়াছে, 'প্রভো, একটু সরিযা দাঁড়াও, আমাকে একটু পথ দেও, নতুবা প্রস্তরপেষণে মারা যাই যে।' হায় ময়স্থান সে কথায় তুমি কর্ণপাত কর নাই। * * * কিন্তু আজ তোমার কি দশা? সেই কৃপাভিখারিণী বিরহী গঙ্গা অচিরে তোমার শব দেহকে উল্লঙ্ঘন করিবে। * * আজ ২২শে ভাদ্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী তিথি। গহনার প্রবীণ অধিবাসিগণ একত্রে বসিযা পুনরায় বর্ষা পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না, * * * সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছে; * * * সহসা ও কি? শত বজ্রনিনাদের ন্যায কিসের শব্দ ও? ঐ যা, ময়স্থান-চূড়া ত আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এ দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রামের দিকে,—কোন্ দিকে নয়?—প্রধাবিত হইতেছে। তন্মুহূর্ত্তেই গ্রামবাসিগণ যে যেখানে পারিল ছুটিতে লাগিল, * * * আকাশমণ্ডল ধূলিধূসরিত হইল, কেহই আর কিছু ভাল দেখিতে পায না, * * বড় বড় শিলাখণ্ড নিম্নে পতিত হইয়া অপর পারে ঊর্দ্ধমুখে ভীমবেগে ছুটিতে লাগিল, এই ভাবে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় কুম্ভকারচক্রের ন্যায ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরহী বক্ষে আসিযা যেন ক্লান্ত হইযা শুইযা পড়িল—পতন, উত্থান পুনঃপতনে পর্ব্বতস্কন্ধশোভী কত শত বনস্পতি যে উৎপাটিত ও ভূপতিত হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

ওদিকে বিরহী গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে, মৎস্যগণ নির্জ্জল শিলাতলে কিয়ৎক্ষণ ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যাইতেছে। তিন দিন এই ভাবে মহাপ্রলয়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব ঘুরুর মেঘাস্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়াছিল, তিন দিন পরে সকলে দেখিল, ময়স্থানের উচ্চ চূড়া পুরাণপ্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় বিরহী গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, আর তাহার মৃতদেহ নদীর এক তট হইতে তটান্তর পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ, পূর্ব্বকথিত গিরিসঙ্কট হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত এবং নদীর তলদেশ হইতে আট শত হস্ত উর্দ্ধ স্খলিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা স্তূপরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অভিনব ভীমকলেবর স্তূপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চান কি? ভারত সাম্রাজ্যের ২৮ কোটী ৭০ লক্ষ অধিবাসী যদি প্রত্যেকেই বাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ স্তূপাঙ্গ হইতে এক মণ মৃত্তিকা বা প্রস্তর তুলিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে ৩ মাস সময়ে সমস্ত স্তূপ নিঃশেষিত হইতে পারে। সম্মুখে এই বিকটমূর্ত্তি বিপুল স্তূপ পথ বদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছে, এখন গরীব বিরহী গঙ্গা যায় কোথায়? ইহাকে তখনই ঠেলিয়া ফেলা ত তাহার সাধ্য নয়। তাই গত বৎসরের সেই দিন হইতে একাল পর্য্যন্ত বিরহী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কুলিতেছে, আর গন্তব্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় অলকনন্দার রাজস্ব বকেয়া ফেলিয়া নিজের তহবিলটি হ্রদে পরিণত করিতেছে। এই নিবিড় বর্ষায় হ্রদের জল হু হু বাড়িয়া যাইতেছে, আর অলকনন্দা তথা গঙ্গাতীরবাসিগণ প্রাণ লইয়া অতি দূরে পলায়ন করিতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায় না যাইতেছে, সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে জবরদস্তিতে তুলিয়া দিতেছেন। নদীদ্বয়ের উভয় তটে যত দূর পর্য্যন্ত জল উঠিবার সম্ভাবনা, তত উচ্চে স্থানে স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, আর ঢোল বাজাইয়া প্রজাগণকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহই যেন কখনও স্তম্ভসমূহের নীচে না যায়। এদিকে নূতন বাঁধের পশ্চাতে, ৪ শত হস্তের অধিক গভীর, বাঁধ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৩ মাইল দীর্ঘ ও স্থলবিশেষে প্রায় দেড় মাইল প্রশস্ত একটি হ্রদ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, বাঁধটি পশ্চাৎস্থিত জলের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইবে—না, যতদিন পর্য্যন্ত হ্রদের জলে উচ্ছ্বসিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকিবে।" সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সমস্যার পূরণ হইয়াছে,—অবশেষে বাঁধই ভাঙ্গিয়াছে।

সমালোচনা।

ঐক্যতানিক স্বরসংগ্রহ—শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। স্বরলিপি সঙ্গীতের উন্নতির একটি অবলম্বন। ইহার সাহায্যে চেষ্টা করিলে সকলেই সঙ্গীতের সুখ উপভোগ করিতে পারেন, অভিমানী ওস্তাদদিগের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। স্বরলিপি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গীতকে নিকটস্থ করিয়া তোলে, অর্থাৎ সকলেই দূরদেশের সঙ্গীত হইলেও স্বরলিপি দেখিয়া ঘরে বসিয়া তথাকার সঙ্গীতমাধুরী উপভোগ করিতে পারেন। এই হেতু সঙ্গীতের স্বরলিপিপ্রকাশ আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আদরণীয়।—দক্ষিণা বাবু কনশার্টের গৎ ও থিয়েটারের গীতসমূহের স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কতিপয় গান বাজাইয়া দেখিয়াছি মন্দ শুনিতে নয়। কিন্তু তিনি স্বরলিপির যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তত সুবিধাজনক নহে। দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি তেমন সরল নহে। কিন্তু (গীতসূত্রসারের) বিন্দুমাত্রিক পদ্ধতি না লইয়া যে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা খুব সঙ্গত হইয়াছে; কারণ, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির অপেক্ষা কিছু

জটিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা ইউরোপীয় 'সলফাটনিক' স্বরলিপিরই বাঙ্গালা অনুবাদ মাত্র। দেখিয়াছি, এই ইউরোপীয় 'সলফাটনিক' পদ্ধতিটি সকল পদ্ধতির অপেক্ষা অস্পষ্ট ও জটিল। যে স্বরলিপি যত স্পষ্ট হইবে, ততই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং তাহাকেই সঙ্গীত লিখিবার জন্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা উচিত। এখন পাঠকদিগের সম্মুখে স্বরলিপি-সমূহের মর্ম্মের আভাস দিতেছি,—তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, কোন্ স্বরলিপি সরল, উৎকৃষ্ট ও স্পষ্ট।

দেখুন, দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের মাথায় একটি চন্দ্রবিন্দু, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে একটি বিন্দু, কসিমাত্রিক স্বরলিপিতেও অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে একটি বিন্দু, এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে বিসর্গের ন্যায় দ্বিবিন্দু ব্যবহৃত হয়।

সুরের অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এই যে বিন্দুচিহ্ন, ইহা সকল স্বরলিপির মধ্যেই ন্যূনাধিকপরিমাণে কোন-না-কোনও রূপে প্রবেশ করিয়াছে; ইউরোপীয় সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে এই বিন্দু পার্শ্বে থাকিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুরের বা মাত্রার অর্দ্ধ মাত্রা প্রকাশ করে, 'সলফাটনিক' রে পার্শ্বে থাকিয়া সুরের অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করে; কসিমাত্রিক স্বরলিপিতেও ইহা সুরের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রিকত্ব সূচিত করে; দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ইহা চন্দ্রবিন্দুরূপে সুরের মাথায় চড়িয়া এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের পার্শ্বে ইহা দ্বিবিন্দু হইয়া অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করে।

অর্দ্ধমাত্রাব্যঞ্জক এই বিন্দুচিহ্নের মূল উৎপত্তিস্থান অনেকে ইউরোপীয় স্বরলিপিকে মনে করিতে পারেন—নানাকারণে দেখিয়াছি, মনে হওয়াও সম্ভব; কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে, যেহেতু পূর্ব্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের এই বিন্দু অর্দ্ধমাত্রাসূচক ছিল।—মনে হয়, আমাদের দেশ হইতেই অন্য দেশে ইহার প্রচলন সম্ভব।

অর্দ্ধমাত্রা—অর্দ্ধমাত্রিকত্ব বুঝাইবার জন্য সাংখ্যস্বরলিপিতে অস্পষ্ট চিহ্ন এই বিন্দুর ব্যবহার নাই; তাহাতে স্পষ্ট করিয়া সুরের পার্শ্বে অর্দ্ধমাত্রা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এই স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রা প্রকৃত অর্দ্ধমাত্রিক চিহ্নের দ্বারাই ব্যক্ত হয়। এই প্রকৃত ভাবের দরুণই সাংখ্যস্বরলিপি স্পষ্ট, সরল ও স্বাভাবিক; ইহাতেই তাহার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ। বৃথা বাক্যবল প্রকাশ করিয়া তাহার উৎকৃষ্টতা রক্ষা করিতেছি না। সত্যের ন্যায় তাহা যেমন সরল, তেমনি শুরুগম্ভীর।—এই স্বরলিপির প্রাণকে প্রকৃত সরল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পুনশ্চ, আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব; দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তকের সুরে তাহার মাথায় একটি বিন্দু, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের পার্শ্বে ঈশান কোণে ১ চিহ্ন, আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের মাথায় রেফ-চিহ্ন, এবং কসিমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের মাথায় একটি কসিচিহ্ন থাকে, কিন্তু সাংখ্যস্বরলিপিতে দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের সুর বুঝাইবার জন্য সুরের মাথায় ২ চিহ্ন থাকে। এখন বুঝিয়া দেখুন, সাংখ্যস্বরলিপি কিরূপ স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার স্বপক্ষে আরও দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এই স্পষ্টতাতেই—প্রকৃতরূপপ্রকাশেই ইহার সারল্য মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে। আর বাক্যবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সাংখ্যস্বরলিপি বিচার করিয়া না দেখিয়া দুর্ব্বোধ্য মনে করেন, অথবা তাহা দেখিয়াও যদি কোনও গোলে পড়িয়া থাকেন, সেই কারণে লোকের অনুরোধবশতঃ এবং কর্ত্তব্য ও সত্যের অনুরোধে এত কথা বুঝাইয়া বলিতে হইল, আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।